ছোটগল্প সংগ্রহ

(পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত

প্রমথনাথ বিশী

সম্পাদক : ড. অশোককুমার কুণ্ডু

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

উল্কাপাত

অনেক কাল আগের কথা, অনেক হাজার বছর আগেকার। তখন এ দেশ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল, তখনো দুষ্মন্ত পুত্র ভরত সিংহাসনে বসেনি তাই ভারত নাম অজ্ঞাত ছিল, তখনো সেকন্দারের সঙ্গে গ্রীক চমু সিন্ধু নদী অতিক্রম করেনি তাই ইণ্ডিয়া বা আরো পরবর্তী কালের হিন্দুস্থান নাম অজ্ঞাত ছিল। তখন সবাই এ দেশকে বলতো জম্বুদ্বীপ। সবাই. কিন্তু কয়জন? তখন এই দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গৌরবর্ণ মানুষের কয়েকটি জনপদ মাত্র স্থাপিত হয়েছে—যে আর্য জাতি ঐ দিকের গিরি-সঙ্কট অতিক্রম ক'রে প্রবেশ ক'রে দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, এরা সেই দুর্বার প্রবাহের প্রথম গোটা দুই তরঙ্গ। দেশের বাকি পনেরো আনা অংশ ঘন অরণ্যের আদিম অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেখানে বাস করতো বনের অন্ধকারের মতো কায়াসম্পন্ন যে-সব জাতি, আর্যদের মতে তারা রাক্ষস, পরবর্তীকালে দাস। এই সময়ে এ হেন অবস্থায় হিমালয়ের পাদদেশে, ক্ষিপ্র বেগবান নদীর তীরে কুশপত্তন নামে এক জনপদ ছিল। ওর কাছাকাছি, অর্থাৎ এক দিবসের দূরত্বে আরও কয়েকটি জনপদ ছিল। নামে জনপদ কিন্তু জনসংখ্যা বিরল। কুশপত্তনের নিকটতম জনপদটির নাম ঋষিপত্তন। দুই পত্তনের মাঝখানে বিস্তৃত প্রান্তর, ফসলের সময়ে ভরে উঠে গম, ইক্ষু ও মুদ্গ বা মুগে। সেই মাঠের একদিকে একটি হ্রদ, নীল তার জল, এখন শীতকালে নীলাভ্রের প্রতিফলনে ঘনতর নীল।

সেদিন অপরাহ্নে সেই হ্রদের তীরে পাথরের উপরে পাশাপাশি জলে পা ডুবিয়ে বসে গল্প করছিল একটি যুবক আর একটি কিশোরী।

যুবক শুধালো—কতগুলো পদ্মফুল দেখতে পাচ্ছ?

কিশোরী বলল—ঐ তো ওখানে এক জোড়া।

আমি দেখছি দু' জোড়া।

আর এক জোড়া কোথায়?

কেন এই যে, বলে জল নিমজ্জিত কিশোরীর পা দু'খানি দেখিয়ে দিল।

কিশোরী খুশী হয়ে অধরোষ্ঠ এগিয়ে দিল।

যুবক বলল, আর এক জোড়া—তবে পদ্ম নয়, পাকা তেলাকুঁচা।

এবারে কিশোরী পার্শ্ববর্তী একটি গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, কি সুন্দর ফল, পেড়ে এনে দাও না।

যুবক গাছে উঠে লতা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এল কয়েকটি পাকা তেলাকুঁচা আর সেই সঙ্গে কয়েক গুচ্ছ রাম্না ফুল, যার গায়ে ইন্দ্রধনুর রঙ ছড়ানো। মেয়েটি ফল কয়টি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলো।

যুবক শুধ'লো আর এগুলো?

ফুলে কি হবে?

কি হবে! তবে দেখো।

তখন ফলের সঙ্গে ফুল জুড়ে, রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে পুরুষে তৈরি করলো কঙ্কন, কণ্ঠী, কেয়ূর, কাঞ্চী আর সযত্নে পরিয়ে দিল মেয়েটির অঙ্গে অঙ্গে। তারপরে তাকে জলের নীল দর্পণের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, দেখো।

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সুন্দর নয়?

মেয়েটি বলল, সুন্দর, কিন্তু এখনি যে ম্লান হয়ে যাবে।

যুবকটি গভীর ভাবে স্বীকার করলো, জানো, আমিও তাই ভাবি, খঞ্জনী, ম্লান হয়ে যাবে যে! তোমার রূপের মতো স্থায়ী কোন বস্তু দিয়ে যদি এই সব অলঙ্কার গড়ে দিতাম।

প্রস্তাবে অসমীচীনতা উপলব্ধি করে খঞ্জনী বলে, তা কেমন ক'রে সম্ভব ধনুক, স্থায়ী আর শক্তর মধ্যে আছে লোহা আর তামা

ছিঃ ছিঃ, তা দিয়ে কি তোমার অঙ্গের অলঙ্কার গড়া চলে। ওতে তৈরি হবে শিকল, বেড়ি, কটাহ।

তারপরে ধনুক নিজ মনে বলে, আহা এমন যদি কিছু থাকতো যার রঙ তোমার গায়ের রঙ মেলে, যার কমনীয়তা তোমার দেহের মতো কোমল। প্রজাপতি কত কি সৃষ্টি করেছেন এমন কিছু সৃষ্টি করেন নি কেন?

খঞ্জনী বলে, হয়তো করেছেন, এখনো মানুষের খুঁজে পায়নি। তারপরে বলে, সেদিন ঋষিপত্তনের মৌক্তিক বলছিল, ঐ যে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওখানে নানা রকম আশ্চর্য সুন্দর সব পাথর আছে।

এবারে যুবক রেগে উঠে বলল, আবার তুমি সেই জাল্ম ছোড়াটার সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছ?

তার রাগ দেখে কৌতুক বোধ করলো কিশোরী, বলল, আমি আর মিশতে গেলাম কই। সে আসে আমি কি করবো?

নিষেধ করো।

নিষেধ শোনবার লোক কিনা সে! আর তাছাড়া তোমাকেও তো নিষেধ করেছিলাম, শুনলে কি?

আমি আর সে।

সেও যে ঠিক ঐ কথা বলে, সে আর আমি।

বটে। তবে থাকো এখানে দাঁড়িয়ে আমি চললাম।

যুবক কিছু দূর গিয়ে ফিরে দেখলো কিশোরী তখন দাঁড়িয়ে। ডেকে বলল, থাকো দাঁড়িয়ে, আসুক ভালুক।

ভালুকের নাম শুনে কিশোরী এক ছুটে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো ধনুককে। যুবক তাকে জোরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। তখন খঞ্জনী হাত, গলা আর কোমরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, যাঃ গেল সব ছিঁড়ে। অপ্রস্তুত ধনুক বল্‌লো, তাই তো।

তখন খঞ্জনী বল্‌ল, এমন কিছু দিয়ে অলঙ্কার গড়িয়ে দাও যা সুন্দর হবে, এত সহজে নষ্ট হয় না। তবে আর মৌক্তিককে আমল দেবো না।

ঠিক তো?

নিশ্চয়।

তবে বলছি, দেবো, দেবো, দেবো।

খঞ্জনী বল্‌ল, মনে থাকে যেন [illegible] সত্যি করলে।

যখন তারা দু'জনে গ্রামে প্রবেশ করল তখন অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে, পাশাপাশি তারা এবং গৃহস্থ কুটীরে [illegible] দেখা দিয়েছে। ধনুক বল্‌ল, চলো তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দি।

বাড়ীতে পৌঁছে [illegible] আলোয় দু'জনেই এক সঙ্গে দেখতে পেলো, দেবদারু গাছের ছায়ায় কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু এগিয়ে আসতেই তারা বুঝলো, অপেক্ষমান ব্যক্তি ঋষিপুত্রের মৌক্তিক।

খঞ্জনী বল্‌ল, মৌক্তিক, এত রাতে যে? মৌক্তিক ও ধনুক এক সঙ্গে বলে উঠল। মৌক্তিক বল্‌ল, রাত কই কেবল সন্ধ্যা। ধনুক বল্‌ল, দস্যু ও রাক্ষস তো রাতেই আসে।

তুমি চুপ করো ধনুক, আমি তোমার বাড়ীতে আসিনি।

আমার বাড়ীতে যাবে এমন কি সাধ্য?

খঞ্জনী দেখ্‌ল, গোলমাল বেধে উঠে, শান্ত করবার অভিপ্রায়ে বলল, আহা, চুপ করো তো ধনুক, শুনিই না, কেন এসেছে।

তবে শোন খঞ্জনী, দূরের ঐ পাহাড়টায় আজ গিয়েছিলাম। দেখো কি সুন্দর পাথরের টুকরো পেয়েছি, কুণ্ডল করে কানে পরলে চমৎকার মানাবে তোমাকে।

এই বলে পাথরের টুকরোগুলো ধরলো খঞ্জনীর সম্মুখে, হোমের আলোয় ঝলমল করে উঠ্‌ল। লোভে জলে উঠলো খঞ্জনীর চোখ, বাঃ কি সুন্দর।

সত্যি সুন্দর, তার উপরে প্রশংসা করলো খঞ্জনী। মুহূর্তে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ পেলো ধনুকের। সে গর্জন ক'রে উঠল, তবে রে অনচন, কতকগুলো বাজে পাথর কুচি দিয়ে মন ভোলাতে এসেছ।

উত্তরীয়খানা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে মৌক্তিক বলে উঠল, কে অনচন?

তুমি, তুমি, তুমি।

বটে? আজ আম ধনুর্ভঙ্গ করবো তবে ছাড়বো।

আমিও মৌক্তিক, চূর্ণ না ক'রে ছাড়ছি নে। তখন দু'জনেই মল্লোচিত বেশ

ধারণ করলো।

এতক্ষণ মন্দ লাগছিল না খঞ্জনীর, পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আনন্দ না পায় এমন রমণী জন্মগ্রহণ করেনি। কিন্তু এখন বাড়বাড়ি হয় দেখে খঞ্জনী বলল, তোমরা ক্ষান্ত হও, আমার কথা শোনো।

দু'জনে স্তম্ভিত হয়ে শুধালো, কি বলছ?

পাথর কানে ঝুলিয়ে রাখা যায় না। মৌক্তিক বলল, কেন তামার আঙটায় পরিয়ে নিলেই কানে ঝুলে থাকবে।

না, এমন সুন্দর পাথরের যোগ্য আঙটা তামা নয়।

তবে, শুধায় মৌক্তিক।

এর যোগ্য ধাতু দিয়ে যদি আঙটা গড়িয়ে দিতে পারো তবেই পরবো আমি কানে।

আর যাবে আমার সঙ্গে।

এতক্ষণ রাগে ফুলছিল ধনুক, এবারে বলে উঠল, আর দেরী কেন? এখনি যাও না।

রাগ করো না ধনুক. তুমি যদি দিতে পারো তোমার সঙ্গেই যাবো। যে আগে দিতে পারবে তার সঙ্গে যাবো।

ধনুক বলল, পাথর চাও, আস্ত পাহাড়টা এনে দিতে পারি, কিন্তু এর যোগ্য ধাতু কোথায় পাবো।

তাহলে আর আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না তোমার।

আমিই বা পাবো কোথায়? ভাবভাবে বলল মৌক্তিক।

তবে ঘরে ফিরে যাও।

আমার তো যেতে আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ গাঁওয়রটা যে থাকবে এখানে।

তার আর কি করবে? ওর যে এই গাঁয়ে বাড়ী।

আচ্ছা তাই সই। কালকেই আমি বের হ'ব যোগ্য ধাতুর সন্ধানে, দূর দূরান্তে দেশ দেশান্তে, দেখি কোথাও পাই কিনা!

আর আমি এখানে বসে প্রার্থনা করতে থাকবো, তুমি যেন শীঘ্র শীঘ্র রাক্ষসের পেটে যাও।

খঞ্জনী বলল, পাশাপাশি কেন তুমিও বের হয়ে পড়ো না, দেখা যাক কে আনতে পারে সেই অমূল্য বস্তু।

সমস্ত ভূমণ্ডল ঘুরে এলেও তা মিলবে না।

ধনুক তুমিই না কতবার বলেছ যে খঞ্জনী যা চায় পৃথিবীতে না থাকলে আকাশ থেকে পড়বে।

যা বলেছ তা ছাড়া আর উপায় নেই সে বস্তু পাওয়ার।

আমি বলছি পৃথিবীতে না পাওয়া গেলে আকাশ থেকেই পড়বে।

বটে! আগে পৃথিবীটা ঘুরে এসে', পরে না হয় আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করো।

ধন্নুক, মৌক্তিক, এবার তোমরা যাও, ঐ দেখো দূরে আচার্য আসছেন।

আচার্য খঞ্জনীর পিতা। আচার্যকে দেখতে পেয়ে মৌক্তিক দ্রুত পা চালিয়ে রওনা হল। ব্যঙ্গের সুরে ধন্নুক শুধলো, কি পৃথিবী ভ্রমণে চললে নাকি; সাবধানে যাতায়াত করো। পথে রাক্ষসের অভাব নেই।

এ তোমার অন্যায় ধন্নুক, চাপা গলায় বলেই কুটীরের ভিতরে অন্তর্হিত হ'ল খঞ্জনী, পিতা কাছে এসে পড়েছেন। অগত্যা ধন্নুক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলো।

২

ধন্নুক ও মৌক্তিকের কলহকে কুশপত্তন ও ঋষিপত্তনের কলহ বলে গ্রহণ উচিত হ'বে না, ব্যাপারটা নিতান্তই তাদের ব্যক্তিগত। কুশপত্তন ও ঋষিপত্তনের মধ্যে কলহ দূরে থাক রীতিমতো সদ্ভাব ছিল। সমষ্টিগত কলহের কারণ ধনের ভাগাভাগি নিয়ে। তখনকার দিনে ধন বলতে গোধন; তখন না ছিল সোনা রূপো, না ছিল নানাবিধ মুদ্রা; থাকবার মধ্যে ছিল লোহা আর তামা, তাও অঢেল। চারদিকে অরণ্য, অরণ্যে ফলমূল ইন্ধন সমস্তই সুপ্রচুর, মৃগয়ালব্ধ পশুরও অপ্রতুলতা ছিল না। সকলে এক মাঠে গরু চরাতো, এক বনে সমিধ আহরণ করতো, পাশাপাশি ক্ষেতে গম ও নীবার ধান্য বপন করতো, আর সন্ধ্যা বেলায় গ্রামে গিয়ে নিজ নিজ কুটীর প্রাঙ্গণে হোমাগ্নি ঘিরে বসে ইন্দ্র,বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্তব করতো। কুটীরে তাদের দরজার বদলে একখানা ক'রে ঝাপ, পরনে মোটা গড়ে বসন, অস্ত্রের মধ্যে কোদাল কুড়ুল খন্তা আর তীর ধনুক। সুখে ছিল তারা। শুধু কুশপত্তন আর ঋষিপত্তন নয়, দূর দূরান্তে আরও যে-সব ছোট বড় পত্তন ছিল, যাদের সংবাদ পৌছতো জনশ্রুতিতে, বা কচিৎ অশ্বারোহী পথিকের মুখে, তারা সবাই সুখে ছিল। ধনের অভাবের জন্যই তারা ছিল ধন্য।

পরদিন প্রাতে মৌক্তিক ঋষিপত্তন ছেড়ে বের হ'য়ে গেল, কাউকে কিছু বলে গেল না, দু' তিন দিন যখন ফিরলো না, সবাই ধরে নিল, হয় রাক্ষসের নয় ভালুকের পেটে গিয়েছে। এমন ঘটনা আদৌ বিরল ছিল না। মৌক্তিকের আত্মীয়-স্বজন না থাকায় তার জন্যে কাঁদবার লোক ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই মৌক্তিকের কথা সবাই ভুলে গেল। ভুলবার বিশেষ কারণও ঘটলো।

হঠাৎ আকাশ তপ্ত কটাহের মতো রক্তাভ হ'য়ে উঠল, আর দেখতে দেখতে কয়েকদিনের মধ্যে আকাশ ঘোর রক্তবর্ণ ধারণ করলো; আকাশের তেমন রঙ কেউ কখনো দেখিনি, না' প্রবীণতম ব্যক্তিরাও দেখেন নি। ভীত সন্ত্রস্ত কুশ-পত্তনে ও ঋষিপত্তনে ইন্দ্র ও বরুণের প্রীত্যর্থে যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল, দেবতারা দয়া করে বৃষ্টি দিলে প্রাণ বাঁচে। কারণ আকাশের বর্ণবিপর্যয়ের সঙ্গে অস্বাভাবিক গরম

পড়েছিল। অবশেষে বৃষ্টির বদলে শুরু হ'ল তুষারপাত। অল্প-স্বল্প তুষারপাতের সঙ্গে সকলেই পরিচিত, প্রত্যেক বছরেই হয়ে থাকে। সবাই ভাবলো এ-ও সেই রকম। কিন্তু প্রথম দিনেই ভুল ভাঙলো। সে কি তুষারপাত দু' এক প্রহরের মধ্যেই মাঠ সাদা হয়ে গিয়ে এক হাঁটু বরফ জমে গেল, কুটিরের ঢালু চাল থেকে বরফ গড়িয়ে পড়ে চারিদিকে এক কোমর উঁচু প্রাচীরের সৃষ্টি করলো, গাছের নরম ডালগুলো বরফের ভারে ভেঙে পড়লো আর সেই সঙ্গে মরে মরে পড়তে লাগলো পাখীর দল। এইভাবে প্রথম দিন কাটলো। পরদিন প্রাতে উঠে লোকে আর পরিচিত পৃথিবীকে চিনতে পারে না। কুশপত্তনের চার দিকেই অরণ্য। সে-সব অরণ্যের অধিকাংশ গাছ তুষারভারে ভূপতিত, যেগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের শাখা পত্রহীন, কাণ্ড তুষারে মণ্ডিত। শ্বাপদ দল হয় মৃত নয় নিরাপত্তার আশায় পলায়িত। হ্রদের জল জমে কঠিন হ'য়ে গিয়েছে, তার উপরে তুষার স্তূপ। কদিন আগে যেমন প্রখর তাপ অনুভূত হয়েছিল, এখন তেমনি অনুভূত হ'ল তীব্র শীত, সেই সঙ্গে বইতে শুরু করলো সূচীস্পর্শী ভীম প্রভঞ্জন। কুশপত্তনের অধিবাসীরা আচার্যের কাছে গিয়ে বলল, আচার্যদেব এ কি কাণ্ড। তিনি বললেন, বাপু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, দেখি, একবার ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সকলের কাছে প্রার্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করি।

কিন্তু যজ্ঞ করা সম্ভব হ'ল না, সমস্ত হোমাগ্নি নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে।

চার পাঁচদিন পরে তুষারপাত বন্ধ হ'ল, লোকে ভাবলো বাঁচা গেল, কিন্তু তখনো অনেক কিছু জানতে তাদের বাকী ছিল।

হঠাৎ অনেক রাত্রে পাতার কুটীরে জেগে উঠে কুশপত্তনের অধিবাসীরা দেখলো যে, প্রকাণ্ড আকাশখানা বিদ্যুতের নখ চঞ্চুর আঘাতে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে ঘোর রবে গর্জন হচ্ছে। এমন বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জন আগে কেউ শোনেনি। এমন সময়ে উৎকটতর এক গর্জনে সকলে সচকিত হয়ে উঁকি মেরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে, সমস্ত আকাশ, সমস্ত দিঙমণ্ডল ও সমস্ত পৃথিবী মধ্যাহ্ন জ্যোতিতে ভাস্বর ক'রে তুলে আকাশের পটে নীলাভ শিখা। হল চালনা করে ভীম বেগে ছুটে আসছে এক বিপুল উল্কাপিণ্ড।

আর্তরবে সবাই চিৎকার ক'রে উঠল, মা মা হিংসী মেরো না, মেরো না আমাদের। পৃথিবী কাঁপতে লাগলো, জল স্থল অরণ্য কান্তার টলতে লাগলো, ইন্দ্রিয়গ্রাম বিভ্রান্ত, চৈতন্য মূর্চ্ছিত, উল্কাপিণ্ড মাটিতে এসে আঘাত করেছে।

পরদিন এমন সুপ্রভাত, যেমন স্বাভাবিক, তেমনি শান্ত তেমনি নিরাময়ে পূর্ণ। এ কয়দিনের প্রাকৃতিক নিষ্ঠুরতার চিহ্নমাত্র নাই। কুশপত্তনের ধনুক প্রভৃতি কয়েকজন সাহসী যুবক উল্কাপিণ্ডটার সন্ধানে বের হল, তাদের ধারণা কাছেই কোথাও পড়েছে। কিন্তু কয়েকজন পথ ঘুরে এসেও কোথাও কিছু দেখতে পেল না। তারা হতাশ হ'য়ে যখন ফিরছে, একজন লক্ষ্য করলো যে, তখনো চারদিকে

তুষার জমে রয়েছে, অথচ হ্রদের জল টলটল করছে? এ কেমন করে হল? সেখানেও তো জল জমে গিয়েছিল। কৌতূহলী হ'য়ে এগিয়ে গিয়ে সবাই দেখতে পেলো জল শুধু টলটল করছে না টগবগ ক'রে ফুটছে। ব্যাপার কি? তবে কি ঐ তপ্ত উল্কাপিণ্ড হ্রদের মধ্যে প'ড়ছে আর তারই তাপে তুষার গলিয়ে দিয়ে জলকে ফোটাচ্ছে? তখন সকলে হ্রদের তীরে গিয়ে দেখলো যে জল থেকে গরম বাষ্প উঠছে, একজন তাতে হাত দিল, সঙ্গে সঙ্গে ফোস্কা পড়ে গেল। তবে খুব সম্ভব উল্কাপিণ্ডটা ঐ অংশসম্পর্কিত হ্রদের গর্ভেই পড়েছে। এখন আর কিছু করবার নেই, সকলে ফিরে এসে আচার্যকে সব নিবেদন করল। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনে বললেন, তোমরা যা ভাবছ তা নয় উল্কাপিণ্ড হ্রদের মধ্যে পড়েনি, মৈনাক এসে ওখানে আশ্রয় নিয়েছেন, আমাদের বড় সৌভাগ্য। যাই হোক তোমরা ওদিকে গিয়ে আর ওঁকে বিরক্ত ক'রো না।

আচার্যের কথা শুনে কুশধ্বজের লোকেরা হ্রদের দিকে যাওয়া বন্ধ করলো।

৩

বাকি দিনের পর শূন্য হাতে মৌক্তিক ফিরে এলো, খঞ্জনার কানের কুণ্ডলের যোগ্য কিছু কোথাও মেলেনি। যা নেই তা পাওয়া যায় না। বড় মুখ ক'রে সন্ধানে বেরিয়েছিল, ছোট মুখ হ'য়ে ফিরে এল। ভাবলে আর কেন? এ মুখ আর দেখিয়ে কাজ নেই। এখন মনে হ'ল ধনুক অভিশাপ দেয় নি আশীর্বাদ করেছিল, রাক্ষসের পেটে গেলেই ভালো ছিল। শূন্য হাতে কেমন ক'রে খঞ্জনার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে, সে মুখ ভার করবে, ধনুক ব্যঙ্গ করবে, না সেদিকে যাওয়ার পথ বন্ধ। ঋষিসত্তমের কাছেই বা ফিরবে কেমন ক'রে, সবাই নিষেধ করেছিল এখন বিদ্রূপ করবে। এ হেন অবস্থায় একমাত্র কাম্য মৃত্যু, আত্মহত্যা। হাঁ ঐ হ্রদের জলে ডুবে সব জ্বালা দেবে জুড়িয়ে। ইতিমধ্যে হ্রদ নিয়ে যে সব কাণ্ড ঘটে গিয়েছে তার কিছুই সে জানতে না, তাই নির্ভয়ে যাত্রা করলো হ্রদের দিকে, তা ছাড়া মৃত্যুপথযাত্রীর আবার ভয় কিসের। হ্রদের তীরে এসে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, দৃষ্টি নিবদ্ধ প্রস্তরসম জলের দিকে। পরলোকগত মায়ের মুখ মনে পড়ে মনটা হু হু করে উঠল মনে পড়লো খঞ্জনার কথা, কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে পড়লো ধনুকের মুখ ব্যঙ্গে কঠোর। নাঃ বাঁচবার আর কারণ নেই। খুব জোরে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপরে হাত জোড় ক'রে কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম জানালে তার পরেই ভগ্নমূল শিলাখণ্ডের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো জলের মধ্যে।

মৌক্তিক ডুবছে।

অতলে তলিয়ে চলেছে আরও, আরও নীচে চারদিকে ঘোর অন্ধকার। কিন্তু এ কি. আর নীচে তো যাচ্ছে না, নীচে থেকে কে যেন ঠেলা দিয়ে তুলে

দিচ্ছে উপরের দিকে। কঠোরতর প্রয়াসে দম বন্ধ করলো সে। তখন তার মনে হ'ল না, কেবল কুম্ভক বা দম বন্ধ করবার উপরে ভরসা না ক'রে দেহের সঙ্গে শিলাখণ্ড বেঁধে নেওয়া উচিত ছিল। না, আবার যেন নীচে নামছে। এবারে তার পায়ে শিলাখণ্ড ঠেকলো, ভাবলো, ভালই হয়েছে; ঐ পাথরটাকে আঁকড়ে পড়ে থাকলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, কয়টাই বা মুহূর্ত! শিলাখণ্ড হাত দিয়ে ধরতেই সেটা হাতে উঠে এলো, ছোট একটা পাথরের টুকরো। আর সেই অসতর্কতার সুযোগে জলের নীচের চাপ তাকে সবেগে ঠেলে তুলে দিল, এক লহমার মধ্যে তার মাথা জেগে উঠল জলের উপরে দিনের আলোয়, তখনো হাতে ছিল সেই শিলাখণ্ড। সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেলো সেই পাথরের টুকরো, পাথর ছাড়া আর হবেই বা কি, সে ভাবলো। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে, তার চোখ আর ফিরতে চায় না! এ কি বস্তু? এমন তো কেউ কখনো দেখেনি, এই রকম ধাতুর সন্ধানেই তো দেশ বিদেশে ঘুরে মরেছে, শবশেষে তা মিলল কি না মৃত্যুর গুহার ঠিক চৌকাঠটার কাছে? না, আর মরবার কারণ নেই। পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে সে উঠে এলো জল থেকে—অনেকক্ষণ বিস্ময়মিশ্রিত উল্লাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার দিকে। ভাবলো, এবারে দেখে নেবো ধনুবকে, যখন এরই কুণ্ডল গড়িয়ে পরিয়ে দেবো খঞ্জনীর কানে। আপাততঃ জিনিসটা সাবধানে লুকিয়ে রাখা দরকার, হাতে ক'রে পথেপথে ফিরলে লোভে প'ড়ে পাঁচজনে কেড়ে বা চুরি ক'রে নিতে পারে। তখন একটা গভীর গর্ত ক'রে সেই টুকরোটাকে পুঁতে রেখে তার উপরে একটা চিহ্ন রেখে গাঁয়ের দিকে যাত্রা করলো। তাকে দেখে সবাই বিস্ময়ে আনন্দে নানা রকম প্রশ্ন করলো। সব প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দিল সে।

এই প্রথম মানুষে মিথ্যা কথা বলল, এই প্রথম মানুষের পাঁচজনের চোখ থেকে গোপন করলো আপন সম্পত্তি। মৌক্তিক সোনা আবিষ্কার করেছে।

৪

মৌক্তিক আবিষ্কৃত বস্তুটার নামকরণ করেছে সুবর্ণ। বস্তুটার মনোহর রঙ ঐ নামটির কারণ, আরও একটা কারণ আছে। খঞ্জনীর উজ্জ্বল গায়ের রঙ দেখে মৌক্তিক কখনো কখনো তাকে সুবর্ণ বলে ডাকতো। এখন সেই নামে আর এই বস্তুর নামে একাকার হ'য়ে গেল। মৌক্তিক ভাবে, খঞ্জনীর গায়ে ছাড়া এমন রঙ আর কোথাও দেখিনি—দুটিই সুবর্ণ।

কিন্তু তার মুস্কিল হ'ল এই যে, ঐ শক্ত বস্তুটা দিয়ে কি ভাবে কুণ্ডল গড়ানো যায়, কি ভাবে তার উপরে পাথরের টুকরো বসানো যায়—কিছুই ভেবে পায় না। মাঝে মাঝে লুকিয়ে গিয়ে লুকানো সুবর্ণের টুকরো দেখে আসে। না, ঠিক আছে। এ দিকে শূন্য হাতে যাওয়া চলে না খঞ্জনীর কাছে কিংবা বস্তু

পিণ্ডটাও দেওয়া চলে না, কুণ্ডল গড়িয়ে দেবে তার প্রতিশ্রুতি। ওদিকে ভয় পাছে ইতিমধ্যে ধনুক বিয়ে ক'রে ফেলে তাকে—লোকটা যে গোঁয়ার সব পারে। একটা সঙ্কট কাটিয়ে উঠে পাঁচটা সঙ্কটের কবলে পড়লো সে।

তার মনে পড়লো যে, কামারদের লোহা পিটিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে দেখেছে। লোহা গরম ক'রে পিটোলে যদি অস্ত্র তৈরি হয় তবে সুবর্ণ গরম ক'রে পিটিয়ে কুণ্ডল তৈরি না হবে কেন? কিন্তু কামারের কাছে নিয়ে যেতে সাহস হয় না সুবর্ণখণ্ড। তখন সে গোপনে হ্রদের তীরে গিয়ে সুবর্ণের টুকরো তুলে অনেক দিনের চেষ্টায় আগুনে তাতিয়ে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দুটো কুণ্ডল তৈরি ক'রে আর তার উপরে বসিয়ে দিল রঙিন পাথরের টুকরো দু'খানা। কুণ্ডল তৈরি হ'লে তার আনন্দ দেখে কে! এবারে দেখে নেবে সেই গোঁয়ারটাকে। তার মুখের উপর দিয়ে আনবে খঞ্জনীকে, কানে দুলবে সুবর্ণের কুণ্ডল। আর দেরী নয়, এখনি রওনা হতে হবে কুশপত্তনের দিকে।

কুশপত্তনের কাছে সরস্বতী নদীর ধারে যখন সে এসে পৌছল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। হাঁটু জল নদী পার হ'য়ে ওপারে পৌছতেই দেখতে পেলো খঞ্জনী কলসী ভ'রে জল নিয়ে ফিরছে।

খঞ্জনী আমি এসেছি।

অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে খঞ্জনী চমকে উঠল। কেঁপে উঠল তার কলসীর জল।

তাই তো মৌক্তিক যে। এতকাল কোথায় ছিলে তুমি, কোথায় গিয়েছিলে?

সেদিনের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়েছ খঞ্জনী। সব ভুলে গেলে নাকি? তোমার কানের কুণ্ডলের যোগ্য বস্তুর সন্ধানে বের হয়েছিলাম।

মনে পড়ে খঞ্জনীর, বলে, পেলে নাকি?

এই দেখো—বলে মৌক্তিক বের করে কুণ্ডল জোড়া। সেই আলো আঁধারিতেও ঝলমল ক'রে ওঠে সুবর্ণের কুণ্ডল. বিস্ময়ে আনন্দে লোভে চক চক ক'রে ওঠে খঞ্জনীর চোখ।

নাও পরো।

কোথায় পেলে?

সে সব পরে হবে আর এসো আমার সঙ্গে নিরিবিলি বসে তীরে সুস্থে সব বলবো, অনেক কথা।

সেদিনের প্রতিশ্রুতির পূর্ণ স্মৃতি উদিত হয় খঞ্জনীর মনে, যোগ্য কুণ্ডল যে দিতে পারবে তার সঙ্গে যাবে বলেছিল সে।

কি ভাবছ? গম্ভীর হ'লে কেন?

মৌক্তিক ভাই, তোমার অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছে।

তার মানে?

এর মধ্যে ধনুকের সঙ্গে যে আমার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে।

ভাল বুঝতে পারে না। মৌক্তিক, শুধায়, কার সঙ্গে কার বিয়ে হয়ে গিয়েছে?

মৌক্তিকের কণ্ঠস্বরে ভীত হয় খঞ্জনী অস্ফুটস্বরে বলে, ধনুকের সঙ্গে আমার।

মৌক্তিক উত্তর খুঁজে পায় না। খঞ্জনী বলে, কি করবো আমি। তুমি চলে গেলে, দীর্ঘকালের মধ্যে ফিরলে না, আচার্য বিবাহের প্রস্তাব করলেন, আমি অসহায় মেয়েছেলে কি করতে পারি।

কি করতে পারো! তবে প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়েছিলে কেন?

ও একটা কথার কথা বই তো নয়। তুমি যে সেটাকে এমন সত্য বলে গ্রহণ করবে কে জানতো। এই দেখো না কেন, ধনুক গ্রাম ছেড়ে নড়ে নি।

তার কারণ সে কাপুরুষ। আমি যখন পাগলের মতো দেশে দেশে ঘুরে মরছি, অনাশ্রয়ে, অনাহারে, কখনো ভাল্লুকের মুখে, তখন সে তোমার আঁচল চেপে বসে রয়েছে। অবশেষে মৃত্যুর গুহার মধ্যে প'ড়ে উদ্ধার করে এনেছি এই রত্ন। আর তুমি বলছ কি না কথার কথা, মেয়েছেলে এমনি বাক্য সর্বস্ব বটে।

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে খঞ্জনী বলে উঠল, আমি যাই। দেরী দেখে ধনুক আসছে আমার খোঁজে।

ঠিক সে সময়ে অদূরে ধনুকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হ'ল, খঞ্জন দেরী করোনা, এসো। তার পরেই দ্বিতীয় মনুষ্য মূর্তি দেখে শুধালো, ও কে?

উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। ইতিমধ্যে সে কাছে এসে প'ড়ে মৌক্তিককে চিনতে পেরে বলল, মৌক্তিক যে। তা হ'লে রাক্ষসের পেটে যাওনি।

সেই আশাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে খঞ্জনীকে বিয়ে করেছ। আমি তোমার মতো কাপুরুষ নই, খঞ্জনীর যোগ্য কুণ্ডল তৈরি করে এনেছি—এই দেখো, বলে কুণ্ডল দুটি মেলে ধরলো তার সম্মুখে।

বিস্ময়ে অন্ত থাকে না ধনুকের।

কই দেখি, বলে কুণ্ডল জোড়া নিয়ে সবলে নিক্ষেপ করে সরস্বতীর জলে: মুহূর্তে কুণ্ডল তলিয়ে যায়।

কি করলে, কি করলে—চিৎকার ক'রে ওঠে খঞ্জনী।

কেন, ওর সঙ্গে যাবার ইচ্ছা নাকি?

গেলে ঠেকায় কে, বলে মৌক্তিক।

ঠেকাই আমি, বলে ধনুক ঝাঁপিয়ে পড়ে মৌক্তিকের ঘাড়ে। তখন দু'জনে পরস্পরকে আক্রমণ ক'রে মাটিতে গড়াতে থাকে। রুদ্ধবাক খঞ্জনী দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝতে পারে না কি কর্তব্য। দীর্ঘকালের পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিল মৌক্তিক, অল্পক্ষণের মধ্যে পরাভূত হ'য়ে এলিয়ে পড়ে। ধনুক দাঁড়িয়ে উঠে দু-তিন বার পদাঘাত ক'রে মৌক্তিককে, তারপরে খঞ্জনীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায় গ্রামের দিকে। তার কলসীটা আর মৃতপ্রায় মৌক্তিক সেখানেই পড়ে থাকে।

সুবর্ণের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

মৌক্তিকের যখন জ্ঞান হ'ল, তখন অনেক রাত, চোখে পড়লো কালপুরুষের হীরক খচিত তরবারিখানা দিগন্তের দিকে ঝুলে পড়েছে। মূঢ়ের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে রইলো যেন চরাচরের সঙ্গে তার কোন অনিবার্য যোগ নেই, যেন সে এ সমগ্রের অঙ্গীভূত নয়, কোন্ নক্ষত্রলোক থেকে ছিটকে এসে পড়েছে কিন্তু এমন তো দীর্ঘকাল থাকতে পারে না, জ্ঞান ও দেহ সতেজ হয়ে উঠতেই অবস্থার সম্যক প্রত্যয় হ'ল। তখন একটা অন্ধ আক্রোশে ভ'রে উঠল তার মন। কার উপরে? কার উপরে নয়? কুশপত্তন, ঋষিপত্তন, ধনুক, হাঁ এমন কি খঞ্জনীর উপরেও। সে কিনা প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন ক'রে আগেই বিয়ে ক'রে ফেলল, মৌক্তিকের প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতীক্ষা করল না। না, সব সমান। ক্রোধের সঙ্গে ফিরে পেল বল, উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করলো ঋষিপত্তনের দিকে।

এদিকে পরদিন প্রত্যূষে, অন্য দিনের চেয়ে আগে শয্যা ত্যাগ ক'রে কলসী নিয়ে খঞ্জনী চলল সুবর্ণতী নদীর দিকে। সারারাত্রি সেই উজ্জ্বল ধাতুখণ্ড তার মনের মধ্যে বিচ্ছুরণ করেছে। কলসী নামিয়ে রেখে জলের মধ্যে হাতড়ে খুঁজতে লাগলো। জল সামান্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে ঠেকল সুবর্ণ কুণ্ডল। সত্যি তাই কিন্তু আর একটি গেল কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও দ্বিতীয় কুণ্ডল পেলো না।

অনেকক্ষণ, কুণ্ডলটির মনোহর ঔজ্জ্বল্যের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধভাবে বসে রইলো খঞ্জনী। কিন্তু এমনভাবে সারাদিন তো বসে থাকা যায় না, বন থেকে সমিধ সংগ্রহ করে ফিরে এসে তাকে বাড়িতে দেখতে না পেলে খুঁজতে বের হবে ধনুক। হয়তো এখানে কুণ্ডল সমেত আবিষ্কার করবে খঞ্জনীকে, তাহলে আর রক্ষা নেই। ধনুক হাড়ে চটে গিয়েছে মৌক্তিক আর কুণ্ডলের উপরে, কাল রাতে বেশ বুঝতে পেরেছে। কাজেই কুণ্ডল আর কানে পরা হ'ল না, আঁচলে বেঁধে নিয়ে ফিরে চললে খঞ্জনী।

খঞ্জনী, আজকাল তোমার কি হ'য়েছে, কথা বলো না কেন?

কেন বলবো না, এই তো বলছি।

এ কি কথা বলা হ'ল? এ কেবল উত্তর দেওয়া, তা-ও বাধ্য হ'য়ে।

শরীরটা তেমন জুৎ নেই।

ধনুক বলে, শরীর বেজুৎ হওয়ার কথা আমার, সেদিন গাঁওয়ারটার সঙ্গে জোর লড়াই করতে হ'য়েছিল।

কাজটা ভালো করোনি।

খারাপটাই বা কি করেছি?

করোনি! খামোকা একটা লোককে মারপিট করলে।

বেশ করেছি। একজন পত্নীকে ভাঙচি দিতে এসেছিল।

ও সব তোমার কল্পনা।

তবে ঐ কুণ্ডল দুটোও কল্পনা! ও দুটো গিয়েছে, আপদ গিয়েছে।

আর কেউ না জানুক খঞ্জনী জানে, দুটো যায়নি. একটা তখনো বাঁধা আছে খঞ্জনীর আঁচলে। লুকিয়ে রাখতে হবে কিন্তু কোথায় রাখবে, কেউ যদি খুঁজে পেয়ে নিয়ে যায়, তাই আঁচলে বেঁধে সঙ্গে রাখে। সে ভাবে, এ কেমন বস্তু যা কানে পরলে অশান্তি, লুকিয়ে রাখলে শান্তি নেই। ধনুক বলেছিল, কুণ্ডলজোড়া সাপের চোখ জোড়ার মতো ভীষণ সুন্দর, আর ও সৌন্দর্যের দিকে না এগোনোই উচিত।

দেখো খঞ্জনী, তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আর কখনো যদি ঐ বাউণ্ডুলেটাকে দেখি তোমার কাছাকাছি, তবে তাকে খুন ক'রে ফেলবো।

এই বলে চলে যায় ধনুক। খঞ্জনী জানে, বাজে কথা বলবার লোক নয় ধনুক, প্রয়োজন হ'লে মেরে ফেলতে পারে বটে। মৌক্তিক আর না আসুক তাই সে মনে মনে কামনা করে। কিন্তু তখনি মনে পড়ে খণ্ডিত কুণ্ডলের কথা। জোড়া ভাঙা কুণ্ডল কানে দিয়ে সুখ নেই। কল্পনায় দেখে, দুই কানে দুই কুণ্ডল ঝলমল করছে, কেবলমাত্র তারই দুটো কানে. কুশপত্তনের আর সমস্ত নারীর কানে কড়ির কুণ্ডল, শাঁখের কুণ্ডল আর আচার্য কন্যা খঞ্জনীর কানে স্বর্ণ কুণ্ডল, যার অনুরূপ কেউ কখনো দেখেনি। কিন্তু এক কান যে ন্যাড়া হয়ে থাকবে, আর একটা কোথায় গেল? না, জলের নীচে নেই খুব ভাল ক'রে দেখেছে। তখনি মনে পড়ে, মৌক্তিকের কাছে নিশ্চয় আছে, কারণ ঐ কুণ্ডল দুটোর মধ্যে স্বর্ণ পেয়েছে, বেশি পায়নি এমন হ'তেই পারে না। কুণ্ডল না থাক স্বর্ণ আছে, তৈরি ক'রে দেবে মৌক্তিক। খঞ্জনী স্থির করে, মৌক্তিকের সঙ্গে দেখা করতেই হবে কিন্তু খুব গোপনে, ধনুক জানতে পারলে আর রক্ষা নেই, না মৌক্তিকের না খঞ্জনীর? আজই দেখা করবে সন্ধ্যার সময়ে।

অনেক রাতে মনুষ্য স্পর্শে মৌক্তিক জেগে উঠল—

কে? কে?

আস্তে কথা বলো মৌক্তিক আমি খঞ্জনী।

তুমি এত রাতে এখানে? ধনুক জানতে পারলে তোমার সঙ্কট ঘটবে।

সে গিয়েছে গিরিপত্তনে চন্দন কাষ্ঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, আজ রাতে ফিরবে না।

এবারে উঠে বসলো মৌক্তিক, বলল, হঠাৎ কি মনে করে?

জলের মধ্যে একটা কুণ্ডল খুঁজে পেলাম, আর একটা কোথায়?

নদী পার হওয়ার সময়ে পায়ে বেধেছিল, নিয়ে এসেছি! ওঃ সেটার জন্যেই এসেছ! আমি ভেবেছিলাম ভালোবাসো।

ভালোবাসি বইকি।

তবে নিশ্চয় ধনুকের চেয়ে নয়।

ছোট্ট একটি 'না' বলে খঞ্জনী।

আর নিশ্চয় ঐ কুণ্ডলটার চেয়েও নয়।

উত্তর দেয় না খঞ্জনী।

আচ্ছা নিয়ে যাও, বলে শয্যার তলা থেকে বের ক'রে কুণ্ডলটা দেয় খঞ্জনীর হাতে। খঞ্জনী বলে, দু'কানে বেশ মানাবে; পাড়ার সুবালা, সুদামীদের শাঁখের কুণ্ডল, ওরা আচ্ছা জব্দ হবে।

হু, বলে মৌক্তিক।

আর দেরী করবো না, অনেক সময় আগে ফিরে আসে ধনুক।

এই বলে কুণ্ডল দুটো হাতের মুঠোয় চেপে ধরে মৌক্তিকের কপালে একবার অধরোষ্ঠ স্পর্শ করিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে বের হ'য়ে গেল খঞ্জনী।

বুকের ভিতরে অন্ধ আক্রোশ পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে থাকে মৌক্তিকের। এই সংসার, এই খঞ্জনী, এই সুবর্ণ!

খঞ্জনী কুটীরে প্রবেশ করবার সময়ে দেখতে পেলো—দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ধনুক।

দু'দিন বাদে খঞ্জনীর মৃতদেহ হ্রদের জলে ভেসে উঠল। খবর পেয়ে দেখতে গেল মৌক্তিক। না, এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই, দুই কানে দুলছে সুবর্ণের সেই দুটি কুণ্ডল।

মৌক্তিক গ্রামে ফিরলো না—চলল অনির্দিষ্টের পথে। একবার বের হ'য়েছিল খঞ্জনীকে খুশী করবার আশায়, এবারে বের হ'ল তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্পে। কুশপত্তন গ্রাম নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে, না পারে আর ফিরবে না এদিকে। খঞ্জনী মরলো, ও বেঁচে থাকতে যাবে কেন?

৫

সেই উল্কাপাতের ঘটনার পরে তিন চার মাস চলে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে। এবারে যেমন দারুণ শীত পড়েছিল তেমনি দারুণ গরম। গ্রীষ্মকালে হ্রদের জল কমে যায়, এবারে কিছু বেশি কমলো। লোকে আচার্যকে কারণ শুধালে তিনি বললেন, প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে মৈনাক জলপান করছেন, কিছু বেশী তো কমবেই। মৈনাকের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে হ্রদ জলশূন্য হয়ে পড়লে মৈনাককে দেখা যাবে আশায় সকলে অপেক্ষা করতে লাগলো। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হ'ল না—একদিন দেখা দিলেন মৈনাক। বিশাল বপু প্রাতঃসূর্যের প্রভাময়, পেশীময় দেহ পাথরে ধাতুতে মিশিয়ে গঠিত; অথচ জীবনের কোন লক্ষণ নেই, নেই এতটুকু চঞ্চলতা, নেই এতটুকু শব্দ। সকলে ভীত বিস্মিতভাবে তটস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জল আরও কমলে মৈনাকের সবটাই

প্রায় দৃশ্যমান হয়ে উঠল, অতি বিরাট এক বস্তু পিণ্ড, পাথর হতে পারে আবার ধাতু হওয়াও অসম্ভব নয়, পাথরই হোক আর ধাতুই হোক, সবচেয়ে বিস্ময়কর তার রঙ। এমন উজ্জ্বল মনোরম স্নিগ্ধ প্রভা কেউ কখনো দেখেনি। সকলে অর্থাৎ কুশপত্তন ও ঋষিপত্তনের অধিবাসিগণ চিত্রার্পিতের মতো মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলো সেদিকে, সকলের আগ্রহে আচার্য এলেন, এসে নিরীক্ষণ ক'রে বললেন, না মৈনাক নয়, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করেছেন—এটি তার অণ্ড। অনেকেই বিশ্বাস করলো, কিন্তু সকলে করলো না, তারা ভাবলো, এ যেন সেই খঞ্জনীর কুণ্ডলের ধাতু মনে হচ্ছে, তেমনি স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভা, তেমনি দিব্যকান্তি। তাই হোক ইন্দ্র, তাই হোক।

এবারে একটু ঘটনার পর্ব সূত্রের বিন্যাস আবশ্যক।

খঞ্জনীর মৃতদেহ ভেসে উঠলে কুশপত্তন ও ঋষিপত্তনের অধিবাসিগণ হ্রদের ধারে সমবেত হ'য়ে [illegible] করতে লাগলো, এমন সময় দু'চার জনের চোখে পড়লো তার কানের কুণ্ডল। কুণ্ডলের সঙ্গে সবাই পরিচিত কিন্তু এ কুণ্ডল কিসে গড়া। তখন মানুষের চেয়ে কান এবং কানের চেয়ে কুণ্ডল বড় হয়ে উটল। ইতিমধ্যে বাতাসে ভেসে মৃতদেহটা এসে [illegible] পাশের তরুণকে ঠেলা দিয়ে বলল, ও দুটো খুলে নিয়ে আমাকে দাও না।

এরা দু'জনেই কুশপত্তনের লোক।

এ ঘটনা অগ্রসর হ'তেই ঋষিপত্তনের সর্দারের প্ররোচনায় একজন তরুণ এসে চেপে ধরলো অন্য একটি কান। তখন দু'জনের টানাটানিতে কান ছিঁড়ে কুণ্ডল হাতে এলো, রক্ত পড়লো না. অনেকক্ষণ মৃত্যু হয়েছে।

কুণ্ডলের আধাআধি সমভাগ হওয়াতে কুশপত্তন ও ঋষিপত্তনের বিবাদ প্রবল হয়ে উঠতে পারলো না, কিন্তু উভয় পত্তনেই গৃহযুদ্ধ দেখা দিল। একটি কুণ্ডল অনেকগুলি কান, মীমাংসার পথ বন্ধ। তাই কুণ্ডলকে উপলক্ষ্য করে চুরি, ছলনা. ছিনতাই, মিথ্যা ভাষণ প্রভৃতি দেখা দিল। কুণ্ডল আজ সুবালার কাছে, কাল সুমতির কাছে, পরশু সুনীতির কাছে. অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডল ঘরে ঘরে আগুন ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। ওর মধ্যে যারা চিন্তাশীল তারা ভাবলো, কুণ্ডলের ধাতু নিশ্চয় আছে. কিন্তু কোথায়? খঞ্জনী মৃত. কাজেই উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সবাই জিজ্ঞাসা করলো ধনুককে। সে বলল, কেমন করে জানবো? মৌক্তিক ওকে হত্যা ক'রে নিখোঁজ হয়েছে। হত্যা করতে গেল কেন? খুব সম্ভব ঐ কুণ্ডলের লোভে, শেষ মুহূর্তেই ভয় পেয়ে না নিয়েই পালিয়েছে। সকলেই কথাটা বিশ্বাস করলো, এ বস্তুর জন্য হত্যা অসম্ভব নয়। সেই বস্তু আজ বিপুলায়তনে দেখা দিয়েছে এ হ্রদের গর্ভে।

কুশপত্তন ও ঋষিপত্তন সাকুল্যটা দাবী করলো, কেউ ভাগাভাগিতে রাজী নয়। আপোষে যখন সুবর্ণের ভাগ সম্ভব হ'ল না তখন যুযুধানগণ রণং দেহি

বলে হ্রদের ধারে সমবেত হ'ল।

সুবর্ণের প্রতি তৃষ্ণা আরও খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। মানব সমাজে যুদ্ধ দেখা দিল।

৬

হ্রদের তীরে যুধ্যমান পক্ষদ্বয় যখন বিশ্রামের অবকাশে নিজ নিজ পক্ষের হতাহতকে রণক্ষেত্র থেকে অপসারিত করছিল, তখন তাদের চোখে পড়ল অতি দূর পশ্চিমাকাশ ঘন ধূলিজালে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছে। আহতদের আর্তনাদ, নিহতের নীরব ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বিস্ময়ে তারা সেই দিকে চেয়ে রইল—ব্যাপার কি? এরা কারা? অনেক দূরে? এত ধূলা ওড়ে কেন? তবে কি অশ্বারোহী বাহিনী? কেন আসছে? এই দিকেই কি? তবে কি তারাও সুবর্ণের সন্ধান পেয়েছে - পেল কার কাছে? প্রভৃতি চিন্তার ঢেউ তাদের মনের উপর একটার পরে একটা আঘাত করতে লাগলো। ক্ষণকালের জন্য গত দু'মাসের বিরামহীন সংগ্রামের স্মৃতি লোপ পেল তাদের মন থেকে।

গত দু'মাস ধরে কুশপত্তন ও অমরপত্তনের অধিবাসী যখন স্বর্ণপিণ্ড অধিকারের আশায় পরস্পরকে নিহত করছিল, আহত করছিল, ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছিল, শস্য লুণ্ঠন করছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অতিরিক্ত পাঠ্যাংশে নারী হরণ, শিশু হরণ, পরস্পরের সুনাম হরণ করছিল আর নীরবে সেই সুবর্ণপিণ্ড উজ্জ্বল প্রভাময় স্মিতধিক্কারে সেই অপূর্ব দৃশ্য নিরীক্ষণ করছিল, তখন হন্যে কুকুরের মতো প্রতি-হিংসাপরায়ণ মৌক্তিক দেশদেশান্তরে দূরদূরান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল প্রতিহিংসার উপযুক্ত হাতিয়ারের সন্ধানে। অবশেষে হাতিয়ার তার জুটে গেল। জম্বুদ্বীপের পশ্চিমতম প্রান্তে দুর্গম গিরিসংকটের কাছে এক বৃহৎ জনপদ ছিল, যেখানে বাস স্থাপন করেছিল একদল নবাগত। তাদের ঋজুদীর্ঘদেহ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, বর্ণ গৌর, দীর্ঘকেশ, পরিধানে পশুচর্ম বা বল্কল, তাদের দুর্জয় অস্ত্র তীর ধনুক, লৌহফলক সমন্বিত ভল্ল, কুঠার; তাদের দুর্বার বাহন ক্ষিপ্রবেগশালী, পুঞ্জীভূত তেজোরাশি, সদৃশ, পেশী-চিক্কণ, অশ্ববাজি। নবাগতগণ তখন পূর্বাগত ও প্রত্যাসন্নদের চাপে বিব্রত, নূতন স্থান, জলাশয় প্রভৃতির সন্ধান করছিল। এমন সময়ে মৌক্তিকের মুখে শুনতে পেলো, সুদূর তড়াগসরিতের বিবরণ, শস্য শ্যামল প্রান্তর ও সমৃদ্ধ জনপদের কাহিনী। তারা তখনি অশ্বে আরোহণ করতে উদ্যত আর কি! তারপর যখন শুনলো যে, এসব অধিকার করতে কিছু যুদ্ধের প্রয়োজন হ'তে পারে—তখন তাদের উল্লাস ধ্বনিত হ'য়ে

উঠল—চিৎকারে। খঞ্জনী-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে আশায় তার মন উৎফুল্ল, অশ্বারোহী বাহিনীর পথ প্রদর্শকরূপে মৌক্তিক ছুটলো সকলের আগে। ঘোড়ায় চড়া সে জানতো।

যুযুধান কুশপত্তন ও ঋষিপত্তনের অধিবাসীগণ অভিভূতভাবে বেশীক্ষণ থাকবার সময় পেলো না, অল্প দু'চার দণ্ডের মধ্যেই বিপুল অশ্বারোহী বাহিনী দৃষ্টিগোচর হ'ল তারা বুঝলো এদের হাতে নিস্তার পাওয়া কঠিন। অন্যদিকে নবাগতগণ, বিশাল শস্যক্ষেত্র, উর্বরা ভূমি, সুপেয় নদী প্রবাহ, সমৃদ্ধ জনপদ থেকে আনন্দ ধ্বনি ক'রে উঠলো, তাদের বিস্মিত উল্লাসের অন্ত নাই। কিন্তু সেই উল্লাস চরমে উঠল যখন হ্রদের মধ্যস্থিত সেই বিপুল সুবর্ণ পিণ্ড তাদের লক্ষ্য-গোচর হ'ল। এমন বস্তু দেখা দূরে থাক কল্পনা করতেও ভরসা পায়নি। সবচেয়ে বেশী বিস্ময় হ'ল মৌক্তিকের। তবে জলের নীচেই লুকিয়ে ছিল সেই বস্তু যার সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরে মরেছে সে। যার একটি ক্ষুদ্র খণ্ড পেয়ে জীবন ধন্য মনে করেছিল, কুণ্ডল গড়িয়ে দিয়েছিল খঞ্জনীকে, যে কুণ্ডলের জন্য তার মৃত্যু, আর মৃত্যু কি না সেই হ্রদের জলে যার গর্ভে লুক্কায়িত ছিল কুবেরের ঐশ্বর্য। খঞ্জনীর কথা মনে পড়তেই বিস্ময়ের সঙ্গে মিশলো দুঃখ।

সুবর্ণের চরম প্রতিক্রিয়া এবারে আরম্ভ হওয়ার মুখে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধতে চলেছে।

ঋষিপত্তনের অধিবাসীরা কিছু চালাক। তারা ভাবলো, নবাগতদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কুশপত্তনকে পরাজিত করা যাক, তারপরে সুবর্ণপিণ্ড ভাগাভাগি করে নিলেই চলবে। মৌক্তিক মধ্যস্থ থাকায় কাজটি অসম্ভব হ'ল না, সহজেই রাজী হ'ল নবাগতগণ। কুশপত্তন ও তার অধিবাসীগণ যুদ্ধে চিহ্নিত হ'য়ে গেল। ভাগাভাগির কথা উঠবার আগেই নবাগতগণ আক্রমণ করলো ঋষিপত্তনের অধিবাসীদের, অল্পক্ষণের মধ্যেই তারাও নিশ্চিহ্ন হ'ল। মৌক্তিক বুঝলো, তার পর লক্ষ্য ডিঙিয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছে, বেঁচে থাকার আর অর্থ হয় না। হ্রদের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সে মৃত্যু বরণ করলো। তখন নবাগতদের যুদ্ধ বেধে উঠল, সবাই-আর সকলের চেয়ে অধিক ভাগ নিতে চায় ঐ অদৃষ্টপূর্ব মনোহর ধাতুপিণ্ডের। লড়াই এখনো চলছে।

ভগবানের পলায়ন

প্রভু, আমার প্রাতঃ প্রণাম গ্রহণ করুন। বৎস, তোমার মঙ্গল হোক। তার-পরে কি সংবাদ।

আজ্ঞে সংবাদ অত্যন্ত খারাপ

কোথাকার?

আজ্ঞে, পৃথিবীর।

ওখান থেকে কখনো ভাল খবর আসতে শুনি নি। তা আবার নূতন কি ঘটলো?

আপনার অনুমান যথার্থ, খবর পুরাতন এবং অশুভ, পুরাতন বলেই খারাপ, আর যত পুরাতন হচ্ছে, ততই অধিক খারাপ হচ্ছে! অনেকটা বাতের ব্যথার মতো আর কি।

বেশ বলেছ, এখন আমার কি কর্তব্য?

ওদিকে একবার দৃষ্টি দিতে হয়।

বেশ, আর একজন অবতার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আজ্ঞে, অবতারে আর চলবে না।

কেন?

ওখানকার অধিবাসীরা নিজেরাই এক একজন অবতার সাজছে। আর তা ছাড়া, মৎস্য কূর্ম বরাহাদি অবতারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছে।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা! সে আবার কি?

যে ব্যাপার বোঝা যায় না অথচ বোঝবার ভান করতে হয়, তাকেই ওরা বলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

বেশ, তা হলে এখন কর্তব্য?

সেটা জানবার আশাতেই তো আপনার কাছে আসা।

তা বটে। আচ্ছা, আমি নিজেই না হয় একবার ঘুরে আসি।

তার চেয়ে আর ভালো কি হতে পারে।

সেই ভালো, তুমি প্রচার করে দাও, আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি, এবারে আর অবতার নয়, স্বয়ং অবতারী।

একটু সাবধানে যাতায়াত করবেন, স্যার, ওরা আর সেই ওরা নেই খুব শেয়ানা হয়েছে।

তোমার পরামর্শ ভুলবো না। এখন যাও।

পূর্বোক্ত সংলাপের পাত্রগণ: স্বয়ং ভগবান ও তাঁর একান্ত সচিব শ্রীমান চিত্রগুপ্ত। স্থান বৈকুণ্ঠ, কাল [illegible]।

কেমন করে রটলো, কে রটালো কেউ বলতে পারে না, সবারই মুখে এক কথা, ভগবান আসছেন, ভগবান আসছেন। সবাই বলাবলি করছে আর ভয় নেই, শত্রু নিহত হবে; সবাই বলাবলি করছে আর ভাবনা নেই, সমস্ত অভাব পূর্ণ হবে, সবাই বলছে জরা মৃত্যু আধিব্যাধি ইনকামট্যাক্স কিছুই থাকবে না। ধার্মিকগণ বলছেন ধরণী আবার শস্যে পূর্ণা হবেন, তড়াগ হ্রদ সরিৎসমূহ সুজলে পূর্ণ হবে। রাজনীতিকগণ বলছে পূর্ব শিবির পশ্চিম শিবিরে গলাগলি হবে। অর্থনীতিকগণ বলছে সি ডি এস এবং এ ডি এস সমূলে লোপ পাবে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ বলছেন এবারে অনায়াসে পুরানো নলকূপগুলোর নল বিক্রি করে দেওয়া চলে, ভগবান যখন আসছেন সব তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবেন, নলকূপের আবার প্রয়োজন কি। কংগ্রেসীগণ বলছেন শুধু সদাচার কমিটিতে কুলোবে না, পাশাপাশি কদাচার কমিটি খুলে দেওয়া আবশ্যক। কম্যুনিস্টগণ পার্টি মেম্বর হিসাবে ভগবানে বিশ্বাস করেন না, তবু বলা যায় কি, তাই ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা ও দাবীর ফিরিস্তি ঠিক করে রাখছে। জরাসন্ধের মতো যুক্ত "সংযুক্ত সোস্যালিস্টগণ" এখনো মনস্থির করতে পারেন নি, কারণ ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জয়প্রকাশজী ও ডক্টর লোহিয়া একমত নন। আর জনসাধারণ খুব খুশী! অন্তত একটা দিন সবেতন ছুটি মিলবে। চাই কি বোনাস পাওয়াও অসম্ভব নয়। ভগবান তো ঘন ঘন আসেন না। শহরে শহরে সিনেমা ও "অব্যর্থ মহৌষধের" বিজ্ঞাপন আচ্ছন্ন করে দিয়ে যত্রতত্র সর্বত্র এক বিজ্ঞাপন— "আগামীকল্য গোবিন্দপুরের ন্যাড়া বটগাছতলায় বেলা আড়াইটা নাগাদ স্বয়ং ভগবান দেখা দেবেন। তিনি সকলের সকল প্রার্থনা পূরণ করবেন। একে একে আসুন, দলে দলে আসুন, দলাদলি-নির্বিশেষে আসুন, ভগবান সকল-দলের ঊর্ধ্বে। এমন সুযোগ অবহেলায় হারাবেন না। আসুন আসুন, যথাসময়ে আসুন।"

এ বিজ্ঞাপন ছাপবার খরচ কে দিল? অনেকে বলল রাষ্ট্রসংঘ, অনেকে বলল কমনওয়েলথ, আবার ওর মধ্যে যারা ওয়াকিবহাল, তারা গলা খাটো করে বলল, খরচ দিয়েছে ভারত সরকার, তবে ধর্মনিরপেক্ষ কিনা, তাই গোপনে।

মোট কথা খরচ যেই দিক, খবর তো মিথ্যা হতে পারে না, বিজ্ঞাপন পড়েছে

যে। সকলেই যথাসময়ে গোবিন্দপুরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। ভগবান আসছেন।

২

গোবিন্দপুরের মাঠ আজ সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য। সকাল থেকে বললে কম বলা হয়, গতকল্য সন্ধ্যা থেকে ভিড় জমতে শুরু করেছে, অনেকে সারারাত ইঁট মাথায় দিয়ে ঘুমিয়েছে, সামনের দিকে জায়গা পাওয়া চাইতো; অনেকে তাস খেলে জেগে কাটিয়েছে, চা জল খাবারের অভাব হয় নি, ছোট ছোট দোকান ও ফিরিঅলা দেখা দিয়েছে; এখন সকালবেলায় গোবিন্দপুরের প্রশস্ত প্রান্তর জনসমুদ্র। লোকের দোষ দেওয়া যায় না, ভগবানকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার কৌতুহল তো আছেই, তা ছাড়া আছে প্রচণ্ড আগ্রহ, ভগবান নাকি সকলের প্রার্থনা পূরণ করবেন। এমন সুযোগ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে কখনো ঘটে নি, শেষে ঘটলো কিনা কলিকালে! একদল খোল বাজিয়ে গান ধরেছে—"ধন্য ধন্য কলিযুগ সর্বযুগ সার, যাহে ভগবান কল্পতরু অবতার।" আধুনিক মেলায় যে-সব অনুষঙ্গ থাকে, সবগুলিই দেখা দিয়েছে, দেশী-বিদেশী কাগজের রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যান, ফিল্ম তুলবার ক্যামেরা, চাগ্রম, কে-কম্যান, ঘুগনিদানা, মুকুং পবিত্র জল পান কিস্তিয়ে, আইসক্রিম, দামী মোটরগাড়ী থেকে নেমে সুবেশ ও সুবেশাগণের রোমশ হস্তে বিতরিত ফুচকা ভোজন, আর বিচিত্র কোলাহলের সমাবেশে গমগমে চাপা আওয়াজ। ভিড় দেখে ভিড় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে—ভগবানের খোঁজ করতে এখনো শুরু করে নি। এমন সময়ে বেতারে ধারা বিবরণী আরম্ভ হল।

"ন্যাড়া বটগাছতলায় উপযুক্ত আসন প্রস্তুত হয়েছে, এখনি শ্রীভগবান ও তাঁর একান্ত সচিব শ্রীচিত্রগুপ্ত আগমন করবেন, আপনারা অধীর হবেন না।... ঐ যে তাঁরা আসছেন, শ্রীভগবানের অঙ্গে রাজবেশ আর শ্রীচিত্রগুপ্তের অঙ্গে অমাত্যের বেশ—ঐ যে তিনি হাত তুলে সকলকে আশীর্বাদ করলেন, ঐ যে তাঁরা নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন। এবারে শ্রীভগবানের অভ্যর্থনা উপলক্ষে কবিগুরু রচিত সঙ্গীত আরম্ভ হল, আপনারা শুনুন।"

সকলে শুনতে পায়—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে,
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।"

ধারা বিবরণী বলে যায়, "আপনারা ঠেলাঠেলি করে ঘাড়ের উপরে এসে পড়বেন না, শ্রীভগবান ভগবান হলেও এখন নরদেহধারী, চাপা পড়ে মারা গেলে, না মারা গেলে কথাটা বলা ঠিক হয় নি, স্বর্গে ফিরে গেলে আপনাদের প্রার্থনা পূরণ হবে না ; অতএব আপনারা শৃঙ্খলাভঙ্গ করে ভগবানের ঘাড়ে এসে, না, ও কথাটা বলা অন্যায় হল, ভগবদ্‌স্কন্ধে এসে চাপবেন না, নিজ নিজ পায়ের উপরে দণ্ডায়মান থাকুন, আপনাদের কারো প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না।"

পাঠক, তুমি যদি এই মওকায় ভগবদ্দর্শন করতে চাও তবে তোমার আশা সফল হবে না, কারণ তেমন পুণ্য তুমি করনি। অবশ্য আমাদের লেখকদের কথা স্বতন্ত্র, আমরা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, ও সর্বশক্তিমান, প্রায় ভগবানের মতোই তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে লেখার জন্য আমরা Royalty পাই, ভগবান এক পয়সাও পান না। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বেদের বাবদ কত Royalty পেয়েছেন ? না, কপিরাইট চলে গিয়েছে যুক্তি অচল, যেহেতু এখনো তিনি জীবিত। তাই আমাদের কথা ছেড়ে দাও, তুমি দেখতে পাবে না, ধারাবিবরণী শুনেই তোমাকে খুশী থাকতে হবে।

মেলার প্রান্ত থেকে ভগবদ্ সমীপে পাশাপাশি দুটি রাস্তা প্রস্তুত হয়েছে, একটি যাওয়ার একটি ফিরে আসবার, অনেকটা যেমন সার্বজনীন দুর্গাপূজায় হয়ে থাকে। দলে দলে লোক যাচ্ছে, দলে দলে লোক ফিরে আসছে, সকলেরই মুখ সমান প্রসন্ন।

আপনি কি প্রার্থনা জানালেন ?

বেশি নয়, খানকতক বাড়ি আর নগদ কয়েক লক্ষ টাকা, তবে বাড়ী যেন Death Duty free হয় আর টাকার বাবদ income Tax যেন ভগবানের তবিল থেকে দিয়ে দেওয়া হয়।

আপনি ?

আমার নাতির জন্ত মন্ত্রিত্ব। আগে অবশ্য জেলে যায় নি, তবে যেমন মতিগতি শীঘ্রই যাবে।

মন্ত্রিত্ব চেয়ে কি ভালো করলেন ? আজকাল আবার সদাচার সমিতি নামে এক ক্যাচাং হয়েছে।

আমি তার চেয়ারম্যান।

ও মশায় আপনাদের দরখাস্তের কি হল ?

একান্তসচিব নিয়ে বরকরে ফাইল ভুক্ত করলেন। মঞ্জুর হবে আশা দিয়েছেন।

ঐটি আমার ভালো লাগছে না, সকলকেই আশা দিচ্ছেন, সকলের দরখাস্তই ফাইলভুক্ত হচ্ছে। কবে হবে?

জিজ্ঞাসা করেছিলাম একান্ত সচিব বললেন সমস্ত দরখাস্ত পাওয়া গেলে ভগবান consider করবেন, কাকে কতখানি দেওয়া যায়।

তবেই হয়েছে। দরখাস্তের স্তূপ যে ইতিমধ্যেই পাহাড় প্রমাণ হয়েছে।

তা হোক আমরা সকাল বেলায় সাবমিট করেছি;

আরে, সেই জন্যই তো অনেক নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে।

তাতে ক্ষতি হবে না। একান্ত সচিব বললেন ভক্তির কমবেশি অনুসারে Priority হিসাব করে দরখাস্ত consider করা হবে।

তবে আমার ভয় নেই, আমরা আজ তিন পুরুষ ধরে হিন্দুমহাসভার মেম্বার। ভয় তো ওঁর।

কেন? কম্যুনিস্ট বলে বলছেন? ভক্তি রস আমাদের অস্থিমজ্জায়। দেখেন নি জলকাত বলতে আমরা কখনো পিছপা হয়েছি?

কিন্তু আপনাদের ছাড়িয়ে গিয়েছে চীনপন্থীরা।

ওদের আমরা কম্যুনিস্ট বলেই স্বীকার করি নে।

ধারা বিবরণী বলছে—"এখন আর আপনারা ভগবানের কাছে আসবার চেষ্টা করবেন না। এখন আধঘণ্টা তাঁর টিফিন। এই অবসরে কিছু বিবরণ দান করছি। এ পর্যন্ত ১৬৬৩৫৪০০০০০০০ খানা দরখাস্ত পড়েছে। তাঁরা যে পরিমাণ টাকাকড়ি প্রার্থনা করেছেন তা দিলে মুদ্রাস্ফীতি আরো প্রবল হয়ে উঠবে, অথচ না দিলেও নয়, কিভাবে দেওয়া যায়। Lend-lease-এর অনুরূপ কোন ব্যবস্থা সম্ভব কি না বিচার করবার উদ্দেশ্যে ভগবান একটি one-man-Committee বসাবেন বলে চিন্তা করছেন। ওদিকে মাকিন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে Foreign observer কয়েকজন এসেছেন। ইতিমধ্যেই আড়াই কোটি ফিট ছবি তোলা হয়েছে। টিফিনের পরে ঘণ্টা দুই সাধারণে প্রবেশ করবার সুযোগ পাবেন না, তখন সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষগণ দেখা করবেন, তবে একত্রে নয়, যেহেতু ভগবান প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় আগমন করেছেন। তারপরে পাঁচটা থেকে আবার সাধারণের প্রবেশাধিকার। আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না, সকলের প্রার্থনা পূরণ না করে ভগবান প্রত্যাবর্তন করবেন না।'

ও কি দক্ষবুড়ী, কোথায় যাও?

থামো, থামো, এখন সময় নয়। পরে যেয়ো, ভগবান এখন টিফি করছেন।

আরে ওকে ধরো, থামাও।

কে ওকে ধরতে গিয়ে বুড়ী মেরে খুনের দায় ঘাড়ে নেবে বাপু।

কেউ এগোয় না, কারণ সকলেই চেনে তাকে। দক্ষ বুড়ী গোবিন্দপুরে লোক, হত-দরিদ্র, সংসারে আছে ছোট একটি নাতি, আর আছে ভাঙা একখানি ঘর, যার মধ্যে চাঁদের আলো ও বর্ষার জলের সমান প্রবেশ।

সেই দক্ষ বুড়ী ভগবদ্দর্শনের আশায় এগিয়ে চলেছে।

ও আবার কি চাইবে?

কেন, ওরই তো বেশি দরকার। ওর যে কিছু বলতে কিছু নেই।

আরে সেই জন্যই তো ওর আশা কম। ভগবান অপাত্রে দয়ার অপব্যয় করেন না, তাঁর বিবেচনা আছে।

আচ্ছা বসো না দেখা যাক বুড়ী কি প্রার্থনা করে।

বক্তা দুইজন বুড়ীকে অনুসরণ করে বলল, সে ততক্ষণ প্রায় ভগবদ্‌সমীপে গিয়ে পৌঁছেছে।

একজন পাণ্ডা-কাম-পুলিস বাধা দিয়ে বলল, এই বুঢ়ী মৎ যাও।

রাখো তো বাপু, মেলা বক্ বক্ করো কেন। লোকটা মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে পারে না, গেল মহিলা পুলিশের সন্ধানে, সেখানে তো তাদের দেখা পাওয়া যাবে ফিল্মি ক্যামরার কাছে। ততক্ষণ বুড়ী গিয়ে পৌঁছেছে ভগবানের দরবারে। বুড়ীর ভাগ্য ভালো ভগবান তখন টিফিন ও যোগনিদ্রা করে দরবারে এসে বসেছেন, পাশে একান্ত সচিব।

কইগো ভগবান কই?

ঐ যে দেখছ না?

ও তো মানুষ, অনেকটা আমাদের পাড়ার কারোর মতো।

আরে বুড়ী, ভগবান নিরাকার, এখানে এসেছেন মানুষের মূর্তি ধারণ করে নইলে দেখতে পাব কি করে।

তাই বলো।

তখন বুড়ী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে সোয়া পাঁচ আনা পয়সা প্রণামী দিল ভগবান একান্ত সচিবের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন, তাবটা দেখছো ে

লোকের এখনো শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। তারপরে বুড়ীকে শুধালেন, বৎসে, তোমার কি প্রার্থনা বলো।

দক্ষ বুড়ী কথা বলে না।

নির্ভয়ে বলো কি চাই বৎসে, তোমার ভক্তিতে সত্যই প্রীত হয়েছি।

তবু বুড়ী নীরব।

কাজেই ভগবান একে একে প্রার্থিতব্য বস্তুর নাম করতে লাগলেন।

প্রাসাদোপম অট্টালিকা?

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত লক্ষ মুদ্রা?

সেফটি ভল্টে রক্ষিত স্বর্ণপিণ্ড?

হিসাব বহির্ভূত লক্ষ মুদ্রা? কিছুই নয় কি আশ্চর্য? তবে কি পুনর্যৌবন চাও? কিম্বা মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন কিম্বা শত্রু নিপাত। বলো বৎসে খুলে বলো, ভগবানের কাছে অকরণীয় কিছুই নাই, ভগবানেরও অদেয় কিছুই নাই, কেবল সাহস করে বলা চাই বৎসে। কতজনে কত কি বলে গেল, কতক গোপনে কতক প্রকাশ্যে। প্রকাশ্যে আপত্তি থাকে না হয় গোপনেই বলো, ভয় করো না, আমি ভগবান্, আমার উপরে কেউ নেই।

এবারে বুড়ী মুখ খুলল, বলল, বাবা, প্রকাশ্যেই বলবো তোমার কাছে বলবো তার আবার ভয় কি? তবে এতক্ষণ সাহস হচ্ছিল না, তবে কি না তুমি যখন ভরসা দিলে—

নির্ভয়ে বলো বৎসে,

পারবে কি বাবা?

এমন বাতুলোচিত প্রশ্নের একমাত্র উত্তর স্বর্গীয় হাসি। ভগবান্ সেই হাসি হাসলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিরা বলে উঠল, বুড়ী কার সঙ্গে কথা বলছ খেয়াল রেখো। তোমার সাতপুরুষের ভাগ্য যে ভগবান তোমাকে জিজ্ঞাসা করছেন।

রাগ করো না বাপ সকল, কোথাও পাই নি, কেউ দিতে পারে নি, বলেছে পাওয়া যায় না, তাই ভয় হচ্ছিল।

সকলের সঙ্গে ভগবানের তুলনা হয় না, তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সমস্তই তাঁর করায়ত্ত।

আমি আর নিজ মুখে কি বলবো, আমার ক্ষমতা সমস্তই বিস্তারিত বর্ণনা

আছে শাস্ত্রে, ভক্তদের মুখেও কিছু শুনলে" অতএব বৎসে নিঃসঙ্কোচে তোমার প্রার্থনা জানাও, এখনি পূরণ করবো।

দক্ষ বুড়ী ভারি খুশী হল, বলল, বাবা, টাকা কড়ি আমি চাইনে, আমি গরীব আমার প্রার্থনাও সামান্য।

এই বলে আঁচলের তলা থেকে একটা টিনের কৌটা বের করে বলল, সর্বশক্তিমান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, আমাকে দয়া করে হাফ কে জি সরষের তেল দাও, বাবা।

এক সঙ্গে শত বজ্রপাত হলেও বোধ করি এমন বিস্মিত কেউ হতো না বুড়ী বলে কি? বিস্ময় প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায় না ভক্তগণ। ওদিকে ভগবানের শ্রীবদনে দ্রুত ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। তাঁর মুখ শুষ্ক, নেত্র বিস্ফারিত, ওষ্ঠাধর কম্পমান! অবিশ্বাস, বিস্ময়, ভীতি দ্রুত পদক্ষেপ করে যায় তাঁর মুখমণ্ডলে আর সঙ্গে সঙ্গে স্বেদ বম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে, তিনি বলে ওঠেন বাবা চিত্রগুপ্ত, এ কোথায় আনলে বাপ? কিন্তু কোথায় চিত্রগুপ্ত। বেগতিক দেখে কখন সরে পড়েছে। ভগবান্ বুঝলেন "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে আয়নায়।" তাকিয়ে দেখলেন তখনো বুড়ী সেই কৌটা এগিয়ে দিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, মুখমণ্ডল তার হাফ কে জি প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল।

এহেন অবস্থায় ভগবান কি করলেন? পূর্ব পূর্ব অবতারে যে অপূর্ব পন্থা গ্রহণ করেছেন এবারেও তা-ই করলেন, পরিত্যাগ করে উর্ধ্বশ্বাসে চোঁ চোঁ দৌড় মারলেন।

ধারা বিবরণী বলে যাচ্ছে, "ভগবানের ঐশী লীলা মানুষে বোঝে এমন কি সাধ্য? চরাচরের ঐশ্বর্য যাঁর নখকণার চেয়েও নগণ্য তাঁর কাছে এক বুড়ী কিনা প্রার্থনা করছে হাফ কে জি……কিন্তু এ কি, এ কি, হঠাৎ ভগবানের শ্রীমুখে ভাবান্তর উপস্থিত কেন? এ কি, এ কি, হঠাৎ তিনি আসন পরিত্যাগ করলেন কেন? এই যে তিনি পলায়ন শুরু করেছেন, জরাসন্ধের ভয়ে যেমন মথুরা থেকে পালিয়েছিলেন, ঐ যে ক্রমে দূরতরে গিয়ে পড়ায় তাঁকে হ্রস্বতর দেখা যাচ্ছে—না, আর দেখা যাচ্ছে না তাঁকে, এবারে বোধহয় মৌলিক নিরাকার রূপ অবলম্বন করেছেন। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি 'ভগবান্ অদৃশ্য হওয়ায় এখানেই ধারা বিবরণী সমাপ্ত হল।"

মেলা ভাঙলো। দক্ষ বুড়ী তখনো প্রার্থনার ভঙ্গীতে সেই কৌটা এগিয়ে

দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভক্তিমতী সেই নারী কেমন করে বিশ্বাস করবে যে হাক কে জি সরষের তেল দেওয়ার ভয়ে ভগবান্ পলায়ন করেছেন। পরবর্তীকালে লোকে জিজ্ঞাসা করলে বুড়ী বলতো, না বাবা ভগবানের কিছুই অসাধ্য নাই।

'তবে কেন দিলেন না?'

'ও তাঁর এক 'লীলা', তুমি আমি বুঝবো এমন কি আমরা পূণ্যি করেছি।'

দৃষ্টি ভেদে

অবশেষে ক্ষেমেশ ও পরমেশ প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় উন্মাদাগারে ভর্তি হয়েএকেবারে ঠিক পাশাপাশি ঘরে স্থান পেল। যারা ওদের ইতিহাস জানতো কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌ল, একেই বলে নিয়তি। যারা জানতো না কিছুই বুঝতে পারলো না। গল্পটা তাদের জন্যেই লিখত।

ক্ষেমেশ ও পরমেশ এক গাঁয়ের বাসিন্দা, প্রতিবেশী বললেই চলে। যুদ্ধ বেধে উঠ্‌তে যখন ইষ্টক খণ্ড থেকে পিষ্টক খণ্ড পর্যন্ত সমস্ত বস্তু ক্রেয় পদার্থ হয়ে উঠল আর দামটাও নাকি শনৈঃ শনৈঃ টাইফয়েড জ্বরের তাপমাত্রার মতো বাডতে বাড়তে নিরীহ জনাসাধারণের সাধ্যেব অতীত হয়ে গেল তখন ওরা বল্‌ল, চলো ব্যবসা করা যাক।

ওরা কেবল প্রতিবেশী নয়, বাল্যকাল থেকে এক ডাণ্ডা গুলিতে খেলা করেছে, গুরুমশায়ের কাছে এক বেতে মার খেয়েছে, আর বাল্যকালের এই ঐক্য বাডতে বাড়তে যথাসময়ে দুজনের এক সঙ্গে গুম্ফ শ্মশ্রুর রেখা দেখা দিয়েছে আর অবশেষে দুইজনে একই পিতার দুই কন্যাকে বিবাহ করে নৈমিত্তিক যোগাযোগকে নিত্য যোগাযোগে পরিণত করে ফেলেছে। তাই যখন তারা একমালিতে ব্যবসার প্রস্তাব করলো কেউ বিস্মিত বোধ করেনি। তখনো তারা মানে যারা ওদের ইতিহাস জানতো কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল, একেই বলে নিয়তি।

স্থির হল যে ক্ষেমেশ গ্রামে গ্রামে ঘুরে মাল সংগ্রহ করবে আর পরমেশ কলকাতায় ব'সে বিক্রি করবে। যুদ্ধের কৃপায় এখন কেনাবেচার কাজ অত্যন্ত সহজ। একমাত্র ক্রেতা মিলিটারি বিভাগ, ক্রেতা খুঁজে বার করতে হয় না, সে-ই বিক্রেতাকে খুঁজে বার করে। আর আগেই বলেছি বিধাতা চরাচরের যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সমস্তই এখন ক্রয়যোগ্য বস্তু। এহেন যুদ্ধাবস্থাকে মানুষে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে এমন দুঃস্বপ্ন একমাত্র অব্যবসায়ীরাই দেখে থাকে।

ইতিমধ্যে পরমেশ একটি প্রমাণ সাইজের দাড়ি গজিয়ে ফেলল। এ দাড়ি আধিভৌতিক নয়, আধিদৈবিক। বিবর্তনবাদের যে নিয়মের বশে জিরাফের গলা লম্বা হয়, বাঘ ও জেব্রার গায়ে ডোরা দেখা দেয়, রাজনৈতিকগণের কণ্ঠস্বর উচ্চ ও গতিবিধি প্রচ্ছন্ন হয় সেই আমোঘ নিয়মের তাড়নাতেই পরমেশের দাড়ি গজালো। মিলিটারির সঙ্গে কারবার করে অল্পদিনেই সে বুঝে ফেলেছে সাহেব লোকের কাছে বিশেষ মার্কিন সাহেব লোকের কাছে, "হোলি বিয়ার্ডের" বড়

মর্যাদা। পরমেশ যখন উচ্চাঙ্গের হাসিতে "হোলি বিয়ার্ড" আলোকিত করে পাঁচ টাকার জিনিসের দাম পঁচিশ টাকা বলতো তিনতারাওয়ালা মার্কিন জেনারেল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে গুদামঘর দেখিয়ে দিয়ে পাইপ্ চাপা অধরোষ্ঠে অব্যক্তস্বরে অর্ধোক্ত বলতো—ও, কে হোলি বিয়ার্ড। জঙ্গী সমাজে পরমেশ এখন দি হোলি বিয়ার্ড নামে পরিচিত।

এদিকে পরমেশ দাড়ি গজিয়ে বিক্রির সুবিধে করে নিয়েছে জানতে পেরে ক্ষেমেশ একটি প্রমাণ সাইজের শিখা গজিয়ে ফেলল। তার অভিজ্ঞতা এই গ্রামাঞ্চলে জিনিস খরিদের কাজে শিখা বড় সহায়ক।

দা ঠাকুর এসেছেন বসতে দে বলে যে-চাষী গেরস্ত অভ্যর্থনা করতো, জিনিস বেচবার পরে হিসাব করতে গিয়ে দেখতে পেতো যে দা ঠাকুর তাকেই বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। পরমেশের জবাপুষ্প সমন্বিত শিখাগ্র গ্রামে গ্রামে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ফিরতে লাগলো। মোট কথা অল্প দিনের মধ্যে ভারতীয় সনাতন শ্মশ্রু ও সনাতনী শিখার কৃপায় ওদের ব্যবসা হরিণগেলা অজগরের পেটের মতো ফুলে উঠল। তখন ওরা পৈত্রিক মাঠকোঠার বাড়ি ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে ইষ্টকালয়ের পত্তন করলো। বাড়ি দুটোর ভিত যখন কোমর পর্যন্ত উঠেছে তখন কুমারিকা থেকে কাশ্মীর অবধি নড়ে উঠল, গান্ধীজী হাঁক দিয়েছেন "ভারত ছাড়ো।"

এই "ভারত ছাড়ো" হাঁকের সঙ্গে ইংরাজের ও আমাদের গল্পের ভাগ্য অপ্রত্যাশিতভাবে জড়িত। ইংরাজ ভারত ছেড়ে গিয়ে বাঁচলো আর তাদের ভারত ছাড়া করতে গিয়ে আমাদের গল্পের ভরাডুবি ঘটলো। এবারে আরম্ভ করি সেই ভরাডুবির পালা।

॥ ২ ॥

বছর তিনেক পরে ক্ষেমেশ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে (ইংরাজকে ভারত ছাড়াতে সে জেলে গিয়েছিল) গ্রামে ফিরে এসে দেখলো যে তার বাড়ির ভিত তেমনি কোমর অবধি আছে আর পরমেশের বাড়ির তে-তালার ছাদের উপরে পরমেশের দীর্ঘ শ্মশ্রু তাকে কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন করে বাতাসে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হচ্ছে। এসো এসো ভাই ক্ষেমেশ, তুমি আসবে সংবাদ পেয়েই দাঁড়িয়ে আছি।

ক্ষেমেশ বলল—তুমিও জেলে যাবে বলেছিলে শেষে কি হল ?

সব ঠিকঠাক, এমন সময়ে বাপুজির এক গোপন দূত এসে বলল, তোমার উপরে হুকুম এ অঞ্চলের আন্দোলন চালাতে হবে. জেলে গেলে তোমাকে চলবে না।

তা আমার বাড়িটা ওঠেনি কেন?

পাগল নাকি? বাড়ি শেষ হলে সরকার নিশ্চয় বাজেয়াপ্ত করে নিতো।

এটুকুও তো নিতে পারতো।

ছেলের হাতে মোয়া আর কি। আমার নামে ট্রান্সফার করে রেখেছি না।

ব্যবসা কেমন চলছে?

ব্যবসা কার সঙ্গে। ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে! ছিঃ? পরমেশের ঐ সংক্ষিপ্ত ছিঃ শব্দটির মধ্যে স্বাধীনতাকামী ভারতের ধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠল।

টাকা কড়ি?

একটি বিড়ি বের করতে গিয়ে মন্তব্য করলো, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি কি না, হ্যাঁ, কি বলছিলে? টাকা কড়ি? কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নীচে নামিয়ে বলল, সব স্বাধীনতা সংগ্রামে খরচ হয়ে গিয়েছে। একবার ভেবেছিলাম একটা তালিকা রাখি, কিন্তু পাছে পুলিশের হাতে পড়ে তাই আর সে চেষ্টা করিনি।

তা যা হয়েছে হয়েছে, এখন বাড়িটা আমার নামে ট্রান্সফার করে দাও।

এখনো বিপদ কাটেনি, আগে ইংরেজ ভারত ছাড়ুক।

তা আমার স্ত্রী পুত্র কোথায়?

তাদের মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই ক্ষেমেশ প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারলো কিন্তু তখন আর কী করবার আছে। দু'চার দিন পরে সে কলকাতায় চলে এলো।

কলকাতায় আসতেই শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুবান্ধবরা বললো, মামলা করো।

ক্ষেমেশ বললো, আমি কপর্দকহীন।

সে জন্য ভেবো না, আমরা জোগাড় করবো। তখন সে কিছু পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করে উকীল বাড়িতে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল।

পরমেশ আগেই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে সমস্ত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করেছিল আর সে টাকা কিনা দেশের কাজে ব্যয় হয়ে গিয়েছে। কাজেই তাকেও সময়োচিত বেশ পরিবর্তন করতে হল। 'দি হোলি বিয়ার্ডে'র সমর্থক গেরুয়া জামা কাপড়, রুদ্রাক্ষের মালা ললাটে রক্তচন্দন, হাতে কমণ্ডলু—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত কিছুমাত্র ত্রুটি হল না। শত্রুরা কানাঘুষায় বলতে শুরু করলো যে ক্ষেমেশ যাতে পাগল হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যে তান্ত্রিক অভিচার শুরু করেছে সে। কারণ সে নাকি উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনেছে যে বাদী পাগল

প্রতিপন্ন হলে মামলা চালাবার অধিকার হারায়।

তখন বন্ধুরা এসে ক্ষেমেশকে দুঃসংবাটি দান করলো: (এসব কাজে বন্ধুর কখনো অভাব হয় না) ওহে পরমেশ যে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে।

আমি করেছি হাইকোর্টে নালিশ।

সেই সঙ্গে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে আপত্তি কি?

উদ্দেশ্য ?

ও তোমাকে উচাটন কিনা পাগল করতে চায়, আমাদেরও সেই ক্রিয়া আরম্ভ করা উচিত যাতে ও পাগল হয়ে যায়।

এসব পরামর্শ বড় অগ্রাহ্য হয় না। কাজেই এ পক্ষ থেকেও অভিচার শুরু হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। পথে দেখা হওয়ায় পরমেশ ও ক্ষেমেশ পরস্পরকে আক্রমণ করে বসল। একজনের হাতের কমণ্ডলু ও অপরের বগলের নথীপত্র ধুলোয় লুটোতে লাগল। পাঁচজনে মিলে ছাড়িয়ে দিলে। দুইজনেই এক যোগে থানায় গিয়ে First Information লিখিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। তারপর থেকে তারা আত্মীয় স্বজন কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ। কাজেই আর মারামারির আশঙ্কা রইলো না। কিন্তু আধিভৌতিক উৎপাতের পথ বন্ধ হলেও আধিদৈবিকের পথ খোলাই রইলো—আর অচিরে ফলও ফলল সেই পথে। প্রথমে ক্ষেমেশ পাগল হয়ে গেল, তার কিছুদিন পরে পরমেশ। যারা আধিদৈবিকে বিশ্বাসী তাঁরা বললেন হতেই হবে, মন্ত্র তো মিথ্যা হতে পারে না। আর যাঁরা আধিভৌতিকেই সন্তুষ্ট তাঁরা বললেন, এর চেয়ে অনেক কম বিপদে লোকে পাগল হয়ে যায়—এ আর এমন নূতন কি?

প্রথমে ক্ষেমেশ গিয়ে ভর্তি হল গৌড়ীয় উন্মাদ আশ্রমের ১৩ নম্বর ঘরে, কয়েক দিন পরেই ১৪ নম্বর ঘরে ভর্তি হল পরমেশ। যারা ওদের ইতিহাস জানতো বলল: নিয়তি। যারা জানতো না তাদের জন্যই নেপথ্য বিবরণ প্রকাশ করলাম। পরবর্তী ঘটনা সকলেরই অজ্ঞাত—তা এবারে সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

॥ ৩ ॥

পরদিন পরমেশ ও ক্ষেমেশের আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে গিয়ে ওদের ভাবগতিক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

একি ব্যাপার! দু'দিন আগেও যারা পরস্পরকে খুন না করে জলগ্রহণ

করবে না প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ছিল; একজন বলতো ওর দুঃশাসনী বুকের রক্তপান করবো—অপর জন বলতো দুর্যোধনের মতো ওকে ভগ্নউরু করবো; আজ তাদের একি অপ্রত্যাশিত সৌভ্রাত্র্য। সবাই দেখলো ওরা দুজন বারান্দার একপাশে পাশাপাশি চেয়ার টেনে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রান্তালাপে নিযুক্ত। ওরা আত্মীয়দের দেখেও দেখলো না, বরঞ্চ চেয়ার দু'খানা আরও ঘনিষ্ঠভাবে টেনে নিল।

সবাই গিয়ে রেসিডেন্ট ডাক্তারকে শুধালো, স্যার ব্যাপার কি?

তিনি বললেন, নইলে আর উন্মাদ রোগ বলছে কেন?

কিন্তু ধরুন হঠাৎ যদি আবার খুন চেপে যায়!

আমরা আছি কেন?

কিন্তু স্যার পীনাল কোড বলেও তো একটা ব্যাপার আছে!

পাগলের আচরণ পীনাল কোডের অধিকারের বাইরে। তা ছাড়া তেমন হওয়ার আশঙ্কা নেই, তবে নিরাময় হয়ে উঠলে কি হয় কে জানে!

ওরা সবাই বলল, না, না, নিরাময় হলে আর এমন হবে কেন। তা স্যার, কতদিন লাগবে?

এখন থাকুক কিছুদিন, ওদের কেস একেবারে হোপলেস নয়।

উন্মাদাগারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা হয়ে থাকে এপর্যন্ত সবাই জানে কিন্তু ঠিক তার প্রকৃতিটা অল্প লোকেরই পরিজ্ঞাত। ব্যাপারটা জানাজানি হলে সংসারে পাগলের সংখ্যা কমতো বই বাড়তো না। এখন রীতিটা বৈজ্ঞানিক হলেও খুব কঠিন নয়। প্রত্যেক রুগীকে একটা করে ঘরে আবদ্ধ করে চার পাঁচজন বলবান ব্যক্তি লাঠিপেটা করতে থাকে যতক্ষণ না রুগী একেবারে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে। অবশ্য প্রকাশ্য অপারেশন থিয়াটারে নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি এবং ঔষধাদি সজ্জিত আছে—সেসব কেবল রুগীর আত্মীয়-স্বজনদের অভিভূত করবার উদ্দেশ্যে।

যথাকালে প্রাতঃকালে পাশাপাশি ১৩ নম্বর ও ১৪ নম্বর ঘরে যথাশাস্ত্র চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে যায়। তখন উক্ত দুই ঘর থেকে আর্তরব উঠতে থাকে, "কোথায় ভাই পরমেশ বাঁচাও!" "কোথায় ভাই ক্ষেমেশ বাঁচাও।" কিন্তু কে কাকে বাঁচাবে—দুজনেরই সমান অবস্থা। ক্রমে উচ্চকণ্ঠ মৃদু ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, বোঝা যায় এবেলার মতো Treatment সাজ হল। আত্মীয়স্বজন এত জানতে পারে না, তারা প্রকাশ্য স্থানে বিচিত্র চিকিৎসা সরঞ্জামগুলো পরস্পরকে ইঙ্গিতে

দেখায় আর মুগ্ধ হয়ে ফিরে যায়—রুগী সেরে উঠলো বলে।

সব হাসপাতালেই চিকিৎসারীতি প্রায় একই রকমের, তবে কিছু উনিশ বিশ থাকা অসম্ভব নয়। এই জন্যেই হাসপাতালে অভিভাবকের প্রবেশের সময় সঙ্কীর্ণ। তবু যে মাঝে মাঝে আত্মহত্যা ও গুম খুনের সংবাদ পাওয়া যায় সে কেবল ব্যবস্থার ত্রুটিতে।

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ওদের আত্মীয়স্বজন আসে প্রতিদিন ওদের তন্ময় ঘনিষ্ঠ প্রীতি মুগ্ধ ভাব দেখে—আর বুক ভরা সংশয় নিয়ে ফিরে যায়, ভাবে হয়তো তখনই ওরা পাগল ছিল, এখনই প্রকৃতিস্থ।

ওদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে একজন পার্টটাইম রাজনীতিক ছিল, বিশ্বের হিত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই তার মাথায় আসে না, সে তো রীতিমতো একটা সিদ্ধান্ত করে বসল। তার সিদ্ধান্তে এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায কেনেডি ক্রুশ্চেফ, মাও-সে'তুং প্রভৃতিকে উন্মাদাগারে প্রেরণ। তবে নেহরুকে প্রেরণ করা চলবে না। তিনি গোড়া থেকেই বেজায় প্রকৃতিস্থ। কিন্তু কেমন করে অব্যবসায়িগণ বুঝবে যে এই প্রকৃতিস্থতার মূল কারণ হচ্ছে ডজন খানেক দুর্দ্ধর্ষ বলশালী ব্যক্তি, যাদের কখনো কখনো ডন কুস্তি করতে দেখতে পেয়েছে ওরা হাসপাতালের বাগানের মধ্যেই কিন্তু বুঝতে পারেনি তাদের সার্থকতা।

একদিন ওরা হাসপাতালে আসতেই ভিজিটিং সার্জেন মেজর ভোঁসলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাঁ, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসারযোগ্য ডাক্তার বটে, মুখমণ্ডল যদি বাংলাদেশে হয় তবে উদরটা গুজরাটে। সবসুদ্ধ মিলে একটা বিধাতার বিস্ময়ের হাঁ।

ওরা কেমন আছে, স্যার।

আমার তো মনে হয় ইম্প্রুভমেণ্ট হচ্ছে, আশা করি মাসখানেকের মধ্যে রিলিজ করে দেওয়া সম্ভব হবে।

ওরা উঁকি মেরে দেখলো। এখন আর কাছে যায় না, তাতে নাকি রুগীদের রি-অ্যাক্শন খারাপ হয়। পরমেশ ও ক্ষেমেশের মুখ কিছু গম্ভীর, আর চেয়ার দু'খানাও তেমন ঘনিষ্ঠ নয়।

ভালো কোথায়! এ যে পূর্ব্ববৎ হতে চলল।

ডাক্তার বলল, আপনারা বললে তো শুনেছি না, আমাদের রিপোর্ট ফেভারেবল।

হবেও বা, ভাবতে ভাবতে ওরা চলে যায়।

রুগী ভালোর দিকে, এখন আর সবদিন আত্মীয়স্বজন আসে না. ৪। ৫ দিন পরে পরে এসে সংবাদ নিয়ে যায়।

সেদিন এসে দেখলো পরমেশ ও ক্ষেমেশ বারান্দার দুই বিপরীত প্রান্তে চেয়ার টেনে নিয়ে উপবিষ্ট, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না কেবল একবার একবার পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। আরও মনে হল এতদিনে যেন ওরা চিনতে পারছে আত্মীয়দের।

তবু সন্দেহ যায় না।

কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু, আবার কি রিল্যাপ্স করবে নাকি?

রিল্যাপ্স কোথায়? আমাদের মেশিন ক্রমেই অধিকতর অনুকূল রাডিং দিচ্ছে ওরা দ্রুত আরোগ্যের পথে।

কিন্তু ওদের ভাবগতিক দেখে—

ভাবগতিক যাই হোক, আমাদের ইলেকট্রো লুন্যাসিগ্রাফ মেশিন তো মিথ্যা বলতে পারে না, ওদের লুন্যাসির কোএফিসিয়েণ্ট প্রায় নরম্যালসির কাছা-কাছি এসেছে, এখন যে কোন দিন রিলিজড্ হবে, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন।

পরদিন ভোরে ওদের বাড়ীতে এমার্জেন্সী মেসেজ পৌছলো, শীঘ্র আসুন, রুগী সম্পূর্ণ নরম্যাল হয়েছে, এখনি নিয়ে যেতে হবে।

ওরা গাড়ী নিয়ে ছুটে গিয়ে উপস্থিত হল। রুগীরা কোথায়?

অফিস ঘরের মধ্যে পরমেশ ও ক্ষেমেশ ৭।৮ জন বলশালী লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দণ্ডায়মান। কাছেই মেজর ভোঁসলা। আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হতেই রুগীরা ছাড়া পেলো আর সেই মুহূর্তেই দুজনে হিংস্র জাগুয়ারের মতো পরস্পরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে পরস্পরকে ভূপাতিত করলো।

আজ শালার দুঃশাসনী রক্ত পান করবো।

আজ শালার দুর্যোধনী উরুভঙ্গ করবো।

একি কাণ্ড স্যার?

রুগীরা পারফেক্টলি নরম্যাল হয়েছে, ইলেকট্রো লুন্যাসিগ্রাফের রীডিং।

কিন্তু অবস্থা এযে পূর্ববৎ হল—

তাহলে বুঝতে হবে তখনি ওরা নরম্যাল ছিল।

তবে এতদিন কী অবস্থা চলছিল?

সেটাই এবনরম্যাল, অস্বাভাবিক।

তবে উন্মাদে আর প্রকৃতিস্থে ভেদ কিসের?

দৃষ্টির। আমাদের দৃষ্টিতে ওরা এতদিনে নরম্যাল হয়েছে, এবারে বাড়ী নিয়ে যান।

তখন দুইপক্ষ গর্জমান, লম্ফমান। পরস্পরকে হন্যমান প্রকৃতিস্থ পরমেশ ও ক্ষেমেশকে গাড়ীতে চাপিয়ে আত্মীয়েরা বাড়ী ফিরে চলল।

আগের ভাব ভাষা আচরণ ফিরে পেয়েছে কাজেই ওরা প্রকৃতিস্থ ছাড়া আর কি।

ইশারা

স্টেশনের নামটা অদ্ভুত রাজাভাতখাওয়া। কোন্ এক রাজা নাকি কী একটা উৎকট পণ রক্ষা ক'রে এখানে ব'সে ভাত খেয়েছিলেন। তা খান, আমাদের আপত্তি নাই। আপত্তি এই যে, এমন সৃষ্টিছাড়া স্থানও যে, ভূ ভারতে থাকতে পারে তা কল্পনায় ছিল না। পাহাড়ে আর জঙ্গলে চারদিক থেকে জায়গাটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে তারই মাঝখানে মীটার গেজ লাইনের ছোট্ট একটি রেল স্টেশন—এ ছাড়া দূরে বা নিকটে গ্রাম বা শহর বলে যদি কিছু থাকে তা জানবার উপায় নেই—পাহাড় আর জঙ্গল দৃষ্টির অন্তরায়। গাড়িতে আসবার সময়ে দু' মিনিট আগেও বুঝতে পারিনি যে, একটা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছি। গাড়ির গতি একটু মন্দ হতে অনুভব করে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি যে সামনেই স্টেশন। এ যেন জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে এতটুকু একটু লোকালয় প্রক্ষিপ্ত। নেমে পড়লাম। দু'জন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁদেরই আমি অতিথি।

পাঠকে হয়তো ভাবছেন এমন স্থানে আসবার কি প্রয়োজন ছিল? কিছুই প্রয়োজন ছিল না। তবে কিনা রবীন্দ্রনাথ নামে একজন বাঙালী কবি কিছুকাল আগে দেহরক্ষা করেছেন, বৈশাখ মাসে তাঁর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একে যদি প্রয়োজন বলা যায় তবে সে প্রয়োজন কবির নিশ্চয় নয়। আমারও নয় বলে' মনে করি। জামালগুড়ি চা-বাগানের যে সব উদ্যমী যুবক এই উপলক্ষে আমাকে এতদূর টেনে এনেছেন তাদেরও নিশ্চয় নয়। তবে কার? একেই বলে ভূতের বেগার।

নমস্কার স্যার, পথে নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে।

না, না, কষ্ট কোথায়? বেশ আরামে এসেছি।

এই পর্যন্ত বলে মনে মনে বললাম, পথ তো এখনো ফুরোয়নি।

এমন মর্মান্তিক সত্য অনুভূতি অল্পই ঘটেছে। অল্পক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম। আসুন স্যার, এবারে রওনা হতে হবে।

অনেক দূর নাকি?

দূর আর কই—কুড়ি পঁচিশ মাইল। অপর যুবকটি বলল, চমৎকার পাকা রাস্তা। ঘণ্টাখানেকে পৌঁছে যাবো।

ছোট একখানা মোটর গাড়িতে করে তিনজনে রওনা হ'লাম—ড্রাইভারকে নিয়ে চারজন।

সরু কালো ফিতের মতো পীচঢালা পথ, দু'পাশে ঘন বনস্পতির অরণ্য, দু'হাত ভিতরে দৃষ্টি চলে না, বনস্পতির তলায় আগাছার নিবিড় জঙ্গল। এ যেন পথের দু'দিকে দুর্ভেদ্য উদ্ভিদের প্রাচীর উঠে গিয়েছে। উপরের দিকে চাইলে দেখতে পাওয়া যায়—ঐ অনেক উঁচুতে দু'পাশের গাছের মাথায় মাথায় মিলে গিয়েছে। এ যেন উদ্ভিদের একটি অন্তহীন টানেলের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে কাজেই টানেল ঘন অন্ধকার—কেবল মোটরের বাতি দুটো আলোর সম্মার্জনী নিক্ষেপ করে পথ ঝাঁট দিয়ে চলেছে। ঐ ক্ষীণ আভাতে অন্ধকার আরো ভয়াবহ হয়ে চোখে পড়ছে।

আমি শহরের মানুষ; বনজঙ্গলের কথা বই ছাড়া পড়িনি, বললাম বাঘ টাঘ বের হবে না তো।

না স্যার, বাঘ কোথায় মানুষের দাপটে সব ভুটান পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছে।

বাঘও যে মহাপ্রস্থানের পথে যেতে পারে নতুন জানলাম।

অপর যুবকটি বলল, ভয় যা হাতীর।

তার মানে?

মাঝে মাঝে বের হয় কিনা।

তবে তো মুশকিল।

মুশকিল আর কি। গাড়ি থেকে নেমে দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

তারপর?

তারপর আর কি? ধীরে ধীরে চলে যায়—আর তেমন তেমন খেয়াল হলে গাড়িখানা দুমড়ে ভেঙে ফেলে দিয়ে যায়। ভারী মেজাজী জানোয়ার।

গাড়ি ভেঙে ফেললে হেঁটে যেতে হয়?

তা ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন।

তা বটে। মনে মনে বললাম—ভয় আর কাকে বলে।

একজন বলে উঠল—আসল ভয় কি জানেন?

ভাবলাম এ সব তবে আসল ভয় নয়। শোনাই যাক সে বস্তু না জানি কি।

পথে একটা নদী আছে।

নৌকায় পার হতে হবে বুঝি?

এ সব পাহাড়ী নদীতে নৌকো কোথায়?

খুব স্রোত বুঝি ?

জল নেই তার স্রোত। স্যার, আপনি বুঝি এদিকে এই প্রথম ?

প্রথম (এবং শেষ—এটা অবশ্য মনে মনে)।

হঠাৎ বন্যা নামে।

হঠাৎ ?

এ তো বাংলাদেশের বন্যা নয় যে বৃষ্টি দেখে বা নদীতে জল বাড়তে দেখে বুঝতে পারা যাবে। এ দেশের বন্যা আধ ঘণ্টা আগেও বুঝতে পারা যায় না।

অপর যুবকটি ব্যাখ্যা করে বলল, পাহাড়গুলো কাছেই কিনা। দু' তিন মাইলের মধ্যেও পাহাড় আছে। সেখানে বৃষ্টি হলেই পাহাড়ের সমস্ত জল ঝাঁপিয়ে চলে আসে মালখাই নদী দিয়ে।

বৃষ্টি এখন হচ্ছে নাকি ?

বৃষ্টি কোন্ সময় না হচ্ছে। স্যার, ডুয়ার্সে দুটো ঋতু বর্ষা আর শীত।

বেশতো বন্যা দেখলে নদীতে না নামলেই চলবে।

বন্যা দেখলে আর নামবো কেন।

তবে আর কি ভয় ?

নেমেছি এমন সময়ে বন্যা এসে পডলেই ভয়।

তেমন ঘটে নাকি ?

যুবক দুজন সমস্বরে বলে উঠল—খু-ব।

এমন কখনো ঘটেছে নাকি ? কতবার ?

এই তো সে বছর জোয়ালখালি চা বাগানের ম্যানেজার মিস্টার জেফ্রি গাড়ি সুদ্ধ বন্যার মুখে পড়ে গিয়েছিল।

মারা গেল নাকি ?

মিস্টার জেফ্রি অনেক কষ্টে বেঁচে গেল কিন্তু মিসেস জেফ্রি যে কোথায় তলিয়ে গেল আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অপর যুবক বলল, পাচ সাতদিন পরে পাওয়া গিয়েছিল মাইল পঁচিশ ত্রিশ দূরে। তবে তখন আর চিনবার উপায় ছিল না—পাথরের ধাক্কায় ধাক্কায় একটা মাংসপিণ্ড মাত্র।'

সাহেব কি করলো ?

মিস্টার জেফ্রি বছর খানেকের মধ্যেই চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গিয়েছে।

লোকে তো বলে স্যার—

এই যে নদীতে এসে পড়েছি বলে উঠল অপর যুবকটি।

নদীর কাছে বন না থাকায় অনেকটা ফাঁকা। তারার আলোয় আর মোটরের আলোয় মালখাই নদীর চেহারা দেখতে পেলাম। অনেকটা চওড়া

সত্য, নদীগর্ভে ছোট বড় উপল বিছানো—ওর উপর দিয়েই পথ—অর্থাৎ মোটর চলাচল করে। অদূরে একটা উঁচু দ্বীপের মতো।

ওটা কি ?

ওটা দ্বীপ ঃ বন্যার সময়ে ওখানে উঠে প্রাণ বাঁচায়।

ওখানে উঠেই তো মিস্টার জেফ্রি প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল।

ওটা যদি তলিয়ে যায় !

তবে এ অঞ্চলে একখানা গ্রামও জেগে থাকবে না।

ভয়ঙ্কর যার কীর্তিকলাপ সেই নদী কিন্তু আমরা একেবারে নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলাম। সংসারে ভীষণতম ভয়ের ব্যাপারগুলো অধিকাংশ সময়েই মনে মনে ঘটে।

॥ ২ ॥

দুদিন জামালগুড়ি চা বাগানে কাটিয়ে আবার ফিরে চলেছি। শেষ রাতে গাড়ি ধরতে হবে রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে, তাই রাত্রে আহারান্তে বেশ খানিকটা সময় হাতে রেখে রওনা হ'লাম। সেই পথ, সেই গাড়ি, সেই দু'জন যুবক সঙ্গী। এ দু'দিন মন্দ কাটে নি। তবে রবীন্দ্র জন্মোৎসব কেমন হ'ল জিজ্ঞাসা বাহুল্য, যেহেতু অধিকাংশ চায়ের বাগান এবং অধিকাংশ রবীন্দ্র জন্মোৎসব সভা একই ছাঁচে ঢালাই। ওর মধ্যে ছোট বড় আছে, তবে ছাঁচ আলাদা নয়। কাজেই যাঁরা একটি চায়ের বাগান ও একটি রবীন্দ্র জন্মোৎসব সভা দেখেছেন তাঁদের সব দেখা হ'য়ে গিয়েছে। অতএব ও আলোচনা বাহুল্য।

অনেকক্ষণ নীরবে চলবার পরে মৌন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে বললাম, আকাশে খুব মেঘ করেছে।

একটি যুবক বলল, এদিকে আকাশে কখন্ মেঘ নেই স্যার ?

শীতকালে ?

ঘন কুয়াশা মেঘের চেয়েও খারাপ। মেঘ তবু কতকটা উঁচুতে কুয়াশা দরজা জানলা দিয়ে ঢুকে চোখে মুখে ভেজা গামছা চাপা দেয়।

যুবক দুটির কথাবার্তা শুনলে বেশ বুঝতে পারা যায় এরকম প্রশ্নে অভ্যস্ত, উত্তরগুলো সব সময়েই হাতের কাছে গোছানো থাকে। চায়ের বাগানের মতো চায়ের বাগানের বাবুদের কথাবার্তাও বুঝি এক ছাঁচে ঢালা।

বললাম পথে আবার না বৃষ্টি নামে !

একজন বলল, নদীটা পেরিয়ে গেলে নামুক যত খুশি বৃষ্টি।

বললাম বন্যা নামলে নদী পার হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, কি বলেন ?

অসম্ভব বই কি ! সেইজন্যেই তো এত আগে বের হলাম। নইলে শেষরাতে গাড়ি, ঘণ্টা দুই আগে বের হলেই চলতো।

বেশিক্ষণ কথাবার্তা চালানো গেল না। একে ভরা পেট, তাতে রাত্রি

হয়েছে, তার উপরে ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস। চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে কতক্ষণ জানি না, একটি যুবক বলে উঠল উঠুন স্যার, উঠুন, নদীর ধারে এসে পড়েছি।

ঘুমের ঘোরে শুনলাম নদীতে বান এসে পড়েছে। ধড়ফড় করে জেগে উঠে বললাম—বান এসে পড়েছে তবে তো মুশকিল!

ওরা বলল, বান কোথায়? দিব্বি শুকনো। তাইতো দেখছি।

নিশ্চিন্ত মনে মোটর নদীর মধ্যে নেমে গেল। গাড়ি অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে এমন সময় এক তুমুল কলরব উঠল।

স্যার নামুন,

কেন, কি হয়েছে?

ড্রাইভার ও সঙ্গী দু'জনের মুখ থেকে সমস্বরে একটিমাত্র শব্দ বের হ'ল—বান।

গাড়ি থেকে নেমে দেখি তিনজনে মোটরখানা ঠেলছে। আপদ্‌ধর্মে অতিথি বিচার নেই—বলল্ স্যার একবার যদি হাত লাগান।

চারজনে মোটরখানা ঠেলছি। যাওয়ার সময় ঐ যে উঁচু দ্বীপটা দেখেছিলাম, বুঝলাম তার উপরে তুলতে হবে গাড়িখানা।

আমার অবস্থা উপভোগ করবার মতো বটে! স্থান অজানা, রাত্রি ঘনান্ধকার পশ্চাতে ধাবমান মৃত্যুর বন্যা, অচেনা এক নদীগর্ভে রাত্রি দ্বিপ্রহরে মোটর গাড়ি ঠেলছি।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। বন্যার কলগর্জনের মধ্যেও তার টুকরো ভেসে আসছিল আমার কানে।

গাড়িখানা তুলতে পারবো কি?

বোধহয় পারবো, এখনো মিনিট দশেক সময় পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে।

স্যার, বড় কষ্ট দিলাম।

সে কি কথা! প্রকৃতির খেয়ালের দায়িত্ব তো আপনাদের নয়।

অবশেষে দ্বীপের নীচে এসে উপস্থিত হলাম, দেখলাম গায়ে বেশ প্রশস্ত পথ।

এখানে এমন সুন্দর পথ হ'ল কি করে?

মিস্টার জেফ্রি এই দ্বীপে উঠে রক্ষা পেয়েছিলেন তারপরে তৈরি করে দিয়েছেন পথটা, যাতে বিপদের সময়ে লোকে সহজে মোটর তুলতে পারে।

মোটরখানাকে ঠেলে দ্বীপের মাথায় তুলে চারজনে শুয়ে পড়লাম, বসে থাকবার মতো শক্তি কারো দেহে অবশিষ্ট ছিল না। আকাশের দিকে চোখ পড়তেই দেখি সেখানেও একটা বন্যা আসন্ন হয়ে উঠেছে। মেঘগুলো তাড়া খেয়ে ছুটছে, তারাগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে, সমস্ত আকাশটায় চলছে একটা সমুদ্র মন্থনের পালা। কিন্তু অধিক কবিত্ব করবার সময় ছিল না। সেকালের বিজয়ী

রাজারা হতভাগ্য পরাজিতকে রথচক্রে বেঁধে নিয়ে যেতো তেমনি বৃহৎ সমারোহে আসছে ঐ পাহাড়ী বন্যা। অন্ধকারের রথারোহণে নিশীথের মৌন প্রহরগুলিকে বেঁধে নিয়েছে রথের চাকার সঙ্গে। অতিকায় একটা নিরেট হাতুড়ির মতো সমস্ত বন্যাপ্রবাহ একযোগে আঘাত করলো ক্ষুদ্র দ্বীপটাকে মনে হল চরাচর কাঁপছে। কারো কথা কেউ শুনতে পাচ্ছি না। মনের মধ্যেকার চিন্তাগুলোও যেন ঐ শব্দে চাপা পড়ে গিয়েছে। দ্বীপের মজ্জার মধ্যে আছে পাথর তাই তাকে ধসাতে পারলো না, সেই ক্ষোভে অধিকতর ফেনিল, কুটিল, জটিল হয়ে, ফুলে ফেঁপে, গর্জে, যমরাজের বাহন মহিষের মতো খরখড়্গ শৃঙ্গ দ্বারা ঢুঁর পরে ঢুঁ মেরে সহস্রকণ্ঠের হলহলায় দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত ক'রে তরল মৃত্যু দুই চক্ষুর সীমানা অবধি বিস্তারিত হয়ে গিয়েছে। ভালো করে দেখে মনে হ'ল যেন আর একখানা আকাশ বন্যায় উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে; কালো জল, কালো মেঘ, ফেনার চমক তারা, আর ঐ গর্জন ছাপিয়ে গিয়েছে মেঘের ডাককে।

চারজনে নীরব। এমন উপচীয়মান মৃত্যুর সম্মুখে কীই বা থাকতে পারে বলবার।

কিছুক্ষণ পরে, কতক্ষণ বলতে পারি না, কানের প্রত্যয় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ঐ মহাকালীর লেলিহ রসনার সম্মুখে—সঙ্গীদের একজন বলে উঠ্‌ল, যাক্, বেঁচে গেলাম।

তাইতো মনে হচ্ছে ভাই, আর জল বাডবার আশঙ্কা নাই।

এতক্ষণ তাদের নীরবতার কারণ বুঝতে পারলাম। অভ্যস্ত চোখ ও অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে ওরা বিচাব করছিল বন্যার জল কতদূর উঠবে।

একজন বলল, স্যার আর ভয় নেই, জল আর বাডবে না।

আর একজন বলল, যা বাড়বার বেড়েছে, এবার কমবার পালা।

শেষ রাতে আমরা রওনা হতে পারবো মনে হচ্ছে।

তখন একজন পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়ে বলল, আগেও বন্যার মুখে এইভাবে এখানে আশ্রয় নিয়েছি, কিন্তু এমনতরো রোখ কখনো দেখিনি।

আর একজন আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, স্যার এক হাত নীচেই জল, খুব সাবধানে নড়াচড়া করবেন, একবাব জলে পা পড়লে আর রক্ষা নেই।

আমি বললাম—একেবারে মিসেস জেফ্রির দশা। কেউ উত্তর দিল না।

তারপর একজন বলল, স্যার আপনি গাড়ির মধ্যে উঠে একটু গড়িয়ে নিন।

আর আপনারা?

আমাদের জেগে থাকা ছাড়া উপায় নাই, তাছাড়া গাড়ির মধ্যে চারজনের শোবার জায়গা তো হবে না।

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলাম, বেশি অনুরোধ করতে হ'ল না, সন্তর্পণে পদক্ষেপে মিসেস জেফ্রির দশা এড়িয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। একটুখানি গড়িয়ে নেবো মনে করে শুতেই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

॥ ৩ ॥

স্যার উঠুন, উঠুন।

ডাক শুনে জেগে উঠে নিতান্ত অপ্রস্তুত বোধ করলাম, সবাই জেগে আর আমি কিনা স্বার্থপবের মতো ঘুমোচ্ছিলাম। বললাম—এই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তার পরে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠলাম—এ কি, আকাশ যে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে ভোর হ'ল বুঝি।

তারা বলল, ভোর হয়নি, তবে রাত শেষ হ'ল বলে।

নদীর দিকে তাকাতেই বিস্ময়ের সীমা রইলো না, এ যে আগাগোড়া শুকনো। রাতের বন্যা তবে কি দুঃস্বপ্ন নাকি ?

তাবা বললো, এখানকার বন্যার এই তো রীতি। কে বলবে রাতে প্রলয়ঙ্করী বন্যা এসেছিল।

আমার মুখ দিয়ে শুধু বের হ'ল—কি আশ্চর্য।

তখন সকলে মিলে মোটরখানা ঠেলে নামিয়ে নির্বিঘ্নে নদী পাব হলাম। তারপরে বাঁধানো রাস্তায় মোটর সবেগে ছুটে চলল।

সহানুভূতি সুরে বললাম আপনাদের রাতে ঘুম হল না। আমি একাই সব জায়গা জুড়ে নিয়ে ছিলাম।

জায়গা থাকলেও ঘুমোতে পারতাম না। বানের দিকে চোখ রেখে জেগে থাকা অত্যাবশ্যক। পাহাড়ী নদীর বান বিশ্বাস নাই, কমে গিয়েও অনেক সময় আবার বেড়ে যায়।

অন্য একজন বলল, ঐটুকু জায়গায় বসে বসে আপনিই বা কতক্ষন ঘুমিয়েছেন।

বলতে যাচ্ছিলাম তা বটে। এমন সময়ে স্বপ্নের কথা মনে পড়লো। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই বুঝলাম ঘুম এসেছিল নিশ্চয়। আগুন ছাড়া তো ধোঁয়া হয় না। স্বপ্নের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠতেই রহস্যের আর এক দিগন্ত অবারিত হয়ে গেল। অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বের হল—তাই তো।

কি স্যার !

না এমন কিছু নয়।

বললাম বটে এমন কিছু নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলাম না। শুধোলাম আচ্ছা—মিসেস জেফ্রি কি বাঙালী ছিলেন ?

তারা সবিস্ময়ে বলে উঠলেন চিনতেন নাকি ?

কি করে জানলেন ?

না, হঠাৎ এমনি মনে হ'ল তাই বললাম।

হঠাৎ এ কথা মনে হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি—অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।

শুনুন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি। নদীতে বান এসেছে। বানের তাড়ায় একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি এসে উঠল দ্বীপটায়। পুরুষটির শ্বেতাঙ্গ, রমণী সুন্দরী হলেও শ্বেতাঙ্গিনী নয়। চারিদিক ডুবে গিয়েছে—দ্বীপের আগাগোড়া নিমর্জ্জিত শুধু মাথার টাকটা যেন শুকনো। পাশাপাশি ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপরে পুরুষটি মেয়েটিকে ইঙ্গিতে বলল এদিকে সরে এসো, তোমার পায়ের কাছে জল এসে পড়েছে। মেয়েটি পুরুষটির কাছে সরে আসতেই হঠাৎ পুরুষটি তাকে মারলো এক প্রচণ্ড ধাক্কা।

একি করলে! একি করলে! **oh brute! and all for Dorothy!** কতক বাংলায়, কতক ইংরাজিতে বলতে বলতে প্রবল স্রোতের মধ্যে পড়ে মেয়েটি আর তার শেষ কথাগুলো গেল তলিয়ে।

এই পর্যন্ত বলে মন্তব্য করলাম অবশ্য এরা নিশ্চয় জেফ্রি দম্পতি নয়। তবু কেমন মনে হ'ল তাই বললাম।

তারপরে প্রসঙ্গ পালটে বললাম—ট্রেন পাবতো।

তারা ঘড়ি দেখে বলল—যথেষ্ট সময় আছে-তা ছাড়া এদিকের-ট্রেন প্রায়ই দেরী করে। তাদের কথাই ঠিক। ট্রেন পৌঁছবার আগেই আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম। আমাকে একখানি খালি কামরায় তুলে দিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে যুবক দু'জনের একজন বলে উঠল, স্যার, আপনি স্বপ্নে যা দেখেছেন তা একেবারে মিথ্যা নয়।

তারপরে তারা জেফ্রি দম্পতির যে কাহিনী বলল তার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এই রকম।

মিস্টার জেফ্রি চা-বাগানের ম্যানেজার। বাগানের এক কেরানীর মেয়ে নলিনী, সুন্দরী আর শিক্ষিতা। একবার ছুটিতে কলকাতা থেকে বেড়াতে আসে। জেফ্রি সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে তাকে বিয়ে ক'রে ফেলল। বেশ চলছিল তাদের দাম্পত্যজীবন শিক্ষাদীক্ষাহীন তেপান্তরের মধ্যে। এমন সময় নূতন এসিস্ট্যান্ট-ম্যানেজার এলো জোন্‌স্, সঙ্গে তার অবিবাহিতা ভগ্নী ডরোথি। তারপর থেকেই ফাটল ধরলো জেফ্রি-দম্পতির মিলিত জীবনে। এ মুল্লুকের সমস্ত চা-বাগান জানলো যে জেফ্রি বিয়ে করতে চায় ডরোথিকে—কিন্তু পথে দুস্তর বাধা নলিনী বা নেলি। তারপরেই পাহাড়ী নদীর বন্যায় নেলির তলিয়ে যাওয়া।

কি আশ্চর্য তারপরে কি হ'ল?

সে তো কাল রাতে বলেছিলাম। জেফ্রি বিলেত চলে গেল।

আর নূতন এসিস্ট্যান্ট-ম্যানেজার আর ডরোথি! তারাও সেই সঙ্গে বিলেত চলে যায়।

এবারে বুঝেছি। তারপরে তাদের বিয়ে হয়েছে—তাই বুঝি কালকে

বলছিলেন লোকে বলে—কথাটা আর শেষ করতে পারেন নি নন্দী এসে পড়েছিল।

সে অর্থে বলি নি।

তবে ?

লোকে বলে জেফ্রি আত্মহত্যা করেছে।

কেন ?

ডরোথি বিয়ে করতে অস্বীকৃত হ'য়েছিল।

কেন ?

নেলির মৃত্যু তার কাছে সন্দেহজনক মনে হ'য়েছিল।

গাড়ি ন'ড়ে উঠতেই যুবক দু'জন নমস্কার ক'রে নেমে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল। অজ্ঞাত একটি রমণীর মৃত্যুর বিবরণ কি ক'রে আমার স্বপ্নে প্রতিভাত হ'ল—সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদের চেষ্টায় মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম। সেই মৃত্যুকণ্টকিত দ্বীপের স্থান-মাহাত্ম্যই কি এর কারণ ? না সেই মৃত্যু-তরঙ্গিণী পার্বতী বন্যাই এর কারণ ? সেদিনও স্থির করতে পারি নি। তারপরে অনেক বছর চলে গিয়েছে এখনো পারি নি। এখন আর রহস্যভেদের বৃথা চেষ্টা করি না, মাঝে মাঝে রহস্যটা মনে পড়ে যাওয়ায় কেমন যেন আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি!

সহযাত্রী

আজকালকার দিনে বোম্বাই মেলে কূপে গাড়িতে একাকী স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ভাগ্যগুণে সেই অসম্ভবটাই সম্ভব হল দেখছি আমার ভাগ্যে। ভাগ্য যে সর্বদাই বাম, এ কথা সত্য নয়। অবশ্য এলাহাবাদের পথে গেলে এমনটি কখনোই ঘটতো না, নাগপুরের পথ বলেই সম্ভব হল। একে শীতকাল তাতে আবার দু' রাত্রির পথ সমস্ত গাড়ির মালিক রূপে নিজেকে দেখে বেশ স্বস্তি অনুভব করলাম। তাড়াতাড়ি নীচের বার্থে বিছানা পেতে নিয়ে বাক্স, টিফিন বাস্কেট প্রভৃতি যথাস্থানে রেখে দিয়ে স্থির হয়ে বসলাম। কিন্তু গাড়ি না ছাড়া অবধি নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। হয়তো শেষ মুহূর্তে একজন এসে উঠে পড়বে। আটকাবার নিয়ম নাই, খালি বার্থ থাকলে পথ ছেড়ে দিতেই হবে। আপনারা ভাবছেন আপত্তির কি কারণ? অনেক কারণ, মশাই, অনেক কারণ। সমস্ত কামরাটা একা পেলে যথেচ্ছ আচরণ করা যায়। প্রথমেই ধরুন, হঠাৎ মনে আবেগ এলে গান সুরু করতে বাধা নেই, কারো ঘুম ভাঙানোর ঝুঁকি নিতে হয় না। তার পরে বিড়ি চুরুট সিগারেট যেমন খুশি যখন খুশি খাও। মশাই ওদিকে একটু সরে বসে খান শুনতে হবে না। তারপরে দুটো বার্থের মধ্যে যখন যেটাকে খুশি ব্যবহার করুন। উপরেরটাকে বেডরুম, নীচেরটাকে ড্রয়িং রুম মনে করলে ঠেকায় কে। আর এই শীতের রাত্রে হঠাৎ যদি সহযাত্রীর বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ইচ্ছা জাগে, আর সে যদি জানলাটা খুলে দেয় আমিই বা ঠেকাই কি করে? এই শেষেরটাকে আমার সবচেয়ে ভয়। নৈসর্গিক দৃশ্য, বিশুদ্ধ বায়ু প্রভৃতিকে দরজার কপাট ও জানালার খড়খড়ি ফেলে ঠেকিয়ে রাখাটা মনুষ্যত্বের অপরিহার্য অঙ্গ, আশা করি ভদ্রলোকমাত্রেই তা স্বীকার করবেন। তবে কাচের শার্সি দিয়ে একটু আধটু কখনো কখনো দেখলে ক্ষতি নাই। অবশ্য একা গাড়িতে চোর ডাকাতের ভয় আছে সত্য—কিন্তু কে বলতে পারে মাঝ রাতে সহযাত্রীটিই হঠাৎ ছোরা বের করে বলবে না—ভয় নেই শীগ্‌গির যা আছে দিন নইলে—ছোরাখানা মারাত্মকভাবে ঝকঝক করে ওঠে। উঁহু, শিকলের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, আগেই কেটে দিয়েছি। এ রকম বিপদ যে না হতে পারে তা নয়। কিন্তু মাঝ রাতে হঠাৎ জানালা খুলে দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসকে আমন্ত্রণ বা সবগুলো আলো নিবিয়ে দিয়ে মার্গ সঙ্গীত চর্চা (রবীন্দ্র সঙ্গীতে আপত্তি নাই, অল্পক্ষণেই শেষ হয়) করার চেয়ে ভালো। সংসারে চোর ডাকাতের চেয়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনকারীর ও সঙ্গীতানুরাগীর সংখ্যা অনেক বেশি আর প্রাণহরণের চেয়ে নিদ্রাহরণ কম বিরক্তিকর নয়। বলাবাহুল্য গাড়িতে উঠেই প্রাথমিক সতর্কতা হিসাবে দরজা জানলার যাবতীয়

ছিটকিনি ও লক বন্ধ করে দিয়েছি, প্ল্যাটফর্মের দিকের গুলোরও। দরজা খোলা রাখা কিছু নয়—ওতে টিকিট-ধারীর প্রবেশ-প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তবু ভয় যায় কই? রেলের লোক এসে বল্লে খুলতেই হবে। সেই রকমই নিয়ম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম এখনো দশ মিনিট সময় বাকি। কাঁটা দুটোর গতি এমন মন্থর কেন? পা দুখানা অসমান বলেই কি! আর পাঁচ মিনিট। বোধহয় আর কেউ উঠবে না। তবু না ছাড়লে নিশ্চয় হওয়া যায় না। অবশেষে সত্য সত্যই গাড়ি ছাড়লো। সহযাত্রীহীন গাড়ির নিঃসপত্ন মালিক হয়ে প্রকাণ্ড একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এই চরম অবস্থাতেই মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় যে, ভগবান আছেন। বাথরুমটা আর একবার ভালোভাবে তল্লাসী করে এসে ছিটকিনিগুলো আর একবার পরীক্ষা করে শুয়ে পড়লাম। এখন দেখি একটা দরজার ছিটকিনি আর লকগুলো কেমন ঢলঢল করছে। নিজের উপরে রাগ হল, এমন ভাবে অন্য দরজাটা আঁকড়ে বসে সময় নষ্ট না করে স্টেশনে মেরামত করিয়ে নিলেই হতো। যাকগে, এক ধাক্কায় খুলতে পারবে না, ঠেলাঠেলি করতে হবে ততক্ষণে ঘুম ভেঙে যাবে। আমার ঘুম খুব পাতলা। তারপরে কি উপায়ে দরজার প্রতিরোধ দুর্ভেদ্য করে তোলা যায় চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা আর মনে নেই।

॥ ২ ॥

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসলাম, শীতে সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট! দুখানা মোটা কম্বল ভেদ করে শীতের হিম অঙ্গুলি সমস্ত শরীরকে অবশ করে তুলেছে। হঠাৎ এত ঠাণ্ডার কারণ বুঝতে পারি না। অবশ্য শীতের কাল, কিন্তু আমার গায়েও যে কাবুলী কম্বল। পরিবেশের দিকে তাকাতেই শীতের কারণ বুঝতে পারলাম। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটেছে। প্ল্যাটফর্মের বিপরীত দিকের দরজা খোলা। ঢিলে ছিটকিনি ও লক গাড়ির ঝাঁকুনিতে খুলে গিয়েছে। মনে মনে রেল কোম্পানীকে অভিশাপ দিতে দিতে উঠে গিয়ে দরজাটা যথাসাধ্য বন্ধ করলাম, ভাবলাম এবারে শীতের প্রতিকার হবে। কিন্তু ওকি, ওকে? উপরের বার্থে ঘুমোচ্ছে কে?

তখন প্রথম সম্বিৎ হল রাতের নীল আলোটা জ্বলছে কেন, আমি তো সব আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়েছিলাম। তখন এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মাঝখানে এক স্টেশনে গাড়ি থামতে ঐ লোকটি ধাক্কাধাক্কি করে দরজা খুলে উপরের বার্থটি দখল করেছে। আলো জ্বালাটাও তারই কীর্তি। বুঝলাম লোকটা নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীন, দরজা ভালো করে বন্ধ করে নি। নিঃসপত্ন গাড়ির মালিক জোটাতে মনটা অপ্রসন্ন হল—তবু কিছু করবার নাই। বিছানায় এসে বসে একটা চুরুট ধরালাম। তখন সহযাত্রীর প্রতি যে মনোভাব হয়েছিল

তাকে কিছুতেই সহানুভূতি বলা যায় না। এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আবার যখন হঠাৎ ঘুম ভাঙলো দেখলাম কে একজন আমাব দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোর ডাকাত নাকি? চট করে উঠে বসলাম। মনে হল ইনিই আমার সহযাত্রী, উপবেব বার্থের মালিক।

কি ঘুম ভাঙলো?

বললাম, আপনি বুঝি উপরের বার্থে ছিলেন?

ঐখানেই তো ঘুমোই।

শোনো একবার কথা। বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলোও অভ্যস্ত হয় নি। ঘুমোই—যেন ওখানেই ওঁর স্থায়ী বাস।

প্রকাশ্যে শুধোলাম, তা উঠলেন কি করে?

ঐদিকেই প্ল্যাটফর্ম পড়েছিল কিনা। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল: ভালো করে বন্ধ করেন নি। তা আপনাকে আর জাগালাম না? শুয়ে পড়লাম।

দরজা এত অনায়াসে খুলে গেল? আশ্চর্য?

আশ্চর্য বইকি! রেলের দরজার রহস্য অপার—বলতে বলতে তিনি বিছানার এক পাশে বসলেন।

এবারে লোকটাকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম। যেমন কৃশ তেমনি ফ্যাকাশে—চোখ আর কান কোটরগত। তার উপরে গায়ে রাজ্যের জামাকাপড় গলাটা গায়ের চাদর দিয়ে জড়ানো। শীতের বিরুদ্ধে সতর্কতার অন্ত নাই।

চুরুট খাচ্ছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, খাবেন? বলে একটা চুরুট বার করলাম।

না, না থাক্, এক সময়ে ধূমপান করতাম এখন আর করিনে।

ডাক্তারের নিষেধ বুঝি?

ডাক্তারের আমি কি ধার ধারি!

চুরটের প্রসঙ্গ আর তো টানা যায় না, ভাবছি এবারে কোন্ প্রসঙ্গ শুরু করা যায়। মাঝ রাত্রে আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল।

এমন সময়ে সহযাত্রী বলে উঠলেন, আচ্ছা, মশাই আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?

না।

কেন?

কখনো দেখিনি, কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি।

দেখেছে অনেকেই বুঝতে পারেনি, আপনিও দেখেছেন বুঝতে পারেন নি।

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি।

বল্লাম—সেরকম ক্ষেত্রেও দেখিনি বল্‌লে কি অন্যায় হয়।

ধরুন এখানেই, এই গাড়ির মধ্যে এখনি যদি ভূত আবির্ভূত হয়!

মনে মনে বললাম, তুমিই ভূত, আর ভূত যদি বা না হও তবে বুদ্ধু।

প্রকাশ্যে বললাম. ভূত বলে পরিচয় না দিলে হয় তো বুঝতেই পাবো না, কেন না শুনেছি যে ভূতে আর মানুষে বাইবে থেকে প্রভেদ নেই।

যা বলেছেন। আমিও ঐ কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করি, লোকে বুঝতে চায় না।

আপনি কি একজন প্রেততত্ত্বজ্ঞ? এত কথা শিখলেন কি করে?

ঠেকে শিখেছি মশায় ঠেকে শিখেছি।

ভূত দেখেছেন বুঝি?

সে কথাব উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, ভূত মানুষেব কাছে আসে ভয দেখাবার জন্যে নয়।

তবে?

সে কিছু বলতে চায়।

বলবে আবাব কি?

সকলে তো এক কথা বলতে আসে না। কেউ চায় নিজেব পরিচয়টা দিতে, কেউ চায় জীবনকালে অপ্রকাশিত কোন গুপ্ত তথ্য জানাতে। ঐ অন্তিম আকাঙ্ক্ষার সুতোটুকু ছিঁড়তে না পাবা অবধি তাব উর্ধ্বকাশে গতি হয় না।

এসব কথা যে না জানতাম তা নয়, তবু সেই গভীব বাত্রে, ধাবমান গাড়িব নির্জনতার মধ্যে তাব মুখে কথাগুলো একটা নূতন মাত্রা লাভ করলো। খুব ঘুম পাচ্ছিল তাই প্রসঙ্গ শেষ করে দেবাব ইচ্ছায বললাম—কত দূব যাবেন?

সামনেব স্টেশনেই। নিন, আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না বুঝতে পেরেছি আপনাব ঘুম পাচ্ছে।

এই বলে লোকটি উঠে দাঁড়ালো, বার্থে উঠতে গিযে কাছে ফিরে এসে বলল এই কার্ডখানা রাখুন, যদি কখনো কাজে লাগে।

তার কার্ড আমার কোন্ কাজে লাগবে! তবু ভদ্রতার খাতিরে গ্রহণ কবে পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম, পডবাব ইচ্ছাও ছিল না, উপাযও ছিল না, আলো কম।

সহযাত্রী বার্থে উঠলেন। আমিও শুয়ে পডলাম। শয়নমাত্র গাঢ় নিদ্রা।

॥ ৩ ॥

আবার প্রচণ্ড শীতে ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসলাম। দরজাটা আবার খুলে গিয়েছে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে উপরের বার্থে চোখ পড়লো বার্থ খালি। লোকটা গেল কোথায়? বাথরুমে নাকি? দরজায় ধাক্কা দিতেই বাথরুম খুলে গেল—ঘর খালি। নিশ্চয় লোকটা সেই 'সামনের স্টেশনে' নেমে

গিয়েছে—কিন্তু সত্যি কি দায়িত্বজ্ঞানহীন। জানিয়ে গেলেই তো চলতো? যেমন চোরের মতো এলো, তেমনি চোরের মতো গেল! Scandalous! কিন্তু ওকি বার্থের উপরে কম্বলখানা ফেলে গিয়েছে যে? এক পাগল ছাড়া আর তো কেউ শীতের রাতে কম্বল ভুলে যায় না। কিংবা হঠাৎ পা ফসকে পড়েই বা গেল। যাই হোক ঘটনাটা পরবর্তী স্টেশনে জানানো দরকার। পরবর্তী স্টেশনের অপেক্ষায় চুরুট ধরিয়ে জেগে বসে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরবর্তী স্টেশনে গাড়ি এসে থামলো।

(পাঠক আমি ইচ্ছা করেই স্টেশনের নাম উল্লেখ করছি না। কেন যথা সময়ে বুঝতে পারবেন।)

গাড়ির দরজা খুলতেই সম্মুখে একজন টিকিট চেকারকে পেলাম। তাকে কাছে ডেকে নিয়ে যথা সম্ভব সংক্ষেপে পাগলটির বিবরণ জানালাম (এতক্ষণে তার পাগলত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছি) বললাম আপনি নোট করে নিন এভাবে গভীর রাত্রে যাত্রীদের হয়রানি বাঞ্ছনীয় নয়। ইতিমধ্যে আর একজন চেকার কাছে এসে পড়েছে। দু'জনের মধ্যে মৃদুস্বরে কি যেন কথা হল, একবার আমার কামরার নম্বরটা তারা দেখলো। কিন্তু নোট করবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তারপরে বলল, আচ্ছা আপনি যান, আমরা নোট করে নিলাম আর কোন ভয় নাই।

একটু রূঢ়ভাবেই বললাম, ভয়ের কথা হচ্ছে না, এ আপনাদের ডিউটি, কর্তব্য।

আগে বাংলা শব্দ বলে ইংরাজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতাম। এখন ইংরাজি শব্দ বলে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করি। যুগধর্ম।

চেকার দুজন নিজেদের মধ্যে চোখের ইসারায় কি যেন বলাবলি করলো। আমি বললাম দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সামনের স্টেশনে আপনাদের ব্যবহার সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।

আমার উষ্মায় তাদের মুখে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র বৈকল্য প্রকাশ পেলো না। ভাবলাম রেলের জগৎটাই বিচিত্র। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল। দরজা বন্ধ করে মনে মনে গজরাতে গজরাতে সামনের স্টেশনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। মস্ত জংশন স্টেশনে এসে যখন গাড়ি থামলো তখন ভোর হয়ে বেশ আলো হয়েছে তাড়াতাড়ি নেমে স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে চললাম। ঘরে ঢুকতে যাবো এমন সময়ে দরজার কাছে দেয়ালে আঁটা একখানা বড় ফটোগ্রাফ দেখে অকস্মাৎ স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হলাম। এ কি হল? এ যে আমার সহযাত্রীর ছবি! না, অণুমাত্র সন্দেহ নাই—সেই মুখ চোখ সেই কৃশতা কেবল গায়ের জামাগুলো নাই! নীচে হিন্দি ও ইংরাজিতে লিখিত "কেহ অনুগ্রহ করে মৃত ব্যক্তির পরিচয় দিতে পারলে রেল কর্তৃপক্ষ বাধিত হবে।"

তখনি মনে পড়লো সেই কার্ডখানার কথা। পকেট থেকে বার করলাম— হাঁ নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত। এক মুহূর্তে সহযাত্রীর অদ্ভুত আচরণ ও বিবরণ যথাযথ অর্থবহন করে মনের মধ্যে উদিত হল। তবে কি নিজের ঐ পরিচয়টি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাকে দেখা দিয়েছিল? বলতে ভুলে গিয়েছি ছবিখানা দেখিবামাত্র সেই শীতের রাত্রেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়েছিল। এখন রুমাল দিয়ে কপাল মুছে ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে স্টেশন মাস্টারের হাতে কার্ডখানা দিলাম। লোকটি বাঙালী। শুধোলেন, এ কি?

ঐ মৃত ব্যক্তির পরিচয়।

ভীত বিস্ময়ে তিনি বললেন, পেলেন কোথায়?

সব বলছি, আগে দয়া করে একজন কুলিকে আমার কামরা থেকে জিনিস-গুলো নামিয়ে আনতে বলুন, আপনার দরজা বরাবর ঐ যে আমার কামরা!

॥ ৪ ॥

তারপরে স্টেশনমাস্টারের বিবরণ আমার অভিজ্ঞতা ও কয়েক পেয়ালা গরম চা মিলিয়ে যা দাঁড়ালো তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হচ্ছে মাসখানেক আগে বোম্বাই মেলের ঐ কামরা থেকে একজন যাত্রী পড়ে গিয়ে মারা যায়। কেউ বলে রাত্রির অন্ধকারে পা ফসকে পড়ে যায়, কেউ সন্দেহ করে আত্মহত্যা। রেলের চাকায় গলা থেকে ধড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শীতকালে গায়ে অবশ্যই গরম জমা ছিল, পুলিস এসে পড়বার আগে তা লুট হয়ে যাওয়ায় পরিচয় কিছুই জানা যায় না। রেলের নিয়ম অনুসারে মৃতদেহের ফটোগ্রাফ নিয়ে পরিচয় জানবার উদ্দেশ্যে বড় বড় স্টেশনে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। লোকটা মারা গিয়েছিল রবিবার রাতে। সেই থেকে প্রত্যেক রবিবার রাতে ছায়াশরীরী দেখা দেয় ঐ কামরায়। আমি চতুর্থ রবিবারের যাত্রী।

শুধোলাম অন্য যাত্রীদের অভিজ্ঞতা কি রকম?

প্রথম দুই রবিবারের যাত্রী দুইজন ভয় পেয়ে মাঝপথে চেন টেনে গাড়ি থেকে নেমে অন্য কামরায় যান। তৃতীয় রবিবারে ও কামরায় যাত্রী কেউ ছিল না।

আমি বললাম, উপরের বার্থে যাত্রী থাকলে কি হতো?

ও বার্থের টিকিট বেচা বন্ধ করে দিয়েছি!

আমার মনে হয় ও কামরাখানাই লাইন থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত।

রেলওয়ে বোর্ডে লেখা হয়েছে। তাদের হুকুম পেলেই সরিয়ে ফেলা হবে।

লোকটা কেন দেখা দেয় কিছু অনুমান করতে পারেন?

স্টেশনমাস্টার বললেন অনুমানের তো প্রয়োজন নাই, প্রমাণ আপনার হাতে। ঐ পরিচয়টি দেওয়ার জন্যেই দেখা দেয়।

বললাম প্রেতাত্মা ভিজিটিং কার্ড পেলো কোথায় ?

তিনি বললেন, যে জামাকাপড় মৃতদেহের গা থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে তা ই বা পেলো কোথায় ?

এই জন্যেই কি আগের স্টেশনের চেকার বাবুরা তেমন গা করেনি।

অবশ্যই এই জন্যে। তারা জানে যে ভয়ের কারণ চলে গিয়েছে তাই আপনাকে সাহস দিয়ে বলেছিল, যান ভয় নাই।

তারপর তিনি আর দু'পেয়ালা চায়ের হুকুম দিয়ে বললেন, কিন্তু ধন্য আপনার সাহস মশাই, আমি হলে তো ভয়েই মরে যেতাম।

আমি বললাম, এতে আর সাহস কোথায় দেখলেন। আমি তো বরাবর তাকে মানুষ বলেই ভেবেছি।

মশাই ভূতকে মানুষ ভাবা, সে কি কম সাহসের কথা।

অবশেষে মন্ত্রী হলাম

না মাসিমা এ বছর পাঁচ টাকা চাঁদা আমরা নেব না, অন্তত দশ টাকা চাঁদা দিতে হবে।

কেন বাবা, এ বছর এমন কি ঘটলো যে একেবারে ডবল চেয়ে বসলে।

এর পরের বছর হয়তো চারগুণ চাইবো, অপূর্বদা যে মিনিস্টার হয়েছেন।

মাসিমার অর্থাৎ বাড়ির গৃহিণীর মুখের উপর দিয়ে ক্ষণকালের জন্যে গৌরবের আভা ফুটে উঠলো কিন্তু তখনই চাঁদাব চাহিদার বৃদ্ধিতে সে আভা স্থায়ী হতে পারলো না।

জানেন মাসিমা অপূর্বদা যে আমাদের পাড়ার গৌরব। বলুনতো কাছাকাছি কোন্ পাড়াতে একটা মিনিস্টার আছে।

এবারে আমরা স্থির করেছি অপূর্বদাকে সরস্বতী পূজা কমিটির চেয়ারম্যান করবো।

আর এক সময় এসে অপূর্বদার সঙ্গে দেখা করে যাবো। এখন আমাদের বিদায় করে দিন, নানা জায়গায় ঘুরতে হবে কিনা।

কিন্তু বাবা একেবারে পাঁচ থেকে দশ, একি জুলুম হলো না।

মাসিমা মিনিস্টারের বাড়ি থেকে এর চেয়ে কম নিলে আর সকলে কি দেবে!

বাবা, আজকালকার মিনিস্টার ঐ নামেই শুধু, মাইনেতো কেরানীর মতো।

মাসিমা, নামটাই তো সব। মানুষ মরে যায়, নামটাই তো অমর হয়ে থাকে।

অনেক দর কষাকষির পরে সাড়ে সাত টাকা চাঁদা আদায় করে ছেলেরা বিদায় হলো।

স্বামীর মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করবার পরে অপূর্ব পত্নী দোকানে একখানা শাড়ি পছন্দ করে এসেছিল, বুঝলো এ মাসে সেটা কেনা যাবে না।

আর ইতিমধ্যে যদি দোকানী শুনে থাকে যে তার স্বামী মন্ত্রী হয়েছে, তবে তো আদৌ নয়। কেন না শাড়িখানার দাম অন্তত পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেবে দোকানদার। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে তিনি বললেন দোকানদার জাতটাই নেমোখারাম। দেশের সেবা করবার উদ্দেশ্যে আমার স্বামী মন্ত্রী পদ স্বীকার করলো। কোথায় তার স্ত্রীকে অমনি দেবে না তার উপর শতকরা পাঁচটাকা বাড়িয়ে দিল।

অভিজ্ঞ পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে, (১) আসন্ন সরস্বতী পূজো উপলক্ষে পাড়ার ছেলেরা চাঁদা আদায় করতে এসেছে, (২) পাড়ার বিশিষ্ট বাসিন্দা অপূর্ব রায় ডেপুটি মিনিস্টার নিযুক্ত হয়েছেন, (৩) তদীয় পত্নী স্বামীর কাছ থেকে যে শাড়িখানা প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল, চাঁদার বর্ধিত ছিদ্র দিয়ে আপাতত কিছুদিনের জন্যে সেট অন্তর্হিত হলো।

ছেলেরা অপূর্ব রায়ের পত্নীকে খুশী করবার জন্যে একটু অত্যুক্তি করেছিল, বলেছিল কলকাতার কোন পাড়ায় এমন মিনিস্টার আছেন। ওটাকে মিথ্যা বলে ধরা উচিত নয়। কারণ চাঁদার রস দোহন করতে গেলে ওটুকু তৈল খরচ করা অপরিহার্য। এ পাড়াতে না হোক ঠিক পাশের পাড়াতে গোবিন্দ দত্ত নামে একজন মিনিস্টার আছেন। তিনি আবার অপূর্বের চেয়ে এক ধাপ উঁচুতে অবস্থিত। গোবিন্দবাবু রাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ কিনা মিনিস্টার অব স্টেট। এবারে ছেলেরা তাঁর বাড়ি আক্রমণ করলো।

মাসিমা, এই যে আমরা এসেছি।

মাসিমা অর্থাৎ গোবিন্দ দত্তর স্ত্রী বললেন, এসো বাবা, আমি তোমাদের জন্যেই বসে আছি। আরও আগে আসবে ভেবেছিলাম।

আগেই আসতাম মাসিমা, অপূর্বদার বাড়ি গিয়েছিলাম কিনা, তাই একটু দেরী হলো।

কোন্ অপূর্বদা?

আপনি খুব জানেন তাকে মাসিমা ঐ যে পার্কের ওদিকটায় থাকে। কালকে মিনিস্টার হয়েছে খবর বেরিয়েছে কিনা।

অপূর্ব রায়ের উল্লেখে গোবিন্দ দত্তের পত্নীর মুখে অবজ্ঞার ভাব দেখা গেল। নিতান্ত তাচ্ছিল্যভাবে বললেন, ঐ যে ডেপুটি মিনিস্টারটা, তা তাঁর স্ত্রী কত দিলেন?

এ যুগের বালকেরা জন্ম থেকেই সাবালক। কিন্তু এখানে তাদের হিসাবে একট ভুল হয়ে গেল। বলন যাওয়া মাত্র ও বাড়ির মাসিমা দশ টাকা দিয়ে বসলেন।

ছেলেরা যদি বলতো যে অনেক দর কষাকষি করতে হয়েছে তবে সাড়ে সাত টাকা উঠেছে তাহলে গোবিন্দ দত্তের স্ত্রী হয়তো খুশী হতেন।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, তা দিতে পারে। নতুন জুতো বেশ মচ্মচ

করে কিনা। আমরা তো বাপু ডেপুটি মিনিস্টারকে মিনিস্টার বলেই ধরি না।

ছেলেরা আবার হিসাবে ভুল করলো। বললো, কি জানেন মাসিমা, আমাদের কাছে সব মিনিস্টারই সমান। গণতন্ত্রের যুগ কিনা।

তাদের কথা শুনে মুখে আষাঢ়ে মেঘ নামিয়ে গোবিন্দ দত্তের স্ত্রী বললেন, তোমরা ওবেলা আরেকবার এসো, এখন আমার হাত জোড়া। এই বলে বিনা উপসংহারে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর সস্নেহ ব্যবহারে অকস্মাৎ রূপান্তরের কারণ ছেলেরা বুঝতে না পেরে আপাতত অন্য শিকারের সন্ধানে গেল।

২

সংসারে যে সব অলিখিত নিয়ম আছে পুরুষে পুরুষে পদের উঁচুনীচু নিয়ে ভেদ থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে না, কাজের চাপে পিষ্ট হয়ে শ্রেণী ভেদ মাথা তুলতে পারে না। কিন্তু তাদের স্ত্রীদের বেলায় অন্য বিধান। তাদের অবসর বেশী, মর্যাদাবোধ বেশী, তাই শ্রেণী ভেদ সম্বন্ধে তারা বড় সচেতন। ডেপুটি ও সাব-ডেপুটিতে বন্ধুত্ব হলেও হতে পারে, কিন্তু ডেপুটির স্ত্রী কখনো সাব ডেপুটির বাড়িতে পদার্পণ করে না। সরকারী বেসরকারী যত পর্যায়ের চাকরি আছে সব ক্ষেত্রেই এটা সাধারণ নিয়ম,মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেই বা না হবে কেন? তবে মন্ত্রীরা কিনা গণতান্ত্রিক চাকুরে তার উপরে আবার তাদের চাকুরী স্থায়ী নয়, কাজেই মুখ্যত একটা মেলামেশার ভাব দেখাতে হয়। কিন্তু মুখের ভাব আর মনের ভাব তো একরকম হবেই এমন কথা নেই, তাই তারা পরস্পরকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে। ক্যাবিনেট মন্ত্রীর স্ত্রী রাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রীকে নিম্নতম পর্যায়ের জীব বলে মনে করে আর রাষ্ট্র-মন্ত্রীর স্ত্রী ডেপুটি মন্ত্রীর স্ত্রীকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। সামাজিক সম্মেলনে দেখা হলে যতটা সম্ভব তারা পরস্পরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে। এবারে সহজেই বুঝতে পারা যাবে (যদি ইতিমধ্যে বুঝতে না পারা গিয়ে থাকে)।

কেন হঠাৎ রাষ্ট্রমন্ত্রীর পত্নী ছেলেদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। আমার আগে কিনা অপূর্ব রায়ের বাড়িতে উঠেছিল। ছোকরাদের অন্তত পাঁচ দিন ঘোরাবো। আর তার কিনা এমন স্পর্ধা যে দশ টাকা দিয়ে বসলো। ঐ কাঁটাটাই বেশ তীক্ষ্ণ। অন্তত পঁচিশ টাকা না দিলে তাকে জব্দ করা যাবে না। অথচ রাষ্ট্রমন্ত্রীর পত্নী এবং ডেপুটি মন্ত্রীর পত্নী ছেলেবেলা থেকে সহপাঠী।

আর যতদিন অপূর্ব রায় ডেপুটি মিনিস্টার হয় নি, ততদিন দুজনের মধ্যে পুরাতন সখ্য বজায় ছিল। কিন্তু এখন সে কিনা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। 'দুই বনস্পতির মধ্যে রাখে ব্যবধান।' এ ক্ষেত্রে বনস্পতি মন্ত্রী নয়, তাদের পত্নীদ্বয়।

৩

মন্ত্রীকে সবাই খুশী রাখতে চায়, কারণ লোকের বিশ্বাস তারা যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী। প্রকৃত রহস্য জানলে বুঝতো মন্ত্রিত্ব থেকে যত নীচের দিকে যাওয়া যাবে প্রকৃত সত্যকার ক্ষমতার অধিকার তত বেশী। মন্ত্রী চলেন সেক্রেটারীর মর্জিতে, সেক্রেটারী চলেন আনডার সেক্রেটারীর মর্জিতে, আনডার সেক্রেটারী চলেন ডিরেকটরের মর্জিতে, আর ডিরেকটররা চলেন করনিকদের মর্জিতে. আর সমস্ত শাসনযন্ত্র চলে দারোয়ান, চাপরাশি, লিফটম্যানদের মর্জিতে। কারণ তারা সচিবালয়ের দরজা জানালা না খুললে লিফট না চালালে সমস্ত অচল।

যাই হোক যথা নিয়মে অপূর্ব রায়ের সম্বর্ধনা সভা হয়ে গেল। রজনীগন্ধার তোড়া, রবীন্দ্র সঙ্গীত, আনন্দ নৃত্য; জলযোগ ও বক্তৃতা কিছুই বাদ পড়লো না। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে সভাপতি হলেন গোবিন্দ দত্ত, প্রধান অতিথি অপূর্ব রায়ের পত্নী আর প্রধান সম্মানের পাত্র অপূর্ব রায় স্বয়ং। উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিত গোবিন্দ দত্তর পত্নী। সভা শেষে অপূর্ব রায়ের স্ত্রী গোবিন্দ দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন দিদিকে যে দেখলাম না।

গোবিন্দ দত্ত বললেন, তার বড় মাথা ধরেছে কিনা, নইলে আসবার খুব আগ্রহ ছিল।

কথাটা শুধু সর্বৈব মিথ্যা নয়, ঠিক বিপরীত। সভায় আসবার প্রস্তাব শুনে গোবিন্দবাবুর স্ত্রী স্বামীকে এমন ধিককার দিল যে মাথা ধরে গেল রাষ্ট্রমন্ত্রীর। শুধু ধরে গেল নয়, এখনও ধরে আছে। বাড়ি ফিরে গেলে আরও বাড়বে এমন আশঙ্কা।

তোমার লজ্জা করে না, নেচেনেচে সভাপতি হতে যাচ্ছো। ডেপুটি আবার মন্ত্রী নাকি? আর যেমন কাণ্ড তোমাদের দলের যাকে তাকে নিয়ে মন্ত্রী বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

বলছো কি সুষমা, অপূর্ব আমাদের সকলের চেয়ে বিদ্যা বুদ্ধিতে বেশী। ওর দেশী-বিদেশী দু দুটো ডকটরেট ডিগ্রী আছে জানো? একেবারে দো-

নলা বন্দুক।

তবে একটা সিপাহীকে নিয়ে মন্ত্রী করে দাও না কেন; তার হাতেও তো দোনলা বন্দুক।

ছি! অমন করে বলতে নেই আমরা সবাই দেশের কাজ করছি; সবাই দেশের কথা ভাবছি।

গোবিন্দ দত্তর স্ত্রী কণ্ঠস্বরের ঝঙ্কার আর এক মাত্রা বাড়িয়ে বলে, দেশের কথা ভাবছো না ছাই! দেশ তোমাদের কথা ভাবছে এটাই সত্যি। আজকে সকালে কাগজে কি লিখেছে দেখেছো। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি ছ-মাসের মধ্যে ক্যাবিনেট মন্ত্রী যদি না হতে পারো তবে আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো।

আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে বলে উৎকট শিরঃপীড়া বহন করে সভাপতি হওয়ার জন্যে রওনা হলেন গোবিন্দ দত্ত।

ওদিকে অপূর্ব রায়ের পত্নী বাড়ি ফিরে এসে স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির বলে বুঝলেন যে মাথা ধরা নয় তাকে অপমান করবার উদ্দেশ্যেই সভায় তাঁর অনুপস্থিতি।

পত্নীদের নিকটতম ও নিশ্চিততম চাঁদমারী লক্ষণ হচ্ছে হতভাগ্য স্বামী। আর তাঁদের হাতের এমন নিপুণতা যে প্রত্যেক লোষ্ট্র গবাক্ষ বিদ্ধ করে।

এমন করে আমাকে অপমানিত না করলে কি ক্ষতি হতো।

কিছুই বুঝতে পারে না অপূর্ব। বলে অপমানটা কোথায় দেখলে? আমার চোখে তো তেমন কিছু পড়লো না।

তা পড়বে কি করে; তুমি তো আমার ছাড়া আর কারোর দোষ দেখতে পাও না। ঐ যে সুষমা সভায় আসে নি কেন জানো?

মাথা ধরেছে বলে শুনলাম।

মাথা ধরেছে না ছাই; আমাকে অপদস্থ করবার জন্যেই আসে নি।

বিস্মিত অপূর্ব বললো, তোমাদের মধ্যে এত বন্ধুত্ব; আজ একথা বলছো কেন?

বন্ধু-বান্ধব আমার কেউ নেই—গম্ভীরভাবে বললো তার স্ত্রী।

এতক্ষণে শিপ্রা একটা সত্য কথা বললো।

মেয়েরা চির-নির্বান্ধব। তারা প্রত্যেকেই রবিনসন ক্রুশোর মত নির্জন দ্বীপের অধিবাসী; চমকে উঠবার জন্যেই অপরিচিত পদচিহ্নটুকুরও প্রয়োজন

হয় না ; নিজের পায়ের ছাপটাই যথেষ্ট।

৪

অপূর্ব রায় যতদিন মন্ত্রী হয় নি, মন্ত্রিমণ্ডলীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতো ; তখন ভাবতো আহা। যদি মন্ত্রী হতে পারতুম! অবশেষে সেই মন্ত্রিপদ তার ভাগ্যে জুটলো। কিন্তু প্রথম দিনেই আবিষ্কার করলো পদটা নিতান্তই গোষ্পদ। ভেবেছিল স্ত্রী সন্তুষ্ট হবে ; ছেলেরা গৌরববোধ করবে ; পাড়াপড়শীরা সম্মানবোধ করবেন; কার্যক্ষেত্রে দেখলো ঠিক তার বিপরীত। স্ত্রীর কথা তো আগেই বলা হয়েছে ; ছেলেরাও খুশী নয়। কারণ লোকে তাদের ডেপুটি বাবুর ছেলে বলে উল্লেখ করে। বন্ধু-বান্ধব ছোট বড নানারকম দাবী-দাওয়া নিয়ে আসে। আর পাড়ার দোকানদার থেকে আরম্ভ করে ফিরিওয়ালা পর্যন্ত সকলেই দাম চড়িয়ে দিয়ে জিনিস বিক্রি করে। তবে লাভের দিকেও যে কিছু নেই এমন নয়। সরকারী মোটরগাড়ী, সরকারী চাপরাশি এবং পার্সোন্যাল এ্যাসিস্টেণ্ট ও প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রভৃতি তার বাইরের ঘরটা দখল করে নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। অপূর্ব রায় ঘরটা পঁচাত্তর টাকা ভাড়া দেবে স্থির করেছিল, গেল সেই পঁচাত্তর টাকার আশা। তাছাড়া দিবারাত্র ফোনের ঝনঝনানিতে সর্বদা ব্যস্ত করে রাখে। বিশেষভাবে শিপ্রার নির্বিঘ্ন মধ্যাহ্ন নিদ্রা ঐ তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজে চৌচির হয়ে ফেটে যায়। এখানেই শেষ নয়, অপূর্ব-র বাড়িতে যাতায়াত সমস্ত রকম নিয়মকে লঙ্ঘন করে গেল। কোনদিন সকাল আটটায় বেরিয়ে গিয়ে দুটোয় একবার এলো, কোনদিন তাও এলো না, হয়তো আসতে রাত বারোটা বেজে গেল। শিপ্রা জেগে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঝি চাকর সর্বদা গজ গজ করে। নিতান্ত মন্ত্রী বলে চাকরি ছেড়ে যেতে সাহস পায় না। হায়! দেশের কাজ করা বড় সহজ নয়। তবু কিনা দেশের কাজ করবার লোকের অভাব ঘটে না কখনও। রেলগাড়ি, স্টীমার প্রভৃতি যানবাহন দ্রুত নড়ে চড়ে বটে,তবে তার আরোহীদের নড়া-চড়া সঙ্কীর্ণ। সেই বিপদটি ঘটলো শিপ্রা দেবীর। মন্ত্রিমণ্ডলী একদিন স্টিমার ভ্রমণে বের হয়েছিল। শিপ্রা খুব আশা করে নূতন ধরনের শাড়ী ব্লাউজ পরে গিয়েছিল। উপরের ডেকে মন্ত্রিমণ্ডলী ও তাঁদের পত্নীরা বসে গল্প করছেন, চা খাচ্ছেন। অনেকদিন পরে সুষমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। সে আনন্দে তার পাশে গিয়ে বসে বললো, 'সুষমাদি কেমন আছো ?'

সুষমা সংক্ষিপ্ততম শব্দে উত্তর দিল 'ভাল'। তারপরে পার্শ্ববর্তিনী

ক্যাবিনেট মন্ত্রী পত্নীর সঙ্গে যেমন আলাপ করছিল তেমনি করতে থাকল। সে আশা করেছিল শিপ্রা উঠে চলে যাবে। কিন্তু শিপ্রা উঠলো না দেখে সুষমা বললো, চলো ভাই মিসেস মুৎসুদ্দি এ জায়গাটা বড গুমোট, সামনের দিকে গিয়ে বসি। মুখ কালো করে বসে থাকল শিপ্রা। দেখলো অদূরে সমস্ত মন্ত্রীরা একত্র মিলে গল্প গুজব করছে, তবে তাদের স্ত্রীরা ঠাট বজায় রেখে উপবিষ্ট। তার ইচ্ছা হলো অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকে, কিন্তু ঐতো আগেই বলেছি এসব যানবাহনে নডা-চড়ার স্থান সংকীর্ণ। অবশ্য নীচে মস্ত নদী। না, সেটা ভবিষ্যতের জন্যে হাতে থাকল ভাবলো শিপ্রা। তাবপরে তাব কানে এলো চাপরাশি, আরদালি ও বাবুর্চিদের স্বগত সংলাপ।

চা আগে ওদিকে নিয়ে চলো।

মেমসাহেব, আর চা আনবো কি ?

আরে উনি তো ডেপুটিবাবুর স্ত্রী।

তবে ওঁকে পরে দিলেও চলবে।

অবশেষে শিপ্রা আবিষ্কার করলো একদিকে তিনটি মহিলা একঘরে হয়ে বসে আছে, তারও তো নিজের একঘরে অবস্থা। তাই সে সেখানে গিয়ে বসলো।

মহিলারা তাকে দেখে বলে উঠলো, 'আসুন এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ?'

'চা পেয়েছেন কি ?'

দেখুন তো মন্ত্রী পত্নী হবার কত সুবিধে, কেমন বিনে পয়সায় হাওয়া খাওয়া যাচ্ছে।

শিপ্রা আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। বলে উঠলো, আপনারা একঘরে হয়েছেন। তবু বেশ সন্তুষ্ট মনে গল্পগাছা করছেন, লজ্জা করে না ?

একটি মহিলা, ওদের মধ্যে বয়স্ক বলে উঠলো, 'ও বুঝেছি, আপনিও বুঝি আমাদের মতো ডেপুটি মিনিস্টারের স্ত্রী। তাতে লজ্জার কী আছে ? আমার স্বামীতো আগে গাঁয়ের দফাদার ছিলেন, দেখুন তো কতটা উন্নতি হয়েছে।

অপর একজন বললো,'দফাদার তবু ভালো,আমার উনি ছিলেন কলেজের প্রফেসার। আট-ন মাসের আগে কখনো বেতন পেতেন না,আর এখন বলে...

তৃতীয় মহিলাটি বললো, দেখুন কখনো মোটর গাড়িতে চড়বো ভাবতে পারি নি। তবে তিনবার মোটর চাপা পডতে গিয়েছিলাম বটে, আর আজকাল আমি যখন মোটর চেপে গঙ্গায় স্নান করতে যাই, চাপা পডবার

ভয়ে লোকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়।

শিপ্রা রেগে বললো, আপনাদের স্বামীদের আরদালি চাপরাশিরা ডেপুটি বাবু বলে শুনেছেন ?

শুনেছি বইকি। ডেপুটি হওয়া কি কম গৌরবের বিষয় ? লজ্জায় ও রাগে দ্রুত প্রস্থান করলো শিপ্রা। আর জাহাজের রেলিং ধরে তাকিয়ে থাকলো। সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে এসে শিপ্রা স্বামীকে বললো, এখনই পোড়া চাকরি ছেড়ে দাও।

বিস্মিত অপূর্ব শুধালো, বলো কি। এইতো সবে শুরু, দু-চার বছর দেশের উন্নতি করতে দাও। পরে না হয় দেখা যাবে।

তখন শিপ্রা কাঁদতে কাঁদতে সারাদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো।

অপূর্ব বললো, ওসব গায়ে মাখতে নেই, ডেপুটি মিনিষ্টার আর ক্যাবিনেট মিনিষ্টারের মধ্যে প্রভেদটা নিতান্তই কাল্পনিক।

তবে তুমি কল্পনা নিয়েই থাকো বলে কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলে প্রস্থান করলো শিপ্রা।

৫

অপূর্ব রায়ের জীবন থেকে শান্তি, স্বস্তি, আনন্দ, আরাম, বিরাম সমস্ত অন্তর্হিত হয়েছে। যেদিন প্রথম মন্ত্রী হবার সংবাদ পেল, মনে করেছিল হাতে স্বর্গ পেলাম, কিন্তু স্বর্গে ঢুকে দেখলো বৃত্তাসুর তা অধিকার করে বসে আছে। শতশত লোক দেখা করতে আসে, নমস্কার করে সেলাম করে। সকলেরই এক সুর দেহি দেহি। সে ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছে কিছু দেবার ক্ষমতা তার নেই। কোন দাবীকে সত্য মনে হলে সে তাকায় সেক্রেটারীর দিকে। সেক্রেটারী গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে। প্রার্থী মনে মনে মন্ত্রীকে অভিশাপ দিয়ে চলে যায়। বলে সেক্রেটারীকে আগে থেকে শিখিয়ে দিয়েছে। যখন বাড়ীতে আসে দেখে স্ত্রী মুখ ভার করে বসে আছে। একদিন বড় ছেলেটি স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো। ছেলেরা তাকে ডেপুটি মণ্ডা বলে ক্ষেপায়। তার অপরাধের মধ্যে সে মোটাসোটা গোলগাল, রংটাও ফর্সা। কাজেই মণ্ডার সঙ্গে তুলনীয় হতে পাবে বটে।

ওদিকে আর এক বিপদ। যেখানে যত খুচরো 'মহতী' সভা হয় সেখানে ডাক পড়ে সভাপতিত্ব করবার। কোনদিন তার বলবার অভ্যাস নেই, তবু যেতে হয়। ভোটের সময় আবার ওদের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে তো।

আর আহার নিদ্রা বিশ্রামের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রাতে কখনো ফেরে বারোটায়, কখনো কখনো ন'টা-দশটাতেও বটে।

একদিন রাত আটটায় ফিরলো, শিপ্রা জানালায় দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে পড়লো গাড়ির মধ্যে একটি মহিলার শাড়ির আভাস। গাড়ি চলে গেল। স্বামী বাড়িতে প্রবেশ করলে শিপ্রা কিছু উত্তেজিতভাবে বললো, 'ঐ মহিলাটি কে বলো দেখি?'

অপূর্ব স্বাভাবিকভাবেই বললো ওঁকে কি আগে দেখোনি? উনি আমাদের দলের একজন মস্ত পাণ্ডা।

তাই বুঝি ওঁকে নিয়ে গাড়িতে করে রাতের বেলায় ঘুরতে হয়?

রাতেও ঘুরতে হয়, দিনেও ঘুরতে হয়, ওর হাতে অনেকগুলি ভোট। কথাটা সেইখানেই থেমে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থামলো না। দুদিন বাদে বিধানসভায় বিরোধী দলের একজন প্রশ্ন করে বসলো, স্যার, মন্ত্রী অপূর্ব রায় সরকারী গাড়ীতে মেয়েদের নিয়ে রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ান। এ অত্যন্ত গর্হিত কার্য। এদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সরকারী দল থেকে একজন বলে উঠলো, দোষটা কি? সরকারী গাড়িতে ঘোরা, মহিলা নিয়ে ঘোরা, রাতের বেলায় ঘোরা?

পূর্বোক্ত বিরোধীপক্ষ বলে উঠলো, তিনটেই।

তখন দুই পক্ষে রূপকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হয়ে গেল। কে ঘুস খায়, কে আপিসে কোন কাজ না করে পড়ে ঘুমোয়, কে জনসভায় নির্জলা মিথ্যে কথা বলে। অভিযোগের আর অন্ত নেই।

বিধানসভায় যার সূত্রপাত হলো, সংবাদপত্রে এসে হলো তার মুণ্ডপাত। বড় বড় হরফে জোরালো ভাষায় একাধারে প্রশ্ন এবং মন্তব্য লিখিত হলো।

ভোরের বেলাতেই কাগজখানা পড়লো শিপ্রার হাতে। স্বামীর মুখের উপরে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, দেখো যা বলেছিলাম তা সত্যি কিনা।

অপূর্ব এক ঝলকে কাগজখানা দেখে নিয়ে বললো, মন্ত্রীদের অপদস্থ করবার জন্যে ওরকম অভিযোগ হামেশাই উঠছে।

কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল আর হাতে একখানা কাগজ নিয়ে তেমনি তাড়াতাড়ি ঢুকলো শিপ্রা। বললো, নাও এখনই রিজাইন দিয়ে চিঠি লেখো।

স্বামী বুঝতে পারলো না পরিহাস না ক্রোধ।

কি শুনতে পেলে না? এখনই এইখানে বসে লিখতে হবে, এই নাও কলম।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলো, তারপরে সংসার চলবে কি করে?

আগে যেভাবে চলতো।

আগে কিভাবে চলতো সকলের জানবার কথা নয়, কেন না অজীর্ণ ও পিত্তশূল রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট হ'লেও এত বেশী নয় যে তারা সবাই 'অপূর্ব রায়ের অব্যর্থ অজীর্ণবজ্র ও পিত্তশূলান্তর মহৌষধে'র নাম জানবে বলে আশা করা যায়।

অপূর্ব বললো, তুমি মেয়েছেলে বলে সব কথা বুঝতে পারছো না আমি যদি এখন রিজাইন করি একটা পলিটিক্যাল ক্রাইসিস দেখা দিয়ে আমাদের দল ভেঙ্গে যাবে।

বাকিগুলোও বলো, মনুমেণ্ট ভেঙ্গে যাবে, হাওড়ার পুল ভেঙ্গে যাবে, সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। নাও বলছি লেখ। নইলে আজ তোমারই একদিন কি আমারি একদিন।

অগত্যা নিতান্ত প্রাণভয়ে একখানা রিজাইন দিয়ে চিঠি লিখলো। বললো, থাক আমার পকেটে, আপিসে গিয়ে পাঠিয়ে দোবো।

না সে কষ্ট তোমার করতে হবে না। পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা আমি করছি।

কিন্তু কারোরই ব্যবস্থা কবতে হলো না। ইতিমধ্যে এক রাজনৈতিক সংকট উপস্থিত হয়ে এই পারিবারিক সঙ্কটের উদ্ধার করে দিল।

৬

সংসারে যেমন মন ভাঙ্গাভঙ্গি চলে, রাজনীতিতে তেমনি দল ভাঙ্গাভাঙ্গি। চতুর মুখ্যমন্ত্রী টের পেলেন যে জন দুই দেশহিতৈষী মন্ত্রী, জনকুড়ি দেশহিতৈষী দলীয় সদস্য নিয়ে অধিকতর আগ্রহে দেশহিত করবার উদ্দেশ্যে সেই দিনেই Floor Cross বা মেঝে অতিক্রম করবে। ঐ সংখ্যক সদস্য দল পরিবর্তন করলে তার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাবার কথা। কাজেই তাদের সুযোগ আসবার আগেই সভা আরম্ভ হওয়া মাত্র তিনি স্পীকারকে অনুরোধ করলেন সভা কিছুক্ষণ মুলতুবি রাখুন। বর্তমান বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার অনুরোধ করে রাজ্যপালকে আমি চিঠি লিখেছি, উত্তর যে কোন মুহূর্তে এসে পৌঁছতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে সমস্ত বিধানসভা হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, রাজ্যপালের চিঠি স্পীকারের হাতে এসে পৌছলো। স্পীকার ঘোষণা করলেন, রাজ্যপাল তাঁর সংবিধানগত ক্ষমতার বলে বর্তমান বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। ঘোষণাটি শুনবামাত্র সমস্ত সদস্য ক্রোধে আক্রোশে বিদ্বেষে বিরক্তিতে 'ফেটে পড়ল'। কেবল দেখা গেল অপূর্ব রায়ের মুখে একটি অভূতপূর্ব স্বস্তির ভাব। এমনভাবে তার সাংসারিক সংকটের সমাধান হবে প্রত্যাশা করেনি।

এখন আর অপূর্ব রায় এবং গোবিন্দ দত্ত মন্ত্রী নয়। তাদের পত্নীরাও মন্ত্রীপত্নী নয়। ফলে তাদের মধ্যে যে সাময়িক শ্রেণীভেদ দেখা গিয়েছিল, কাজেই তা লোপ পেয়েছে। এখন শিপ্রা রায় ও সুষমা দত্ত একসঙ্গে ভোরবেলা রবীন্দ্রসরোবরে বেড়াতে যায়, একসঙ্গে লেকমার্কেটে বাজার করে এবং সন্ধ্যা বেলায় পাড়ার পার্কে এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে পান খেতে খেতে সুখ-দুঃখের আলাপ করে। অসম থেকে নেমে এসে দুজনেই এখন মাটির উপরে সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর কারো মনে শ্রেণীবিদ্বেষের আক্ষেপ নেই। অবসর সময়ে শিপ্রা বাড়িতে দরজা বন্ধ করে বসে অজীর্ণবজ্র বড়ি তৈরি করেন, আর সুষমা দত্ত কি করেন ঠিক জানি না। খুব সম্ভব আহার ও নিদ্রার মধ্যে সমস্ত দিনরাত্রিকে সুষমভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তাঁদের পারিবারিক শান্তি ফিরে এসেছে। কাজেই এখন পাঠকেরও শান্তি।

বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাৎ আছে

অবশেষে মোতিলাল নগদ বিশ হাজার টাকায় পেন্সন বিক্রয় করে করে ফেলল। বন্ধুরা খুশী হল, নগদ টাকা কলসীর জল, কমা ছাড়া বাড়বে না। শত্রুরা দুঃখিত, টাকাটা পেয়ে বুড়ো দুটি মেয়েরই বিয়ে সমারোহে সম্পন্ন করবে। পরিবারবর্গ অবশ্য ক্রেতব্য দ্রব্যের একটি দীর্ঘ তালিকা পেশ করলো (যদিচ এতদিন সে-সব না কিনেও বেশ চলে যাচ্ছিল)। সকলের হাসি নিন্দা ও দ্রব্যতালিকা উপেক্ষা করে মোতিলাল মনে মনে হাসলো। আর হাসলো মধুময় নগদ টাকার বিনিময়ে মোতিলালের পেন্সন যে ক্রয় করেছে। ঐ টাকার জোরে তার মেয়ে দুটি সৎপাত্রে অর্পিত হল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ বিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে হাজার খানেক লোক ভুরি ভোজন করে গেল। অবশ্য আইনের চোখে অতিথিগণ নিজ নিজ রেশন

পাঠাইয়া দিয়াছিল। সাধারণের দৃষ্টি নিতান্ত স্থূল বলে তা দেখতে পায় নি। বন্ধুরা গোপনে সন্ধান নিতে চেষ্টা করলো টাকার আর কত অবশিষ্ট আছে। শত্রুপক্ষের কালো মেয়ের পিতারা ভগবানের অবিচারের জন্য মোতিলালকে দায়ী করলো। আর দ্রব্যগুণ বঞ্চিত পরিবারবর্গ বলল একসঙ্গে দুটি মেয়ের বিয়ে না দিলে এমন কি ক্ষতি হতো। আমরা অর্থাৎ পূজা সংখ্যার গল্পলেখকগণ সর্বজ্ঞ বিধায় জানি যে মোতিলালের হাতে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে বৎসর কাল চলতে পারে। এ হেন অবস্থায় মানুষের কাঁদা উচিত কিন্তু মোতিলাল অসামান্য ব্যক্তি বলে মনে মনে হাসলো। পাঠকগণের উপরে লেখকগণের জিত এই জন্যে যে পাঠকগণ সর্বজ্ঞ নন। তাই তাদের সুবিধার জন্য কিছু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক।

মোতিলাল হাইকোর্টে ত্রিশ বছর দোভাষীর কাজ করে যেদিন বিদায় নেবে তার বাল্যবন্ধু মধুময় এসে উপস্থিত হল। বুড়ো বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখেছিলেন যে বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাৎ আছে তিনি মোতিলাল ও মধুময়ের বাল্য প্রণয়ণের বিবরণ জানতেন না, জানলে তাঁর যুক্তি দৃঢ়তর হতো। ওরা দু'জনে বাল্যকালে এক পাঠশালায় পড়েছে, এক গুরুমশায়ের হুঁকোতে তামাক খাওয়া শিখেছে, গণিতের ক্লাসে পাড়ার অগণিত পেয়ারা গাছ লুণ্ঠন করেছে, ভূগোলের ক্লাসে এমনি গোল করেছে যে গুরুমশায় ছুটি দিতে বাধ্য হয়েছেন। এসব আনাচার সত্ত্বেও মোতিলাল বি-এ পাশ করলো এবং হাইকোর্টে মুরুব্বির জোরে দোভাষীর সহকারীরূপে নিযুক্ত হল। আর মধুময়ের কি হল? সে কথা বিস্তারিত বলাই বাহুল্য। গোলদীঘির পশ্চিম দিকে যে অট্টালিকায় যেখানে এক সময় সরস্বতী বিরাজ করতেন, তারপরে ছাত্র অধ্যাপক ও কর্মিগণের দাপটে দুষ্ট সরস্বতীকে আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন সেখানকার শিক্ষানবিশির ফলে মধুময় বেশ চৌকষ হয়ে উঠেছে। আগে শুধু নামেই মধুময় ছিল, এখন তার হাস্যে মধু, বাক্যে মধু, ব্যবসায়ে মধু আর চিত্তে সে কথা না হয় থাক।

এমন সময়ে ১৯৪৮ সালে সদ্যস্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে একশ টাকার নোট বাতিল হয়ে যাবে। তখন মধুময় দাড়ি কামিয়ে ফেলে একটি শিখা গজালো আর সেই শিখাগ্রে একটি রক্তবর্ণ জবাফুল বেঁধে ১০।৫ টাকার পুরনো নোটে হাজার কুড়ি টাকা নিয়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হল। হঠাৎ এত টাকা সে পেলো কোথায় এ প্রশ্ন যাঁর মনে উদিত হবে

তিনি নিশ্চয় যুদ্ধের বাজারে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে মাল সরবরাহ করেন নি। মার্কিনীরা অনাচারী বিধর্মী হলেও দি হোলি বিয়ার্ডের পরম ভক্ত। মধুময়ের দাড়িও মধুময়—ঐ দাড়ির মাহাত্ম্যে ইষ্টক খণ্ডকে পিষ্টক খণ্ডের দরে কাঁচকে কাঞ্চনের দরে বিক্রয় করে মধুময় একটি মধুচক্র বিশেষ হয়ে উঠল। সেই মধুময় শিখার মাহাত্ম্যে গ্রামের নিরক্ষর নর-নারী বুড়ো-বুড়ি সধবা-বিধবা অধবাগণের কাছে ৫ টাকা, ১০ টাকায় একশ টাকার নোটগুলি কিনে ফেলল। বিক্রেতারা ভাবলো যথা লাভ। মোটকথা মধুময়ের পুষ্পানন সমন্বিত শিখা গাঁয়ে গাঁয়ে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাতে সুরু করলো। তারপরে ঐ ১০০৲ টাকার নোটগুলি নিয়ে কি করলো জিজ্ঞাসা করবেন না—কারণ জানি না। জানলে এই গল্প লিখবার বদলে মধুময়ের পন্থা অনুসরণ করতাম। ও পন্থা যে অনুসরণ করে তার লেখক হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যতদুর জানি মধুময় মুস্তাফি নামে কোন বাঙালী লেখক নেই। তারপরে একদিন খবর পেলো যে বাল্যবন্ধু মোতিলাল নাগ শীঘ্রই পেন্সন সহ অবসর গ্রহণ করবে। তখন সে একদিন সুপ্রভাতে মোতিলাল ভবনে দর্শন দিল। বন্ধুর সর্বনাশ সাধন যেমন সহজসাধ্য তেমনি পরম প্রীতিপদ।

২

তারপর গঙ্গা ও যমুনার বিয়ের কি করছ মোতিলাল। আমার মেয়ে দুটিকে তো কোন রকমে গছিয়ে দিয়েছি।

মধুময়ের কথা শুনে মোতিলাল বলল তোমার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। কলকাতা শহরে তিনখানা বাড়ী করেছ, আয়টাও সেই অনুপাতে। আর আমি থাকি ভাড়া বাড়ীতে, তারপরে রিটায়ার করলাম, বড জোর শ দুই টাকা পেন্সন পাবো। খাবো না মেয়ের বিয়ে দেব।

কিছু জমিয়েছ তো!

কিছু নয়, এই বাজারে টাকা জমানো যায়।

তাই বলে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে থাকবে কি করে? আচ্ছা এক কাজ করো না, পেন্সন Commute করে বিয়ে দাও না কেন।

না ভাই আজকাল সরকারের টাকার টানাটানি, ওদিকে সুবিধে হবে না।

তবে এক কাজ করো কোন মাড়োয়ারীর কাছে পেন্সন বিক্রয় করে নগদ টাকা নাও না কেন?

এখন পেন্সন বিক্রয় যে চলে কখনো শোনেনি মোতিলাল। মধুময় বুঝিয়ে

বলল খুব চলে। অনেকটা জীবনবীমার মতো। তোমার বয়স এখন ষাট বছর, স্বাস্থ্যও ভাল আছে, অনায়াসে আরও কুড়ি বছর বাঁচবে। বছরে যদি আড়াই হাজার টাকা পেন্সন পাও তবে দশ বছরে পাবে পঁচিশ হাজার টাকা। ঐ টাকার সুদ বলে কিছু কেটে নিলেও অনায়াসে কুড়ি হাজার টাকা পেতে পারো।

সত্যকার বিস্ময়ে মোতিলাল বলে এরকম ব্যবসাও চলে নাকি।

আরে মাড়োয়ারীদের মধ্যে চলে না এমন ব্যবসা নেই।

এ একটা উপায় বটে, কিন্তু ভাই আমি গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়াদের হাতে পড়তে চাই না।

আরে শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীই কি কম।

তবু হাজার হোক বাঙালী মনে দয়ামায়া আছে। বাঙালী যদি কেউ রাজি থাকে জানিও।

আচ্ছা দেখবো বলে সেদিনের মতো বিদায় নিল মধুময়।

আসল কথা মধুময় কিছু মধু সংগ্রহের আশাতেই এসেছিল। তবে এই উপায়ে মধু সংগ্রহ তার নূতন নয়। অনেকের কাছে পেন্সন বিক্রয় করে বেশ টাকা কামাচ্ছে।

মানুষের বয়স নিয়ে ব্যবসা করতে গেলে কিছু জ্যোতিষ ও কাকচরিত্র জ্ঞান থাকা উচিত। কারো কাছে পেন্সন কিনবার আগে তার কুষ্ঠি দেখে, পিতৃমাতৃ কুলের তিন পুরুষের গড় আয়ু দেখে তবে টাকা দেয়—এ পর্যন্ত ঠকেনি মধুময়—বরঞ্চ তার মধুচক্র পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। মোতিলালকে এই ফাঁদে ফেলা যায় কি না সেই আশাতেই তার কাছে এসে মেয়ের বিয়ের কথা তুলেছিল।

বাল্যবন্ধু মোতিলালের পিতৃমাতৃ উর্দ্ধতন তিন পুরুষের কথা সে জানে কেউ নব্বই বছরের আগে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেনি। তা ছাড়া তার কুষ্ঠি-খানাও আগে অনেকবার দেখেছে—দেখেছে যে বড় ২।৪ টা ফাঁড়া যা ছিল অনেকদিন কেটে গিয়েছে—এখন ওর আসন্ন বৃহস্পতির দশা। বৃহস্পতি ভালো ছাড়া মন্দ করে না তার উপরে আবার বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ। তার মনে পড়লো কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতি। আর সর্বোপরি আশার কথা এই যে মোতিলাল লোকটা সরল কিনা নির্বোধ। সে স্থির করলো, আগেই স্থির করেছিল মোতিলালের মালঞ্চ থেকে কিছু মধু সংগ্রহ করা যাক।

বঁধুর সঙ্গে মধুর মিল স্বাভাবিক।

কয়েক দিন পরে মোতিলাল ভবনে এসে বলল, দেখো ভাই তোমার মতো বাল্যবন্ধুকে গণ্ডেরিয়ারাম বাটপাড়িয়াদের হাতে ফেলতে চাই না। যা থাকে কপালে বলে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমিই না হয় টাকাটা দেব, তবে একটা লেখাপড়া করে নেওয়া আবশ্যক।

বলা বাহুল্য মোতিলাল আশাতীত আনন্দিত হল। ঐ কুড়ি হাজার টাকাই স্থির হল। লেখাপড়া হয়ে টাকা হাত বদল করলো।

মোতিলাল বলল—২। ৪ বছর মধ্যে যদি মারা পড়ি তবে তোমার টাকা মারা যাবে যে।

ভাই মোতিলাল আমি কাকচরিত্র জানি। এখন তোমার বৃহস্পতির দশা, এই দেখো না প্রাপ্তিযোগ ঘটলো, নব্বই বছরের আগে মরবে না।

মধুময় ভাবলো খুব ঠকালাম। হাইকোর্টে ত্রিশ বছর যে দোভাষীর কাজ করেছে তাকে সে চেনে না, বালবন্ধু মোতিলালকেই চেনে। বঙ্কিম-চন্দ্রের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পৎ আছে।

তার পরের কথা পাঠকের পরিজ্ঞাত। গঙ্গা ও যমুনা নামে মোতিলালের কন্যাদ্বয়ের মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

তার পরেও কিছু কথা আছে—সেটাই আসল কথা।

৩

এই ঘটনার বছর খানেক পরে একদিন প্রভাতে শহরের সম্ভ্রান্ত সংবাদ-পত্রগুলিতে সোচ্চার হেড লাইনে সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হল—'প্রসিদ্ধ মানব প্রেমিক শ্রীমোতিলাল নাগ মহাশয় অনশনে প্রাণত্যাগের সিদ্ধান্ত করে অদ্য প্রভাত থেকে আমৃত্যু অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন।' সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ তাঁকে ছেঁকে ধরলে আপনার ব্রত সম্বন্ধে কিছু বলুন, মোতিলাল বলল অনেক দিন তো বাঁচলাম আর এখন বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

কেন?

দেশে এত অনাচার অত্যাচার দুর্নীতি, কলোবাজারি মুনাফাবাজি, খুন জখম রাহাজানি বাঁচবো কোন্ আশায়।

সরকারের কাছে আবেদন করুন।

মোতিলাল বলল, এই অনশনই আমার আবেদন।

তারপর থেকে প্রতিদিন প্রধান সংবাদ রূপে মোতিলালের অনশনের

বিবরণ প্রকাশিত হতে লাগলো। প্রথমটা কেউ বিশেষ গ্রাহ্য করেনি, ভেবেছিল পাগলের কাণ্ড। কিন্তু পর পর যখন এই সংবাদ অধিকতর চিত্রযোগে প্রকাশিত হতে থাকলো, সেই সঙ্গে রিপোর্টারদের চমক প্রদ বিবরণ তখন সংবাদটা রাইটার্স' বিল্ডিং-এ পৌঁছলো। রাইটার্স বিল্ডিং শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হলেও সংবাদ সেখানে সব শেষে পৌঁছায়। মুখ্যমন্ত্রী একজন ডাক্তারকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু সেদিন ডাক্তারের পৌত্রের অন্নপ্রাশন বিধায় দিন দুই পরে তিনি মোতিলালের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলেন, বললেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত, তাঁর অনুরোধে অনশন পরিত্যাগ করুন। মোতিলাল কোন কথা বলল না। ঈষৎ হাস্য করলো আর আঙুল তুলে উপরের দিকে দেখালো। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তারের রিপোর্ট পেয়ে চিন্তায় পড়লেন। কোন মন্ত্রী পরামর্শ দিল লোকটাকে MISA আইনের বলে জেলে পাঠিয়ে দিন; কোন মন্ত্রী পরামর্শ দিল আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করুন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তারকে বললেন আপনি প্রত্যেক দিনের রিপোর্ট আমার কাছে দেবেন। সরকারী চালের আর একটি রহস্য এই যে রিপোর্ট সরকারের কাছে পৌঁছবার আগেই সংবাদপত্রে পৌঁছায়। পর পর সংবাদ প্রকাশিত হতে লাগলো মোতিলালবাবুর দেহে ওজন দশ পাউণ্ড কমে গিয়েছে; প্রস্রাবে এলবমিন ও এসিটন দেখা দিয়েছে, এমন চললে আর সপ্তাহ কাল মধ্যেই।

পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন এ সময়ে মোতিলালের বাল্যবন্ধু ও পেন্সনক্রেতা মধুময় মুস্তাফি নীরব কেন? তিনি নীরব নন। সুন্দরবনে মধুর দাদন দেওয়া ছিল সেই মধু সংগ্রহের আশায় তিনি নক্র কুম্ভীর সর্প ব্যাঘ্রসঙ্কুল সুন্দরবনের যে গভীর অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন সেখানে সংবাদপত্রেব গতিবিধি বিরল। বলা বাহুল্য নামের সার্থকতা সাধনের উদ্দেশ্যে মধুময় বাস্তব মধুও খরিদ করে থাকেন। সভ্য জগতে ফিরবার মুখে হঠাৎ তাঁর হাতে একখানি সংবাদপত্র পড়লো, তখনি একখানি ট্যাকসি ভাড়া করে মোতিলাল ভবনে এসে উপস্থিত হলো।

মোতিলাল এ আত্মহত্যার চেষ্টা কেন?

বাঁচবার ইচ্ছা নেই, এখন মরবো।

মধুময় কপাল চাপড়ে বলে উঠল সেই সঙ্গে আমিও যে মরবো।

না, না, তুমি মরবে কেন? তুমি বেঁচে থেকে মানুষের উপকার করো।

আরে মানুষের উপকার করতে গিয়েই তো এই বিপদ। বিশ হাজার

টাকায় তোমার পেন্সন কিনেছি, আরও ত্রিশ বছর বাঁচবে আশায়,দুই বছরের মধ্যেই যদি মরো তবে যে আমিও মরলাম। এভাবে বন্ধুকে ফাকি দেওয়া দুর্নীতি নয়।

তাবও প্রায়শ্চিত্ত এই প্রাণদান।

আবে ভাই আব দশটা বছব জীবন ধারণ কবো আমার লাভে দরকার নাই আসলটা অন্ততঃ ঘবে আসুক।

সে আব সম্ভব নয়।

তখন মধুময় মধুর বদলে হুল বেব কবে অনুনয় বিনয় অনুযে গ অভিযোগ অবশেষে বাপান্ত গালাগালি সুরু কবলো এমন সময়ে সবকাবী ডাক্তার ঃসে বলল, এ সময় ওকে বেশি জ্বালাতন কববেন না ওর হয়ে এসেছে।

ডাক্তাববাবু, আমার যে টাকা মাবা যাচ্ছে।

ডাক্তাববাবু শুধু চিকিৎসক নন দাশনিকও বটেন তিনি বললেন সংসারে অমব যদি কিছু থাকে তবে টাকা, আব উনি তো টাকা নিয়ে চিতায় উঠবেন না।

একবকম তাই। বিশ হাজার টাকায জীবনস্বত্বে ওঁব পেন্সন ক্রয় কবেছি, উনি চিতায় উঠলে আমাব টাকাও যে সেই সঙ্গে চিতায় উঠবে।

ডাক্তার বললেন আপনি এখনি বেব হয়ে যান নতুবা সবকারকে জানাতে বাধ্য হ'ব।

সরকাবের নিকুচি করি বলে মধুময় লাফিয়ে উঠে মোতিলালেব উদ্দেশ্যে বলল মোতিলাল তোমাব মনে এই ছিল।

মোতিলাল ক্ষীণকণ্ঠে বলল, সংসাব দুর্নীতিময়।

ডাক্তার রিপোর্ট দিল যেকোন মুহূর্তে কীডনি ফেল কবতে পারে ব্লাড প্রেসাব ৮০তে নেমে এসেছে। বাড়ীব মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠল।

তাবপবে মাঝখানে নেপথ্যে কি ঘটলো জানি না (জানলেও বলতেও বাধ্য নই) পরদিন সংবাদপত্রে প্রচারিত হল—মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অনুরোধে মানবপ্রেমিক মোতিলাল নাগ মহাশয় অনশন ব্রত ত্যাগ কবিয়াছেন। বন্ধুরা হতাশ হন। তারা ইতিমধ্যেই স্থির করেছিল পাড়াটাব নামকরণ করবে শহীদ মোতিলাল কলোনি।

আসল কথা সেদিন গভীররাত্রে মধুময় এসে গোপনে মোতিলালের হাতে দশ হাজাব টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, জানি তোমার টাকা ফুরিয়ে

এসেছে এই নাও, এবারের মতো প্রাণটা রক্ষা করো।

মৃদুহাস্যে মোতিলাল বলল—কার ?

তোমার-আমার দু'জনেরই। এই নিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা দিলাম, না হয় আমার লাভ কিছু কম হবে।

আশাকরি এ দুর্নীতির টাকা নয় ?

আরে না, না এ সুন্দরবনের মধুর টাকা। ঐ যে তোমাদের কবিগুরু বলেছেন না 'মধুময় জগতের ধূলি' এ সেই এক মুঠো ধূলি।

মোতিলাল ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলো এবং নবলব্ধ দশ হাজার টাকায় নব-বলে বলীয়ান হয়ে তার সংসার সচ্ছলভাবে চলতে লাগলে।

মোতিলাল মাঝে মাঝে আত্মচিন্তা করতো, ভাবতো ভাগ্যিস বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল নতুবা আজ কি দশা হতো। কিন্তু তারপরে যখনি ক্ষীয়মাণ টাকার পুঁজির কথা মনে হতো ভাবতো তত কিম্ ? তখনি মনের মধ্যে আশ্বাস বাণী শুনতে পেতো সংসার থেকে দুর্নীতি তো লোপ পায়নি।

কিন্তু ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটলো। বছরখানেক পরে হঠাৎ একদিন মোতিলাল মোটর চাপা পড়ে মারা গেল, মোটরখানা আবার স্বয়ং মধুময়ের। মধুময় গাড়ীতে ছিল, তখনি তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে গেল। তারপরেও ২। ৪ মিনিট মোতিলাল জীবিত ছিল। মধুময় ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, ভাই মোতিলাল সংসারের দুর্নীতি দূর না করেই তুমি চললে।

শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মোতিলাল বলল অন্ততঃ ত্রিশ হাজার টাকার পরিমাণে দুর্নীতি দূর করেছি, জীবিত থাকলে আরও কিছু করতাম। শেষ-পর্যন্ত তোমারই লাভ হ'ল।

মধুময় বলল তোমারও কিছু কম নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের আশঙ্কার চেয়ে বর্তমানের ক্ষতিতেই তাকে অধিকতর ব্যাকুল করে তুলল। হাসপাতালের শান্তিভঙ্গ করে সে ডুকরে কাঁদতে লাগলো।

ডাক্তার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ব্যথাচ্ছলে বলল, ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু কিনা।

কিন্তু এখানেই দুর্নীতিমোচন কাহিনীর শেষ নয়। মোতিলালের জীবন-হানির জন্য তার পরিবারকে আরও দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে মধুময় বাধ্য হল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, তোমাকে শত সহস্র নমস্কার—বাল্য প্রণয়ে সত্যই অভিসম্পাৎ আছে।

স্থানীয় কবি

সিংভূম জেলার একটি শহরে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলাম। (বিশেষ কারণে শহরের নামটা গোপন রাখতে বাধ্য হলাম, নতুবা ভবিষ্যতে সভাপতি পেতে অসুবিধা হতে পারে)। কলকাতা থেকে সভাপতি আসছে কাজেই সমারোহের অভাব হল না। কলকাতার জিনিষের আদর স্বভাবতই বেশি। গাড়ী থেকে নেমে দেখি একদল ছোট মেয়ে ফুলের মালা ধূপ দীপ হাতে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে সঙ্গে উঠল শঙ্খধ্বনি ও হুলুরব। আমি তো আমি। গাড়ীতে যে একজন সহযাত্রী ছিলেন তিনিও। ভদ্রতা রক্ষা করে সমস্বরে যে কয়েকটি কথা বললেন আমার কান এড়াল না 'দেখো আবার বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে এলো।' বরের যোগ্য আয়োজন সন্দেহ নাই। বইয়ের ফুট নোটে ক্ষুদে অক্ষরের উপরে পাইকা স্মল পাইকা অক্ষরের মতো নবীন ও প্রবীণ সমাদরকারীর অভাব ছিল না। কোন রকমে পাশ কাটিয়ে মোটর গাড়ীতে চেপে নির্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। সেখানেও সমারোহের ধাক্কা কাটিয়ে তবে স্বস্তি পেলাম।

আমি একজন সাধারণ সাহিত্যিক—কলকাতায় আমার মতো শত শত আছে। তবে এই সমারোহ কেন? আর কিছুই নয় ভবিষ্যতে বৃহত্তর সাহিত্যিকি-গণকে গাঁথবার আশায়—ছোট মাছ বঁড়শিতে গেঁথে মাছ ধরবার আশা। যাই হোক, ভোজ্য ও পানীয়ের আয়োজনও বেশ রাজকীয় মাপের (আজকার দিনে ভোটদাতা মাত্রেই রাজা)! যে সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে এসেছি (তার নামটাও গোপনীয়), তার স্থায়ী সভাপতি, সেক্রেটারী এবং অন্যান্য পদাধিকারিগণ সপ্তরথীর মতো সর্বদা আমাকে ঘিরে অবস্থিত আর সকলেরই অনুরোধ আজকার সভায় যেন আমি বাংলা সাহিত্যের মূলসূত্র ব্যাখ্যা করি। এক মুহূর্ত যে একাকী বিশ্রাম করবো এমন অবসর পেলাম না কিম্বা সপ্তরথীর ব্যূহ ভেদ করে পাণ্ডব সৈন্য প্রবেশ করবে এমন অবকাশ নেই। সভাপতিত্ব অনেক স্থানেই করেছি কিন্তু এমন নীরন্ধ্র ঘেরাও অবস্থা কখনো ঘটেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম সকলেরই মুখে চোখে একটা ত্রাসের ভাব, আর চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে যা বলেছিলেন তারও কিছু কিছু ভগ্নাংশ কানে আসছিল। 'একটু লক্ষ্য রাখবেন', 'পথেই আটকাবেন', 'একবার ঢুকবার সুযোগ পেলে আর', 'অভ্যস্ত এক গুয়ে', 'কবি না কপি'—ব্যাপার কি। এ সব আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় সহজেই বুঝলাম, কাজেই কৌতূহল

বাড়ছে অথচ জিজ্ঞাসা করতেও ভদ্রতায় বাধে। এত সতর্কতার বিরুদ্ধে লোকটি নিশ্চয় অসামান্য হবেন। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি !

দুপুর বেলায় খাদ্য সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে-সব আমা সাত দিনের ভোজ্য আর সাতাশ দিনের ওষুধের কারণ।

এ কি কিছুই খেলেন না যে—

বললাম আমি সাহিত্যিক হলেও সর্বভুক নই।

কিন্তু গতবারে যিনি এসেছিলেন তিনি বেশ খান। মা দুর্গার মুকুটে মতো মাছের দুটো মুড়ো অনায়াসে খেয়ে ফেললেন—অবশ্য অন্যান্য খাদ্য বাদ যায়নি।

সে রকম সাহিত্যিক যদি চান আরও অনেক নাম করতে পারি। করলাম (সে সব নামগুলিই গোপন রাখলাম কি জানি যদি তাঁদের কারও চোখে পড়ে)।

যাক এবার আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন, সন্ধ্যা ছয়টায় সভ পাঁচটায় চায়ের জন্যে ডাকবো।

আমি তাঁদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শয্যা গ্রহণ করলাম। ভাবলাম অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বাংলা সাহিত্যের মূ সূত্র থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। হায় তখন কে জানতো যে আসল অধ্যায়টার সূত্রপাত হয়নি। এত সন্ত্রাস এত সতর্কতা যার জন্যে তিনি যে এতক্ষ আমার আশায় গোপনে খাটের তলে আত্মগোপন করে বিরাজ করছিলে তখনই টের পেলাম আত্মরক্ষার উপায় যখন লোপ পেয়েছে।

কেবলই মেদুর ও পেশল তাকিয়া দুটি টেনে নিয়ে শুয়েছি এমন সময় সাক্ষাৎ সম্মুখে এক মূর্তির আবির্ভাব। কোথা থেকে এলেন কে ইনি এস ভাববার আগে তাঁর চেহারাটি আমাকে বিস্মিত করলো। মস্ত সটাক মাথা আর কৃশ শরীর গায়ে একখানা উড়ুনি। একটা বড় ঘড়ির পেণ্ডুলামকে উল্টো করে টাঙ্গালে অনেকটা এমনি হতে পারে। আমার অবাক বিস্ময় কাটবার আগেই মূর্তি আত্ম পরিচয় দান করলেন—আমি স্থানীয় কবি।

এই বলে উড়ুনির তলে নির্দেশ করলেন, মস্ত একটা পুটুলি।

সব কবিতা।

আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?

এলেন কোথা দিয়ে ?

জমাদারদের উঠবার জন্যে বাথরুমে যে পেঁচানো সিঁড়ি আছে বাধ্য হয়ে
াই দিয়ে উঠতে হয়েছে, ভাগ্যে দরজাটা খোলা ছিল।

এমনভাবে প্রবেশের অর্থ কি ? সোজা পথে এলেই পারতেন।

তাই তো পাবা উচিত, তবে কি জানেন এখানকার লোকেরা বড় কুচটে
াইরে থেকে সাহিত্যিক এলে আমায় সঙ্গে দেখা করতে দেয় না।

এতক্ষণে বুঝলাম উদ্যোক্তাগণের সতর্কতা ও শঙ্কার কারণ।

শুধলাম আপনার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করেন এঁরা ?

ঈর্ষ্যা, ঈর্ষ্যা ! বুঝলেন না ঈর্ষ্যা হতাশের শেষ সম্বল।

এঁরা সবাই কবি নাকি ?

সেদিকে ঢুঁ ঢুঁ ।

তবে আব ঈর্য্যার কারণ কি ?

পাছে আমার নাম কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে ।

এবারে প্রসঙ্গ উল্টে বললাম আজকার সভায় নিশ্চয় কবিতা পড়ছেন ।

তবে আর এমন লুকিয়ে আসবো কেন ?

তা বটে। তা আপনার সবই কবিতা না কাব্যও আছে।

আমি খণ্ড কবিতার পক্ষপাতী নই—সবই পৌরাণিক কাব্য যার স্বভাব
র্না।

বেশ। তা এক সময় আসবেন শুনবো।

আর তো সময় হবেনা স্যার। ওরা টের পেলেই আমাকে বের করে দেবে।

এখন যে ঘুম পাচ্ছে আবার।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমার কবিতা শুনে অনেকেই ঘুমিয়ে
ড়েন কিনা। আমি নিজেও মাঝে মাঝে লিখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।
াতেই তো সর্বনাশ হল।

কি রকম ?

আমার স্ত্রী আস্ত ত্রিদিব বিজয় কাব্যখানা নিয়ে উনুন জ্বালবার কাজে
গালেন ।

তিনি বুঝি জানতেন যে, আপনি কবিতা লেখেন।

খুবই জানতেন, তবে তখন কিছু বলতেন না কিন্তু চাকুরিটি যাওয়ার পর
কেই—

হঠাৎ চাকুরি গেল কেন ?

বিড়িঅলা এক মাড়োয়ারীর গদিতে খাতা লিখতাম। জানেন তো কেঁদ পাতা দিয়ে বিড়ি তৈরি হয়। মাঝে মাঝে খাতার মার্জিনে কেঁদ পাতা সম্বন্ধে কবিতা লিখতাম। হঠাৎ একদিন মাড়োয়ারী বেটার চোখে পড়তে তাড়িয়ে দিল।

বলেন কি ?

তা দিকগে। কিন্তু সেই কবিতাটা যে টুকে নিয়ে আসবো তাও পারলাম না। তবে কবিতাটা মুখস্থ আছে। শোনাই আপনাকে।

কেঁদপাতার খেদ নাম দিয়েছিলাম।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো।

কবি স্বরগ্রাম নীচু করে বলল বোধকরি টের পেয়েছে, আমি চললাম।

তবে আপনার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না।

কেন হবে না। চা পানের সময়ে জিজ্ঞাসা করবেন আপনাদের এখানে স্বয়ম্ভূবাবু নামে যে স্থানীয় কবি আছে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। দয়া করে স্থানীয় কবি বলতে ভুলবেন না। তা হলে আপনার প্রশ্রয় পেয়ে কাছে যেতে পারবো।

বেশ তাই হবে। আপনার কবিতা না শুনে যাচ্ছি না।

কবি সন্তর্পণে প্রস্থান করলেন—একই পথে, একই ভাবে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। লোকটা খুব সম্ভব পাগল। (অধিকাংশ কবিই পাগল)। কবিতা লিখতে গিয়ে চাকুরি হারানো, স্ত্রীপুত্রের কাছে উপেক্ষিত হ'ল—তবু ছাড়লো না কবিতা লেখা। তবে লক্ষ্মীর মতো সরস্বতীও চঞ্চল নাকি।

দরজায় ঘন ঘন টোকা কাজেই খুলে দিতে হল। এবারে বাংলা সাহিত্যের মূলসূত্র জিজ্ঞাসুদের প্রবেশ। এর চেয়ে কেঁদপাতার ক্লেশ কবির সঙ্গে অনেক সহনীয়।

চা পানের সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা এখানে স্বয়ম্ভূবাবু বলে কেউ আছেন ?

উপস্থিতগণ বিস্মিত হয়ে বললেন, স্বয়ম্ভূবাবু !

একজন বললেন হেড মাষ্টারের দপ্তরীর নাম স্বয়ম্ভূ বটে।

আর একজন বললেন রেজিষ্ট্রারের নাম স্বয়ম্ভূ।

আমি বললাম, না, না, ওঁরা নন। ঐ যে যিনি কবিতা লেখেন।

তখন একজন বলে উঠলেন ও স্থানীয় কবি।

হাঁ হাঁ ঠিক তাই।

আপনি কি করে তাঁর নাম জানলেন?

কলকাতার অনেক কাগজে তাঁর কবিতা পড়েছি।

কোন্ কোন্ কাগজে স্যার বলতে বলতে নির্ধারিত শিল্পীব মতো স্থানীয় কবি অন্তরাল থেকে প্রবিষ্ট হলেন।

ও আপনি, নমস্কার। (আগে যে পরিচয় হয়েছিল উভয়ের ব্যবস্থা মতো গোপন থাকলো)

কত কাগজে নাম কি মনে আছে।

স্থানীয় কবি ও উদ্যোক্তাগণ সকলেই বিস্মিত হলেন, বলা বাহুল্য সব চেয়ে বিস্মিত হলেন স্থানীয় কবি স্বয়ং।

কি কবিতা স্যার।

সব কি মনে আছে তবে কেঁদ পাতাব ক্লেশ কবিতাটি উত্তম হয়েছিল। সবটা মনে নেই।

আমার আছে বলেই আরম্ভ করলেন

কেঁদ পাতা কেঁদে কয়

ছিলাম কানন ময়

লোকে নিল ছিঁ ড়ি

হইলাম বিড়ি।

উদ্যোক্তাগণ দেখলেন তাব হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করা কঠিন তাই সমস্বরে বলে উঠলেন, সভার সময় হয়েছে মোটব প্রস্তুত।

আমরা সকলে গিয়ে উঠলাম। স্থানীয় কবি উঠতে উদ্যত হলে সবাই বলল আব জায়গা নেই।

না থাকুক ,আমি পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে যাবো।

তাকিয়ে দেখি প্রৌঢ় স্থানীয় কবি মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে—বগলে স্থানীয় কবিতার তাড়াটি। দুঃখ হল হায় স্থানীয় কবিব দুঃখ কেউ বোঝে না।

সভাস্থলে নেমে দেখি তিনি আমাদের আগেই এসেছেন। তিনি সপ্রতিভভাবে হেসে বললেন আমি গলি পথ দিয়ে এলাম কিনা।

তারপর যথা সময় অর্থাৎ ঘণ্টাখানেক পরে সভা আরম্ভ হল। বাঙ্গালীর

সভার বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—সবই এক ছাঁচে ঢালা। যতক্ষণ সভা চলেছিল স্থানীয় কবি মঞ্চের আড়ালে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর দৃষ্টি, আমার দিকে নিবদ্ধ। পাছে অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে যাই।

সভা শেষ হলে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। উদ্যোক্তাগণের অনবধানতার সুযোগ এবারে স্থানীয় কবি আগেই গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়েছে। সকলে বলল, সভাপতিকে আর বিরক্ত করবেন না এখন থাক।

বিলক্ষণ সেই কবিতাটার শেষ অংশ শোনানো হয়নি।

আমি বললাম উনি থাকুন না; আমার অসুবিধা হচ্ছে না।

প্রশ্রয় পেয়ে কবি বলে উঠলো শেষ কটা ছত্র শুনিয়েছি। অর্ধেক কবিতা শুনলে আধ কপালে ব্যথা হয়—বলেই আরম্ভ করলেন।

বিড়ি হলে লোকে ধরাবে আগুন

আমার জীবনে নামবে ফাগুন—

নামবে শব্দটায় অর্থ কি হল ?

বুঝলেন না স্যার ওটা না—আসবে শব্দ দুটোর সন্ধি, ছন্দের খাতিরে এ রকম করতে হয়। করতে হয় বই, ওকেই তো আর্ষ প্রয়োগ বলে। বলে ! এই বলে তিনি সকলের দিকে তাকালেন—ভাবটা এই যে কলকাতার সাহিত্যিক ছাড়া এসব রহস্য কে বুঝবে।

বাসায় এসে পৌঁছে আমি বললাম ভোর রাত চারটায় গাড়ী। আপনারা এক কাজ করুন আমাকে খাইয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দিন, ওয়েটিং রুমে থাকবো। তখন জানতাম না কি মারাত্মক প্রস্তাব করলাম।

উদ্যোক্তাগণ হিসাব করে দেখলেন আহারাদি শেষ করে ষ্টেশনে পৌঁছতে রাত বারোটা বেজে যাবে, কাজেই টিকিট পেতে অসুবিধা হবে না। আমি আহার করতে বসলে স্থানীয় কবি নমস্কার করে বিদায় নিলেন। সকলেই নিশ্চিন্ত হল।

আহারাদি শেষ করে ষ্টেশনে পৌঁছে দিলেন। প্রশস্ত ওয়েটিং রুম জনশূন্য। সকলে নমস্কার করে ও ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলেন। আমি একখানা আরাম কেদারায় শুয়ে ভাবলাম খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। এমন সময়ে স্থানীয় কবির প্রবেশ। একখানা চেয়ারে বসে পড়ে তিনি বললেন কবিতার শেষাংশটা শুনিয়ে দি—এমন নিরিবিলি আর কোথায় পাওয়া যাবে।

তিনি আরম্ভ করলেন—

সে আগুন আর সেই যে গন্ধ

বিড়িখোরের তাহা লাগে না মন্দ

কিন্তু হায় রে আমার ছিরি।

ফেলে দিয়ে পথে লোকে দেখে না ফিরি।

বলুন স্যার, কেমন হল।

প্রশংসার শাস্তি বারিতে কবি নিরস্ত হতে পারেন ভরসায় বললাম—চমৎকার এমনটি আগে শুনিনি।

তারপর বললাম অনেক রাত হল এবারে আসুন।

আসবো কি স্যার, এখনো যে রাঘব বিজয় কাব্য শোনানো হয়নি। বুঝলেন কিনা আমি রবি ঠাকুরের মত মস্ত কবিতার পক্ষপাতী নই—আমার আদর্শ হেমচন্দ্র। বৃত্রসংহারেব মতো কাব্য হয়—মেঘনাদ বধ তো ওর ব্যর্থ অনুকরণ। (ঝরণার জল সম্বন্ধে এ সেই নেকড়ে বাঘের যুক্তি।)

তাবপরে মলিন কাপড়ে জড়ানো রাঘব বিজয় কাব্য বের হল আকার দেখে বুঝলাম নাম হওয়া উচিত ছিল রাঘব বোয়াল। তারপরে তিনি এক-টানা সুবে ৩।৪ ঘণ্টা ধরে কী যেন একটা পড়ে গেলেন, হয় তো বা কাব্যই হবে। ২।৩ জন আশ্রয় প্রত্যাশী যাত্রী উঁকি মেরে সরে পড়লো—স্থানীয় কবিকে স্থানীয় লোকেরা চেনে কিনা। কবি মাঝে মাঝে আহা করে ওঠেন আমিও করি, তবে কারণ ভিন্ন, এক দিকে কাব্য রস অন্যদিকে ছারপোকার কামড়। স্থানীয় ছারপোকারাও চেনে নাকি।

এমন সময় গাড়ীর ঘণ্টা পড়লো, যাক বাঁচা গেল। গাড়ী এসে দাঁড়ালে আমি উঠলাম, কবিও উঠলেন। কবি আবার ওঠেন কেন?

চলুন আপনাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দি।

একখানা ফাঁকা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠলাম, তিনিও উঠলেন।

নিন আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে।

এমন সময়ে গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা ও বাঁশী বাজলো।

বললাম নেমে পড়ুন।

সে কী হয়। রাঘব বিজয়ের শেষ সর্গটাই যে শেষ হয়নি, শোনাবো বলেই উঠলাম।

বললাম টিকিট তো করলেন না, পথে চেকার উঠলে বিপদে পড়বেন।

স্থানীয় কবি বললেন, আমি যে কামরায় চাপি চেকারেরা সে গাড়িতে ওঠেন না,ওঁরা আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন কিনা—এই বলে তিনি কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগে মিশ্রিত একটি হাসি হাসলেন। সে হাসি সত্যই রাঘব বিজয়ী হাসি।

বিদ্যাবিপর্ণি কলেজ

বিদ্যাবিপণি নামে বিখ্যাত কলেজে একটা যে সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে এক নজরেই তা বোঝা যায়, বিশেষ নজরটা যদি পড়ে কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে। প্রবেশ করলেই মনে হবে ঘরে এইমাত্র যেন কারো মৃত্যু হয়েছে, চারদিকে উপবিষ্ট সন্ত শোকার্তগণ। স্বয়ং অধ্যক্ষ তুষারখণ্ডের মতো শীতল ও নীরব, সহাধ্যক্ষ কড়িকাঠে আবদ্ধদৃষ্টি, দর্শনের অধ্যাপক সেই যে যৌবনের শেষে দু পাটি দাঁত বাঁধিয়ে ছিলেন বার্ধক্যে মুখের মাংসপেশী শিথিল হয়ে যাওয়ায় আজ তারা ক্ষণে ক্ষণে স্থানচ্যুত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। সেগুলোকে সামলাতেই তাঁর মনোযোগের বারো আনা ব্যয় হয়ে যায়, এখনো যাচ্ছে; ছাত্ররা ক্লাসে বলাবলি করে ঐ দাঁতের কামড়ে স্বয়ং মা সরস্বতী অস্থির। অন্যান্য অধ্যাপকগণ দেহ দিয়ে জ্যামিতির নানা লম্ব কোণ্ রচনা করে প্রায় উপবেশন করে আছেন কেবল ইতিহাসের অধ্যাপক সবাক ও সচল।

এমন বেয়াড়া বাঁদর ছেলের দল কখনো দেখি নি, কিছুতেই ঘাড় নোয়ায় না, নির্বোধ না অত্যন্ত বুদ্ধিমান বুঝতেই পারলাম না।

কথায় কথা টেনে আনে, ইতিহাসের অধ্যাপকের কথা ক্রমে অন্যান্য অধ্যাপকদের মুখে কথা টেনে আনতে লাগলো।

কপাল আর কাকে বলে।

আশেপাশের কলেজে কি হচ্ছে দেখছিস তো। আর কিছু না হোক খবরের কাগজে তো পড়ছিস। না তা-ও পড়া ছেড়েছিস।

রসায়নের অধ্যাপক ফোঁস করে বলে উঠলো, এ-সব বাজে বই পড়বার ফল। ও-সব ভক্তি যোগ, সত্যের সন্ধানের মতো ফালতু বই না পড়ে পড় না কেন আমার সরল রসায়ন শাস্ত্র। এই কলেজের ছাত্র জানলে দোকানে শতকরা ত্রিশ টাকা কমিশন দেবে।

কপাল, কপাল।

বলুন ভাঙা কপাল, ওদের আর কি। এগিয়ে যাবে অন্য কলেজের ছেলেরা

পাশের হার বাড়বে, প্রথম দ্বিতীয় হবে, আর তোরা ভেবে মর।

বেটার ছেলেরা বলে কি!

এবারে উত্তরদাতা ইতিহাসের অধ্যাপক। বলে স্যার ও-সবের মধ্যে আমরা যেতে পারবো না। আমি বললাম, সব কলেজে পারছে, খাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ঢালাও ব্যবস্থা তবে তোমরা এত সাধু হতে গেলে কেন! বলে কিনা, আমরা সাধু নই, তবে আবার অসাধুও নই।

দর্শনের অধ্যাপকের দাঁতগুলো এতক্ষণে জুৎ হয়েছে, তাই তিনি পরিভাষার সাহায্যে বলে উঠলেন, এ যে Dichotomy হল, সংসারটা যেন সাধু আর অসাধু দুই ভাগে বিভক্ত। তবে ত্যাঁদড় বাঁদর এসব এলো কেমন করে।

ইতিহাসের অধ্যাপক বললেন, তা জানি না কিন্তু কত 'হিণ্ট' দিলাম তোমরা লেখো জল খেয়ে আসছি,আমার দেরী হলে চিন্তা করো না। বুঝতেই তো পারছ কি আর বলবো। ভাবলাম এবারে সুরু করবে। কিছুক্ষণ পরে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম সবাই আপন মনে লিখে যাচ্ছে। টুঁ শব্দটি নাই।

এবারে দর্শনের অধ্যাপক ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠে বললেন, আপনাদের ভুল ইতিহাস শিক্ষার ফল। ইতিহাসে জালিয়াত, জোচ্চোর, ৪২০ তো কম নেই, তাদের কথা না পড়িয়ে ঐসব অশোক, হর্ষবর্ধন, যীশুখৃষ্ট বুদ্ধের কথা পড়াবার কি প্রয়োজন। নিন এখন ফল ভুগুন, মুস্কিল এই যে আমাদেরও ভুগতে হবে।

তা যদি বললেন তবে আপনাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। ও সব এথিকস মর‍্যাল ল, ট্রুথ পড়াবার কি দরকার।

তবেই বুঝেছেন। ক্লাসে বুঝি পড়াই! আমার লিখিত টেকসট বুক গুলোর গুণগান করি। কেউ চাইলে বলি হেড বেয়ারা গঙ্গার কাছে থেকে কিনে নিয়ে যেয়ো, শতকরা ত্রিশ টাকা ছাড় পাবে। আর কাউকে পাঠাই নস্যি আনতে, কাউকে পান আনতে, তারা চক্ষু লজ্জায় দামটা আর চাইতে পারে না।

ইংরেজির অধ্যাপক এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ জেগে উঠে শুধালেন, কতদূর কি হল। অন্য সব কলেজের ছাত্ররা মেরে বেরিয়ে গেল, আর আমাদের ভাগ্যে কিনা এমন সব ছাত্র জুটলো যারা অবাধ সুযোগ পেয়েও—কি আর বলবো।

তখন অধ্যক্ষ মহোদয় মুখে গোটা দুই পান ভরতে ভরতে বললেন জন

কয়েক মাথালো ছোকরাকে ডাকুন না কেন, একবার জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা যাক না কেন এমন করছে।

সকলেই বুঝলো এ পরামর্শ উত্তম, অল্পক্ষণের মধ্যেই জনকয়েক পরীক্ষার্থী এসে ঘরে প্রবেশ করলো সেই পেপারটার পরীক্ষা শেষ হয়েছিল।

স্যার আমাদের ডেকেছেন ?

হাঁ, কেন তোমরা এমন করছ! দেশের সব কলেজে যে হাওয়া বইছে তার বিরুদ্ধে যাওয়া কি উচিত ?

স্যার, সে হাওয়া যদি দূষিত হওয়া হয়।

দেশ শুদ্ধ লোক যদি দূষিত হাওয়ায় মরে তোমরা ক'জন বেঁচে থেকে কি করবে ?

স্যার, কিছু মনে করবেন না, আপনারা কি এইভাবে পরীক্ষা পাশ করেছিলেন !

আমাদেব সময়ে হালচাল আলাদা ছিল।

সে আলাদা কি রকম অধ্যাপকগণ রিলে রেসে বলে চললেন—

আমাদের সময়ে আড়াই টাকা মণ চাল ছিল,

পাঁচসিকে সের ছিল খাঁটি গাওয়া ঘি,

ছ' আনা সের তেল,

আট আনা দশ আনার মধ্যে মাছ মাংস।

কিন্তু স্যার, দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে সম্বন্ধ কি !

সম্বন্ধ এই যে, এবারে বক্তা দর্শনের অধ্যাপক, মূল্য স্ফীতির সঙ্গে মর‍্যালিটির বদল হয়। সে আমলে এক পয়সায় সাত কলস হৈরঙ্গবিন পাওয়া যেতো বলেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সত্য কথা বলা অনায়াস ছিল, বাছাধন এ যুগে জন্মালে—

অধ্যক্ষ আরম্ভ করলেন, দেখো, তোমরা যে রকম ব্যবহার করছ তার পরিণাম বুঝতে পারছ কি! অন্য সব কলেজের ছাত্রদের পাশের হার বেড়ে যাবে, তারা স্কলারশিপ পাবে। তারপরে পাবে চাকুরিগুলো, কাজেই নিজেদের স্বার্থবিরোধী তোমাদের আচরণ।

স্যার, সে যাই হোক, অন্য কলেজের ছাত্ররা যাই করুক, পরীক্ষায় আমরা 'গণ টোক' করতে পারবো না।

দর্শনের অধ্যাপক স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, আরে

আমার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সব। কেন গণ টোক করতে পারবে না শুনি, হয় তোমরা টুকবে নয় মেরে তোমাদের হাড় ভেঙ্গে দেব—বলে এমন গর্জন তিনি করে উঠলেন যে দন্ত পাটি সবেগে ছুটে গিয়ে ছাত্রটির কপালে লেগে রক্ত পড়তে লাগলো, তবু সে অবিচলিত কণ্ঠে বলল—টুকতে আমাদের নিষেধ আছে।

কার নিষেধ?

আমাদের দিদির।

দিদি! এ কলেজে তো কোন ছাত্রী পড়ে না।

তিনি কলেজের ছাত্রী নন, আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। তাঁর আদেশ।

নামটা কি?

পরিচয় দান নিষিদ্ধ।

আচ্ছা তোমরা এখন যাও।

ছাত্র কয়জন বের হয়ে গেলে অধ্যক্ষ বললেন, সমস্যা জটিল, এর মধ্যে মেয়েছেলে আছে।

যুগ সচেতন পাঠক এতক্ষণ নিশ্চয় ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছেন। অন্যসব কলেজের ছাত্ররা যখন গণ টোক করে পরীক্ষা দিচ্ছে, সকলেই পাশ, সকলেই প্রথম বিভাগ, অনেকেই একশর মধ্যে একশ, তখন বিদ্যাবিপণি কলেজের ছাত্ররা টুকবে না, সমস্ত সুযোগ ও প্রত্যক্ষ উৎসাহ সত্ত্বেও টুকবে না। তারা নিজের বিদ্যায় পরীক্ষা দেবে। নিজের বিদ্যায় কে কবে কী করেছে। এমন দুর্দৈব ঘটলো কিনা শেষে বিদ্যাবিপণি কলেজে। এরকম কিছুদিন চললে এখানে কেউ আর ভর্তি হবে কি। অধ্যাপকরা সকলেই সিদ্ধান্ত করলো এ সেই মারাত্মক দিদির কর্ম। অতএব দিদির সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করা আবশ্যক।

বাংলার অধ্যাপক কৃশ বেঁটে খাটো মানুষ মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভোগে সে বলল সেই ভালো, দিদির সঙ্গে একবার দেখা করুন তবে খালি হাতে যাবেন না।

হাঁ, সন্দেশ নিয়ে যাওয়া ভালো।

সন্দেশ নিতে চান নিয়ে যান, তবে আমি সে কথা বলছি না। আগে তার পড়াশোনা কতদূর খোঁজ নিন, ন্যূনতম গুণ থাকলে চাকরির লোভ দেখান।

আমাদের তো মেয়ে বিভাগ নেই।

খুলুন। বলুন আপনাকে মেয়ে বিভাগের অধ্যক্ষ করে দেওয়া হবে।

তারপরে ?

তারপরের কথা পরে।

সেই সিদ্ধান্তই বহাল হল। স্থির হল দিদির সন্ধান নিয়ে ইতিহাসের, দর্শনের ও ইংরাজির অধ্যাপক দিদির কাছে যাবেন। সন্ধান নিয়ে জানা গেল দিদি পাড়াতেই থাকেন। দর্শনে এম-এ পাশ তবে চাকুরি করেন না। পরদিন তিনজন অধ্যাপক দিদির বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অধ্যাপকগণ ছাত্রদের অবাধ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ তুললেন না, বরঞ্চ বললেন ছাত্রদের কাছে তাঁর গুণপনা শুনে এসেছেন চাকুরি অফার করতে।

দিদি বললেন, আপনাদের কলেজে তো মেয়ে বিভাগ নেই।

খোলা হবে স্থির হয়েছে।

হাঁ আমি এম-এ পাশ বটে তবে কখনো চাকুরি করিনি, প্রয়োজন নেই বলে।

প্রয়োজন আমাদের।

কিন্তু অভিজ্ঞতা যে নেই।

সেই জন্যেই তো এসেছি, আমরা ফ্রেশ মাইণ্ড চাই।

দিদি বললেন, আজকাল ছাত্রছাত্রীরা গণ টোক করে বলে শুনেছি।

সে কথা সত্যি, তবে বিদ্যাবিপণি মহৎ ব্যতিক্রম।

বড় আনন্দের কথা—আচ্ছা আমি রাজি।

চাকুরিতে কে কবে গররাজি।

অধ্যাপকগণ তখনই নিয়োগপত্র দিলেন, নিয়োগপত্র সঙ্গে করেই এসেছিলেন অধ্যাপকগণ উৎফুল্ল হয়ে ফিরে এলো। সেইদিনই মেয়ে বিভাগ খোলা হল। এদেশে আর যারই অভাব হোক কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর অভাব হয় না প্রথমদিনেই জন কুড়ি ছাত্রী জুটে গেল। এবং পরদিন দিদি অর্থাৎ মিস অণিমা সিদ্ধি সেন এম-এ অধ্যক্ষরূপে যোগ দিলেন। বিদ্যাবিপণি কলেজের অধিকাংশ ছাত্র দিদির পাড়ার বাসিন্দা, তাদের চেষ্টায় আরও ছাত্রী জুটতে শুরু করলো।

ইতিমধ্যে গত পরীক্ষার ফল বের হল। দেখা গেল পাশের হারেও পাশের গুণে সব কলেজের নীচে বিদ্যাবিপণির স্থান। নিজের বিদ্যায় কে কবে কী

করেছে।

মিস সেন (এখন আর দিদি নয়) বললেন এতো বড় লজ্জার কথা।

আপনি এসেছেন এবারে সব ব্যবস্থা হবে ।

মিস সেন বললেন, অবস্থা না জানলে ব্যবস্থা হয় কিভাবে।

অধ্যক্ষ বললেন, একথা ঠিক।

এখনি একটা এনকোয়ারি কমিটি গঠিত হল। সকলের অনুরোধে মিস সেন হলেন চেয়ারম্যান।

মিস সেনের আসবার পরে ও এনকোয়ারী কমিটি গঠিত হওয়ার মধ্যে ছয় মাসকাল অতিবাহিত হয়েছে। ছাত্রী বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা প্রথমে যেরূপ বাড়ছিল তাতে ভাঁটা পড়ে এসেছে। আর ছাত্র বিভাগের ছাত্র সংখ্যা রীতিমতো হ্রাস পেয়েছে। কারণ অবশ্যই আছে। কারণ ছাড়া কোন কার্যটা হয়।

বিদ্যাবিপণি কলেজের ফেল করা ছাত্রগণ বাড়ীতে গিয়ে তাড়া খেলো পরমারাধ্য পিতৃদেবগণ বললেন বিদ্যার জন্য তোমাদের ভর্তি করিনি, করেছি ডিগ্রীর জন্যে। অন্য কলেজের ছেলেরা টোকে ? বেশ তো তোমরাও না হয় টুকলে ! যেখানে অবাধ টুকবার সুবিধা সেখানে গিয়ে ভর্তি হওগে।

স্নেহময়ী জননী মুখের কাছে বলয়ঝঙ্কৃত হাতখানা নেড়ে দিয়ে বললেন, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর কি। আর জনক জননী পিতামহী ও মাতামহীর দল বললেন, ভাইরে পরামর্শ করেই তো কাজ করতে হয়। পরীক্ষার বেলাতেও না হয় তাই করলে। কাজেই ছাত্ররা দলে দলে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য কলেজে যেতে লাগলো। এদিকে অর্থাভাবে বিদ্যাবিপণির অধ্যাপকগণের প্রথমে বেতন কমলো তারপরে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

এ হেন পরিস্থিতিতে এনকোয়ারী কমিটির যে রিপোর্ট বের হল তা আদৌ প্রত্যাশাতীত নয়। মিস সেন একটি মাত্র ছত্রে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করছেন—অন্য সব সদস্যও তাঁর সঙ্গে এক মত। তাঁর বক্তব্যের মর্ম সংস্কৃত ভাষায় লিখলে দাঁড়ায় ক্ষেত্রে কর্মে বিধীয়তে আর ইংরাজিতে দাঁড়ায় ডু ইন রোম অ্যাজ দি রোমানস ডু।

বিদ্যাবিপণিতে আবার ছাত্র-ছাত্রীর বান ডাকলো। এবার পরীক্ষায় শতকরা একশজন পাশ—আর সকলেই প্রথম বিভাগে।

অধ্যাপকগণ মহা খুশি কিন্তু তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না মিস সেন ওরফে

দিদিমণির এহেন পরিবর্তনের কারণ কি ?

দর্শনের অধ্যাপক দাঁত জোড়া সামলাতে সামলাতে বলল— সাধুত্ব ততক্ষণ যতক্ষণ না অন্নের থালায় টান পড়ছে ।

ইতিহাসের অধ্যাপক শুধালো—তবে কি আদর্শবাদ বলে কিছু নেই ?

ছিল তখন শিক্ষকরা যখন দরিদ্র ছিল। এখন আর সকলের মতোই তারা স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং উত্তোলন করতে উদ্যত, ও কাজটি ভায়, সদুপায়ে কদাচিৎ হয়। এই যে পথেঘাটে যত রাহাজানি ছিনতাই ছোরা বোমা পিস্তলের খেলা—সকলেই জীবনধারণের মান উন্নয়নে নিযুক্ত। আমরা ওসব পারিনে তাই ছাত্রদের অবাধ টুকবার সুবিধা করে দিয়ে ঐ একই চেষ্টা করছি।

আচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ সমস্ত জেনে শুনেও নীরব কেন ?

কেন নয় ! এই ছাত্ররাই যে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় একমাত্র উপায়।

আর একটা কথার উত্তর দিন। এই সব না পড়ে পাশ ছাত্রের দল কেউ শিক্ষক, কেউ অধ্যাপক, কেউ এনজিনিয়ার, কেউ ডাক্তার হচ্ছে এর পরিণাম কি।

পরিণাম রমণীয়। যাক ওঠা যাক আসছে মাসে পুরো বেতন পাওয়া যাবে তো।

কলেজ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারির মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথা বার্তা হচ্ছিল। তার আগে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক এরাই ছিল দিদির প্রধান চেলা এবং গণ-টোকের চরম বিরোধী।

প্রেসিডেণ্ট—এখন কি করবে ?

সেক্রেটারি—আর কিছু করবার তো পথ নেই ! যেখানে না টুকলে বাপ-মা ঠাকুরমা ধিক্কার দেয়, অধ্যাপকরা টুকবার অবাধ সুবিধা করে দেয় আর সরকার ও শিক্ষা বিভাগ এই সব গণ-মূর্খকে মোটা বেতনের চাকুরি দেয় বাঁচতে হলে সেখানে টুকে বাঁচতে হবে।

ধরো যদি কেউ বাঁচতে না চায় ।

নাও এখন ঠাট্টা রাখো, চলো চা খাওয়া যাক।

পরদিন সকালবেলা বিদ্যাবিপণির ছাত্র সমিতির প্রেসিডেণ্টের মৃতদেহ রবীন্দ্র সরোবরে 'তিন কামানের' কাছে পাওয়া গেল—বুকের উপরে এক খণ্ড কাগজে লিখিত 'দেশব্যাপী গণ-টোকের প্রতিবাদে আত্মোৎসর্গ করিলাম।'

এই সংবাদে দেশময় দুন্দুভি বেজে উঠল। সংবাদপত্র আড়াই কলম

সম্পাদকীয় লিখে শহীদকে ছাত্র সক্রেটিস আখ্যা দিল, ফুলের মালা, গণ-মিছিল শোকসভা, মূর্তি স্থাপনের প্রস্তাব সমস্তই হল। এই মওকায় বিদ্যা-বিপণি ব্যাপারটাকে কলেজের গৌরব স্বরূপ প্রচার করে বেশ কিছু ছাত্র সংগ্রহ করে ফেলল। বলা বাহুল্য গণ-টোক এখনো যথারীতি চলছে।

নেব না পণ, দেব না পণ

পাত্রী সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী কাজেই এক নজরেই পছন্দ হ'য়ে গেল, পাত্রের পিতা বললেন, 'মা লক্ষ্মী, তুমি এবারে এসো, আমার ঘরেই তোমাকে যেতে হবে মা, বুড়োকে চিনে রাখো।'

পাত্রী মৃদু হেসে পাত্রের পিতাকে ও নিজ পিতাকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করলেন, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। পাত্রের পিতাকে আগেই জলযোগ করানো হ'য়ে গিয়েছিল—কাজের কথা উঠতে বাধা ছিল না।

পাত্রের পিতা রামদয়ালবাবু বল্‌লেন 'আপনার মেয়েটি একসঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী। এ মেয়ে আমি নেবোই, নিন চটপট কথাবার্তা সেরে নিন।'

পাত্রীর পিতা হরিচরণবাবু বল্‌লেন, 'মেয়ে যদি নেন, নিজগুণেই নেবেন। তবে আমার একটু অনুযোগ আছে '

—'আবার অনুযোগ কি? এর মধ্যে অনুস্বার বিসর্গ আনবেন না।'

হরিচরণবাবু বল্‌লেন, 'অনুযোগ না বলে অনুনয় বলা উচিত ছিল। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে যে পণ দেবার পক্ষে আমার বাধা আছে, আমার স্ত্রী এই মহল্লার "পণ নেবো না, পণ দেবো না" সমিতির সেক্রেটারি।'

—'কি আশ্চর্য, কি রকম যোগাযোগ দেখুন না প্রজাপতির। আমার স্ত্রীও আমাদের পাড়ার "পণ নেবো না, পণ দোবো না" সমিতির, অবশ্য সেক্রেটারী নন, সভাপতি। তিনি আবার ঘটা করে লেটার হেডিং-এ ছেপে দিয়েছেন, "বিনা পণে দিব বিয়া, এ কোন্ ব্যাভার! কোন্ মুখে চাও এবে দশটি হাজার।"

—'বাঃ চমৎকার মানিয়েছে। কবিগুরুর লেখা বুঝি।'

রামদয়ালবাবু বললেন, 'ধরেছেন ঠিক। বুঝলেন হরিচরণবাবু এবারে পণ প্রথা না উঠে যায় না, পাড়ায় পাড়ায় "পণ নেবো না পণ দেবো না" সমিতি, সমস্ত মেয়েরা সভ্যা। পুরুষদের সাধ্য কি পণ দাবী করে!'

তারপরে তিনি হেসে উঠে বল্‌লেন,'এবারে মায়েদের দৃঢ়তা দেখে বিয়ের

বয়সী ছেলেদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।' আবার হেসে উঠে বল্লেন, 'ভাগ্যিস মশাই আমাদের বিয়েটা অনেক আগে হয়ে গিয়েছিল নইলে ফাঁকিতে পড়তে হতো।'

হরিচরণবাবু বললেন, 'পণের টাকা তো বাজে খরচ—পাত্রের কেবল সাক্ষী গোপাল সাজা।'

—'তা বটে! তাহলে আমাদের দু পক্ষের নীতি এক, তা ছাড়া আপনার মেয়ে, ঐ তো বললাম, একসঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী।'

—'কিন্তু কিছু তো দিতে হবে বই কি! আপনার সুনাম আছে, মেয়ের সমাদর আছে, তবে কি না নাম মাত্রে।'

এত স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পরেও হরিচরণবাবু স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। মধুর বাক্যের মূল্য তার অজানা নয়—এই রকম মধুর বাক্য বর্ষণ করেই তিনি অর্থ মুদ্রা সঞ্চয় করেছেন। তা ছাড়া নিজের পুত্রের বিবাহের জন্য সস্ত্রীক বসে যৌতুক, অলঙ্কার ও প্রণামী প্রভৃতির যে তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন সে এক-খানা রাজজ্যোতিষীকৃত কোষ্ঠীর চেয়ে কম দীর্ঘ নয়। অবশ্য পণের দাবী নেই, কেন না, "পণ দেবো না পণ নেবো না" সমিতির সেক্রেটারি তাঁর পত্নী, আর সুবিধামতো স্লোগান খুঁজে না পেয়ে সংক্ষেপে লেটার হেডে ছেপে দিয়েছেন "আবার পণ ছিঃ!"

হরিচরণবাবু যখন এই সব কথা ভাবছিলেন, রামদয়াল তখন পকেটে হাত দিয়ে বিনা পণে বিবাহের চাহিদার ফর্দখানির স্থূলতা অনুভব করছিলেন, এক একবার মনে হচ্ছিল বুঝি ছোট একখানি পকেট ডিক্সনারী। কিন্তু বৃথা সঙ্কোচ কাপুরুষের লক্ষণ—আর রামদয়ালবাবু আর যাই হোন কাপুরুষ নন অন্ততঃ হরিচরণবাবুর কাছে।

'এই যে পেয়েছি' বলে রামদয়ালবাবু যেই পকেট ডিক্সনারীর ক্ষুদ্র সংস্করণটি বের করলেন সেই বস্তুটি দেখে অজ্ঞাতসারে হরিচরণবাবুর মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল (না ডিক্সনারী নয়) কুষ্ঠি নাকি!

মন্তব্যটাকে উচ্চাঙ্গের রসিকতা মনে করে হোঃ হোঃ শব্দে হেসে উঠলেন পাত্রের পিতা, 'বাঃ বেশ বলেছেন।'

তারপর গাম্ভীর্য ফিরে পেয়ে বললেন, 'সামান্য দাবী দাওয়া না করলে নয়—তাই কিছু করা হয়েছে, ২/১ দফা বাদ দিতে চান তো আপত্তি নেই।'

এই বলে তিনি কাগজের তাড়া হরিচরণবাবুর হাতে দিলেন। হরিচরণবাবু

তালিকাখানি খুঁটিয়ে পড়বার আগে এক নজরে তাকিয়ে দেখলেন চাহিদার ধারা "ক" অক্ষর থেকে নামতে আরম্ভ করে "ঢ়" পর্যন্ত নেমেছে। হরিচরণবাবুর মনে হল আর ক'টা ব্যঞ্জনবর্ণ বাকি থাকে কেন? ঠিক সেই সময় রামদয়াল-বাবু ভাবছিলেন স্বরবর্ণগুলো বাদ প'ড়ে গিয়েছে—আচ্ছা সে-সব না হয় পরিশিষ্ট আকারেই দেওয়া যাবে, তাতে খুব অশিষ্টতা হবে না, সর্বদা হাতে কিছু শেষ মুহূর্তের জন্যে অবশিষ্ট রাখা ভালো। সত্য কথা বলতে কি পণের প্রসঙ্গ কোথাও নাই।

সেই সুদীর্ঘ তালিকা এখানে সম্যক্ উদ্ধার করে দিলে অনেক 'পণ নোবো না পণ দেবো না' সমিতির সদস্যদের উপকার হতো, তবে যাঁরা নিঃসন্তান, বা যাঁদের সন্তানের বিবাহ হয়ে গিয়েছে তাঁদের বিরক্তি উৎপাদন করবে ভয়ে কয়েকটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করবো।

(ক) অলঙ্কার—গিনি সোনার পঞ্চাশ ভরি। জড়োয়া গহনা চলবে না, তবে ঐ পঞ্চাশ ভরির উপরি দিলে আপত্তি নাই

(খ) গডরেজ আলমারি ২টি

(গ) ড্রেসিং টেবিল

(ঘ) সোফা সেট

(ঙ) পালঙ্ক সেট

(চ) বেবি কট (আগাম সতর্কতা হিসাবে)

(ছ) বাসন তিন সেট, রূপার কাঁসার এবং উৎকৃষ্ট চীনামাটির

(জ) বরের ঠাণ্ডা ও গরম স্যুট, তিন জোড়া

(ঝ) সোনার হাত ঘড়ি

(ঞ) মুক্তার বোতাম

(ট) মোটর গাড়ী ২ খানা

(ঠ) মোটর বাইক ১ খানা

(ড) রবীন্দ্ররচনাবলী এক সেট (চামড়ার বাঁধানো)

(ণ) ঐ শরৎ গ্রন্থাবলী (প্রকাশিত হলে)

(ত) রেডিও যন্ত্র

(থ) টেপ রেকর্ডার

(দ) টি. ভি. সেট

(ধ) পুস্তকাধার আলমারী (মেহগনি কাঠের) ১০টি

(ন) ঐগুলির জন্য পাত্রের পছন্দ মতো পুস্তক

(প) প্রণামী পঞ্চাশ সেট দিদি শাশুড়ী, শাশুডী, খুড শাশুডী, জেঠ শাশুডী প্রভৃতি এবং মাসি পিসি, খুড়ি জেঠি প্রভৃতি তথা পাতানে মাসি পিসি খুড়ি জেঠি দিদি

(ফ) ননদ পুঁটিলি ৬৩ প্রস্থ

(ব—চ) অন্যান্য

সর্বশেষে মন্তব্য 'পণ নোবো না, পণ দেবো না।'

যখন হরিচরণবাবু এই তালিকা পাঠ করছিলেন তখন সম্মুখে আয়না না থাকায় নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলেন না বটে, তবে রামদয়াল বাবু দেখছিলেন। তাঁর মনে হল বোধ করি যথেষ্ট চাপানো হয়নি, আরও কিছু ভার সহ্য হতো। অবশেষে প্রায় লুপ্তসম্বিৎ হরিচরণবাবুর যেটুকু চৈতন্যরশ্মি অবশিষ্ট ছিল তাতে নতুন দিগ্‌দর্শন পেলেন তাঁর পুত্রের বিবাহের তালিকায় আরও কয়েকটি আইটেম যোগ করবার অবকাশ এখনো আছে।

রামদয়ালবাবু বললেন, খুব হাল্কা করেই তৈরী করেছি, যা বাজার।

—'না এসব কিছু বেশী হয়নি, তবে কিনা একবার ওঁয়াদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।'

—'ত হবে বইকি। বিশেষ তিনি যখন 'পণ নেবো না পণ দেবো না সমিতির সেক্রেটারি। আর এ তালিকাখানাও আমার স্ত্রীর যিনি নাকি "পণ নেবো না পণ দোব না" সমিতির সভাপতি। এই দেখুন তাঁর স্বাক্ষর। বল্‌লাম শ্রী হস্তের একটা সই করে দাও, তবে তো লোকে বিশ্বাস করবে যে হাল্কা করে তৈরী করেছ।'

এই বলে নিজের রসিকতায় হেসে উঠে বল্‌লেন, 'আজ তবে উঠি, তবে নিশ্চয় জানবেন হরিচরণবাবু এ মেয়ে আমার ঘরে অবশ্যই যাবে—প্রজাপতির স্বহস্ত লিখিত বিধান।'

রামদয়ালবাবু বিদায় হয়ে গেলে হরিচরণবাবু টলতে টলতে পাশের ঘরে শয্যায় এসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। পাঠক বিস্মিত হবেন না, ইন্দুমতী সামান্য ফুলের আঘাতে মারা গিয়েছিল, আর হরিচরণবাবুর তো মাত্র মূর্চ্ছা তার কারণ এই তালিকা ফুলের চেয়েও হাল্কা। হরিচরণবাবুর পতনের সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যা জল ও স্মেলিং সল্ট নিয়ে ছুটে এলো। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে 'কি হয়েছে?'

দুর্বল হরিচরণবাবু সংক্ষেপে কাতরভাবে কেবল একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন—'চ য় বিন্দু র।'

মিনা অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে, মানুষের হাতের আর সব যখন ফুরিয়ে যায় তখনো ফুরোয় না চোখের জল। মূর্ছাভঙ্গের পরে হরিচরণবাবু যখন পণহীন বিবাহের ফর্দখানা স্ত্রীকে দেখিয়ে সমস্ত বিবরণ শোনাচ্ছিলেন আড়াল থেকে সব শুনেছে মিনা আর বুঝেছে লক্ষ টাকার উপর খরচ করে বিবাহ দেওয়া তার বাবার পক্ষে সম্ভব নয়, আর উচিতও নয়। তারপরে তার মায়ের মুখে মহিলা সমাজে প্রচলিত অভিধানের সুশ্রাব্য অনর্গল গালাগালির বহর যখন শুনেছে তখন এখানে বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছে। তখন মনে পড়লো অমিয়র কথা। অমিয় এ কী করলো। তারা দু'জনে বরাবর এক কলেজে পড়েছে, অবশেষে এক সঙ্গে পাশ করেছে এম-এ; স্পষ্ট করে না হলেও আড়ালে দু'জনের মধ্যে বিয়ের কথা হয়েছে। তারপরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের লোভনীয় চাকরী যখন পেলো অমিয় স্পষ্ট করে প্রস্তাব করলো মিনার কাছে।

মিনা বল্‌ল, 'তোমার বাবা মা যে পণ দাবী করবেন, বাবার পক্ষে দেওয়া তা সম্ভব হবে না।'

—'এক পয়সাও যাতে দাবী না করতে পারেন তার ব্যবস্থা করছি। পাড়ার মেয়েদের মধ্যে ক্যানভাস করে মাকে মহল্লার "পণ নেবো না পণ দেবো না" সমিতির সভাপতি করে দিয়েছি, এখন তাঁর পক্ষে পণ নেওয়া অসম্ভব।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিনার মুখ। বল্‌ল, 'তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো।'

অমিয় চিন্তিত হল। মায়ের কাছে মিনাকে বিবাহের ইচ্ছা জানালো। মা রাজি হলেন কাজেই কাজেই বাবাও রাজি হ'লেন। সুসংবাদ জানিয়ে এলো মিনাকে। দুজনে লেকের ধারে বসে গুলমোরের ফুলের বাহার দেখতে দেখতে অমিয় হঠাৎ বলে উঠল, 'মিনা আমার কি মনে হয় জানো, গুলমোরের ফুলগুলো দেখেই কবিরা আকাশ কুসুম কল্পনা করেছেন।'

মিনা বল্‌ল, 'কেমন করে বলবো আমি কবি নই, আর আকাশ কুসুম কখনো দেখিনি।'

—'তবে না হয় আমায় চোখ দিয়ে দেখো, এর চেয়ে আর সুন্দর আর

আছে কি ?'

মিনা জানে না সময় বিশেষে সকলেই কবি, আর তখন তার চোখে চরাচর সুন্দর।

ওরা দুজনে যখন চার চোখ এক করে গুলমোরের ফুলে আকাশ কুসুম দেখছিল তখন অমিয়র পিতা মাতা চার চোখ এক করে পণহীন বিবাহের ফর্দ্দ রচনা করছিলেন।

তার মা বল্‌ল, 'পণ নেবো না, পণ দেবো না ঠিক। কিন্তু তা বলে যৌতুক, অলঙ্কার, প্রণামী ছাড়বো কেন !'

কুণ্ঠিত রামদয়ালবাবু বললেন, 'ফর্দ্দখানা কিছু দীর্ঘ হচ্ছে না! এযে চ বিন্দু পর্যন্ত নামিয়েছ।'

—'তবু তো স্বরবর্ণে হাত দিইনি।'

সত্য কথা বলতে কি, পণ প্রথার মূলে ওঁনারা, আর তা প্রয়োগ করেন এঁনারা।

মিনা কাঁদছিল আর ভাবছিল অমিয় কি সব জানে? নিশ্চয়ই জানে না। আবার ভাবলো আমি যেভাবে জেনেছি সেইভাবে সম্ভবত জেনেছে। তবে আমার মতো নিশ্চয় কাঁদছে না, কাঁদবার ছেলে সে নয়, আবার নিজের কথা ফিরিয়ে নেবার ছেলেও সে নয়। কিন্তু কি করতে পারে অমিয়, কতদূরে যেতে পারে, বাপ মায়ের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করতেও কি পারে? সে কি সম্ভব, সে কি উচিত? তার নিজেরও তো ভাই আছে, সে যদি বাপ মায়ের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করে তবে কেমন লাগে তাদের। আহা এই সময়ে অমিয় যদি থাকতো, সব ভার সব ভাবনা তুলে দিত তার হাতে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখবার সময়ে মানুষে স্বপ্ন বলে বুঝতে পারে না, নইলে আর স্বপ্ন বলেছে কেন। একটি মেয়ে, বয়সে তার চেয়ে কম হবে, সুন্দর, আর কি চমৎকার শাড়িখানা যেন আগুনের সুতো দিয়ে বোনা, মুখমণ্ডল সেই আগুনের আভায় উজ্জল, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এক দৃষ্টি তাকিয়ে আছে তার দিকে। মিনা চেনে না মেয়েটি কে কিন্তু তবু যেন অচেনা নয়, তলে তলে এক সুতোয় যেন দু'জনের হৃদয় গাঁথা। সেও তাকিয়ে রইলো মেয়েটির দিকে। এবারে মেয়েটি হাসলো, সে হাসিটাও যেন কোমল আগুনের শিখা।

মেয়েটি শুধালো, 'তুমি কি ভাবছ?'

মিনা কেমন যেন সাহস পেয়েছে—বল্‌ল, 'ভাবছি আমার দুঃখের কথা।'

—'ওটা কি একটা উত্তর হল! সংসারের সব কথাই দুঃখের, সুখের কথা আর কই?'

—'কেন কত লোক তো সুখী.'

—'তারা সুখের ভান করে।'

—আপনিও কি দুঃখী?

আবার সেই কিংশুক কোমল হাসি। তবে উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বল্‌ল, 'তোমার দুঃখ আমি বুঝেছি।'

—কি দুঃখ বলুন তো।'

—'বিবাহের পণ জুটে উঠছে না—এই তো।'

চমকে উঠে মিনা বলে, 'আপনি কি অন্তর্যামী?'

—মৃত্যুর পরে সবাই অন্তর্যামী।'

- মৃত্যুর পরে! মরেছে কে?

—'আমি।'

—'আপনি? আপনাকে তো চিনতে পারছি না।'

—'পারবে কেমন করে; দেশের লোকে আমাকে ভুলে গিয়েছে।'

—কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

—'পারবে না অনেক দিন আগেকার কথা, তবে মন দিয়ে শোনো। আমার নাম স্নেহলতা। ষাট বছর আগেকার কথা। যখন আমার চোদ্দ বছর বয়স হ'ল, তখন ঐ বয়সে বিয়ে না হলে মেয়েদের নিন্দা হতো, পণের টাকা সংগ্রহের আশায় আমার বাবা হন্যে হ'য়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাবা ছিলেন গরীব, গরীবকে লোকে উপদেশ দেয় টাকা দেয় না। এমন সময় বাবা ও মায়ের কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনতে পেলাম—ভদ্রাসন বেচা ছাড়া নাকি উপায় নাই। চমকে উঠলাম। বাবা মা ছোট ছোট ভাইবোন সব নিরাশ্রয় হবে শুধু আমার জন্যে! তখনি মনঃস্থির করলাম আর সেই রাত্রেই কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিলাম।'

রুদ্ধশ্বাসে মিনা শুধায়, 'তারপরে?'

—'তারপরে আর কি! এ রকম অবস্থায় বাঙালি সমাজে যা হয়ে থাকে তাই শুরু হয়ে গেল। কবি কবিতা লিখলো, বাগ্মী বক্তৃতা দিল, চিত্রকর ছবি

আঁকলো, সম্পাদক মন্তব্য লিখলো, ছাত্ররা মিছিল করলো, স্বদেশীওয়ালরা আর কিছু ভেবে না পেয়ে সরকারকে গাল দিল। দাঁড়াও আরও আছে। শোনো, গ্রামে গ্রামে স্নেহলতা ফাণ্ড উঠলো—

—'সে টাকা পৌঁছলো আপনার বাবার হাতে।'

—রামোঃ এক পয়সাও নয়। দাঁড়াও, তামাসার এখানেই শেষ নয়। কাতাবে কাতারে হাজারে হাজারে যুবক কিশোর মায় বালক অবধি কাগজে স্বাক্ষর করলো পণ নে বো না, পণ দে বো না। আর আমার চিতাভস্ম নিয়ে শ্মশানে এমন ক'ডাকাড়ি প'ড়ে গেল যে গঙ্গায় দেবার মতো এক কণাও অবশিষ্ট রইলো না।'

—তবে এখনো কেন পণ প্রথা চলছে?'

—'কেন চলবে না! "বাঙালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়।"

—'কিন্তু এবারে পণ প্রথা বোধকরি বন্ধ হবে, পাড়ায় পাড়ায় "পণ নেবো না, পণ দেবো না" সমিতি।'

—সেবারেও হয়েছিল। যুবকরা বুকের রক্ত দিয়ে লিখে শপথ করেছিল মা কালীর কাছে, যেটুকু রক্ত ব্যয় করেছিল তার চেয়ে বেশী আদায় করে নিয়েছিল মেয়েব বাপের বুক থেকে। ফলে পণের রেট বেড়ে গিয়েছে। আগেকাব দিনে ধনীতে যত চাইতে সাহস করতো না এখন মধ্যবিত্তে তার চেয়ে অনেক বেশী চায়। আর তা ছাড়া দেখা দেবে পণের বাজাবে কালো বাজার, তার ফলে রেট বেড়ে যাবে। আর নগদ টাকা নিলেই পণ, আর ঐ যে তোমার আড়াই হাত নামা ফর্দের দ্রব্যজাত ও বুঝি কিছু নয়।'

—'এখন কি কর্তব্য,' শুধায় মিনা।

—'কর্তব্য মেয়েদের হাতে '

—'না, না, মরতে পারবো না!'

—'মরতে কে বলছে তোমাকে। ম'রে আমি ভুল করেছিলাম, সেই ভুল সংশোধনের জন্যে বাঙালির নিদ্রায় আমি দেখা দিয়ে যাই, বাঙালী স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেয়।'

—কিন্তু উপায় তো বল্‌লেন না '

—'উপায় জিজ্ঞাসা করো অমিয়কে।'

—'আপনিতো সব জানেন দেখছি।'

—'মৃত্যু যে ত্রিকালজ্ঞ, এখন আমি চললাম অমিয়কে দেখা দিতে।' এই

বলে হস্কা স্বরূপিণী অন্তর্হিত হ'ল।

ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসে মিনা। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখে ভোর হয়ে এসেছে। এমন সময়ে টুক করে একটা কাগজের মোড়ক এসে পড়ে কোলের উপরে। বিস্মিত মিনা খুলে দেখে লেখা আছে—"আজ দুপুর আড়াইটায় লেকের সেই বট গাছটার তলায় উপস্থিত থেকো। অবশ্য অবশ্য। অ।"

মিনা কিছু বুঝতে পাবে না, স্বপ্নেব কথা মনে পড়ে যায়, সব কেমন গোলমাল ঠেকে। চিঠির টুকরখানা জামার ভিতরে বুকের মধ্যে বেখে দিয়ে উঠে পড়ে।

সেই বট গাছতলায় বেঞ্চির উপরে পাশপাশি অমিয় ও মিনা উপবিষ্ট। দু'জনেই নীরব। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ ক'রে অমিয় বল্‌ল, 'কি ভাবছ ?'

—ভাবছি বাড়ীতে না বলে এসেছি, বেশীক্ষণ থাকা উচিত হবে না।'

—'আমি ও এসেছি আফিস পালিয়ে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়—অতএব শীঘ্র চলো রেজিষ্ট্রি আফিসে।'

বলা বাহুল্য অমিয় শুনেছে পিতা মাতার ফর্দখানার কথা। বুঝছে এ ছাড়া উপায় নেই।

মিনার উত্তব না পেয়ে অমিয় শুধালো, 'কি পিছিয়ে গেলে না কি।'

—'মেয়েবা অত সহজে পিছোয় না।'

—'তবে আর বিলম্ব কেন ?'

—শুনেছি রেজিষ্ট্রি আফিসে নোটিশ দিতে হয়।.

—'আর্জেণ্ট ফি দিলে নোটিশের প্রয়োজন হয় না।'

—'কিন্তু তোমার বাবা মাকে কি বোঝাবে।'

'সে দায় আমার।'

মিনা সাগ্রহে অমিয়ব হাতখানা চেপে ধরলো। (এই প্রথম। মিনা মোটেই যুগের যোগ্য মেয়ে নয়)।

রেজিষ্ট্রি আফিসের কাজ সারা করে যখন তারা বাড়ীতে এসে পৌছালো দেখল বাড়ীতে কেউ নেই। মিনা মনে মনে স্বস্তি অনুভব করলো।

"পণ নেবো না পণ দেবো না" সমিতির উদ্যোগে আহূত সভায় অমিয়র মা তখন জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করছিল—'দেশের তরুণ তরুণীদের উদ্যোগী হ'তে হবে পণ করতে হবে পণ নেবো না, পণ দেবো না, তরুণ তরুণীদের

বাবা মাকেও। পণ অদেয়, অগ্রাহ্য, অস্পৃশ্য। প্রয়োজন হলে বাবা মায়ের আদেশ অমান্য করে বিবাহ করতে হবে তরুণ তরুণীদের।'

এমন সময়ে বাড়ী থেকে লোক এসে এক টুকরো কাগজ দিল সভাপতির হাতে,—'শীগ্‌গীর বাড়ীতে এসো।'

অমিয়র বাবা ইতিমধ্যে বাড়ীতে ফিরে সমস্ত অবস্থা অবগত হ'য়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

'আজকের মতো সভার কাজ শেষ হল'—বলে সঙ্গের দাসীকে নিয়ে অমিয়র মা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলেন।

—'এই নাও মা তোমার বউ। সোজা রেজিষ্ট্রী আফিস থেকে আসছি,' এই বলে অমিয় মিনাকে নিয়ে প্রণাম করলো।

তখন অমিয়র মায়ের মুখে যে ভাবান্তরের লীলা চল্‌ল তা উপভোগ্য হলেও বর্ণনার যোগ্য নয়। এক সঙ্গে রৌদ্র ছায়া, বর্ষা বসন্ত, চড়াই উৎরাই আশা নৈরাশ্য, প্রতিষ্ঠা বিসর্জন, হিংসা প্রেম ক্ষণে ক্ষণে ওড়না উড়িয়ে নৃত্য ক'রে চলল।

রামদয়ালবাবু বল্‌লেন, 'নাও, আশীর্বাদ করো।'

মায়ের মুখে প্রথম বাক্‌ স্ফূর্তি হ'ল—'পোড়ার মুখো রেজিষ্ট্রী আফিসে বুঝি সিঁথেয় সিঁদুর দেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

অমিয় বল্‌ল, 'আছে। তবে আমরা ভাবলাম তুমি নিজে দিয়ে দেবে।'

এবারে তিনি প্রকৃত স্নেহাবেগে মিনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এসো মা, এসো। এ তো তোমার বাড়ীঘর। সমস্তই তো তোমার চেনা।'

মিনাকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন, এ বাড়ীতে সে অনেকবার এসেছে।

তারপরে হঠাৎ সরোষে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওরে মাগী এমনি করেই ঠকাতে হয়!'

পর মুহূর্তে কণ্ঠস্বর কড়ি মধ্যম থেকে কোমল গান্ধারে নামিয়ে এনে (তেমন করে বিনা নোটিশে কণ্ঠস্বরের হের ফের করতে একমাত্র মেয়েরাই পারে) বল্‌লেন, 'তোমার মাকে বলিনি মা, বলেছি আমার বেয়ানকে।'

শান্তির সন্ধানে

ফাল্গুন মাসের শেষ তবু বেশ শীত আছে, কারণ একে তো সন্ধ্যা বেলা তার উপরে আবার স্থানটা গাড়োয়াল জেলার একটি গ্রাম। উনুনের ধারে বসে দুজনে গল্প করছিলাম, আমি আর একজন বাঙ্গালী সাধু। গাঁয়ের নাম ও সাধুর নাম দু-ই গোপনে থাকবে, কারণ এ গল্প নয় সত্য ঘটনা। এই মাত্র হাতে গড়া চাপাটি আর সবজি আহার শেষ হয়েছে—এখন আর গল্প করতে কোন বাধা নেই। কারণ কাজের মধ্যে এখন কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়া। ভোর বেলা উঠে দুজনে দুদিকে রওনা হয়ে যাবো, আমি হৃষীকেশের দিকে, সাধুজী দুর্গমতর পাহাড়ের অভিমুখে।

আমি বললাম, সাধুজী আমার প্রশ্নেব উত্তর তো পেলাম না '

তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন. আমাকে সাধুজি বলেন কেন? আমার গায়ে গেরুয়া নেই, পূর্বাশ্রমের নাম পরিত্যাগ করিনি, পা'য় জুতো, শিষ্য সামন্ত ও নেই দেখছেন, তবে সাধুত্ব দেখলেন কোথায়?

এখানে সবাই বলে তাই আমিও বললাম।

আরে এখানকার সরল পাহাড়ীদের কথা ছেড়ে দিন ওদের কাছে সকলেই সাধু। তা ছাড়া বছর কুড়ি ধরে আমাকে এখানে দেখছে—একই অবস্থায় দেখছে সাধু ছাডা আর কি ভাববে।

আমি বললাম বছর কুড়ি যদি এখানে কাটলো তবে কালকে কেন হঠাৎ এ স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবেন বলছেন।

একটা কারণ এখানে ডাকঘর হয়েছে।

সে তো ভালই।

সকলের পক্ষে নয়।

কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে মূল প্রশ্নটা এসে পড়বে বরঞ্চ তারই উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক। আপনার প্রশ্ন ছিল কুড়ি বছর নির্জন বাসের ফলে শান্তি পেয়েছি কি না—এই তো।

আজ্ঞে হ্যাঁ

তবে শুনুন, সাধু জনে যাকে শান্তি বলে তা পাইনি,তবে সংসারী লোকে যাকে অশান্তি বলে তার হাত থেকে বোধ করি উদ্ধার পেয়েছি।

আমি বললাম ব্যাপারটা মোটেই বোধগম্য হল না।

তবে খুলে বলি—একটু দীর্ঘ হবে, আশা করি ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না আপনার

এই বলে তিনি আরম্ভ করলেন।

বি-এ পাশ করে মীরাটে মিলিটারি এ্যাকাউন্টসে কাজ পেলাম, মাইনে দিয়ে বিচার করলে কাজটা ভালো বলতে হবে—গোড়াতেই পাঁচ-শ টাকা বেতন হল, অবশ্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পাশ করতে হয়েছিল।

আমি বললাম এ তো জীবনের চমৎকার সূচনা।

একটু অপেক্ষা করুন, তার পরে মন্তব্য করবেন।

বাইশ বছর বয়স, পাঁচ-শ টাকা মাইনে পাকা চাকুরি রাজ্যের যত মেয়ের বাপ, পরিচিত অপরিচিতের পরিচিত, পরিচিতেব অপরিচিত এক সঙ্গে আক্রমণ করলো। প্রথম পত্র যাগে তার পবে সুপারিশ যোগে তারপরে সশরীরে, ২।৪ জন উদ্যোগী পুরুষ বমাল সমেত উপস্থিত হলেন। এই গঙ্গা স্নান করতে এসেছিলাম ভাবলাম অমনি মেয়েটাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। চিঠির মধ্যে মেয়ের ছবি, সে ছবি ফেরৎ দেবার ডাক-মাশুল গুণতে হতো আমার। তার উপরে ছিল বাপ মায়ের আদেশ, বন্ধুদের অনুরোধ, প্রতিবেশীদের অনু-যোগ, কন্যার বান্ধবদের অনুনয়। বিয়েতে যে আমার অনিচ্ছা ছিল তা নয় – কিন্তু সব জিনিষেরই একটা যোগাযোগ, সময় অসময় আছে। আচমকা আক্রমণে মনটা বিগড়ে গেল। এই গেল অশান্তি নম্বর এক।

শুধালাম দ্বিতীয় নম্বর আছে নাকি।

সরাসরি আমার প্রশ্নেব উত্তর না দিয়ে তিনি বলে চললেন—জীবনবীমার দালালদের উপদ্রব শেষ পর্যন্ত প্রাণান্তকর হয়ে উঠল। যখন যেখানে সেখানে ভোর বেলা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত অন্তহীন শ্রেণী। জীবনবীমার উপকারিতা জীবজনবীমা না করবার অপকারিতা, এদেশের সঙ্গে বিদেশের জীবনবীমার তুলনামূলক আলোচনা শুনতে শুনতে কানেব পোকা মরে গেল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে অপরিচিত মুখ দেখলে আঁৎকে উঠি নিশ্চয় জীবনবীমার দালাল। মাঝে মাঝে স্বপন দেখে শিউরে উঠি।

আমি বললাম, এ রকম অবস্থায় তো অনেকেকই পড়তে হয়।

এখনো শেষ হয়নি, আগে শুনে নিন, তার পরে বিচার করবেন। বন্ধু-বান্ধব যখন দেখল না করলাম বিয়ে, না করলাম জীবনবীমা, তখন পাছে আমার টাকা ব্যাঙ্কে পচে তাই মাসের প্রথমে হাওলাত চাইতে সুরু করলো ঠিক এ সপ্তাহের মাথায় দিয়ে যাবো। যদি কুড়ি টাকা চায় আর দশ টাকা দিই মুখ ভার করে, একশ টাকা চাইলে পঁচিশ টাকা দিলে বলে এত কঞ্জুষ

হ'লে করে থেকে। কাউকে 'না' বললে গঞ্জনা দেয় তোমার খরচটা কিহে, তবু যদি বিয়ে করতে কিম্বা জীবন বীমা করতে তবু না হয় বুঝতাম। তারপর যে টাকা নেয় আর উপুড় হস্ত করে না, চাইলে রীতিমতো রাগ করে। শেষে আমার অবস্থা এমন হল যে ধার করে আমাকে সংসার খরচ করতে হয়, হিসাব করে দেখলাম মাসে আড়াইশ টাকা যায় ঋণ বাবদ। তার মানে আমার বেতন দাঁড়ালো আড়াইশো। আরও মজা দেখুন, পাছে ঋণ পেতে অসুবিধা হয় তাই সকলে বিবাহ করাব কত সঙ্কট, আর জীবন বীমা করায় কত অনটন আমাকে বোঝাতে লাগলো। আবার বছর শেষে বেতন বৃদ্ধি হলে ঋণের চাহিদাও বৃদ্ধি হতো। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা, জীবনবীমার দালাল ও অধমর্ণ-গণের তিনতলা চাপে যখন পিষ্ট হয়ে উঠেছে তখন আর এক বিপদ দেখা দিল—তাঁরা হলেন জমির দালাল। মীরাট শহরের মতো জল-হাওয়া যে আর কোথাও নেই, আর এমন সুলভে এমন দুর্লভ জমিও কোথাও পাওয়া যাবেনা, অতএব অচিরে আমার একটি বাড়ী করা অত্যা-বশ্যক, ইট চুন সুরকি সে-সব নামমাত্র মূল্যে যাতে পাই তার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন—মোদ্দা কথা জমিটা এখনই কিনে ফেলা উচিত।

সাধুজী বলে চলেছেন—চারদিকের আক্রমণে মনের যখন এই রকম উদভ্রান্ত অবস্থা, একদিন বিকালবেলায় নির্জনে মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ চোখে পড়লো গাছের তলায় এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। কি জানি কোন্ আকর্ষণে আমাকে টেনে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত করলো। সন্ন্যাসীর চেহারা দেখে ভক্তির উদয় হল, তার প্রধান কারণ খুব সম্ভব তিনি আমার আক্রমণকারী চার শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। তাঁকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। সন্ন্যাসী নীরব, অতএব আমাকেই সরব হ'তে হ'ল, আমার দুঃখের কথা তাঁকে নিবেদন করলাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে সমস্ত শুনলেন তবে কোন কথা বললেন না, শুধু আঙ্গুল দিয়ে উত্তর দিকটা নির্দেশ করলেন। কিছুই বুঝতে পারলাম না, এদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে বাড়ী ফিরে এলাম। সাধুর ইঙ্গিতের অর্থ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম সেই সন্ন্যাসী হিমালয় পর্বতের দিকে চলেছেন, আমাকে দেখতে পেয়ে আবার ইঙ্গিতে হিমালয় পর্বতটা দেখিয়ে দিলেন। তখন তাঁর উত্তরাস্ত ইঙ্গিতের অর্থ বোধগম্য হল—হিমালয় তো উত্তর দিকেই বটে। আর হিমালয়ের মতো এমন শান্তির আধার আর কোথায়! রাতেই স্থির করলাম সংসার

ত্যাগ করে হিমালয়ের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করবো।

সাধুজী বলে চলেছেন, আমি কম্বল গায়ে টেনে নিয়ে শুয়ে আছি, মাঝে মাঝে ক্ষুধার্ত হায়নার উৎকট-রব শোনা যাচ্ছে, আর তার প্রত্যুত্তরে গ্রাম্য কুকুরের সাবধানী তারস্বর।

ভোরবেলা উঠে দেখি ঘরে চারজন ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, তার কন্যাটি ডানাকাটা পরী, একজন অধমর্ণ, একশ টাকা তার এখনই চাই, সাত দিনের মাথায় অবশ্যই দিয়ে যাবে, তৃতীয় ব্যক্তি জীবনবীমার দালাল, দশ হাজার টাকার বীমা করলে তার কোম্পানী সুদে আসলে বিশ হাজার টাকা ফেরৎ দেবে। আর চতুর্থ ব্যক্তি জমির দালাল, নামমাত্র মূল্যে একখণ্ড জমি আমাকে দেবে, চুন-সুরকি ইট কাঠের জন্য আমার চিন্তা করতে হবে না। এ-সব আক্রমণে আমি অভ্যস্ত, কিন্তু একসঙ্গে চতুরঙ্গ বাহিনীর সম্মুখস্থ আগে হতে হয়নি। তখনই যথার্থভাবে সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'ল।

আপনারা বসুন আমি আসছি বলে বেরিয়ে অফিসে চলে এলাম, অফিসের কাছেই আমার বাড়ী। সেখানে এসে নিঃশর্তভাবে পদত্যাগ লিখে দাখিল করে দিয়ে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে এই গ্রামটিতে এসে আস্তানা গাড়লাম—সে আজ ত্রিশ বছরের কথা। এখানে বেড়ানো উপলক্ষ্য করে আগে দুই-তিনবার এসেছি, কাজেই একরকম চেনা জায়গা। তখন সামান্য গ্রাম ছিল, এখন ডাকঘর, তারঘর, সরকারী ডাক্তার থানা ও বি-ডি-ও'র কৃপায় আধা সহরে পরিণত হয়েছে। এই হ'ল সংক্ষেপে আমার তথাকথিত সন্ন্যাসের কাহিনী। এবার আপনার মূল প্রশ্নের উত্তর দি,—না, আমি শান্তি পাইনি, তবে অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি বলে মনে হয়েছিল।

আমি শুধালাম মনে হয়েছিল কেন বলছেন?

অবশ্যই কারণ আছে।

কি কারণ জানতে পারি কি?

এ জায়গাটা কেদার বদরীর পথের ধারে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার তীর্থ যাত্রী এখান দিয়ে যাতায়াত করে। তার মধ্যে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কেমন করে রটে গেল যে, এখানে এক বাঙ্গালী সাধুবাবা আছেন, তারপর থেকেই সুরু হয়ে গেল আক্রমণ। প্রণাম, পদধূলি গ্রহণ,

পাদ্য অর্ঘ্য দান। আমি যত বলি বাপু হে আমি সাধু সন্ন্যাসী নই, তাদের বিশ্বাস তত দৃঢ়তর হয়। শেষ পর্যন্ত ঠিকুজি-কুষ্ঠি আসতে সুরু করলো, হাত দেখানো আরম্ভ হল—আরম্ভ হ'ল জড়িবাটি প্রার্থনা। ইতিমধ্যে ডাকঘর খুলেছে, নিত্য ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠিপত্র, রোগের ওষুধ, গ্রহশান্তির আবেদন। শেষে অসহ্য হয়ে উঠল। তাই স্থির করেছি স্থান পরিবর্তন করবো।

কোথায় যাবেন?

কয়েক মাইল দূরে একটা নির্জন স্থানে গুহা আবিষ্কার করেছি, তীর্থযাত্রীর পথ থেকে দূরে, দেখি সেখানে কি এই নূতন অশান্তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কিনা। কাল সকালেই থলি ঝুলি নিয়ে রওনা হব।

হাত দেখা কুষ্ঠি দেখা জানেন নাকি?

সামান্য সে এমন কিছু নয়।

শুনবা মাত্র চট করে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, একবার দেখুন না, আমার সময়টা বড় খারপ চলছে।

এই অন্ধকারে।

আমি বললাম, তবে কাল সকালে হবে। তারপর দু'জনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা উঠে দেখি থলি-ঝুলি নিয়ে সাধু কখন প্রস্থান করেছে।

ভাবলাম এমনি করে কিনা শেষে ঠকিয়ে গেল! এমন প্রবঞ্চক কখনো শান্তি পায়!

স্থানান্তরে যাক আর গুহার মধ্যে যাক ওর ভাগ্যে কখনো শান্তি নেই। অগত্যা আমি হৃষীকেশের দিকে রওনা হলাম।

অর্থমনর্থম্

কলকাতার কাছেই মফস্বলের একটি হাসপাতালে তারা আশ্রয় নিয়েছিল—তারা মানে স্বামী-স্ত্রী দুইজন। ডাক্তারবাবু সদাশয় ব্যক্তি। হাসপাতালের হাতার মধ্যে একটি ছোট্ট ঘরে তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। এ অবশ্য দয়ার কাজ কিন্তু সেই সঙ্গে একটু হিসাবও ছিল, তিনি মনে মনে বিচার করে দেখলেন এই অসহায় লোক দুটিকে দিয়ে অনেক কাজ পাওয়া যাবে। হাসপাতালের চৌহদ্দি পরিষ্কার করার জন্যে যে টাকাটা তাঁর হাতে আসে

সেটা ওদের নামে খরচ লিখে নিজে নিতে পারবেন। এটাকে তিনি অন্যায় মনে করলেন না, কেননা ওরা বিনা ভাড়ায় থাকবার সুযোগ পাচ্ছে, তারপর যদি অসুখ-বিসুখ হয়, চিকিৎসাটা তাঁকে বিনা পয়সায় করতে হবে। এ হেন অবস্থায় তাদের প্রাপ্য টাকা আত্মসাৎ করা একরকম তাদের অনুকূলে জীবনবীমা করা ছাড়া আর কি। যাই হোক, লোক দুটি এত ভিতরের কথা জানতে পেল না, আশ্রয়দাতাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করল।

তাদের কাজ খুব লঘু, ঝাঁটা দিয়ে হাসপাতালের চৌহদ্দি পরিষ্কার, হাসপাতালের সামনের সরকারী সড়কটায় জল ছিটিয়ে দেওয়া—একে আর গুরুতর কাজ বলা চলে না। অবশ্য তাঁর বাসাবড়ির ভিতর বাহিরের সব কাজ, যেমন, বাজার করা, আঙিনা ঝাঁট দেওয়া, দুবেলা ঘর মোছা, উনুন ধরানো, জল বয়ে আনা প্রভৃতি কাজকেও গুরুতর বলা উচিত নয়। কয়লার খনিতে বা কারখানায় গেলে এর চেয়ে অনেক বেশী খাটতে হত। নিন্দুকে ভাবতে পারে যে সরকারী তহবিল থেকে যাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে (অন্ততঃ খাতায় সেইরকম লেখা হচ্ছে) তাদের দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করিয়ে নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এখানেও আবার চিন্তায় ভুল। ডাক্তারবাবু একটি ব্যক্তি হলেও ব্যক্তিগত তাঁর এখানে কিছুই নেই। তিনি সপরিবারে এই হাসপাতালেরই তো অঙ্গ। রুগীদের সুচিকিৎসার জন্যই তাঁর সুস্থ, প্রফুল্ল ও চিন্তিত থাকা আবশ্যক। ডাক্তারবাবু একা অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কোনরকমে তাঁর মনটা বিগড়ে গেলে বা তাঁর কোনদিন বাজার না হলে, সে ক্ষতির দায় যাবতীয় রুগীকে বহন করতে হয় ; আর ঐ লোক দুটি এমন বেয়াড়া স্বভাব যে কোন খাটুনিতে আপত্তি নেই, মাসান্তে বা সপ্তাহান্তে, বেতনের তাগিদ দেওয়া অভ্যেস নেই, আর বাজারের টাকা থেকে তারা যে একপয়সাও চুরি করে না, ডাক্তারবাবু নানান পরীক্ষা করে তা বুঝে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কাজেই আগন্তুক লোক দুটির সহায়তায় হাসপাতালের সব রকম কাজ স্বচ্ছন্দে হতে লাগল।

ডাক্তারবাবুটির পরিচয় দেওয়া হল। এখনও পরিচয় দেওয়া হয়নি লোক দুটির। পরিচয় দিতে আপত্তি নেই, তবে মুশকিল এই যে পরিচয়যোগ্য কি-ই বা আছে তাদের। হাজার হাজার লোক সীমান্তের ওপার থেকে নিত্য আসছে, কেন আসছে, কেউ নিশ্চয় করে জানে না-জানলেও কেউ মুখ খুলতে রাজী নয়। কিংবা যখন মুখ খোলে, তখন একজনের উক্তির সঙ্গে আরেক-

জনের উক্তি মেলে না। ফলে লোকের মনে মূল কারণ সম্বন্ধে ধারণা জটিলতর হয়ে ওঠে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে বলেন টাকা পাঠাও, কেন্দ্র বলেন পাঠাচ্ছি। টাকা আসে কি আসে না জানা যায় না, তবে যা নিশ্চয় করে জানা যায় তা হচ্ছে উদ্বাস্তুদের ভোগে কিছু লাগে না, তাদের অবস্থা যেমন তেমনিই থাকে।

যে দলটির সঙ্গে ওরা দুইজনে এসেছিল নদী পার হয়ে, এদেশে পদার্পণ করতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বাবুরা এসে তাদের কাছ থেকে বিবৃতি আদায় করল। উদ্বাস্তুরা প্রথম প্রথম ভাবত দুঃখের কথা শুনে বাবুরা বুঝি টাকা-পয়সা দেবে। শেষে দেখল টাকা পয়সার নাম-গন্ধ নেই, বিবৃতি লিখে নিয়ে আর ছবি তুলে নিয়ে বাবুরা আনন্দে ফিরে চলে যায়। আব সকলে যখন মূঢ়ের মত বসে আছে তখন ওরা দুজনে একটেরে বসে পরামর্শ শুরু করল। পুরুষটি বলল, রাধুর মা, বাবুদের মতিগতি ভাল নয়, ওদের কাছে কিছু প্রত্যাশা নেই। নিজের পথ নিজেদের দেখতে হবে।

স্ত্রীলোকটি বলল, রাধুর বাপ, তোমার কথা শুনেই পথ দেখতে দেখতে এতদূর এলাম। আরও পথ দেখতে হবে।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক, এই দম্পতির রাধু বা রাধা নামে কোন সন্তান ছিল না, তাদের অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি গরু, তাকেই ওরা রাধা বলে ডাকত, সেই সুবাদে ওরা রাধুর বাপ ও মা।

পুরুষটি বলল, তা পথ আর একটু দেখতে হবে বৈকি। আগে চল এই ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়ি।

ছোট একটি পুঁটলি নিয়ে—এই তাদের সর্বস্ব—তারা চলতে আরম্ভ করল এবং বিকেলের দিকে পূর্বোক্ত মফস্বলের হাসপাতালের হাতার মধ্যে প্রবেশ করল। ডাক্তারবাবু তখন বিকেলবেলায় হাসপাতালের ফুল ও সবজির বাগানে ঘুরতে ঘুরতে ভাবছিলেন 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'। শুকিয়ে যাওয়া গাছগুলির পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নি, কারণ আজ মাস তিনেকের মধ্যে একফোঁটা জল পড়েনি তাদের গোড়ায়। এ কাজের জন্যে যে লোকটি ছিল, ছ'মাস বেতন না পেয়ে সরে পড়েছিল, এ কাজটাও তার পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নি, কারণ তার গোড়াতেও ছ'মাসের মধ্যেও একফোঁটা জল পড়েনি। ডাক্তারবাবু ওই খাতের টাকা দিয়ে বাজার থেকে তরি-তরকারি কিনে খেতেন। মনিবকে বোঝাতেন টাকা খরচ করে বাগানে তরি-তরকারি তৈরী করে

খাওয়া আর সেই টাকায় বাজার থেকে কিনে খাওয়া—এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কতটুকু? কাজেই গাছগুলো যে শুকিয়ে গিয়েছে তাতে ডাক্তারবাবু বা সেই গাছগুলোর কোন ক্ষতি হয়েছে মনে করা চলে না।

এমন সময়ে এই দুটি জীর্ণ আগন্তুককে প্রবেশ করতে দেখে ডাক্তারের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল, কার্য-কারণের অনেকগুলি ধাপ একলম্ফে পার হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে এবারে বাগান তদ্বির করার লোক জুটে গেল। একেই বলে ঋষির দৃষ্টি, আর নামটাও কিনা ঋষিচরণ সাহা।

ডাক্তারবাবু তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা বুঝি ওপার থেকে আসছ? আমিও ওপারের লোক। তাঁর উক্তির শেষাংশ অতিশয় দুরাপোহত সত্য, কেননা পাঁচ-ছয় পুরুষ আগে তাঁরা সত্যই পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন।

লোকদুটি অবশেষে একজন সহৃদয় দেশের লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে ভেঙে গিয়ে বসে পড়ল। এতক্ষণ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের খাড়া রেখেছে।

লোকটি বললে, রাধুর মা, দেখ্ রে দেখ্, দেশের লোক দেখ্। এবার বুঝি আশ্রয় মিলল।

ভাবাবেগে রাধুর মা-র মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না, সে দুইহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

ডাক্তারবাবু বললেন, আজ তোমরা ওই ঘরটায় থাকো, আমি এবেলার মত সিধে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপরে কালকে সব কথাবার্তা হবে।

রাধুর মা যখন হাত তুলে কপালে ঠেকাচ্ছিল, ডাক্তারবাবুও তখন অদৃশ্যভাবে সেই কাজটি করেছিলেন। তিনি ভাবলেন ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন তাই দুটি অসহায় নিরাশ্রয় উদ্বাস্তুকে আমার হাতে এনে সমর্পণ করলেন। উদ্বাস্তুকে রক্ষা করা উদ্বাস্তু হিসাবে তাঁর কর্তব্য। তাঁর মনে হল কোথায় যেন পড়েছেন উদ্বাস্তুকে উদ্বাস্তুতে না রাখিলে কে রাখিবে। পরদিন তারা কাজে বহাল হয়ে গেল। বেতনাদির মত অবান্তর বিষয় নিয়ে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তর হল না।

দুই

এমন পরিশ্রমী, মিতবাক্, সংস্বভাব লোক কদাচিৎ দেখা যায়। রাধুর মা ডাক্তারবাবুর বাড়ির ভিতরে গিয়ে কাজ করে, কাজেই মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। একদিন ডাক্তারবাবু স্ত্রী তার হাতে খানকতক পিঠে

দিলেন। রাতের বেলা স্বামীর সম্মুখে সেগুলো ধরে দিতেই শুনতে পেল—এগুলো কোথায় পেলে ?

রাধুর মা বললে, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী দিয়েছেন।

দেখ রে দেখ, দেশের লোকের যত্ন-আত্তি আলাদা।

গাঁয়ে থাকতে রাধুর মা পিঠে করছে সেই কথা আজ মনে পড়ে গিয়ে পিঠের রসের সঙ্গে চোখের জল মিশল।

ডাক্তারবাবুর সাজানো বাগান সতেজ হয়ে উঠল। ফুল ফল ও ডাক্তারবাবুর মুখের হাসি আর ধরে না। আবার নানাসূত্রে বাজারের দর যাচাই করে তিনি বুঝেছেন যে এরা এক পয়সাও চুরি করে না। ফিরে যে পয়সা বাঁচে ডাক্তার-বাবুর কাছে ধরে দিয়ে বলে যে বাবু হিসেব করে নেন্। আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ ওসব বুঝি না।

ডাক্তারবাবু বলেন, তোমাদের মত মুখ্যু সুখ্যু মানুষেরই এখন দরকার। চুরি, তঞ্চকতা, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনায় দেশ ভরে গেল।

এতগুলি অপরাধের নাম একসঙ্গে শুনে ভীত হয়ে উঠে রাধুর বাপ বললে। না বাবু, আমাদের কাছে ওসব পাবেন না।

এ কথা ডাক্তারবাবুর চেয়ে বেশী আর কে জানে।

মাসান্তে যখন বেতনের কথা ওরা তুলল না, ডাক্তাবাবু ভাবলেন এখনই ফাঁড়া কাটেনি। আগে আরও দুতিন মাস যাক।

দু তিন মাস করে ছ'মাস গেল, ওরা বেতন চাইল না। আশ্রয় পেয়েছে, খেতে পায় —এই কি যথেষ্ট নয় ? অন্য উদ্বাস্তুদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের তারা সৌভাগ্যবান মনে করে। এমন সময় এক ঘটনা ঘটল, যার ফল সুদূর-প্রসারী হয়ে দেখা দিল।

তিন

একদিন বিকেলবেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে রাধুর বাপ তামাক খাচ্ছে আর রাধুর মা দেশে ফেলে আসা সুপুরিগাছ গুলি সম্বন্ধে সরবে আত্মচিন্তা করছে। পাঁচ পাঁচটা সুপুরি গাছ সারা বছর আমার সুপুরি কিনতে হয় না, তাছাড়া পাড়া-পড়শীকে কত বিলোই। এতদিনে সুপুরিগুলো বেশ পেকে উঠেছে। লাল রঙ দেখে কাকে এসে ঠোকর মারছে, তা কাকের ঠোকরে সুপুরির কি হবে এ তো আম কাঁঠাল নয়। এবারে আবার পাঁচের বছর, পাঁচ পাঁচ বছর পরে পরে ফসল বেশী হয়। আসবার সময় নৈমুদ্দিনকে বলে এলাম—

বাছা দেখিস তুই খাস, আর যা বেশী থাকে বেচে পয়সা রেখে দিস। যখন ফিরব চেয়ে নেব।

শেষের কথাগুলো রাধুর বাপের কানে গেল। সে বলল তবেই হয়েছে, ফিরে যাবে আবার চেয়ে নেবে। বলি এমন জায়গা ছেড়ে ফিরবে কেন? এমন দয়ালু ডাক্তারবাবুর আশ্রয় ছেড়ে ফিরবার কথা মনে ভাবাও পাপ।

বুড়ি ডাক্তারবাবুর সমর্থনে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় পাঁচ-সাত জন ছোকরা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, বুড়ো, শুনলাম তোমার টিকিট উঠেছে, তুমি অনেক টাকা পাবে। এখন বাড়ি-ঘর করে বসতে পায়, এখানে আর থাকতে হবে না।

বুড়ো প্রথমটা তাদের কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারল না। তিন-চার বার শোনবার পরেও ব্যাখ্যার দরকার হল। ব্যাখ্যাটা বুড়োর এবং পাঠকদের দু-দলের পক্ষেই আবশ্যক।

মাস দুই আগে কোন একটা সৎকাজের জন্য লটারির টিকিট বিক্রী হচ্ছিল। তখন এই ছেলেরা এ'ই চার আনা পয়সা আদায় করে নিয়ে বুড়োকে একখানা টিকিট গছিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল, ভাল করে তুলে রেখো, তোমার টিকিট উঠলে নগদ বত্রিশ হাজার টাকা পাবে। বলা বাহুল্য, এসব কথার গুরুত্ব সে বুঝতে পারে নি, কুলুঙ্গির মধ্যে একটুকরো ঝামা ইট চাপা দিয়ে কাগজখানা রেখে দিয়েছিল।

ছেলেরা শুধলো কাগজখানা আছে তো, কোথায় আছে বের করে আনো দেখি।

তাদের উৎসাহের আতিশয্যে এবং ঘন ঘন তাগিদের ফলে বুড়োকে উঠতে হল এবং কিছুক্ষণ পরে সেই কাগজের টুকরোখানা এনে একজন ছেলের হাতে দিয়ে বলল—নাও বাপু এই তোমাদের কাগজ।

যেন সে একটা মস্ত বড় দায় থেকে অব্যাহতি পেল। ছেলেরা পুরস্কার-প্রাপ্তির তালিকার সঙ্গে বুড়োর টিকিটের নম্বর মিলিয়ে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, মিলেছে মিলেছে! একজন বলল, ভগবান সত্যিই আছেন, নইলে এমন গরীবকে টাকা পাইয়ে দেবেন কেন?

তার কথার প্রতিবাদে আর একজন বলল, ভগবান না ছাই, ওটা Law of Probability। আর একজন বলে উঠল, বুড়ো, এইবার এ গাঁয়েই বাড়ি-ঘর করে বসে যাও। অন্য একজনের ভাবাবেগ বাংলা ভাষার পক্ষে দুঃসহ

-হওয়ায় ইংরেজিতে বলে উঠল, Now he is a rich man.

বুড়ো-বুড়ি তাদের উল্লাসের কারণ কিছু বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল। তখন আবার আরম্ভ হল আর একপালা ব্যাখ্যার বহর। অনেক কষ্টে দীর্ঘকালের অধ্যাবসায়ে বুড়ো ব্যাপারটা বুঝল, বুড়ি তখনও অথৈ জলে।

তখন বুড়ো বলল, যাই, ডাক্তারবাবুকে একবার বিষয়টা বলি। ছেলেদের একজন বলল, হ্যাঁ, সেই কথা ভালো। তিনি সঙ্গে করে সদরে নিয়ে গিয়ে টাকাটা তোমাকে পাইয়ে দেবেন। ছেলেরা চলে গেলে তারা দুজনে ডাক্তার বাবুর অফিসে গিয়ে প্রবেশ করল।

অসময়ে তাদের আসতে দেখে ডাক্তারবাবু শুধোলেন, কী ব্যাপার, হঠাৎ – বুড়ো বলল, কী জানি বাবু ছেলেরা একটা কাগজ বেচে গিয়েছিল, এখন বলছে নাকি অনেক টাকা পেয়েছি। যা করতে হয় করো।

ডাক্তারবাবুর তখন মনে পড়ল যে সকালের দিকে শুনেছিলেন যে 'For the Public' বলে যে লটারী হয়েছিল তার প্রথম পুরস্কার নাকি এই শহরের কোন লোক পেয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে তিনি যে দশখানি টিকিট কিনেছিলেন মিলিয়ে দেখলেন তার কোনটাই নয়। তারপরে ব্যাপারটা সম্পূর্ণই ভুলে গিয়েছিলেন! নিজে যখন পান নি তখন বিশ্বজগতে আর যে কেউ পেতে পারে এ তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। এমন সময় এ সংবাদ। পুরস্কার-প্রাপ্তির তালিকা তাঁর হাতেই ছিল, তিনি মিলিয়ে দেখলেন বুড়োর কথাই ঠিক। একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে দিয়ে মনে মনে বললেন, হায় বিধি, পাকা আম দাঁড়কাকে খায়। বললেন, বোসো তোমরা, অনেক কথা আছে।

বুড়ো-বুড়ি দুজনেই চোখে কম দেখে, তাছাড়া তাদের চোখের অভিজ্ঞতাও বেশী নয়। তখন কোন সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক সেখানে থাকলে ডাক্তারবাবুর মুখের মাংসপেশীতে যে মুহুর্মুহু পরিবর্তন হচ্ছিল তা লক্ষ্য করে এমন জ্ঞান লাভ করতে পারত যার অনুরূপ কোন ভাষা কোন মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে নেই। চোখের সামনেই উপস্থিত এমন একটি লোক যে ব্যক্তি এই টাকা পাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। টাকার মূল্য সে কি বোঝে? এ টাকাটা বিশেষভাবে তাঁরই প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিল। নাঃ, জগতে বিধাতাও নাই, বিচারও নাই, সদাচারও নাই। আছে কেবল নগদ বত্রিশ হাজার টাকা। কী করবে ওরা এই টাকা নিয়ে? ওদের তো বেশ সুখে রেখেছি, এর চেয়ে বেশী সুখ পাওয়ার

কী অধিকার তাদের আছে ? অথচ এই টাকাটা হলে কলকাতায় ছোটখাটো একটা বাড়ি তিনি কিনতে পারেন। দু চার জনের কাছে সন্ধানও নিয়েছেন। আর শেষে কিনা এই চালচুলোহীনদের ভাগ্যেই জুটে গেল টাকাটা ! তখনই মনে হল, আচ্ছা, একটু পলিটিকস করলে কেমন হয় ? মিথ্যা কথা বা তঞ্চকতা আমাকে দিয়ে হবে না, তবে পলিটিকস করতে আপত্তি কি ? তখন তিনি কণ্ঠস্বরে ভয়াবহ গাম্ভীর্য এনে বুড়োকে বললেন, টাকা তো পেলে, সামলাতে পারবে কি ? এই বলে হঠাৎ টাকা পাওয়া যে কত নিদারুণ শোকাবহ ভয়াবহ, মারাত্মক সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা, বোঝাতে আরম্ভ করলেন।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, দেখো আমাদের গাঁয়ের জমিদার বাবুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে ফতুর হয়ে গেল। আর দুর্লভ ফকির এখনো দিব্যি বেঁচে আছে।

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে বুড়ো বলল, বাবু আপনার কথা ঠিক। আমাদের গাঁয়ের পরাণ মণ্ডল হলদি বেচে আড়াইশো টাকা পেয়েছিল, একটা রাত কাটল না, ভোরে দেখা গেল কে তাকে কেটে রেখে গিয়েছে।

বুড়ি বলে উঠল, আরে তাকে তো সাপে কেটেছিল।

ঐ একই কথা হল। মানুষ কাটলেও কাটা, সাপে কাটলেও কাটা, মোট কথা মরেছিল তো।

ডাক্তারবাবু বললেন, তবেই দেখো পয়সার কি ঝামেলা। এত ঝামেলা কি বুড়ো বয়সে তোমরা সামলাতে পারবে ?

তারপর ডাক্তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে বলে চললেন, তোমাদের কথা তোমরা ভাববে। আমি তো পারিনে। কতবার গিন্নীকে বলি, গিন্নী আর কেন, কার জন্যে এত খাটুনি, ছেলে নেই পুলে নেই, চল দু'জনে হিমালয়ে চলে যাই। তা গিন্নীর ভাবগতিক দেখে মনে হয় নিমরাজী হয়েছে।

তিনি বলে চলেছেন, আর টাকার শত্রু কি শুধু চোর-ডাকাত ? হায়, সংসারের টাকার উপরে, কার লোভ নয় ? ভীমরুলের মত লোক জুটে যাবে। পাড়ার ছেলেরা বলবে চাঁদা দাও, রাজনীতিবাবুরা বলবে চাঁদা দাও, কোন্ কোন্ মুল্লুকে খরা হল কি না হল সরকার বলবে চাঁদা দাও, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পরিচিত-অপরিচিত অতিথি মেহমান ভিখারী ঠেঙাড়ে সবারই মুখে দেহি দেহি, দাও দাও। দিলেও জ্বালা, না দিলেও জ্বালা। দিলে বলবে

আরও দিতে পারত। না দিলে বলবে শালা হারামজাদা। কি বুড়ো, পারবে ঠেলা সামলাতে? বুড়ির দিকে তাকিয়ে বুড়ো শুধালো, কি, পারবে?

না বাবু, ও ঝক্কি আমি পোয়াতে পারব না, ও বালাই কেন যে এসে জুটল। দাও, দাও, বিদায় করে দাও।

তার কথা শুনে ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তার পায়ের কাছে প্রণাম করে বললেন, দাও মা তোমার পায়ের ধুলো দাও, তুমি শাপভ্রষ্ট যোগিনী।

হাঁ হাঁ, কি করেন, কি করেন!

আর কি করেন, ডাক্তারবাবু ততক্ষণে বুড়ির পায়ে খামছা মেরেছেন। ধুলো জুটুক আর না জুটুক।

তখন বুড়ো বলল, একটা পরামর্শ দিন ডাক্তারবাবু, টাকাটার কি গতি করা যায়।

বাবা, গতি তো হয়েই আছে। সৎকার্যে দান করো। এই যেহাসপাতালে তোমরা আশ্রয় পেয়েছ, এখানেই দান করে ফেলো। না, না, তোমাদের কোন হাঙ্গামা করতে হবে না। কেবল এই কাগজখানায় আমি লিখছি যে লটারির সব টাকা এই হাসপাতালে দান করলে, তোমাদের শুধু সই করলেই হবে।

লিখতে তো জানিনে বাবা।

টিপ-সই করলেই চলবে।

তখন ডাক্তারবাবু ক্ষিপ্রহস্তে টিকিটের পৃষ্ঠে দানপত্র লিখে ফেলে বুড়োর টিপ-সই নিলেন।

প্রকাণ্ড এক ঝামেলা মিটে গেলো দেখে বুড়ো-বুড়ি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ডাক্তারবাবু ও ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে করতে আস্তানার দিকে প্রস্থান করল।

দিন দুই পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু সপরিবারে শহর ত্যাগ করে চলে গেলেন, বোধকরি হিমালয়ের দিকেই। যে দিকেই তাঁরা যান না কেন, অর্থাভাবে তাঁদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। নিরক্ষর দম্পতিকে দিয়ে লটারির টাকাটা তিনি নিজ-নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

মারাত্মক হাসি

অবশেষে পরিতোষ মারা গেল, প্রাণপণ চেষ্টা ও যথাসাধ্য চিকিৎসাতেও তাকে বাঁচাতে পারা গেল না। প্রথমে ঘরোয়া চিকিৎসা, তারপরে First Aid Box-এর সাহায্য গ্রহণ, পাড়াপড়শীর পরামর্শ, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, ভূতের ওঝা, বদ্যি-হাকিম এবং সর্বশেষে পাশ করা বিজ্ঞ ডাক্তার—কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয়নি, তবু সে রক্ষা পেল না। রোগটা কী জিজ্ঞাসা করলে আমরা নাচার, কেননা পূর্বোক্ত মহাশয়গণ যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তির বাক্য প্রয়োগ অমার্জনীয়। তবে রোগ কী বলতে না পারলেও রোগের লক্ষণ বলতে বাধা নেই আর সে লক্ষণও নাকি একটি মাত্র। পরিতোষের হাসি আর থামে না। কখন কি ভাবে এই হাসির উৎপত্তি হল কেউ লক্ষ্য করেনি। গঙ্গার মত মহানদী যেখানে হিমবাহ থেকে বিন্দু বিন্দু নিঃসৃত হচ্ছে কয়জনে তা লক্ষ্য করে থাকে। প্রথমে হাসিটা অন্তঃসলীলা ছিল, নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে তার পেট ফুলে উঠছিল তারপব সে হাসির ছটা চোখে দেখা দিল। আরও পরে ওষ্ঠাধরের কম্পন ও খুক্ খুক্ খিক্ খিক্ শব্দ তখনও কেউ লক্ষ্য করেনি। সকলেই তাস খেলায় মত্ত ছিল। অবশেষে সে হাসি যখন সোচ্চার হয়ে উঠল তখন সবাই শুধাল কি হল হে পরিতোষ?

কিন্তু উত্তর দেয় পরিতোষের সাধ্য কি। ধাপে ধাপে তাব হাসির শুভ্র সোপানাবলী ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগল, অবশেষে যখন সে প্রশস্ত ফরাসের উপর হেসে গড়াতে শুরু করল তখন সকলে হাতের তাস ফেলে দিয়ে তার দিকে মন দিতে বাধ্য হল।

একজন বলল, এ যে সীবিয়াস হল দেখছি।

আর একজন বলল, হিস্টিরিয়া।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, ওর তো কখনও হিস্টিরিয়া ছিল না, নিশ্চয় মৃগী।

দূর! মৃগ কি কখনো হাসে, বাণ খেলে বড জোর আর্তনাদ করে। ওসব কিছুই নয়, ওর ঘাড়ে ভূত ভর করেছে।

ভূত-তত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো না, ভূত কখনও হাসে না, নাকিসুরে কথা বলে।

রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে যখন তাদের মধ্যে পর্যালোচনা হচ্ছে ততক্ষণে পরিতোষের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠে জল গড়াচ্ছে, চুলের পারিপাট্য নষ্ট হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। সে প্রবলবেগে দুই হাত-পা ছুড়ছে আর হা-হা-হি-হি-হু-হু

যাবতীয় স্বরবর্ণ প্রয়োগে ক্রমে উচ্চস্বরে হেসে চলেছে। তখন বন্ধুদের একজন বলল আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয় ডাক্তার ডাক।

ডাক্তারের কম্মো নয়, ভূতের ওঝা কোথাও আছে কি না খোঁজ কর।

তখন আগে যে সব চিকিৎসা পন্থার উল্লেখ করেছি একে একে তাদের প্রয়োগ চলতে আরম্ভ করল হতভাগ্য পরিতোষের উপরে। যতক্ষণ চিকিৎসা চলছে আমরা গোড়ার কথাটা সেরে নিই।

॥ দুই ॥

বাড়িটার নাম নিত্যধাম। বাড়িওয়াল নাম নিত্যসুন্দর দাস। কাজেই বাড়ির নাম নিত্যধাম না হয়ে যায় না। ভক্ত বৈষ্ণবগণ যাকে নিত্যধাম বলে থাকেন তার স্বরূপ প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত নই, তবে বর্তমান নিত্যধামের নিত্য লক্ষণ একটি তাসের আড্ডা। নিত্যবাবু সদাশয় লোক, নীচের তলায় একটি প্রশস্ত ঘর ফরাস তাকিয়া দিয়ে সাজিয়ে উপরির মধ্যে একজন ভৃত্যকে নিযুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছেন তাসের আড্ডার জন্যে। সারাদিন ঘরটি বন্ধ থাকে শীতকালে সন্ধ্যা ছ'টায়, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা সাতটায় রামচরণ ঘরটি খুলে ঝাড়পোঁছ করে বাবুদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাসাড়ুগণ কেউ নগণ্য ব্যক্তি নন, যারা প্রাইভেট সেকটারে কাজ করেন তাদের সকলেরই উচ্চপদ ও উচ্চতর বেতন, আর পাবলিক সেকটর বিহারীগণের কেউ জয়েণ্ট সেক্রেটারী বা ডেপুটি সেক্রেটারীর অধস্থিত নন, ওর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম পরিতোষ রায়। সে ব্যতিক্রম হলেও তাকে অতিক্রম করে ঘরে প্রবেশ কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

সে পরিতোষ মন্ত্রীদের পি. এ. বা পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। এটা কোন স্থায়ী পদ নয় তবে আবার অস্থায়ী পদও নয়, কেননা পর্য্যায়ক্রমে মুসলিম লীগের আমল থেকে সে কোন না কোন মন্ত্রীর পি·এ· রূপে বিরাজমান আছে। এই অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে এদেশে ও বিদেশে কত বিরাট পরিবর্তন হতে হতে সূর্য অনস্তগামী পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শেষ চন্দ্রকলায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু পরিতোষ রায়ের পদে না হয়েছে লোভ, না হয়েছে উন্নতি। রাজনীতি অভেদে পরিতোষ সকল মন্ত্রীসভার অপরিহার্য পি. এ.।

এখন সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে চাকুরির বাজারে নৈকষ্য কুলীন না হলেও তার সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হতে সকলেই গৌরব বোধ করে। সকলেই পরস্পরের মধ্যে বলে, আর যাই কর ওকে ঘাঁটিও না, ফিস্‌ফিস্‌ করে কি জানি কি

বলে মন্ত্রীদের কান ভারী করে দেবে। আর একজন বলে, কথাটা মিথ্যে নয় ও জানে সব মন্ত্রীদের হাঁড়ির খবর। তৃতীয় ব্যক্তি কাছাকাছি কেউ না থাকা সত্বেও স্বভাবসিদ্ধ শঙ্কায় গলা খাটো করে বলে শুধু কি হাঁড়ির খবর, ওই সঙ্গে ধরে নাও বাড়ির খবর ও গাড়ির খবর। কোন্ মন্ত্রী বাড়ীতে গিন্নীর কাছে দাবড়ানি খাচ্ছে, আবার কোন্ মন্ত্রী এস্প্ল্যানেডের মোড় থেকে লেডি টাইপিস্টকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ডায়মণ্ড হারবার রোড বরাবর ছুটছে ও কোন্ খবরটা না রাখে বল দিকি।

ও একটি পুত্তলিকা—চোখ, কান, নাক, মুখ সবই আছে অথচ কোন কিছু ব্যবহার করছে না। কিন্তু পুত্তলিকা যদি কোনদিন এসব ব্যবহার করে!

করে না বলেই তো সেই মুসলিম লীগের আমল থেকে টিকে আছে। ওর উপরে মন্ত্রীদের অসীম ভরসা। এ হেন পরিতোষ যে নিত্যধামী তাসের আড্ডায় সম্মানিত সদস্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

॥ তিন ॥

পরিতোষ মন্ত্রীদের নানারূপে নানামূর্তিতে দেখেছে। কখনো দেখছে প্রকাণ্ড গোল টেবিলের উপরে তিন চারখানা খবরের কাগজ বিছিয়ে তুষার-মৌলী মুড়ির স্তূপ সকলে মিলে আক্রমণ করেছে, পাশেই ছোটখাটো ফুলুরি-বেগুনীর একটি বিন্ধ্য পর্বত। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের মধ্যে মুখ্য গৌণ ভেদ নেই, সকলেই সমানভাবে মুড়ির অংশীদার।

একদিন ঘরে ঢুকতেই তার মন্ত্রী হঠাৎ বলে উঠলেন, পরিতোষ, কি রকম ইলিশ মাছ খাচ্ছ, এবারে তো শস্তা বলেই মনে হচ্ছে।

সেবার পূজোর সময় প্রবল বন্যায় তিনটি জেলা ভেসে গেল, চারিদিকে আর্তনাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। সবাই যখন দুঃখিত মন্ত্রীমণ্ডলী আনন্দিত হয়ে উঠলেন, যাকে, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। কিছু চাল আর কাপড় নিয়ে এই সময় আমাদের দলের ভলেন্টিয়ার উপস্থিত হলে সমস্ত ভোট আমরা পাব।

এই কথা শুনে অন্য একজন মন্ত্রী বলে উঠলেন, যা বলেছেন দাদা, এই তিনটে জেলা নিয়েই ভয় ছিল। আর ভগবান কিনা বেছে বেছে এখানেই সঙ্কট ত্রাণের উপায় করে দিলেন।

মন্ত্রীরা অনুগত ও নিজ দলের লোকদের চাকরি দেন না, কারণ তারা তো অনুগত আছেই। বিপক্ষ দলের যে সব নেতা, হাফ-নেতা বিধান সভায় ও

বিধান সভার বাইরে সরকারকে বিব্রত করে, বেছে বেছে তাদের লোককেই চাকরি দিয়ে থাকেন। যাক, কিছু দিন তো শান্ত হয়ে থাকবে।

এই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের সমালোচনা করলে মন্ত্রীরা বলেন, আমাদের কাছে পক্ষাপক্ষ ভেদ নেই, এ যে গণতন্ত্রী সরকার।

পরিতোষের মন্ত্রী তাকে সোজাসুজি বলল, ওহে কাজ গুছিয়ে নাও, একটা বাস রুট, ও খান দুই ট্যাক্সি তোমাকে বের করে দিচ্ছি,এবারে ইলেক-সানের পর কি হয় জানি না।

নির্বোধ পরিতোষ প্রস্তাবটা সবিনয়ে প্রত্যখ্যান করল। পরিতোষ যতই ভাবে, মন্ত্রীদের বিশ্বমূর্ত্তি ততই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। পরিতোষের মস্ত একটা সুবিধা ছিল সব কথাই তার কানে প্রবেশ করত, কেউ তাকে গ্রাহ্য করত না। মোটর গাড়ির ড্রাইভার ও মন্ত্রীদের পি.এ.কে কেউ ওকে মানুষের মধ্যে গ্রাহ্য করে না। মন্ত্রীদের মুখে কোন্ কথা সে শোনেনি ভেবে পায় না। রেসের কথা, লটারীর কথা, ভোটের কথা, খেলার টিকিটের কথা, লাইসেন্স পারমিট প্রভৃতি স্বর্ণঘটিত ও নারীঘটিত সমস্ত কথাই শুনেছে, কেবল দেশের কথা ছাড়া। শেষে সে স্থির বুঝে নিয়েছিল যে দেশের কথা ভাববার জন্যে মন্ত্রী বা রাজ-নীতিকগণ নিযুক্ত হন নি। ও কথা ভাববে বেকার ও বিকারগ্রস্ত লোকেরা। এইরকম সিদ্ধান্তের ওপর ভর করে চলতে যখন সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে, এমন সময় রমেশের মুখে হঠাৎ শুনতে পেল মন্ত্রীরা দেশের জন্য ভাবেন।

॥ চার ॥

সেদিন পরিতোষ যখন নিত্যধামের তাসের আড্ডায় প্রবেশ করল, দেখল খেলা অনেক আগে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, অথচ আর জুটি নেই কাজেই সে বসে বসে খেলা দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে এসে উপস্থিত রমেশ সিকদার। লোহার সিকের ব্যবসা বলে লোকে তাকে সিকদার বলেই ডাকে, ওটা কৌলিক পদবী নয়। দুইজন খেলুড়ীদের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখছিল। এমন সময় কোন দুষ্ট গ্রহ রমেশের মুখ দিয়ে বলে উঠল,দেশের জন্যে মন্ত্রীরা ভাবেন। প্রথমে কথাটা খেয়াল করে দেখেনি পরিতোষ, তবে খেয়াল করুক আর না করুক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য। রমেশের কথা সম্বন্ধে সম্বিৎ হওয়ামাত্র পরিতোষের নাভিকন্দরে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। অবশ্য প্রথমে সে নিজেও বুঝতে পারেনি। কিন্তু যতই প্রতিক্রিয়া বর্ধিত ভাবে এগোতে লাগল ততই

তার সমস্ত দেহ কম্পিত বিকম্পিত প্রকম্পিত হয়ে উঠতে লাগল, অবশেষে সে ফরাসের উপর এমন গড়াতে লাগল যে সকলে ডাক্তার বদ্যি ডাকতে ছুটল। অতঃপর কি হল আগেই বর্ণিত হয়েছে।

ত্রিশ বৎসর বিভিন্ন মন্ত্রী সভার পি. এ. গিরি চাকরি করে অবশেষে তাকে কি না শুনতে হল যে মন্ত্রীরা দেশের জন্যে ভাবেন। হ্যাঁ, ভাবতে তাদের দেখেছে, দলের জন্যে, ভোটের জন্যে, ভাই ভাইপো, ভাগ্নে, শালা শালাজদের জন্যে, বিরোধী দলের নেতাদের জন্যে— কার জন্যে নয়। কিন্তু দেশের জন্যে— হায়! ওই অসম্ভব কথা ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে বেচারা পরিতোষ হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে গেল।

বিজ্ঞ ডাক্তার এসে ডেথ সার্টিফিকেটে লিখলেন, কোন কারণে আনন্দের আতিশয্যে হার্ট ফেল করে মৃত্যু হয়েছে। পরিতোষের মৃত্যুর আসল কারণ কেউ জানতে পেল না, একমাত্র যে জানত সেই রমেশ সিকদার বেগতিক দেখে খাটিয়া সংগ্রহের অজুহাতে আগেই সরে পড়ছে।

বলয় বিনিময়

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের নায়ক যক্ষ তখন রামগিরি পাহাড়ে বর্ষকাল-ভোগ্য নির্বাসন যাপন করছিল। এক বৎসরের মেয়াদ। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গণনা করে দেখল যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে আরও প্রায় সাড়ে তিন মাস বাকি আছে, তখন বেচারা একটি প্রমাণ সাইজের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করল, ভাবলো যক্ষপত্নী অলকায় না জানি কি করে দিন যাপন করছে।

এই ক মাসের বিরহে যক্ষ খুব কৃশ হয়ে পড়েছিল, হাত-পা শুকিয়ে গিয়েছিল। তবে শুধু বিরহ নয়, সঙ্গে পাহাড়ী ম্যালেরিয়াও ছিল, তার উপরে নিত্য স্বপাক ভোজন, হাতের যে কত জায়গা পুড়ে গিয়েছিল তার ঠিক নেই, ভাবল যক্ষপত্নী সেই সব পোড়া দাগ দেখলে না জানি কত অশ্রুপাত করবে।

সে নিত্যকার অভ্যাসমত একটি ঝরনার জলে স্নান করতে নামল; স্নান সাঙ্গ করে যখন উঠল, হাতের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল, ডান হাতের স্বর্ণবলয় খানি নেই। কালিদাস লিখেছেন কনকবলয় ভ্রংশ রিক্ত প্রকোষ্ঠঃ, অর্থাৎ কি না তার হাত থেকে সোনার বলয় খসে পড়ে গিয়েছে। সোনার বলয়ের দোষ দেওয়া যায় না, তার হাত এমন কৃশ হয়ে গিয়েছিল সহজেই

সোনার বালাটা গলে পড়ে গিয়েছে। সে তখনি হায় হায় করে আবার ঝরনার জলে লাফিয়ে পড়ল এবং দণ্ড দুই ধরে সন্ধান করল কিন্তু আর সন্ধান পেল না বালাটির।

সে তখন তীরে উঠে কপাল চাপডাতে লাগল, যক্ষপত্নী না জানি কি বলবে। বিদায়কালে তারা দুই জনে বলয় বিনিময় করেছিল। যক্ষপত্নী নিজের হাত থেকে বলয় খুলে নিয়ে স্বামীর হাতে পরিয়ে দিয়েছিল, আবার স্বামীও নিজের বলয় খুলে পরিয়ে দিয়েছিল পত্নীর হাতে, কথা ছিল বৎসরান্তে মিলন হলে আবার তারা বলয় পাল্টে নেবে, ততদিন বিনিমিত বলয় দু'খানিই তাদের স্মৃতিচিহ্ন ও স্মারক। যক্ষ ভাবল মিলনের পরে সে কি কৈফিয়ৎ দেবে স্ত্রীর কাছে? তোমার বিরহে কৃশ হওয়ায় বালা খসে পড়ে গিয়েছিল কৈফিয়ৎ কি স্ত্রী বিশ্বাস করবে? হয়তো ভাববে যে নিশ্চয় কোন পাহাড়ী মেয়েকে উপহার দিয়েছি। তখন যাই ভাবুক এখন সে নিরুপায়, তাই যক্ষ দুঃখিত মনে কুটিরে ফিরে এল।

ক'দিন পরে আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে পাহাড়ের গায়ে নব-বর্ষার মেঘোদয় দেখতে পেল যক্ষ, তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। দুষ্টু মেঘের কারসাজি সুবিদিত, তার প্রকোপে পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন সুখী ব্যক্তিরাও ব্যাকুল হয়, দুঃখীদের, বিরহীদের, দশা সহজেই অনুমেয়। যক্ষ ভাবল এই মেঘ তো উত্তরগামী, শেষ পর্যন্ত অলকায় গিয়ে পৌছবে, তবে এর মুখ দিয়ে পত্নীর কাছে একটা বার্তা পাঠানো যাকনা কেন যে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় আবার আমাদের মিলন ঘটবে। বড়ঘরের লোকের কাছে প্রার্থনায় দোষ নেই, প্রার্থনা পূরণ না হলেও মনে গ্লানি অনুভূত হয় না। তখন সে রীতিমত মন্দাক্রান্তা শ্লোকে মেঘকে বন্দনা করে মনোভাব জ্ঞাপন করল। সে সব কথা কালিদাস মেঘদূত কাব্যে বিস্তারিতভাবে বলেছেন, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এদিকে সেই বলয়খানি স্রোতের তোড়ে গড়াতে গড়াতে ঝরনা থেকে নদীতে গিয়ে পড়ল, নদীর স্রোতের টানে অদূরবর্তী এক বিশাল হ্রদে গিয়ে পড়ল। অবশ্য সে হ্রদটা অনেক কাল হল শুকিয়ে গিয়েছে, এখন ফাঁকা মাঠ, পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কল্যাণে এখন 'স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রির' কারখানা হয়ে গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার প্রভৃতি জিনিস তৈরি হচ্ছে। তবে এ কিনা বহুকাল আগেকার কথা, তখন সেই সমুদ্রোপম হ্রদ অগাধ জলরাশি নিয়ে

বিরাজিত ছিল। যক্ষের মেঘ-বন্দনার দু' এক দিনের মধ্যেই বিষম ঝড় উঠল, আর ঝড়ের কোপে দেখা দিল প্রবল ঘূর্নিবায়ু, সেই ঘূর্নিবায়ু যখন হ্রদটার উপরে এসে পৌছল, হ্রদে সৃষ্টি হল এক জলস্তম্ভের। সকলেই জানেন যে জলস্তম্ভের আকর্ষণে অনেক সময় জলাশয়ের মাছ ও কাদা মেঘের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়, তারপর অনেক দূরে গিয়ে বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ে। এখানেও তাই ঘটল। জলস্তম্ভের আকর্ষণে পার্শে পুঁটি ট্যাংরা মাছের সঙ্গে সেই স্বর্ণবলয়খানি আকাশে উঠে কালিদাস-বন্দিত সেই মেঘের মধ্যে গিয়ে পৌছল আর দক্ষিণের হাওয়ার ঠেলায় মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলল উত্তর দিকে অলকার দিকে। মেঘ যক্ষের আবেদন ভোলে নি। কালিদাস এসব কথা বলেন নি, কবিরা সব কথা খুলে বলা আবশ্যক মনে করে না, এখানেই নাকি তাদের মুন্সীয়ানা।

ওদিকে যক্ষ-পত্নী অলকা নগরীতে মণিহর্ম্যের ছাদের উপরে বসে ভেজা গামছা মাথায় দিয়ে স্বর্ণকদলীর পাতায় মাসকলাই ডালের বড়ি দিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। সকালবেলাতেই সে দু' একবার মেঘের ডাক শুনেছিল, তার ভয় ছিল পাছে বড়ি শুকোবার আগেই বৃষ্টি নামে। অসম্ভব নয়, কেননা আষাঢ় মাস এসে পড়েছে।

যক্ষ নির্বাসনে অন্তরায়িত হওয়ার পরে এই বড়ি দেওয়াই যক্ষ-পত্নীর একমাত্র কাজ ও সান্ত্বনা ছিল। কারণ মাসকলাই ডালের বড়ি যক্ষের বড় প্রিয়, যথেষ্ট তৈরি করে রাখা আবশ্যক, প্রভু ফিরে এলে অভাব না হয়। তাছাড়া, বিরহের দিন-গণনায় ঐ বড়ি ছিল প্রধান উপায়। আগে সে একটি করে ফুল সরিয়ে রেখে দিন গণনা করত, কিন্তু দেখল ফুলগুলো এমন শুকিয়ে যায় যে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এখন প্রতিদিন প্রাতে একটি করে বড়ি সরিয়ে রাখে একটি টুকরির মধ্যে, বড়ি যত শুকোয় তত জমাট বাঁধে, গুণতে অসুবিধা হয় না। সেদিন সকালেই সে বড়িগুলো গুণে দেখেছিল যে দুশো পঁয়ষট্টি বড়ি জমেছে, হিসাব করে দেখল যে আর একশোটি হলে বর্ষপূরণ হয়, অর্থাৎ যক্ষের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে আর তিন মাস দশ দিন বাকি। তিন মাস দশ দিন—সে যে অনেক দিন, ভেবে যক্ষ-পত্নীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। আবার সে মনোনিবেশ করল বড়ি দেওয়ায়। বড়ি দিতে দিতে ভাবল, আহা, প্রভু ফিরে এলে মিলনের দিনে বিরহের উপকরণ বড়ি দিয়ে লাউঘণ্ট রেঁধে দিলে না জানি তিনি কী

খুশিই হবেন। অবশ্য আনমনা হয়ে সবটাই খেয়ে নেবেন না, আমার জন্যেও কিছু অবশিষ্ট রাখবেন। এমন সময়ে তার নজর পড়ল বাম হাতের সেই বলয়খানির দিকে, বিদায়ের প্রাক্‌কালে স্বহস্তে প্রভু যা পরিয়ে দিয়েছিল। সে স্থির করল প্রভু প্রত্যাবর্তন করলে তরকারি পরিবেশন করবার আগে আবার দুজনে বলয় পাল্টে নেবে। এই রকম কথাই আছে।

অনেকক্ষণ সে আকাশের দিকে তাকায় নি, এবারে মুখ তুলে চেয়ে দেখল যে আকাশ কখন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে আর তার ধারে ধারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি নামল বলে। সে তাড়াতাড়ি বড়িগুলো সরিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসল আর জানলা দিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার মনে হল এই মেঘ তো দক্ষিণ থেকে আসছে, যে দক্ষিণে প্রভু নির্বাসন যাপন করছেন,ভাবল এই মেঘখানা হয়তো প্রভুও দেখেছেন আর আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, ও কি প্রভুর সংবাদ জানে? প্রভুর কোন সংবাদ বহন করে আনে না কেন? হঠাৎ তার মনে হল, কেন মনে হল বলতে পারে না,ঐ মেঘ যেন প্রভুর সংবাদ ও আশ্বাসবাহী, ও যেন প্রভু-প্রেরিত মেঘদূত ও যেন গুরু গুরু ভাষণে জানাচ্ছে আর দেরি নেই—ক'দিন বাদেই প্রভু ফিরে আসবেন। তখন সে হাতজোড় করে মেঘদূতকে নমস্কার করল।

এমন সময় তার চোখে পড়ল তড়বড় শব্দে ছাদের উপরে শিল পড়ছে,শিল কুড়োবার লোভে ছুটে চলে গেল ছাদের উপরে; নত হয়ে শিল কুড়োচ্ছে এমন সময়ে পিঠের উপরে আঘাত অনুভব করল; কি হয়েছে দেখবার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই গড়িয়ে পড়ে গেল একখানা স্বর্ণবলয়; সে চমকে উঠল। এ কোত্থেকে এল? ঐ মেঘ থেকেই পড়েছে নিশ্চয়; না জানি কার সোনার বালা—বলে কৌতূহলী হাতে তুলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। এ কি, এ যে তার হাতের বালা, প্রভুকে দিয়েছিল স্মারকরূপে! এ কেমন করে এল এখানে! তখনি মনে হল মেঘের হাত দিয়ে প্রভু দিয়েছেন পাঠিয়ে; বিদ্যুৎ যেমন আসে বর্ষণের আগে,এই সোনার বালাখানাও এসেছে তেমনি তাঁর আগমনের আগে। বালাখানা সজোরে বুকে চেপে ধরল, আহা, প্রভুর স্পর্শ এখনো লেগে রয়েছে। কালিদাস এ কথাটাও লেখেন নি, বস্তুতন্ত্রতার একান্ত অভাব ছিল তাঁর। যাক, না লিখে ভালই করেছেন, তিনি লিখে ফেললে আজ আমি কি লিখতাম।

তারপরে যথাকালে শারদ পূর্ণিমায় যক্ষের সঙ্গে মিলন ঘটল যক্ষ-পত্নীর,

যক্ষ সকালবেলায় ফিরে এসেছে। কুশলপ্রশ্নাদির পরে যক্ষ-পত্নী ভাবল স্বামীকে নিয়ে একটু রঙ্গ করা যাক, কারণ প্রথমেই সে অপাঙ্গে দেখে নিয়েছে যে যক্ষের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠ শূন্য। পত্নী নিজের বাম হাতের প্রকোষ্ঠ দেখিয়ে বলল, দেখো প্রভু, বিদায়কালে তোমার স্বহস্তে পরিয়ে দেওয়া বলয়খানি আমি সযত্নে রক্ষা করেছি, একদিনের জন্যও খুলিনি। আজ এস দুজনে বিরহের বিনিময় আজ মিলনে পুনর্বিনিময় করে নিই।

যক্ষ এতক্ষণ এই ভয়টিই করছিল। সে উত্তর দেবার আগেই পত্নী বলে উঠল, একি প্রভু, তোমার প্রকোষ্ঠ যে শূন্য, বলয়খানি গেল কোথায়?

যক্ষ বলল, প্রিয়ে, তোমার বিরহের কৃশতাই তার জন্য দায়ী আমি এত কৃশ হয়ে গিয়েছি যে অনবধানে বলয় কখন খসে পড়ে গিয়েছে।

পত্নী বলল,প্রভু,তোমার কথায় কোন্ পত্নী না সুখী হবে। তবে বলয়খানি নিশ্চয় সঙ্গে আছে, বের কর, আগে একবার পরিয়ে দিই, তারপরে খুলে নিলেই হবে।

যক্ষ দেখল, এ এক সমস্যা, এখন বলয় কোথায় পাওয়া যায়, সে তো গিয়েছে হারিয়ে। সে বলল, এই কৃশ হাতে কি সে বলয় মানাবে!

যক্ষ-পত্নী বলল, প্রভু, আমিও বিরহ-তাপে কিছু কম কৃশ হইনি, বলয় খসে পড়বারই কথা, তাই দেখো স্বর্ণসূত্র দিয়ে তা হাতের সঙ্গে বেঁধে রেখেছি।

যক্ষ বলল, পাহাড়ের মধ্যে কোথায় আমি পাব স্বর্ণসূত্র!

স্বর্ণসূত্র না জোটে লতাতন্তু তো জুটতে পারত। যাই হোক, বলয়খানি বের কর।

এবারে যক্ষকে স্বীকার করতে হল যে বলয়খানি হারিয়ে গিয়েছে।

বুঝেছি প্রভু, হারিয়ে যায়নি। নিশ্চয় কোন কালো মোটা বন্যনারীকে উপহার দিয়েছ। এই বলে কপালে করাঘাত করল, হায়, শেষে কিনা এই ছিল আমার কপালে।

যক্ষ নানা প্রকারে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু যে সমস্তই অবগত আছে সে বুঝবে কেন।

অনেকক্ষণ মান-অভিমানের পরে পত্নী বলল, অনেক হয়েছে, বলয় না পাই তোমাকে তো ফিরে পেলাম, এই যথেষ্ট। নাও, চল, এখন খেতে চল?

দেখো, আবার পুরাতন হাতের রন্ধন রুচিকর হয় কিনা!

স্বর্ণ-থালিকায় মল্লিকা-ফুলের স্তূপের মত বাতাসে উড়ে যায় এমন হাল্কা অন্ন, আর চারদিকে ছোট বড় নানা পাত্রে সজ্জিত নানাবিধ ব্যঞ্জন, সঙ্গে গ্রহমণ্ডল মধ্যে গ্রহরাজ বৃহস্পতির মত বিরহযাপনের বড়ি দিয়ে রাঁধা লাউঘণ্ট। বিস্ময়ে প্রত্যাশায় আনন্দে যক্ষের চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সে বলল, প্রিয়ে, এ যে অসাধ্য সাধন করেছ। সত্যি, তোমার মত গুণবতী পত্নী যে পায় তার সৌভাগ্য।

বাধা দিয়ে পত্নী বলল, থাক থাক, অনেক হয়েছে। আমার দত্ত বলয়, অপরকে বিলিয়ে দিয়ে এসে এখন গুণগান হচ্ছে। তাছাড়া এ প্রশংসা তো আমাকে নয়। ঐ স-বড়ি লাউঘণ্টকে।

যক্ষ বুঝল এতক্ষণ পরে পত্নী একটা সত্য কথা বলেছে, তবে তা আর মুখে প্রকাশ করল না। পত্নীর কাছে মনের সব কথা বলা নিরাপদ নয়।

যক্ষ বড় তৃপ্তির সঙ্গে খেতে শুরু করল, তবে যক্ষ-পত্নীর একটা আশা সফল হল না, লাউঘণ্ট একটুও অবশিষ্ট রইল না। লাউঘণ্টটুকু সব চেটেপুটে খেতে গিয়ে যক্ষ অনুভব করল পাত্রের উপরে শক্ত একটা কিছু আছে, ভাবল, ওটাও খুব সম্ভব রন্ধন-শিল্পের অন্তর্গত। সানন্দে সেই ঘণ্টমিশ্র গোলাকার পদার্থটাকে মুখের কাছে তুলে যক্ষ চমকে উঠল, একি, এ যে একখানা বলয় দেখছি! প্রিয়ে, রন্ধনের সময়ে কি তোমার হাত থেকে খসে লাউঘণ্টর মধ্যে পড়েছে? আরে এ যে আমার হাত থেকে খসে পড়া সেই বলয়। প্রিয়ে, সত্যি বল এ বলয় পেলে কোথায়?

স্বামীর অধীরতা দর্শনে বলয় লাভের রহস্য প্রকাশ করল যক্ষ-পত্নী। তখন যক্ষও বলয় হারানোর রহস্য বিবৃত করল। যক্ষ বুঝল মেঘের উপরে যে কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি সে পালন করেছে, সংবাদের সঙ্গে বলয়খানি এনে পৌঁছে দিয়েছে।

দাও প্রভু, এবারে বলয়খানি দাও, ধুয়ে দি।

দাঁড়াও প্রিয়ে, বলে লেহন করে বলয়ের অঙ্গ থেকে লাউঘণ্টর শেষ-কণাটি পর্যন্ত আত্মসাৎ করল যক্ষ, মহানসে, থালিকায় বা বলয়গাত্রে কণামাত্র অবশিষ্ট রইল না যক্ষ-পত্নীর জন্যে।

তারপরে সেই শারদ পূর্ণিমার রাত্রে মণিহর্ম্যের ছাদে বসে বিরহের দিনের বলয় মিলনের দিনে পুনর্বিনিময় হল যক্ষ-দম্পতির মধ্যে। তারপরে যে সব

কাণ্ড ঘটল সান্ধি-সমাস দুরূহ ছন্দ ও দুরূহতর শব্দ-সমন্বিত ভাষায় কালিদাস তা বলতে পারতেন, আভাসে প্রকাশে একরকম মানিয়ে যেত। কিন্তু বাংলা ভাষা যেমন বে-আব্রু তেমনি সহজবোধ্য, তার উপরে হাতে অন্য কাজ না থাকায় পুলিস উদ্যত। অতএব পাঠকের কৌতূহল সংবরণ করা ছাড়া উপায় নেই।

ফুচকা

অশেষ ও নীরদ বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। খানকতক বাস এসে চলে গিয়েছে কিন্তু চাপতে পারেনি ওরা, মুষ্টিযোদ্ধা ছাড়া কারো পক্ষে চাপা সম্ভব নয়। কাজেই ধীরভাবে অপেক্ষা করছে, যদি কোন বাসে কোন ফাঁকে চড়তে পারে। বাস স্টপের মতো সহিষ্ণুতা শিক্ষার স্থান অল্পই আছে সংসারে।

এমন সময়ে ওদের চোখে পড়ল, ঠিক দু'জনের যে এক সঙ্গে চোখে পড়েছে তা নয়, অশেষ আগে দেখল অদূরে পথের পাশে একটি ক্ষুদ্র জনতা, মাঝখানে ফিরিওয়ালা ক্ষিপ্রহাতে ফুচকা বেচে চলেছে। নানা বয়সের মেয়েরা, কিছু বালকও আছে, সানন্দে সাগ্রহে অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করে চলেছে ঐ বস্তুগুলি।

অশেষ আপন মনে বলে উঠল, ন্যাশানাল হেলথ নষ্ট করতে এমন জিনিস আর নেই।

নীরদ শুনল। সে জানে ন্যাশানাল হেল্‌থ্‌ রক্ষা করার দৈব অধিকার পেয়েছে অশেষ। সে ডাক্তার কি না।

নীরদ বলল, শুধু ফুচকাকে দোষ দিয়ে কি লাভ?

শুধু ফুচকা নয়, ফুচকি আর ঐ জর্দা।

আবার জর্দাকে কেন? বলল নীরদ। সে মাঝে মাঝে জর্দা খেয়ে থাকে।

জর্দাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি, তবে ফুচকি নয়। যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম— হয়তো প্রধানমন্ত্রীও লুকিয়ে লুকিয়ে খান, দিল্লীতে ওকে আবার বলে গোল গাপ্পা। যাক, তুমি যখন প্রধানমন্ত্রী হওনি, আপাতত দেখ মেয়েরা কেমন আনন্দে খাচ্ছে।

দেখিনি আর! এরাই আমার ডিসপেন্সারিতে যাবে গ্যাস্ট্রাইটিস চিকিৎসা করাতে। ফুচকি আমার দু'চক্ষের বিষ।

অশেষ, বস্তুটার প্রতি তোমার যতই রাগ থাকুক না কেন, ওর নামটা বিকৃত কর না, ফুচকি নয় ফুচকা। সংসারে এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে আনন্দ দেখলে আনন্দিত হওয়া উচিত।

এবারে নীরদের চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে সে ফুচকা জনতার দিকে তাকাল।

চকোরী যেমন ব্যথিত চক্ষু হয়ে একাগ্র ভাবে চন্দ্রের সুধাপান করে চলে, ব্রজাঙ্গনারা যেমন তন্ময় হয়ে স্বামী পুত্র সংসার ভুলে গিয়ে (হ্যাঁ, এদের মধ্যেও অনেকের সংসার ও স্বামী পুত্র আছে। বয়স ও সিঁথির সিঁদুর প্রমাণ) কৃষ্ণের রূপসুধা পান করে চলে তেমনি ভাবে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে এরা ছাপরা জেলাবাসী (ওটা পরে জানা গিয়েছে) ফুচকাওয়ালার শ্রীহস্ত প্রদত্ত ফুচকা গলাধঃকরণ করছে। অনেকেই বড় ঘরের ঘরণী। পোশাক ও অপেক্ষমান মোটর গাড়ি প্রমাণ। অনেকেই সাধারণ ঘরের ; অনেকেই শিক্ষিতা হাতে ইংরেজি ও বিজ্ঞানের বই ; কেউ কেউ বোধ করি বাড়ির দাসী ; বালিকারা এখনো ফ্রক ছাড়েনি। কিন্তু হলে কি হয়, ভেদাভেদ এখন লুপ্ত। শ্মশানে ও ফুচকার আসরে সবাই সমান।

কেবল ছুটি তরুণী দল থেকে একটু আলাদা দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছিল। বোধ করি পরে আসাতে কাছে ঘেঁসতে পারেনি। কিম্বা দূরত্ব রক্ষা করেই চলতে চায়। তারাও নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, তবে কথার ধারা শুনে বুঝতে পারা যায় অশেষ ও নীরদের সংলাপ তাদের কান এড়ায়নি।

ফুচকাকে বললে ফুচকি, আবার উপদেশ ঝাড়া হচ্ছে।

লীলা আস্তে, শুনতে পাবে।

শুনলেই হল। চাপা গলায় কথা বলে এমন এক্সপার্ট হয়েছি যে ক্লাসের সামনের সারির ছেলেরা শুনতে পায় না। আর তাছাড়া মনে নেই আমাদের প্রোফেসার বলেছিলেন, মেয়েদের কথা শুনলেও বোঝা যায় না।

শিপ্রা বলল, শিপ্রা তার সঙ্গিনী। কিন্তু সত্যি যদি ভাই গ্যাসট্রাইটিস হয়।

ডাক্তার আছে কি করতে। ভগবান ব্যাধি ওষুধ ছুই-ই সৃষ্টি করেছেন, ভয় নেই, চল, আরও গোটাকয়েক খাওয়া যাক। এর ফুচকাগুলো খুব চমৎকার।

ব্যাধিকে ভয় করিনে, তবে এঁর ডাক্তারখানায় না যেতে হয়।

লীলা বলল, উনি আবার ডাক্তার !

কেন, দোষটা কি ?

আরে ডাক্তার তো অখাদ্য খেতে দেখলে খুশি হবে। রুগী পাওয়া যাবে।

চুপ চুপ, শুনতে পাবে।

এমন সময় বাস এসে পড়ল, এবারে মরীয়া অশেষ ও নীরদ ঝুলে পড়ল একসময়ে ওরা জুজুৎসু বিদ্যা শিখেছিল।

দুলতে দুলতে ঝুলতে ঝুলতে চলল অশেষ, ঐ দুটি মেয়ের তীক্ষ্ম কটাক্ষ মনের মধ্যে খোঁচা মারতে লাগল। নাপিতের নরুণ ও নারীর কটাক্ষ ক্ষী হলেও মর্মঘাতী। বাসের চলনের তালে তার মাথা যখন পার্শ্ববর্তীর মাথা অনভীষ্ট ঢু মারছিল সে ভাবছিল মেয়েটি চাপা স্বরে কি যেন বলছিল, নিশ্চ তাকে ব্যঙ্গ করছিল, তার কথা বোধ করি শুনতে পেয়েছিল, হয়তো সঙ্গিনীর সঙ্গে তাকে নিয়েই ঠাট্টা করছিল। করুক, তাতে তার কী? কিম্বা আদৌ সে আলোচনার বিষয় ছিল না। তাকে হয়তো চোখেই পড়েনি।

অশেষের মনটা মুষড়ে গেল। মেয়েদের মনে যেমন তেমন একটা ছায় পড়লেও পৌরুষ সার্থক হয় পুরুষের।

আঃ মশায়, অত জোরে ঢুঁ মারবেন না, পিঠে বাতেব ব্যথা হয়েছে।

সরি।

সোজা হয়ে দাঁড়ান মশাই, গায়ের উপরে এসে পড়বেন না।

আবার আমার দিকে ঝুঁকলেন কেন?

সরি।

এমন সময়ে কারো একখানা পা মাড়িয়ে দিল। সে ব্যথা আত্মসা করবার আগেই তার মাথাটা সজোরে বাসের ছাদে গিয়ে ঢুঁ মারল।

নানা জনে নানা মন্তব্য করল।

তবু ভালো।

মাথাটা শক্ত বটে!

যাকে বলে হেডস্ট্রঙ্।

সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে ঊর্ধ্বে অধে আঘাত খেয়ে সমস্ত সংসারে উপরে চটে গিয়েছে অশেষ, সব চেয়ে বেশি ঐ ফুচকাভোজিনীর উপর।

মধ্যপথে সে বাস থেকে নেমে পড়ল, ভিড়ে নীরদ দেখতে পেল না।

বেহায়া মেয়েটার নামটা জানতে পারলে হত।...কি কাজ আমার নামে?...ভুগুন গ্যাসট্রাইটিস হয়ে ডবল ফি দিলেও আমি চিকিৎসা করবি না... পাড়ার ডাক্তারদের বলে দেব যেন কেউ চিকিৎসা না করে...কো পাড়ায় থাকে... কি নাম?...

॥ ২ ॥

পরদিন যথাস্থানে যথাসময়ে অশেষ উপস্থিত হল, দেখল সমস্তই ঠি

আছে, ফুচকাওয়ালা উদার হস্তে ফুচকা বিক্রী করছে, নরনারী অবাধে গলাধঃকরণ করছে, সমস্তই ঠিক আছে অথচ সমস্তই ঠিক নেই। সময় বিশেষে এক অনেকের চেয়ে বেশি। নেই সেই বাঞ্ছিত মুখটি। তার মনটি ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। যথাসময়ে শব্দটি অভ্যাসদোষে প্রয়োগ করেছি। যথা সময়ের অনেক আগে অশেষ উপস্থিত হয়েছিল আর যথাসময়ের পরে অবধি দাঁড়িয়ে রইল, সেই বেহায়া মেয়েটি আজ এল না। তারপরে সমস্ত ফুচকা নিঃশেষ হয়ে গেলে, অন্ধকার হয়ে এলে ফুচকাওয়ালা আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল, তখন অগত্যা তাকেও স্থানত্যাগ করতে হল।

কিন্তু প্রেমিক সে, হতাশ হলে চলে না। তাই সে পরপর কয়েকদিন যথাস্থানে উপস্থিত হল, এবারে আর যথাসময় লিখলাম না। তারপরে অষ্টম কি দশম প্রতীক্ষার দিনে যথাস্থানে দেখা মিলল সেই মেয়েটির। অশেষ দেখতে পেল মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ কি? হঠাৎ অশেষের মনে হল কে যেন বজ্রমুষ্টিতে তার হৃদপিণ্ডটা সবলে চেপে ধরেছে—প্রাণ যায় আর কি? মেয়েটির পাশে বিশ্রব্ধভাবে কে ঐ যুবক দণ্ডায়মান! এর চেয়ে যে না দেখা ভালো ছিল। শূন্য পটে তুলি চালাবার অবকাশ ছিল, এখন যে, পট নিষ্ঠুরভাবে পূর্ণ। অবাঞ্ছিত বস্তুকে দেখবার একটা ঝোঁক থাকে, যতই তা অপ্রীতিকর হোক না কেন। সে ভাবল একটু এগিয়ে দেখা যাক না ওদের কথাবার্তা শোনা যায় কি না। এগোতেই শুনতে পেল মেয়েটি যুবককে বলছে, আপনার স্ত্রী খাচ্ছেন না কেন? অশেষ দেখল পাশেই আর একটি তরুণী। তার হৃদ্‌পিণ্ডে মুহূর্তে আবার স্বাভাবিক স্পন্দন ফিরে এসেছে, এখন তা প্রকাণ্ড আকাশভরা বায়ুমণ্ডলের মতো স্পন্দন।

আর মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় মনে করে যুবকটির উদ্দেশ্যে অশেষ বলল, এই ফুচকিগুলো খান কেন?

লীলা বলল, ফুচকি নয় ফুচকা।

নাম বদলালেও ওদের স্বভাব বদলায় না, ওগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক, সদ্য গ্যাসট্রাইটিস।

নইলে ডাক্তার রুগী পাবে কোথায়? লীলা দেখে নিয়েছে তার পকেটের স্টেথোস্কোপটা।

যা বলেছেন মশাই, ফুচকা আমার দু'চক্ষের বিষ।

বিষের চেয়েও মারাত্মক, বিষ প্রাণে মারে, ওগুলো সারা জীবন ভোগায়।

কিন্তু বড়ই চমৎকার, একবার খেয়ে দেখুন স্যার, বলল লীলা।

মাফ করবেন।

তা বটে, ডাক্তার অসুস্থ হলে রুগীর বিপদ।

এমন সময় বাস এসে পড়তেই লীলা উঠে পড়ল। সে বাসের দরকা নয় অশেষের, ভাবল উঠে প’ড়ি। কিন্তু সঙ্কোচ কাটাতে কাটাতেই বাস চলে গেল। হায়, বাস, সময় সুযোগ ও নারী কারো জন্যে অপেক্ষা করে না।

পরদিন অশেষ ডিসপেন্সারিতে বসে আছে, এমন সময় একটা জরুরি কল এল। ব্যাগ হাতে করে সংবাদদাতার পিছু পিছু এসে নিজ-পাড়ার একটা বাড়িতে ঢুকেই বিস্মিত হয়ে গেল, লীলা যে।

লীলাও কম বিস্মিত হয়নি, সে জানত না যে ডাক্তার এ. রায় মানে সেই ফুচকা-নিন্দুক লোকটি। ছোট্ট একটি নমস্কার করে বলল, আসুন উপরে।

আশা করি গ্যাসট্রাইটিস নয়?

গাসট্রাইটিসই বটে।

আপনার?

না, আমার মায়ের।

হওয়া তো উচিত ছিল আপনার।

তাহলে বোধ করি খুশি হতেন।

রুগী পেলেই ডাক্তার খুশি।

তবে ফুচকি খেতে নিষেধ করেন কেন?

ঘরে ঢুকল ওরা। মা, ডাক্তার রায় এসেছেন।

অশেষ দেখল শয্যায় শায়িতা বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা।

কি হয়েছে আপনার?

পেটে ব্যথা, বোধ করি অম্বলের ব্যাথা।

ছিল কি আগে?

মাঝে মাঝে হয়, এবারে বাড়াবাড়ি।

তারপরে ডাক্তারদের যতগুলি নিরীহ ও অর্থহীন পরীক্ষা আছে, যথা টেম্পারেচার, ব্লডপ্রেসার, বুকে স্টেথোসকোপ বসানো, পেট টিপে দেখা, জিভ দেখা সমস্ত শেষ করে অশেষ বলল, ভয়ের কিছু নেই, তবে ক’দিন solid food দেওয়া চলবে না, দুধ ভাত খেয়ে থাকতে হবে।

ওষুধ?

অশেষ জানে ওষুধের দরকার নেই, তবু ভাবল, ওষুধের সূত্রটা হাতে রাখা ভালো, যাতায়াতের পথ খোলা থাকবে। বলল, আমি পাঠিয়ে দেব, তবে

খুব observation-এ রাখতে হবে, ওবেলা না হয় একবার আসব।

লীলা বলল, observation মানে কি ?

চলাফেরা একদম বন্ধ।

তাহলে আজ না হয় কলেজে যাব না, আমাদের লেডি প্রিন্সিপাল আবার চিররুগ্ন, খিট্‌খিটে স্বভাব, ছুটি দিতে ভীষণ আপত্তি করে।

ফুচকি খান না কি ?

সর্বনাশ ! আগে ফুচকাওয়ালা কলেজের কাছে বসত, তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাতেই তো লোকটা সরে গিয়ে ওখানে বসে।

মায়ের অবস্থা দেখলেন তো, এখন ফুচকি খাওয়া ছাড়ুন, নইলে ভুগবেন।

ভয় কি, ডাক্তার আছে তো। কিন্তু ডক্টর রায়, ফুচকি বলা ছাড়ুন, লোকে শুনলে দেহাতী মনে করবে।

বিদায়ের সময়ে লীলা ফি দিল।

অশেষ বলল, ওবেলা না হয় একসঙ্গে নেব।

না তা হয় না, ওবেলার ফি ওবেলা।

ওবেলা আবার এল অশেষ। বিদায়ের সময়ে ফি দিতে গেলে অশেষ বলল, এবেলা তো আপনার কল দেননি, তবে আবার ফি কেন ?

নিষেধও তো করিনি।

ফি না নিয়ে উপায় রইল না অশেষের।

গ্যাসট্রাইটিস অতি অবাধ্য রোগ, তবে এক্ষেত্রে নিতান্ত সুবোধ ছেলের মতো ব্যবহার করল, তিনদিনে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেলে লীলাদের বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ হল অশেষের। বাড়িতে যাওয়া বন্ধ হলেও পথটা তো বন্ধ হয় না, পথে ঘাটে অনেক সময় দেখা হয় দু'জনের। এক পাড়াতেই দু'জনের বাড়ি, দুশো গজের মধ্যেই, মাঝখানে এক গলি, বাড়ির আড়াল মাত্র। কয়েক দিন পরে অশেষের ডাক্তারখানার সম্মুখে দু'জনের দেখা হল। অশেষ গাড়িতে চাপছিল।

লীলা শুধাল, গাড়ি কিনলেন কবে ?

এই সবে মাত্র, আজকেই প্রথম বউনি।

নিজেই চালান না কি ?

তাইতো চালাব ভাবছি। কোন্ দিকে যাচ্ছেন ?

শ্যামবাজারে মাসির বাড়িতে।

যদি কষ্ট না হয় তবে চলুন না পৌঁছেদি।

কষ্ট হবে কি না বুঝতে পারছি না, আমার উপর দিয়েই তো বউনি করছেন। এই বলে হেসে অসঙ্কোচে গাড়িতে উঠে পাশে বসল। যে সব মেয়ে আত্মরক্ষা করতে জানে লীলা তাদেরই একজন। বউনিতে গাড়ি, চালক ও আরোহিণী তিনজনেই রক্ষা পেয়ে গেল, তবে শেষ পর্যন্ত শেষ-রক্ষা হল না, হল না তার কারণ গোড়ায় গলদ ছিল না।

তারপর থেকে লীলাকে কলেজ পৌঁছানো, মাসির বাড়ি, পিসির বাড়ি, মামার বাড়ি প্রভৃতি স্থানে পৌঁছানোর দায়িত্ব সহজেই অশেষের উপরে এল। তবে বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার যেতে হলে যে আলিপুর খিদির-পুর গঙ্গার ধার হয়ে যাওয়ার একটা সরল পথ আছে তা প্রথম আবিষ্কার করল লীলা। একদিন গঙ্গার ধারে বাঁধানো বেঞ্চির উপর বসে দু'জনে গল্প করতে করতে লীলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, আচ্ছা আমার জন্যে যে এত তেল পোড়ান সে কি পরোপকার না কৌতূহল?

এ প্রশ্নের জন্য অশেষ প্রস্তুত ছিল না। বলল, মনে করুন পরোপকার।

এত ঘোরাঘুরির পরেও পর?

তবে মনে করুন কৌতূহল।

ঠিক করে বলুন।

ঠিক শুনলে কি খুশি হবেন?

দেখি।

আমি তোমাকে ভালবাসি। হল তো?

লীলা খুশি হল কি রাগল বোঝা গেল না, তখন সন্ধ্যার ঘোর তার মুখের উপরে ছায়া টেনে দিয়েছে।

এ সব কথা মেয়েরা অনেক আগে বোঝে। পুরুষের মনে ভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠবার আগেই বোঝে। প্রথম যেদিন বুঝল যে অশেষ তাকে ভাল-বাসে সে একবার হতভম্ব হয়ে গেল। সে একটা সামান্য মেয়ে, খেটে খায়। অন্যদিকে জ্ঞানে গুণে অবস্থায় সব দিকেই অশেষ অসামান্য। এমন অবস্থায় এ কি করে সম্ভব? কি করে সম্ভব সে জানে না, কেউ কোনদিন জানে না। তবে যে সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে লীলা নিঃসন্দেহ। তাই যেদিন অশেষ বিবাহের প্রস্তাব করল লীলা বলল, মাকে বলুন।

আগে মেয়ের মনের কথা জানি।

এতদিনেও যদি না জেনে থাক তবে ডাক্তারি করা ছেড়ে দাও।

পুলকিত অশেষ বলে উঠল, তবে তুমি আমাকে ভালবাস?

লীলা নির্বিকার ভাবে বলল, না।

চমকিত অশেষ বলল, তবে যে সেদিন বলেছিলে তেতলার ছাদের কোণটিতে বসে অনেক সময়ে আমার কথা ভাব।

ভুল শুনেছিলেন।

মুহ্যমান অশেষ বলল, তবে আমার সঙ্গে এমন ঘোরাফেরা কর কেন?

কাজের সুবিধা হয় বলে, বেড়াবার সুযোগ হয় বলে।

শুধু তাই?

হ্যাঁ।

তবে—

তবে আর কি, এখন বাড়িতে পৌঁছে দাও।

যদি কোন পাঠক ভেবে থাকেন যে মেয়েটি হতভাগ্য পুরুষটাকে খেলাচ্ছে, যেমন খেলিয়ে খেলিয়ে মাছটাকে টেনে তোলে শিকারী তেমন করে তবে তার চেয়ে ভুল আর কিছু হয় না। হ্যাঁ না দিয়ে বোনা যে অদৃশ্য জাল মনের মধ্যে ছড়ানো মেয়েটি তাতে ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছে। পুরুষ অসহায়, মেয়েরা অসহায়তর। কন্দর্প ও প্রজাপতির দড়ি টানাটানির অসহায় শিকার নর নারী। এ মন্তব্য পাঠকদের উদ্দেশ্যে, পাঠকরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে সাক্ষী মানলেই প্রকৃত কথা জানতে পারবেন।

॥ ৩ ॥

১৮ই অঘ্রাণ যথাশাস্ত্র লীলা ও অশেষের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম, কাজেই এ শোনা কথা নয়। দু'জনের মধ্যে ফুচকা সম্বন্ধে একটা চুক্তি হয়েছে। ফুচকির বদলে ফুচকা বলতে হবে অশেষকে, আর লীলা যখন ফুচকা খাবে সঙ্গে একটা করে সোডামিণ্ট ট্যাবলেট খাবে। আর সেই ফুচকাওয়ালা অশেষের দেওয়া নূতন ধুতি চাদরও পাগড়ি পরে সমাগত অতিথিদের ফুচকা বিতরণ করেছে—অবশ্য খবরটা জুগিয়েছে অশেষ। আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এখন লীলাকে শ্যামবাজার নিয়ে যেতে হলে ল্যান্সডাউন ওয়েলেসলি ও কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট বরাবর যায় অশেষ, আলিপুর খিদিরপুর হয়ে সোজা রাস্তায় আর যায় না। আরও কিছু পরিবর্তন এক বছর পরে। এখন ড্রাইভারে নিয়ে যায় লীলাকে, অশেষের আর সময় হয় না। আরও কিছু পরিবর্তন পাঁচ বছর পরে। এখন স্বামীস্ত্রীতে কদাচিৎ দেখা ও কথাবার্তা হয়, দু'জনেই নিজ নিজ কাজে ভারি ব্যস্ত। অশেষের পসার বেড়েছে, ছেলেমেয়েতে লীলার তিনটি। ফুচকা খাওয়ার সময় পর্যন্ত পায় না।

আয়না

অবশেষে কিছু কিনতেই হ'ল। চক্ষুলজ্জা তো আছেই, তারপরে তখন শুনলাম মার্কিন মুলুক আর বাঙ্গাল মুলুকেই শুধু সমঝদার আদমি আছে তখন আর কিছু না কিনে পারা গেল না। কারণ তাজগঞ্জের এই দোকানটিতে কিছু কেনা না কেনার সঙ্গে সুবে বাংলার সম্ভ্রম নাকি জড়িত। তাই এ শুধু পুরানো জিনিস ক্রয় নয় মার্কিন মুলুকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাও বটে, একে "জাতীয় কর্তব্য" বললে নিতান্ত মিথ্যা হয় না। কিন্তু কথা হচ্ছে কি কিনি। মার্কিন মুলু.কব ভূভ্রমণ বাতিকগ্রস্ত ধনীরা তাজগঞ্জের পুরানো জিনিসের দোকানে আর কিছু অবশিষ্ট রাখে নি। পারলে তাজমহলটা কিনে পাথরগুলো খসিয়ে দেশে নিয়ে যায়, ইংলণ্ড থেকে এমন নিয়ে যায়, যাচ্ছে, অতি পুরাতন স্মৃতিমণ্ডিত অট্টালিকাগুলো। তাজমহল সম্বন্ধে সে-রকম প্রস্তাব করেছে কি না জানি না, করলে অবশ্যই ভারত সরকার সম্মত হবে, কেননা বৈদেশিক মুদ্রার বড় টানাটানি। তাজমহলটা বিক্রি করতে পারলে মালগাড়ী তৈরির একটা কারখানার অর্থ জোগান হওয়া অসম্ভব নয়।

তবে ব্যাপারটা খুলেই বলি। তাজমহল দেখা শেষ ক'রে ফিরবার সময়ে মনে হল এখান থেকে পুরানো কিছু স্মৃতিচিহ্ন কিনে নিয়ে যাওয়া উচিত, নয়তো সকলে হয়তো বিশ্বাস করবে না এতদূর এসেছিলাম। এ সব জিনিসের দোকানের অভাব নেই এ পাড়াটায়।

পাড়াটার নাম আগেই বলেছি, তাজগঞ্জ। তাজমহল গড়তে কুড়ি বছর সময় লেগেছিল, প্রায় এক জেনারেশন কাল। অনেক হাজার কর্মী, সাধারণ মজুর থেকে বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ এ অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য হয়েছিল, অনেক ছোট বড় বাড়িঘর গড়ে উঠেছিল, তার পরে যখন তাজমহল গড়া শেষ হয়ে গেল তখন পাড়াটা আর ভেঙে গেল না, তাজগঞ্জ নাম নিয়ে রয়ে গেল, আজও রয়েছে। এ পাড়ার একটা বড় ব্যবসা পুরাতন জিনিসপত্র বেচা বলাবাহুল্য সমস্তই পুরাতন নয়; নূতনকে পুরাতন করবার কৌশল ওরা জানে; সেই পুরাতন কিছু কিনবার আশায় আট-দশখানা দোকান ঘুরলাম, কিছুই পাই নে, যা পাই হয়তো নিতান্তই বাজে, নয় সাধ্যের অতীত। অবশেষে স্থির করলাম আর বিলম্ব করা সম্ভব নয়, এখানেই শেষ দোকান মনে করে ঢুকে যখন জিনিস-পত্র নাড়াচাড়া করছি এমন সময় বাদশাহী বৃদ্ধ দোকানদার মার্কিন মুলুকের সঙ্গে বাঙ্গাল মুলুকের একটা ইকোয়েশান নিক্ষেপ করলো আমাকে লক্ষ্য করে। অতএব কিনতেই হবে।

অনেক দেরাজ, অনেক আলমারি, কাঠের ও লোহার সিন্দুক তন্ন তন্ন করে খুঁজে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি তখন চোখে পডলো চৌকো ছোট একখানা আয়না, তার একটা কোণ আবার ভেঙে গিয়েছে, চারিদিকে রুপোর ফ্রেম আঁটা, অবশ্য রুপো বলে এখন আর বুঝবার উপায় নেই, দোকানীর উক্তিই একমাত্র প্রমাণ। সেটা হাতে তুলতেই দোকানী সোল্লাসে বলে উঠল, বডি তাজ্জব চিজ, একেবারে খানদানী বস্তু, খোদ বাদশা সাজাহানেব সময়কার। অবশ্য দামটা দেবাব সময় বুঝলাম বাদশাহী আমলেব জিনিস বটে। তারপরে হোটেলে ফিবে এসে অনেকগুলো সুটকেসের কোন্ একটার কোন এক জায়গায় বেখে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভুলেই গেলাম।

২

একদিন বাড়ি ফিবে দেখি যে মুখে মৌসুমী মেঘ নামিয়ে পত্নী উপবিষ্ট। কিঞ্চিত রসিকতার হাওয়ায় মেঘ উডিয়ে দেওয়াব মানসে বললাম, শবৎকালে বর্ষাব মেঘ কেন? পাঠকদের অবগতির জন্য নিবেদন করি যে পত্নীব নাম শরণ্ময়ী। কিন্তু উল্টো ফল ফলল, মৌসুমী মেঘে বর্ষণ আরম্ভ হ'ল।

ব্যাপার কি, কি হয়েছে, কোন দুঃসংবাদ আছে নাকি, নানাবিধ প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পেলাম না। অবিরাম চলল,মেঘ,বর্ষণ ও কটাক্ষ বিদ্যুদ্দাম নিক্ষেপ। এ কি জ্বালা। তবে যেহেতু সমস্ত বিষয়েরই অবসান আছে, এ পালাবও শেষ হল, কান্না থামলো। একটা নূতন সত্য হৃদয়ঙ্গম হ'ল, স্ত্রীলোকের কান্নাব উৎসও অফুরন্ত নয়। তবে এই বিরতি নূতন আবর্তির ভূমিকা হ'তে পাবে আশঙ্কায় কণ্ঠে যাবতীয় মাধুর্য টেনে নিয়ে বললাম, লক্ষীটি বলো না কি হয়েছে? এবারে শরণ্ময়ীব মুখ ফুটলো, সে বললো, আমাকে আর কেন? যাব ছবি লুকিয়ে এনে বাক্সয় বেখে দিয়েছে তাব কাছে গেলেই তো ভালো হয়।

আকাশ থেকে পডলে মানুষের মনেব ভাবটা কি রকম হয় অনেকটা অনুভব করতে পারলাম।

কি বলছ? কার ছবি? কোথায় রেখেছি? কবে আনলাম!

যাও যাও, আর নেকামি করতে হবে না। কোথায় রেখেছ, কবে এনেছ, কার ছবি, কিছুই তোমার অজানা নয়।

আমি বললাম, দেখো জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়। এমন কাজ কোন্ দুঃসাহসে করতে যাবো!

আর সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ বুঝি পরস্ত্রীর ছবি এনে লুকিয়ে রাখা। তাই

আজ কিছুদিন থেকে তোমাকে অন্যমনস্ক উদাসীন দেখছি।

অবোধ নারীকে আফিসের রহস্য বোঝাতে চেষ্টা করা বৃথা। হিসাব বিভাগের কাজ আমার, এখন সালতামামি, আমার 'তহবিল মিল গ্রস্ত ছল-ছল লোচন প্রান্ত।' অবশ্য শরন্ময়ী হিসাব মেলাবার একটা সহজ উপায় আবিষ্কার করেছে। দু'চার দিন পরপর হিসাবের খাতায় 'তহবিল গরমিল, বলে কখনো ৬২।/০, কখনো ১০২৭/০ লিখে তহবিল মিলিয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু আমার বেলায় টাকাটা অপরের আর মালিক ঠিক আমার স্বামী নয় (যদিচ ইংরাজি মতে স্বামী বলতে Master ও Husband দু-ই বোঝায়), তাই ঠিক ও উপায়টা আমার বেলায় অচল। তাই কিছু বোঝাবার চেষ্টা না করে কণ্ঠস্বরে সময়োচিত গাম্ভীর্য এনে বললাম, চলো কোথায় কি রেখেছি দেখাবে—এই বলে হাতে ধরে তাকে তুলে দাঁড় করালাম।

নিঃশব্দে সে গিয়ে একটা পুরাতন সুটকেস খুলে ফেলল। এবং কতক কাপড় চোপড় তুলে ধরে এই দেখো বলে হঠাৎ অবাক হয়ে গেল।

এ সেই আগ্রা থেকে আনা আয়নাখানা যার কথা আমি ভুলেই গিয়ে-ছিলাম। এমনি ভুল হয়েছিল যে ফিরে এসে বের করবার কথাও মনে হয়নি।

আমি বললাম, আয়নাখানা আগ্রায় কিনেছিলাম, সামান্য পুরানো ভাঙা জিনিস দশগুণ দামে চাপিয়ে দিয়েছিল আমার ঘাড়ে। তা কি হয়েছে পরস্ত্রীর ছবি কোথায়?

যে বিস্ময়ে স্ত্রীলোকের কণ্ঠ বাক্‌রুদ্ধ হয় সে যে কি অসামান্য বস্তু সহজে অনুমেয় নয়। তাই সে চেষ্টা আর করলাম না। অবশেষে সে নিজেই বলে উঠল, কি আশ্চর্য, এই কাচের মধ্যে একটি অতি সুন্দরী মেয়ের ছবি দেখেছিলাম।

বললাম, এতক্ষণে বুঝেছি, নিজের মুখখানাই দেখেছিলে। মনে রেখো ওখানা আয়না।

সুন্দরী অভিযোগ একেবারে সরাসরি অস্বীকার না করে বলল, তা কি করে হবে, তার গায়ে যে মোগলাই পোশাক ছিল।

তবে চোখের ভুল!

কখখনো নয়, বলে চোখ থেকে বার কয়েক কটাক্ষদাম নিক্ষেপ করে বুঝিয়ে দিল এহেন চোখের ভুল হওয়া অসম্ভব।

আয়নাখানা টেনে বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, নাও এটা তো-মাকেই দিলাম।

সেদিনের মতো পর্ব এখানেই মিটে গেল।

আয়নাখানা আমার স্ত্রী শয়নঘরে ঝুলিয়ে রেখে দিল। বললাম, ভালোই হল, মাঝে মাঝে তোমার সুন্দর মুখখানা দেখতে পাবে। সেদিনের ব্যাপারটা যে তার নিছক চোখের ভুল সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়, এমন কি ক্রমে তারও সেই ধারণা হল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দুজনেরই ধারণা বিষম নাড়া খেল। সেদিন সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী তার বান্ধবীদের সঙ্গে 'মন নিয়ে ছিনিমিনি' নামে যুগান্তকারী সিনেমা দেখতে গিয়েছে। তার অনেক অনুরোধে সত্ত্বেও সিনেমায় আমি বড় যাইনে, বলেছি যে সংসারটাই এমন আবোল তাবোল যে সিনেমায় যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনে। কি একটা প্রয়োজনে শয়নঘরে ঢুকেছি, ঘরে নিস্তেজ একটা নীল আলো জ্বলছে, দরজায় ঢুকতেই চোখে পড়ে আয়নাখানা। হঠাৎ চোখের উপরে বিদ্যুৎচমকের মতো ভেসে উঠল একটি রমণীয় নারীমুখচ্ছবি। ভাবলাম তবে তো স্ত্রীর কথা মিথ্যা নয়, আয়নাতে এ কার প্রতিবিম্ব! পর মুহূর্তে মনে মনে হাসলাম। আরে রাম। এ যে উল্টো দিকে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের মেয়েটার প্রতিবিম্ব। ঘাড় ফিরিয়ে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এ কি! এ যে বিলিতি মেয়ে, পোশাকটাও সেই দেশী! আয়নার ছবিতে যে মোগলাই পোশাক। মিলিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে আয়নায় তাকিয়ে দেখি কোথাও কিছু নেই, শুধু তাই নয়, ক্যালেণ্ডারের প্রতিবিম্ব পড়া সম্ভবও নয়। একি হল! চোখের ভুল, না মনের ভুল। একেই auto suggestion বলে! যাই হোক, ঘটনাটা মনেই চেপে রাখতে হবে, কাউকে, বিশেষ আমার স্ত্রীকে বলা চলবে না।

কিন্তু বেশিদিন না, বেশিক্ষণ চেপে রাখা সম্ভব হল না। সেই রাতেই ঘটনাটি ঘটল। মাঝ রাতে হঠাৎ আমার স্ত্রী ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল, শীগ্‌গির ওঠো।

ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠে শুধালাম, কি হল?

আয়নার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্ত্রী বলল, সেই মুখ।

কোথায় দেখি।

আয়নায় তাকিয়ে দেখি কোথাও কিছু নেই, পরিষ্কার স্বচ্ছ কাঁচ।

না না, ও কিছু নয়, চোখের ভুল। বললাম বটে তবে কণ্ঠস্বরে আর তেমন প্রত্যয় ছিল না, নিজেও একবার দেখেছি কি না।

তারপরে আমিও বারকয়েক সেই মুখ দেখেছি, স্ত্রীও দেখেছে, অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় ভীতির ভাব কমে এসেছে। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য

করলাম যে দুজনে একসঙ্গে কখনো দেখিনি। আর দেখিনি দিনের বেলায়।

একদিন আমার স্ত্রী বলল, দেখো আয়নাখানায় কিছু দোষ আছে, ফিরিয়ে দাও।

বাঃ, নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছি, ফিরিয়ে দেব কেন ?

তা হোক্, ও জিনিস ঘরে রাখলে অমঙ্গল হবে।

হ'লও তাই, বেশীদিন বিলম্ব হল না।

হঠাৎ স্ত্রীর আর্তস্বরে জেগে উঠে দেখি যে মেঝের উপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় তুলে শুইয়ে চেখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, পাখাটা জোর ক'রে দিয়ে নাকের কাছে স্মেলিং সল্ট-এর শিশি ধরলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুললো, চোখে তখনো উদ্‌ভ্রান্তির ঘোর। শুধালাম, কি হয়েছিল ?

মেয়েটাকে খুন ক'রে ফেললো।

বুঝলাম মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অনিবার্য পরিণাম। বললাম, এখন ঘুমোও, পরে শুনবো।

পরে শুনলাম। পরদিন আমার স্ত্রী বলল, রাতে একবার উঠেছিলাম স্নানের ঘরে যাওয়ার জন্যে। ফিরে আসতেই চোখ পড়লো আয়নার দিকে, আর দেখলাম, পাঠান গোছের একটা ষণ্ডা লোক এক হাত দিয়ে মেয়েটির মুখ চেপে ধরে বুকে মস্ত একখানা ছুরি বসিয়ে দিল, আর ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। উঃ, সে কি রক্ত! যেন গোলাপ ফুলের ফোয়ারা। তারপরে একটু থেমে বলল, ঐ অলুক্ষণে আয়না আমি খুলে রেখে দিয়েছি, হয় তুমি ফেরৎ পাঠিয়ে দাও নয় আমি গঙ্গায় ফেলে দেব।

বললাম, গঙ্গায় ফেলে কাজ নেই বরঞ্চ যমুনায় ফেলে দেবো। শীগ্‌গিরই আমাকে যেতে হবে আগ্রায়, আয়নাখানা আমার বাক্সে দিতে ভুলে যেয়ো না।

আগ্রায় হোটেলে এসে উঠেছি। দেশের বড় বড় শহরে হিসাব পরীক্ষা ক'রে বেড়ানো আমার কাজের অঙ্গ। সঙ্গে আয়নাখানা এনেছি, দোকান-দারকে বলে-কয়ে ফিরিয়ে দেব, দেখি যদি টাকাটা ফেরৎ পাওয়া যায়।

হোটেলের lounge-এ অর্থাৎ বিশ্রামকক্ষে কয়েকজন অতিথি অপেক্ষা করছিলেন, কমন্ লাঞ্চের ডাক পড়বে। বড় বড় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবার এটা উত্তম অবসর, কাজেই দেশ সমাজ যুদ্ধোত্তর পৃথিবী সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলছিল। এমন সময়ে কয়েকজন অতিথি শহর

[রে পুরাতন দ্রব্য ক্রয় করে ফিরলেন।

তাজগঞ্জ থেকে সব কিনলেন বুঝি ? শুধালেন একজন প্রবীণ ব্যক্তি।

ক্রেতাদের একজন বললেন, হঁ্যা, দামটা বোধ করি কিছু বেশি নিয়েছে।

তা তো নেবেই, মার্কিনী টুরিস্টদের জ্বালায় আগ্রার ধুলোমুঠি সোনামুঠির দরে বিকোচ্ছে। দেখি কি কিনলেন ?

নানা জনের পকেট ও প্যাকেট থেকে বের হয়ে এল ভাঙা পাথরের বাটি, পাথরের উপরে মিনাকরা ছবি—এমনি সমস্ত বহুমূল্য আবর্জনা।

এসব কেনায় বিপদ আছে।

আছে বইকি, দাম দশগুণ অথচ কিছু না কিনে উপায় নেই, আগ্রায় স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে যেতে হবে তো। বললেন একজন ক্রেতা।

সে বিপদ তো আছেই, তবে সে কথা বলছি না। বললেন সেই প্রবীণ ব্যক্তি। তবে আর কি হতে পারে ?

তবে শুনুন। কয়েক বছর আগে তাজগঞ্জের একটা দোকান থেকে কোণ-ভাঙা এক আয়না কিনেছিলাম অনেক দাম দিয়ে।

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।

পূর্বোক্ত ক্রেতা সাগ্রহে শুধালেন, তারপরে ?

সে এক অলুক্ষণে আয়না মশাই। তাতে মাঝে মাঝে নানা রকম প্রতিবিম্ব দেখা যেতো। কখনো দেখা যেতো সুন্দরী একটি মেয়ের মুখ, কখনো দেখা যেতো একটি সুপুরুষ যুবা পায়রা ওড়াচ্ছে, এমন আরও কত কি! আমার স্ত্রী বললেন, অলুক্ষণে আয়নাখানা ফেরৎ দিয়ে এসো। আরে ফেরৎ দেওয়া কি সহজ, আবার আগ্রায় আসতে হয়। আমি তখন থাকতাম নাগপুরে।

সবাই নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে শুনছে।

তারপরে ?

একদিন রাতে স্ত্রী চীৎকার ক'রে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অনেক চেষ্টায় মূর্ছা ভাঙালাম। তখন তিনি বললেন, রাতে একবার জেগেছিলেন তখন ঐ আয়নায় দেখতে পেলেন যে এক গুণ্ডাধরনের পাঠান দুর্বৃত্ত সেই সুন্দরী মেয়েটিকে খুন করছে।

কি সর্বনাশ !

সর্বনাশের সবটা এখনো শোনেননি। সেই বিভীষিকার প্রতিক্রিয়ায় কয়েকদিনের মধ্যে আমার স্ত্রী মারা গেলেন।

ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ?

দেখিয়েছিলাম বইকি। তিনি বললেন স্ট্রোক। ডাক্তারদেব ঐ এক কথা, বিদ্যায় না কুলোলে স্ট্রোক বলে সংক্ষেপে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। তারপরে আগ্রায় এসে দোকানীর হাতে-পায়ে ধরে আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম সর্বনাশা আয়নাখানা।

ক্রেতারা একবাক্যে বললেন, না মশায়, আয়না কিনিনি আমরা কেউ।

আমি বুঝলাম সেই সর্বনাশা আয়না এতদিন পরে আমার ভাগ্যে জুটেছিল।

শ্রোতাদের কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেন, বললেন, চোখের ভুল।

সেই প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, চোখের ভুলই হোক আর মনের ভুলই হোক যেমন দেখেছিলাম, যেমন ঘটেছিল বললাম, বিশ্বাস করতে কাউকে অনুরোধ করছি না।

এতক্ষণ আর একজন প্রবীণ ব্যক্তি নীরবে শুনছিলেন, কোন কথা বলেননি, এবারে বললেন, এতে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। কোন কোন পুরানো বাড়ীতে যেমন অশরীরীর আনাগোনা হয়ে থাকে, ঐ আয়না-খানাতেও তেমন ঘটেছে।

তারপর তিনি ব্যাখ্যা শুরু করলেন।

কোন বাড়িতে প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের ফলে খুন জখম হ'য়ে গেলে পরবর্তী কালে মাঝে মাঝে অনেক সময়ে সেই খুন জখমের তারিখটিতে তারই প্রতিভাস দেখা যায়। আমরা সমস্ত ইতিহাসটা জানিনে বলেই খাপছাড়া বা ভুতুড়ে মনে করি। ঐ আয়নাখানাতেও তেমনি একটা ইতিহাসের ছাপ থেকে গিয়েছে। হয়তো ঐ আয়নার সম্মুখেই খুনটি ঘটেছিল। ফটোগ্রাফের প্লেটে যেমন ঘটনার ছাপ থেকে যায় আয়নাখানাতেও তেমনি ছাপ রয়ে গিয়েছে।

তবে সব সময়ে দেখতে পাওয়া যায় না কেন ? শুধালেন একজন শ্রোতা।

ফটোগ্রাফের নেগেটিভেও সব সময় ছাপ দেখতে পাওয়া যায়! তার জন্যে আলোয় তুলে ধরা আবশ্যক। এসব অলৌকিক প্রত্যক্ষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ আবশ্যক।

অন্য একজন প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা দোকানী ফেরৎ নিতে চাননি কেন ?

এ তো সহজ কথা। সে ঐ অলুক্ষণে আয়না বিদায় করতে চায়। সে জানতো ওর কাণ্ডকারখানা।

এমন সময়ে ওয়েটার এসে জানিয়ে গেল খানা তৈরি। কাজেই এ গভীর আলোচনার এখানেই অবসান হ'ল। অমি আর দোকানীকে ফেরৎ দেওয়ার চেষ্টা করলাম না। সন্ধ্যাবেলায় যমুনার ধারে গিয়ে আয়নাখানা জলে ফেলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

রাতে জরুরী টেলিগ্রাম পেলাম : দুপুরবেলায় হঠাৎ আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তারে বলেছেন—স্ট্রোক।

দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারী

রণজিৎ ব্যস্তসমস্তভাবে বাড়িতে ঢুকে ডাকাডাকি শুরু করল, বেতসিনী দেখ কি পেয়েছি।

রণজিৎ ও বেতসিনী নববিবাহিত দম্পতি।

পাশের ঘরে বেতসিনী কেক তৈরি করবার উদ্দেশ্যে ক্রীম দিয়ে ময়দা মাখছিল তবে নবনীনিন্দিত কর হওয়ায় তা চোখে পড়ল না রণজিতের। বিবাহের পরে প্রথম কিছুকাল দম্পতির চোখ কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্বকর্ম-সাধনে বিস্মৃত হয়।

দেখ কি পেয়েছি। বলে ছোট একখানি পুস্তিকা এগিয়ে দিল পত্নীর দিকে।

পথে ঘাটে যে-সব বিজ্ঞাপন-পুস্তিকা বিতরিত এ তাদেরই একখানা।

বেতসিনী দেখল বড় বড় হরফে লেখা আছে দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটল নার্সারি। কথাটা প্রথমে ইংরাজিতে পরে বাংলা অক্ষরে লিখিত। পড়ে কিছুই বুঝতে পারল না, শুধাল, ব্যাপার কি?

পড়েই দেখ।

তুমি পড় আমি শুনি, আমার হাতে ময়দা লেগে আছে।

রণজিৎ পড়তে শুরু করল। আগে অনেকবার সে পড়েছে, এবারে বেতসিনীর জন্যে। সে পড়ছে—'যেহেতু শিক্ষা জাতির প্রধান খাদ্য,যেহেতু অন্নবস্ত্র ঔষধ প্রভৃতি ছাড়াও মানুষে কোনরকমে টিকিয়া থাকিতে পারে; যেহেতু শিক্ষা বিহীন জাতি কম্পাসহীন তরণী, ব্রেকহীন মোটরগাড়ি, সেই হেতু শিক্ষার দিকে জাতীয় মনোনিবেশ সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কর্তাগণ শিক্ষার দিকে যথোচিত মনোযোগ দেন নাই—তার বদলে বড় বড় কল-কারখানা ও কৃষিকর্মের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করায় দেশের আজ এই দুর্দশা। চীনের ও পাকিস্তানের আক্রমণ, উত্তরবঙ্গের বন্যা, ঘন ঘন রেল-কলিশন সমস্তই যথোচিত শিক্ষা-হীনতার ফল। আবার সমস্ত শিক্ষার মূলে শিশু-শিক্ষা। এ তথ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর জানিতেন বলিয়াই তাঁহারা যথাক্রমে শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় লিখিয়া গিয়াছেন।'

বেতসিনী বাধা দিয়া বলল, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বদলে হবে মদন-মোহন মালব্য, দেখ কত বড় ভুল, এটাও শিক্ষার অভাবে।

না, বেতসিনী, নামটা হবে মদনমোহন ঢনঢনিয়া।

তা হবে, তবে আমাদের এম-এ বাংলা সিলেবাসে তাঁর বই ছিল না, কি করে জানব বল।

আমরা জানি কি না, আমাদের এম-কম সিলেবাসে তাঁর লিখিত বই পাঠ্য ছিল। যাক্, এখন শোন।

'অথচ দেশে শিশু শিক্ষাব কোন ব্যবস্থাই নাই, ফলে যেটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বনিয়াদহীন অট্টালিকার মত তাহা দুর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (এখানে দুজনেই হাতজোড করে উদ্দেশ্যে নমস্কাব করল) ও মহামতি বারট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষীগণ বলিয়াছেন যে পাঁচবছব বয়সের মধ্যে শিশুরা যেটুকু শিক্ষালাভ করে তাহাই তাহাদের জীবনের সমস্ত শিক্ষার বনিয়াদ ও মূলধন। অথচ দেশে সেরকম শিশু-শিক্ষা ভবন বা নার্সারি একটিও নাই। তাই এই জাতীয় অভাব দূবীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারি স্থাপন করিয়াছি।'

বেতসিনী বলল, দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারি! সেটা আবার কি? কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। তুমি বুঝেছ রণু?

আগে বুঝিনি, তবে বার কয়েক পডবাব পরে বুঝতে পারলাম।

তবে পড, দেখি বুঝতে পারি কি না।

রণজিৎ আবাব আরম্ভ করল—দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারি কি না মহৎ জন্ম-পূর্ব শিশুভবন।

সে আবার কি বণু, জন্ম পূর্ব মানে কি ?

আহা মন দিয়ে শোনই না বেটসি।

বল, ওদিকে আমার কেকগুলো বোধহয় পুড়ে গেল।

যাক গে। এ তার চেয়ে অনেক জরুবী।

'ইহা কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। জাতীয় পবিত্র কর্তব্য সাধনের উদ্দেশ্যে ইহা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। শিশুর জন্মের পূর্বেই তাদের জন্য সীট রিজার্ভ করা হইয়া থাকে, তাই প্রি-নেটাল বা জন্ম পূর্ব। ইতিমধ্যে সমস্ত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন হইতে পাঁচ হাজারেব অধিক দরখাস্ত পডিয়াছে, কিন্তু মাটিব সন্তানগণেব অর্থাৎ সনস্ অফ দি সয়েলেব দাবি অগ্রগণ্য। সম্ভাবিত অভিভাবকগণ সাক্ষাতে বিস্তারিত বিববণ অবগত হোন। বিলম্বে হতাশ হইবেন। শিক্ষাধ্যক্ষ, ৪৯ নম্বর উডুম্বর রোড, কলিকাতা।'

এবারে তো বুঝলে?

কতকটা।

তবে চল আর দেরি নয়। তিনটে সীট রিজার্ভ করে আসা যাক।

বেতসিনী সলজ্জ মুখে বলল, কিন্তু আমাদের এত তাড়া কিসের ?

বল কি, সীট ফুরিয়ে গেলে হতাশ হতে হবে।

কিন্তু আমাদের তো দেরি আছে।

আরে সেই তো রক্ষে, সীট পেতে অসুবিধা হবে না।

তবে চল, যাওয়া যাক। কিন্তু তিনটে সীট বললে কেন ?

বাঃ, লাল ত্রিকোণ দেখ নি ? 'দো তিন বচ্চে, বস্'।

যত সব মাথা আর মুণ্ডু। দেখ, অমনি যাওয়ার পথে সুলেখাকেও খবরটা দিতে হবে, ও শীগ্‌গীরই এন্‌গেজড্ হতে চলেছে।

বেশ তাই হবে। শীগ্‌গীর কাপড় বদলে এস।

বেতসিনী তৈরি হয়ে এসে বলল, নাও চল, কিন্তু এদিকে আমার সব কেকগুলো পুড়ে গেল।

পোড়াটা কেকের উপর দিয়েই যাক, দেরি হলে নিজেদের কপালটাও পুড়ত।

সুলেখাদের বাড়ি কাছেই। ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করে বেতসিনীরা দেখতে পেল যে সুলেখা ও তার ফিঁয়াসে ভবানন্দ পরস্পরের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে বসে আছে। ধ্যানভঙ্গ হল তাদের, সুলেখা বলল, ব্যাপার কি ? একেবারে দো-নলা বন্দুক যে।

বেতসিনী বলল, দেখতে এলাম তোমাদের দো-নলা বন্দুকটা কতখানি তৈরি হল।

বস, বস।

না বসব না, তোমরাই ওঠ।

এমন জরুরী হুকুম কেন ?

যেতে যেতে বলব, এখন চল।

ওরা বের হওয়ার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল, তাই দেরি হল না, আর মনে হল খুশিই হল, তবে দুজনে একা বেরুতে পারলে আরও খুশি হত। আহা কবিগুরু কি কথাই না শুনিয়েছেন, 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি'। কিন্তু হায়, পথে যে অনেক লোক !

গাড়িতে উঠে বেতসিনী পুস্তিকাখানি দিল সুলেখার হাতে, বলল, নাও,

ইতিমধ্যে পড়ে ফেল। তারপরে ভবানন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার জন্যেও ওটা।

দুজনে পড়তে শুরু করল। গাড়ি চলছে।

পড়া শেষ হলে ভবানন্দ বলে উঠল, বোগাস, আর এক ৪২০ আবির্ভূত হল কলকাতায়। ওদের অবিলম্বে পি ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা উচিত।

সুলেখা বলল, তোমার সব কথাতেই অবিশ্বাস।

সাধে কি আর অবিশ্বাস হয়েছে, ঠকে ঠকে আর কাউকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। ডাক্তারে ব্যবসা খুলেছে, নার্সিং-হোম নামে, হাসপাতালে আর তাদের মন নেই,হাসপাতালে যত অব্যবস্থা বেশি হবে তত নার্সিং-হোম জেগে উঠবে। শিক্ষকেরা ব্যবসা খুলেছে টিউটোরিয়াল হোমে, স্কুলের দিকে আর কারো মন নেই,ইস্কুল যত খারাপ হবে তত জেঁকে উঠবে টিউটোরিয়াল হোম। এবারে এল সেবা ৪২০। জন্মেরই আগেই দোহন করবে বাপ-মাকে। রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ।

তবেই দেখ, রামায়ণ খানা তো মিথ্যা নয়।

এটাও তো মিথ্যা নয়। আর একেবারেই মিথ্যা নয় যে টাকাগুলো ওখানে জমা পড়বে। কিন্তু আমাদের কেন ডেকে নিয়ে এলেন মিসেস রায় ?

বেতসিনী বলল, একটু আগে থেকেই ব্যবস্থা করা কি উচিত নয় ?

কোথায় কি তার ঠিক নেই, এখনই—

তার বাক্য সমাপ্ত হতে পারল না, রুক্ষস্বরে সুলেখা বলে উঠল, কি, তোমার কি কেটে পড়বার মতলব আছে নাকি ?

ইতিমধ্যেই সুলেখার কণ্ঠস্বরে সাধ্বী পত্নীর ঝাঁঝ লেগেছে।

ভবানন্দ হো হো করে হেসে উঠে বলল, বাপরে সাধ্য কি ? প্রণয়িণীর কামড় একেবারে কচ্ছপের কামড়, কেটে পড়ি এমন সাধ্য কি ?

আমি কচ্ছপ ?

নিন্দা করিনি তোমার সুলেখা, কচ্ছপ দশাবতারের মধ্যে গণ্য।

বেতসিনী রাস্তার নিশানা দেখছিল, বলে উঠল, এই তো উদুম্বর রোড।

ভবানন্দ শুধালো উদুম্বর মানে কি বেতসিনী দেবী ? আপনারা তো আবার বাংলায় এম-এ কি না।

মনে পড়ছে না তো। এখন বুঝতে পারছি প্রফেসাররা কেবলই ফাঁকি দিয়েছে।

সুলেখা বলল, উদুম্বর বোধহয় দুম্বা ভেড়া।

অসম্ভব নয়, বলল বেতসিনী।

খুবই সম্ভব, নতুবা এখানে আসছি কেন? দুম্বার লেজের মত বাড়তি টাকাগুলো মাসে মাসে কেটে রাখবে দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারি।

এই তো ৪৯ নম্বর, বলে রণজিৎ ব্রেক কষে গাড়ি থামাল।

তখন চারজন নেমে পড়ে নম্বরের মধ্যে প্রবেশ করল।

॥ ২ ॥

দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারির অফিস একেবারে রীতিমত অফিস। ঘরের মেঝে থেকে শুরু করে দরজা জানালা আসবাবপত্র আর তরুণী রিসেপসনিস্ট অবধি সমস্ত চকচকে ঝকঝকে যেন আয়না দিয়ে মোড়া,তাকালে চোখ ঝলসে যায়। সুলেখা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ভবানন্দর দিকে, ভাবটা, কেমন এখন বিশ্বাস হল তো!

ওরা অফিসে ঢুকতেই তরুণী রিসেপসনিস্ট সুকুমার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠে ওষ্ঠাধরে আনকোরা নূতন রজতমুদ্রার মত হাসি ফুটিয়ে শুধাল—ওয়েল, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

ওরা আসবার কারণ বলল।

তরুণী ওদের বসতে বলে পিছন দিকের একটি দরজার ভারি পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করল। ওরা দেখল দরজার উপরে লেখা আছে 'দি প্রোমোটার'। মুহূর্ত পরে তরুণী বেরিয়ে এসে জানাল যে সাহেব সাধারণতঃ বিকালে কারো সঙ্গে দেখা করেন না; সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ভর্তির আবেদন নিয়ে থাকেন। যাই হোক আপনাদের বেলায় ব্যতিক্রম করছেন। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।

তরুণীকে অনুসরণ করে ওরা চার জনে ঢুকল সেই ঘরে। সে ঘরটিও যেন আয়না দিয়ে মোড়া,যেমন ঘর থেকে বিভ্রান্তি জন্মেছিল সেকালে দুর্যোধনের। চেয়ারে উপবিষ্ট সুবেশ সুপুরুষ সুদর্শন তরুণ, যিনি নাকি এই প্রতিষ্ঠানের প্রোমোটার বা উদ্যোক্তা মিঃ দেব।

ওরা উপবিষ্ট হলে ওদের দিকে তাকিয়ে প্রোপ্রাইটার বলল—ওয়েল?

ওদের মুখপাত্ররূপে রণজিৎ বলল, দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারি সম্বন্ধে আমরা জানতে চাই।

দেব শুধাল, বিজ্ঞাপনে আশা করি দেখেছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু বিজ্ঞাপনে তো সব কথা নেই, সাক্ষাতে জানতে হবে লেখা ছিল।

দেব বলল, একটা নূতন আয়োজন, এ হেন পরিকল্পনা আর কোথাও নেই বা হয় নি। শিক্ষা সম্বন্ধে অভিনবতম উদ্যোগ।

ভবানন্দ বলল, ওসব তো বিজ্ঞাপনেই ছিল, যা ছিল না তাই জিজ্ঞাসা করতে চাই।

করুন।

বিজ্ঞাপনেব ফলে কি বকম সাড়া পাচ্ছেন ?

আশাতীত, অভূতপূর্ব, ওয়াণ্ডারফুল। ইতিমধ্যেই প্রায়— আচ্ছা সঠিক সংখ্যা বলছি— এই বলে বোতাম টিপল, অফিস-বয় এসে দাঁডাল।

দেব বলল, সেক্রেটাবি।

মুহূর্তকাল পরে চকচকে এক তরুণী ঢুকল।

বেতসিনী দরজার পর্দার দিকে তাকিয়ে ছিল, লক্ষ্য কবল, পর্দাব ফাঁকে বিসেপসনিস্টের দুটি চোখ।

মিস সরকার, এ পর্যন্ত কত দরখাস্ত এসেছে ?

কুডি হাজার তিনশো তিয়াত্তর।

দেশের বাইরে থেকে কত ?

পাঁচ হাজার একশো খানা।

দেখলেন তো ব্যাপার। লোকে চায় শিক্ষায় যুগান্তর, এতদিনে মনের মত পরিকল্পনা পেয়েছে কিনা!

এবারে ভবানন্দ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল—

আপনারা সবশুদ্ধ কত ছাত্র নেবেন ?

গোণাগুণতি সাড়ে পাঁচশো। বাই দি বাই, আমরা ছাত্র বলিনে, বলি ইনমেট। ঐ 'ছাত্র' নামটাই ছাত্রদের খারাপ করে দিয়েছে, ডিমরালাইজড্ করে ফেলেছে, তাছাড়া ছাত্র না থাকলে ছাত্র-আন্দোলনও বন্ধ হবে।

আপনাদের পরিকল্পনাটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

বিলক্ষণ! তিন বছর বয়সে ইনমেটকে আমরা নেব, দু' বছর পরে পাঁচ বছর বয়সে তাদের ছেড়ে দেব, ওরই মধ্যে তাদের মনে এমন শুভ পরিবর্তন এনে দেব যার উপরে ভাবী শিক্ষার বনিয়াদ খাড়া হতে পারবে। ওদের বয়স যতই বাড়ুক, আমাদের ছাপ কখনো উঠবে না, যে দেখবে বিস্ময়ে গর্বে

অপরকে দেখিয়ে বলবে হিয়ার গোজ দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারি।

সরকারী সাহায্য পান আপনারা ?

পাই, তবে চাইনে।

তার মানে ?

সরকার সাধাসাধি করছে, আমরা কানে তুলছি নে।

কেন ?

এ আর বুঝলেন না, দর বড়াবার জন্যে।

আপনারা কি শেখাবেন ?

তিন বছব বয়সে আর কি শেখানো যায়। আমরা সে চেষ্টাই করব না।

তবে ?

ওদের মনটাকে বদলে দেব।

কেমন করে ?

সেটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, সব বুঝতে পারবেন না।

বেতসিনী ব্যাকুল ভাবে শুধালেন, মারধোর করবেন না তো ?

দেব হেসে উঠে বলল, ও ডিয়ার, নো, নো।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবাব তার চোখ পড়ল পর্দাব ফাঁকে, আবার এক-জোড়া চোখ। এবারে রিসেপসনিষ্ট তরুণীর। সেক্রেটারি অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।

এবারে আবার আরম্ভ করল রণজিৎ,বেতসিনী ও সুলেখা মুগ্ধ হয়ে শুনছে মাঝে মাঝে দেখছেও বটে, যেমন ঐ পর্দার ফাঁকে জোডা জোডা চোখ।

বেতন কত ?

মাপ করবেন, আমরা বেতন বলিনে, বলি ইনটেক।

বেশ।

ইনটেকের তিন রকম। গর্ভস্থ অবস্থায় একরকম, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে এক রকম, আর ভর্তি হওয়ার পরে এক রকম।

রণজিৎ বিস্ময়ে বলে উঠল, গর্ভস্থ শিশুকেও ভর্তি করেন নাকি ?

অবশ্যই করি। এমন কি যে নর-নারীর এখনো বিয়ে হয়নি, হবে বলে স্থির হয়েছে, তারাও ইচ্ছে করলে সীট রিজার্ভ করতে পারেন।

আশ্চর্য !

আশ্চর্য বলে আর কিছু রইল কি, মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌছল, বলল দেব।

বেতনের রকমটা কি রকম শুনতে পাই না ?

নিশ্চয়। এই বলে বোতাম টিপল, বলল, সেক্রেটারি।

কিন্তু সেক্রেটারি এসে পৌঁছবার আগেই এসে ঢুকল রিসেপসনিস্ট।

আপনাকে নয়, মিস সরকারকে।

অপ্রসন্ন মুখে বের হয়ে গেল সে, প্রসন্নমুখে ঢুকল মিস সরকার।

ইনটেকের টেব্‌ল খানা।

টেব্‌ল এনে হাতে দিয়ে বের হয়ে গেল মিস সরকার।

এই যে, বলে পড়তে আরম্ভ করল মিঃ দেব—শুনুন, গর্ভস্থ শিশুর জন্যে ইনটেক দিতে হবে মাসিক একশো টাকা।

কিছু বেশি হল না ?

রিস্ক্ হিসাব করলে মোটেই বেশি নয়।

রিস্ক আবার কি ?

মিসক্যারেজ হয়ে যেতে পারে।

আই সি, বলল রণজিৎ।

এসব জীবনবীমার নীতি অনুসারে পরিকল্পিত।

আবার দেখুন যে-সব স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ হয়েছে তাদের পক্ষে সন্তান কনসিভ্‌ড্‌ হওয়ার আগে মাসিক দেড়শো, শিশু গর্ভস্থ হলে একশো করে।

এখানে আবার একটু বেশি হল কেন ?

সহজেই বুঝতে পারবেন, ডাইভোর্স হয়ে যেতে পারে সে রিস্কটা তো হিসাবে ধরতে হবে।

আর ? বলে প্রতীক্ষায় রইল রণজিৎ।

যাদের মধ্যে বিয়ের কথা চলছে তাদের পক্ষে এককালীন তিন হাজার টাকা।

এককালীন আবার কেন ?

বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যেতে কতক্ষণ ? আবার যে-সব তরুণ-তরুণী বিয়ে করবার আশায় মন দেয়া-নেয়া করছে তারা এই ধারায় পড়বে।

কেন ?

এ তো বোঝা উচিত, আপনাদের বয়স অল্প। অনেকেই শেষ পর্যন্ত কেটে পড়ে কি না।

সুলেখা কটাক্ষে তাকাল ভবানন্দর দিকে।

আর ?

আর তো নেই। ভর্তি হওয়ার পরে আর কোন ইনটেক নেই।

কেন ?

তখন যে তারা ইনমেট। আপনার ছেলের কাছ থেকে কি আপনি বেতন নেবেন ?

রণজিৎ ও ভবানন্দকে স্বীকার করতে হল ওয়াণ্ডারফুল স্কীম।

বেতসিনী ও সুলেখা বলে উঠল, আমরা আগেই বলে ছিলাম।

রণজিৎ বলল, আমরা সীট রিজার্ভ করতে চাই।

বেশ, আপনাদের কি স্ট্যাটাস বলুন ?

আমরা দু'জনেই বিজনেসম্যান।

না, না, সে স্ট্যাটাস নয়। বিবাহিত কি বিবাহেচ্ছু, এই রকম।

স্ত্রীকে দেখিয়ে রণজিৎ বলল, আমরা বিবাহিত।

সন্তান ?

হয় নি।

কনসেপসন ? আচ্ছা সে না হয় আমাদের গাইনোকলজিস্ট গিয়ে পরীক্ষা করে আসবে। আর আপনারা ?

আমরা বিবাহেচ্ছু।

উত্তম।

বেল টিপতে সেক্রেটারি এসে উপস্থিত হলে দেব বলল, এদের জন্য 'এ' 'ফর্ম' আর ওদের জন্য 'এক্স' ফর্ম।

তার পরে ভবানন্দদের দিকে তাকিয়ে বলল 'এক্স' মানে 'আননোন কোয়ান্টিটি,' আপনারা এখনো তাই কি না।

সুলেখার মুখ লাল হয়ে উঠল।

ফর্ম নিয়ে ওরা গাড়িতে এসে চাপল। প্রথমে কথা বলল বেতসিনী—যাক, একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল।

বিষয়টা কি ? শুধাল রণজিৎ।

ছেলে বগলে করে নার্সারিতে নার্সারিতে ঘুরে দিদিমণিদের সাধ্য-সাধনা করা।

শুধু কি সাধ্য-সাধনা ! আমার দিদি দুটি ছেলেকে ভর্তি করতে গুণে আড়াই হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে।

ভবানন্দ বলে উঠল, আজ-কাল ঘুষ বলে না, বলে ইনটেক।

যাই বলুন, টাকা তো আড়াই হাজারের এক পয়সা কম নয়।

ভবানন্দ বলল, স্কীমটাতে অরিজিন্যালিটি আছে।

সগর্বে বলে উঠল সুলেখা, এবারে স্বীকার করলে তো? তুমি তো আসতেই চাও নি।

তখন ছিল 'আননোন কোয়ান্টিটি'।

এতক্ষণ পরে বেতসিনীর মনে পড়ে গেল দাহ্যমান কেকগুলোর কথা।

সবগুলো পুড়ে গেল।

তবে আর দুঃখ কর কেন? ও তো 'ওয়েলনোন কোয়ান্টিটি'।

এটা কি রকম হল?

পড়ে যাওয়া দুধ, আর পুড়ে যাওয়া কেকের জন্য বিজ্ঞ জনেরা দুঃখ করে না।

হঠাৎ সুলেখা জিজ্ঞাসা করে বসল, বেতসিনী ভাই, উদুম্বর শব্দটার মানে যেন কি বলেছিল?

কিছুই বলিনি, চল, বাড়ি গিয়ে চলন্তিকাখানা দেখা যাবে।

ওরা চলে গেলে অফিস থেকে বের হয়ে পড়ল মিঃ দেব, পিছনে পিছনে এল মিস সরকার।

দেব বলল, চল মিস সরকার, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দি।

মিস সরকার দেবের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল। সব ব্যাপার দেখে রিসেপসনিষ্ট মিস চাকির চোখ জ্বলে উঠল। বাড়ি ফেরবার পথে মিস সরকারের বাড়িতে গিয়ে শুনল সে তখনো ফেরেনি, বোধ করি সিনেমায় গিয়েছে। ক্রোধে ঈর্ষায় মিস চাকির মুখ লাল হয়ে উঠল, অগোচরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, উঃ, এতদুর গড়িয়েছে! এরকম ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের দোষ একেবারেই দেখতে পায় না। নারী ছাড়া নারীর কেলেঙ্কারি দেবে কে?

॥ ৩ ॥

বিজ্ঞাপন ও প্রশংসাপত্রের জোরে দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারির খ্যাতি ও ব্যবসা বেশ ফেঁপে উঠল। টাকা থাকলেই বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। তবে বিজ্ঞাপনের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ প্রশংসাপত্র—অথচ ও বস্তুটি আদায় করতে পয়সা লাগে না, শুধু মুখমিষ্টি হলেই চলে। সব দেশেই এক শ্রেণীর উদার ব্যক্তি আছেন যাঁরা প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই

থাকেন। রাতের বেলাতে বালিশের পাশে ফাউণ্টেন পেন নিয়ে ঘুমোন, পাছে কলম খুঁজে পেতে বিলম্ব হওয়ায় প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর করতে বিঘ্ন ঘটে। এর মধ্যে যাঁরা অধিক উদার, বলেন, ও হে বাপু, যা হোক কিছু লিখে আনো, সই করে দিচ্ছি। কি লিখিত হল পড়েল দেখেন না। অনেকে একেবারে প্রশংসাপত্র লিখে নিয়ে যায়, হেঁ হেঁ স্যার, আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। স্বাক্ষরকারী এক নজরে দেখে নেন চাঁদার খাতা কিনা, তারপরে একনিশ্বাসে স্বাক্ষর করে ফেলেন। অনেকের বোধকরি প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর সম্বন্ধে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে আমমোক্তারনামা দেওয়া আছে—স্বাক্ষরকারীর কাছে যাওয়ার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে হয় না। জনসাধারণ প্রশংসাপত্রের এ রহস্য বেশ অবগত আছে, তবু এ হেন প্রশংসায় তাদের বিশ্বাস টলে না। জ্যোতিষ একটি সুচতুর ধাপ্পা জেনেও যেমন বিপদে পড়লে লোকে জ্যোতিষীর কাছে দৌড়য়।

সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, প্রাচীরপত্র, মুখপত্র, দুর্মুখ পত্র, বেতার—সর্বত্র ঐ এক কথা, এমনটি হয় না, হবে না, এই প্রথম। এখনি সুযোগ নিন, ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না।

আবার শিক্ষক অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক রাজনীতিক মন্ত্রী ব্যবসায়ী সরকারী বেসরকারী কর্মচারী সকলে মিলে একযোগে প্রশংসাপত্রে মুখর হয়ে উঠল, শিক্ষায় যুগান্তর, দীক্ষায় মন্বন্তর, সংস্কৃতিতে গ্রহান্তর, এতদিনে জাতীয় শিক্ষার ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বালিত হল, সভ্যতার নিওন সাইন উজ্জ্বল হল, মানসিক আনবিক বোমা বিস্ফাটিত হল। শীঘ্র, শীঘ্র, বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ফল হাতে হাতে ফলিল। দি গ্রাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারির অফিস দরখাস্তকারী ও কারিণীগণ কর্তৃক অষ্টপ্রহর ঘেরাও হয়ে রইল। দরখাস্তে অফিস ও টাকায় ব্যাঙ্কের অ্যাকউণ্ট পূর্ণ হয়ে উঠল প্রি-নেটালের। তবে ভাবী ইনমেটগণ (ছাত্র-ছাত্রী নয়) এখনো হয় ভবিতব্যের, নয় মাতৃগর্ভে—বিরাজমান। শহরে সকলেরই যখন আনন্দ ও মুখে হাসি, তখন কেবল একজনের মন অশান্ত মুখ গম্ভীর, চোখে প্রতিহিংসার দীপ্তি। এই ব্যক্তি শহরের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম টিউটোরিয়াল কলেজ, নাম পরিচয় 'দি সেণ্ট পারসেণ্ট টিউটো-রিয়াল হোমে'র একমাত্র মালিক-পরিচালক শ্রীহারাধন বক্সী এম-এ (১·২), ডি ফিল, পি-এচ-ডি. ডি লিট (পি. এল. ডি.)। তিনি সমস্ত দেখে শুনে পড়ে বুঝলেন আমার ব্যবসা মাটি করবার মতলব; ভাবলেন হারাধন বক্সী

থাকতে নয়; স্থির করলেন এখনই এর বিহিত করতে হবে। হারাধন বক্সী গুডস্ শীগ্রং নীতির পক্ষপাতী, কারণ তাঁর মত মহাশয় ব্যক্তির পক্ষে অশুভ কাজ কখনো সম্ভব নয়। তিনি ছড়ি হাতে পান চিবোতে চিবোতে বের হয়ে পড়লেন।

॥ ৪ ॥

উদ্যোগী পুরুষসিংহের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারির অফিসে কয়েকদিন হাঁটাহাঁটি ঘাঁটাঘাঁটি করে হারাধন বক্সী বুঝে ফেলল রন্ধ্র কোথায়। মিস চাকি ও মিস সরকারের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে মিঃ দেবকে মন্দার পর্বত করে এবং আবও বুঝল মিস চাকি এখন হঠমান, মানে হঠবার মুখে। তখন মিস চাকির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে প্রস্তাব করল, দেখুন আপনার মত যোগ্য লোকের রিসেপসনিষ্ট হয়ে থাকা শোভা পায় না।

মিস চাকি খুশী হয়ে বলল, তা তো বুঝি কিন্তু অন্য চাকুরি পাই কোথায়?

চাকুরির অভাব কি। আমি এক্ষুনি আপনাকে আমার 'দি সেণ্ট পার-সেণ্ট সাকসেস টিউটোরিয়াল কলেজে' ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করলাম। আমি প্রিন্সিপাল ও প্রোপ্রাইটার।

আশাতীত সৌভাগ্যে খুশী হয়ে চাকি বলল, তা বেতনাদি কি রকম?

বিলক্ষণ! সে-সব শুনবেন বইকি। এই ধরুন বেসিক পাঁচশো টাকা; ডি. এ. আড়াইশো টাকা; ঘেরাও অ্যালাউন্স আড়াইশো টাকা; চড়াও অ্যালাউন্স দেড়শো টাকা; ধরাও অ্যালাউন্স দেড়শো টাকা; ওভারটাইম তা-ও ধরুন শ' তিনেক দাঁড়ায়। কেমন, রাজী?

অবশ্য রাজী। কিন্তু ঐ চড়াও আর ধরাও অ্যালাউন্সটা কি? ঘেরাও অ্যালাউন্স অবশ্য বুঝেছি।

এ আর বুঝলেন না! আর বুঝবেনই বা কি ভাবে, এখানে তো অনাগত বিধাতাদের নিয়ে কাজ। মাঝে মাঝে ওরা আপনার বাড়িতে চড়াও হবে, কখনো কখনো চেপে ধরে দু'এক ঘা দেবে। তার জন্যে কি অ্যালাউন্স দিতে হবে না আপনাকে?

মারধোরও করে নাকি?

করলেই বা, কাগজে বের না হলেই হল।

বেশ, তা কবে থেকে জয়েন করতে হবে?

কালই, শুভস্য শীঘ্রং, আর দেরি নয়। বক্সী অভিজ্ঞ ব্যক্তি, জানে যে বেতন যখন আদৌ দিতে হবে না তখন একটু ফলাও করে বলাই উচিত।

সেইদিনই মিস চাকি পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে বিদায় নিল। যাওয়ার সময় মধুতে বিষ মিশিয়ে মিস সরকারকে বলে গেল, মিস সরকার আপনি রইলেন, নার্সারিটা দেখবেন আর সেই সঙ্গে মালিককেও।

মিস সরকার বিষে মধু মিশিয়ে বলল, সে কি দিদি, আপনি চললেন, মিঃ দেব কিন্তু বড়ই দুঃখিত হবেন।

॥ ৫ ॥

একদিন সকালে সুলেখা এসে উপস্থিত হল, তার সিঁথিতে কুণ্ঠিত সিঁদুরের রেখা, বেতসিনীর বাড়িতে—দেখো দিদি, দি গ্রাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারির বিরুদ্ধে কি সব লিখেছে—এই বলে খানকতক ছাপানো হ্যাণ্ডবিল ফেলে দিল।

বেতসিনী বসে কাঁথা সেলাই করছিল, এখন কেক বানাবার বদলে কাঁথা সেলাই-ই তার পেশা। সে মোটেই বিচলিত হল না, বলল, ও আমি দেখেছি, রোজ ডাকে অনেকগুলো করে পেয়ে থাকি।

বিচলিত সুলেখা শুধাল, এখন কি হবে? এভাবে বিরুদ্ধ-প্রচার চললে নার্সারি যে দাঁড়াতেই পারবে না, আমাদের টাকাগুলো মারা যাবে।

ও আর কিছুই নয়, ব্যবসায়িক রেষারেষি, বুঝলে না সুলেখা? উনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আচ্ছা দিদি, দি সেণ্ট পারসেণ্ট সাকসেস টিউটোরিয়াল হোম ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা ব্যবসা। নামের অর্থ—ওদের ওখান থেকে শতকরা সবাই পাস করে এই ওদের দাবি।

সত্যি কি তাই?

পাগল নাকি? ওসব বিজ্ঞাপন। ওদের বিরুদ্ধেও প্রচার চলছে, তার হ্যাণ্ডবিলও পেয়েছি।

এখন কি করা যায়?

কিছুই করবার নেই, অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

সুলেখা বলল, উনি আমাকে বোঝালেন যে এককালীন তিন হাজার টাকা দেবার বদলে বিয়ে করে ফেললে অনেক লাভ, তখন মাসে একশো টাকা

দিলেই চলবে।

ঠিক কথাই ভবানন্দবাবু বলেছেন। আমাকেও নার্সারির গাইনোকল-জিস্ট এসে পরীক্ষা করে কনগ্র্যাচুলেট করে গিয়েছে, অনির্দিষ্ট কাল আর একশো টাকা করে টানতে হবে না। ভর্তি হলে তো অল ফ্রি।

তখন দুইজনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পরচর্চায় মনোনিবেশ করল।

দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারির আবির্ভাবে ইতিমধ্যে ছোটখাট একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, যে-সব তরুণ-তরুণী দীর্ঘকাল ধরে প্রাক্‌ বিবাহ প্রণয় চালাচ্ছিল, নার্সারির সুযোগ গ্রহণের আশায় এবং এককালীন তিন হাজার টাকা দেওয়ার ভয়ে তারা চটপট বিবাহ করে ফেলল। যে-সব বিবাহিত যুবক-যুবতী সরকারের পরামর্শে 'নিরোধ' চর্চা করছিল, তারা মনঃস্থির করে ফেলেছে, অনির্দিষ্ট কাল একশো টাকার জের কে টানতে চায়। যাদের সন্তানের বয়স তিনের অনেক নীচে তারা বেবি ফুড খাইয়ে ছেলে-মেয়েদের ওজন ও আয়তন বাড়িয়ে তিন বছরের বলে (তিন বছরের নীচে ভর্তি করা হয় না) চালাবার চেষ্টায় নিযুক্ত। ভর্তি হলে অল ফ্রি, কেবল বেতন নয়, খাওয়া-পরার ব্যবস্থাও নার্সারির কর্তৃপক্ষ করে থাকে। এমন সব কাণ্ড চলছে ঘরে ঘরে, সামাজিক বিপ্লব আর কাকে বলে।

ওদিকে হারাধন বক্সী বিয়ে করে ফেলেছে মিস চাকিকে। বক্সী দেখেছে যে, নিয়মিত বেতন দেওয়ার বদলে বিয়ে করে ফেললে অনেক কম খরচ। অন্যপক্ষে মিঃ দেব মিস সরকারকে বিয়ে করে ফেলে নিয়মিত বেতন যোগবার দায় থেকে মুক্তি নিয়েছে। এখন তারা দুইজনে মিসেস দেব ও মিসেস বক্সী রূপে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ। তাদের প্রধান কাজ বিরুদ্ধ পক্ষ সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার। তার বিশেষ কারণ বর্তমান। তাদের প্রাক্‌-বিবাহ রেষারেষি এখন বিবাহোত্তর ঈর্ষাতে পরিণত হয়ে অনর্গল বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিধাতা স্ত্রীলোকের বাহুতে বল দেননি বলেই রসনায় বিষ দিয়েছেন।

এ বিপদ হয়তো অল্পেই নিবৃত্ত হত, বড়জোর সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকত; কিন্তু এ বঙ্গদেশ, এখানে কলহের অকালমৃত্যু কখনো ঘটে না। দেশে যত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক আধ্যাত্মিক দল আছে, সমস্ত রুচিভেদে (শুধুই কি রুচি ?) পক্ষ অবলম্বন করে দুটি প্রতিষ্ঠানের রেষারেষিকে সার্বজনীন সমস্যায় পরিণত করল। আর ছোট-বড় যাবতীয় সংবাদপত্র দুই হাতে তালি দিয়ে উৎসাহ বর্ধন করল।

শেষ পর্যন্ত সমস্যাটি দুটি আকর্ষণী নোটিস রূপে বিধান সভায় উত্থাপিত হল। বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুই না জানায় মন্ত্রীমহাশয় সাত দিনের সময় প্রার্থনা করলেন এবং সপ্তাহান্তে জানালেন যেহেতু বিষয়টি নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেইহেতু সরকারের কিছু করণীয় নাই। এই ভাবে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হল এবং অবশেষে এই নাটকের পঞ্চমাঙ্কের অবসানে যবনিকাপাত হল।

॥ ৬ ॥

তিন বৎসর পরে একদিন সুপ্রভাতে সাড়ে পাঁচশত শিশু শিশুবাহী গাড়িতে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে সাড়ে পাঁচশত মাতা ও সাড়ে পাঁচশত পিতা দি গ্র্যাণ্ড প্রি-.নটাল নার্সারির অভিমুখে যাত্রা করল। খবর রটে যাওয়ায় প্রেস-রিপোর্টার ও প্রেস-ফটোগ্রাফারও জুটে গিয়েছে। সেই শিশুবাহিনী যথাসময়ে যথাস্থানে এসে দেখল অফিসের গায়ে 'দি গ্র্যাণ্ড প্রি-নেটাল নার্সারি' লেখা যে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ছিল তার জায়গায় অন্য সাইনবোর্ড, লিখিত আছে, 'দি ইউনিক ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর (প্রাঃ) লিঃ'।

সকলে অবাক, রাতারাতি নার্সারি গেল কোথায়? দোকানের মালিক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল, আজ্ঞে, আজ তিন বছর নার্সারির মালিক ভাড়া দেয়নি, বাড়িওলা মামলা করে তাদের তুলে দিয়েছে।

তারা গেল কোথায়?

তা জানিনে, তবে আপনারা ভিতরে আসুন, যা চাইবেন পাবেন।

সকালে বজ্রাহত।

সুলেখা বলল, দিদি কি হবে?

বেতসিনী বলল, কি আর হবে, চল, অন্য নার্সারির খোঁজে যাওয়া যাক।

রণজিৎ বলল, মনে হচ্ছে লোকগুলো অসাধু।

অসাধু! একেবারে ৪২০! আমি আগেই বলেছিলাম, বলল ভবানন্দ।

অন্য দিকে পাঁচ-সাত হাজার ছাত্র ও ছাত্রোপম মিলে দি সেণ্ট পারসেণ্ট সাকসেস টিউটোরিয়াল হোম ঘেরাও করেছে। কারণ অবশ্যই আছে, এখানে পড়ে যে-সব ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল, বলা বাহুল্য, সকলেই ফেল করেছে, সাজেশান মত একটা প্রশ্নও আসেনি। কিন্তু কা-কস্য পরিবেদনা! মিঃ ও মিসেস বক্সী নিখোঁজ, পুলিসে নাকি হুলিয়া বের করেছে তাদের নামে।

উপসংহার

দেব-দম্পতি ও বক্সী-দম্পতি হরিদ্বারে চলে এসেছে, ঘটনাচক্র একই ধর্মশালায় তাদের তুলেছে। দেব ও বক্সীর মধ্যে বেশ আলাপ জমে গিয়েছে, কিন্তু মিসেস দেব ও মিসেস বক্সীর মধ্যে বাক্যালাপ নেই, তারা দূর থেকে পরস্পরকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, মনে মনে যা বলে ভাগ্যিস তা শোনা যায় না।

সুলেখা ও বেতসিনী তাদের শিশুপুত্রদ্বয়কে পাড়ার দিদিমণির কে-জি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।

কলা চর্চ্চা

অবশেষে সত্য সত্যই শাপ বরে পরিণত হল। ব্যাপারটা খুলে বলি।

পাড়ায় অনেক কিশোরী ছিল, কিন্তু তাতে কি আসে যায়। বৃন্দাবনেও তো কিশোরীর সংখ্যা কম ছিল না তবু রাধা অনন্যা, কারো সঙ্গে তুলনা হয় না। পাড়াতেও তো তেমনি ছিল, আর নামটাও নাকি রাধার কাছাকাছি, অনুরাধা।

বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান অনুরাধা। বাপ মহাগুণী ব্যক্তি। সেকালের কিমিয়া বিদ্যা না-জানা সত্ত্বেও তিনি লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম। তাঁর ভাবটা মানকর-নিবাসী জীবনের মত, যে নাকি সনাতনকে বলেছিল,'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানো না মণি।' অনুরাধার পিতা বলেন, হীরে মণি মুক্তো বাজে জিনিস, ওর মূল্য মানুষের শখের উপরে, স্থায়ী মূল্য ওর নেই। আসল জিনিস সোনা, যেমন স্থায়ী তেমনি তার স্থায়ী মূল্যে, ওর ওঠা-নামার তালে তালে পৃথিবীর রাজনীতি নাচছে। তবে তিনি সোনার কারবারী নন, সোনার সঞ্চয়ী,সে সোনা আবার, আগেই বলেছি, রূপান্তরিত লোহা। সোজা কথায়, তিনি লোহার কারবারী। পাড়ার ছেলেরা, লক্ষ্য যাদের অনুরাধার উপরে, বলে, লোকটা আয়রন-হার্টেড। কেউ কেউ বলে আয়রনী দেখ, লোহার কারবারীর ঘরে এমন সোনার টুকরো। শুনে অপরে বলে, সোনা জমানোই যে ওর জীবনের আদর্শ, ঘরে তো সামান্য, ব্যাঙ্কে কত আছে হিসাবে রাখো ?

বলা বাহুল্য, পাড়ায় অনুরাধার গুণগ্রাহীর অভাব নেই, বরং সদ্ভাবটাই

কিছু বেশি। গুণগ্রাহী অনেক, তবু পাত্র স্থির হয় না মেয়ের, হয়তো অনেক বলেই হয়না। বলবিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে যে পরস্পর-বিরোধী শক্তিসমূহ নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে স্থায়ীত্ব সৃষ্টি করে, এখানেও তেমনি ঘটেছে।

অনুরাধার মা ভালমানুষ, সোনা ও লোহা কোনটার রহস্য তিনি বোঝেন না। তিনি কাঁসার গুণগ্রাহী, সুযোগ পেলেই প্রয়োজন থাক আর নাই থাক, কাঁসার বাসন কেনেন, ঐ তাঁর ব্যসন।

স্বামীকে বলেন, মেয়ের যে বয়স হল, পাত্র খোঁজ।

অবিনাশবাবু বলেন, কি করে জানলে খুঁজছি না ?

পাত্র কি জুটবে লোহার বাজারে ?

যদি জোটে, বুঝবে আমার মেয়ের ভাগ্য।

যেমন তোমার হয়েছে, আহা !

মন্দটাই বা কি হয়েছে। বলতে বলতে অবিনাশবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, ভাবেন এত করেও স্ত্রীর মন পাওয়া গেল না।

অবিনাশবাবু লোহার কারবারে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ না করে মনস্তত্ত্ব চর্চা করলে বুঝতে পারতেন যে, স্ত্রীজাতির মন কথনো জানা যায় না, ঐ জন্যেই তাদের বলে 'জানানা'। যাই হোক, এত কথা তাঁর বুঝবার শক্তি নেই, সময়ও নেই। তিনি অফিসে বের হয়ে যান।

বিকালবেলায় অবিনাশবাবুর বাড়িতে চায়ের টেবিলে আসর জমে ওঠে। অবিনাশবাবুর বাড়িতে, তবে অবিনাশবাবুর অনুপস্থিতিটাই এখানে প্রধান আকর্ষণ। প্রধান, কিন্তু একমাত্র আকর্ষণ নয়। অনুরাধার মায়ের বিশ্বাস তিনিই প্রধান আকর্ষণকর্ত্রী, আর পদার্থ-বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তার সমর্থন আছে, বৃহত্তর বস্তুপিণ্ডের টানটাই প্রবলতর। তাঁর বসবার জন্যে স্পেশাল চেয়ার আছে। তাঁর এ বিশ্বাসের কারণ অবশ্যই আছে। চায়ের টেবিলে যে-সব গুণগ্রাহী যুবকের আবির্ভাব ঘটে, তারা সবাই মাসি, পিসি, খুড়িমা, মামীমা বলে তাঁকে, সবাই তাঁর কাছেই ঘেঁষে বসে, কিন্তু হায় কবি যে এদিকে গোপন কথা ফাঁসকরে দিয়ে বসে আছেন, 'আমার কণ্ঠ যখন ডাকে, মন যে কোথায় থাকে।' কোথায় আর। ঐ অনুরাধার চারদিকে!. অনেকগুলি মনের অদৃশ্য মৌমাছি অনুরাধাকে ঘিরে অশ্রুত প্রলাপ জানতে থাকে। এমন না-হবেই কেন ? অনুরাধা সুন্দরী তরুণী বিদুষী (বি-এ পাঠরতা), সুকণ্ঠী এবং অশেষ গুণশালিনী, সংক্ষেপে ছোটগল্পের নায়িকায় যেমনটি হওয়া

উচিত। অনুরাধার পিতা ধনসঞ্চয়ে কুবের-বিশেষ এবং যমের মতই অফিস-পাড়ায় রামগিরি আশ্রমে দিন কাটান। আর মাতা সরলা (নির্বোধ ?) ও তার ওজন কমপক্ষে আড়াই মণ। এমন মেয়ের গুণগ্রাহীর সংখ্যা যদি নগণ্য হয় তবে বুঝতে হবে দেশের যৌবন জরাগ্রস্ত।

একদিন নিয়মিত সময়ের কিছু আগে অবিনাশবাবু বাড়ি ফিরে এলেন, আর একজন বড় ব্যবসায়ীর মৃত্যু-সংবাদে শেয়ার বাজার আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর মোটরের চেনা হর্ন শুনতে পেয়ে চায়ের টেবিলের রসগ্রাহী যুবকগণ খিড়কি-পথে সরে পড়ল, এ পথটা আগেও তাদের কখনো কখনো ব্যবহার করতে হয়েছে, কেবল নবাগন্তুক এক যুবক সঙ্কটের কারণ অনুমান না-করতে পেরে যেমন বসে ছিল তেমনি রইল।

অবিনাশবাবু চায়ের আসরে অকাল ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে অনেক গুলি খালি পেয়ালা ও একটি অপরিচিত যুবককে দেখতে পেলেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কে ?

স্ত্রী বললেন, এঁকে চেনো না।

লোহার বাজারের বাইরে কাউকে চেনেন না অবিনাশবাবু। তাই সরাসরি যুবককে প্রশ্ন করলেন, কি নাম ?

যুবকটি তখনো সঙ্কটের গুরুত্ব বুঝতে পারে নি, উত্তর দিল—অয়স্কান্ত রায়।

কি রায় বললে ?

বাপরে বাপ! ঐ বিদ্‌ঘুটে নামটা কোথায় পেলে ? ওটার মানে কি ?

আজ্ঞে শুনেছি একরকম মণি, মানে জুয়েল। যাতে লোহা সোনা হয়ে যায়।

দেখো বাপু, কোন জুয়েলে লোহা সোনা হয়ে যায় না, তার জন্যে চাই এই—বলে তিনি কপালে আঙুল ঠেকালেন, তারপরে ব্যাখ্যা করে বললেন, চাই বুদ্ধি। তা, কি করা হয় ?

এই সংলাপের সময়ে মাতা ও কন্যা স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত ছিল, কন্যা সূচকর্ম-নিরতা আর মাতা নিরতা প্রচুর দোক্তা-সহকারে তাম্বুল-চর্বনে।

তা, কি করা হয় ?

আজ্ঞে, নৃত্যকলা—বাক্যটি শেষ করবার সুযোগ পেল না অয়স্কান্ত।

কি কলা বললে ?

আজ্ঞে নৃত্যকলা।

এখন অবিনাশবাবু নৃত্যও জানেন, কলাও জানেন। তবে দুয়ের যোগা-যোগে কী বস্তু হয় জানেন না, কখনো শোনেন নি, তাই মনে করলেন কোন এক জাতের কলা হবে। কলার উপরে তাঁর বড় রাগ, কেন না প্রথম জীবনে একবার কলার ব্যবসা করতে গিয়ে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করেছিলেন, সেই থেকে কলা ভোজন বন্ধ করেছেন। এখন সেই কলার ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজ বাড়িতে চায়ের টেবিলে উপস্থিত দেখে একেবারে ক্ষেপে উঠলেন, ঐ কলা বেচেই খাওগে, তোমার কিছু হবে না বাপু—বলে তিনি কাপড় বদলাতে প্রস্থান করলেন। বলা বাহুল্য, অপমানিত অয়স্কান্ত তখনি বেরিয়ে চলে গেল, মাতা বা পুত্রী কাউকে নমস্কার পর্যন্ত করল না।

ঘটনাটা অচিরে পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গিয়ে যুবকদের অর্থাৎ যারা অবিনাশ-বাবুর বাড়িতে চায়ের টেবিলের গুণগ্রাহী তাদের অপ্রত্যাশিত আনন্দদান করল, কেন না, তারা সকলেই অয়স্কান্তের আবির্ভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। অয়স্কান্তের অনেক দোষ; সে সুপুরুষ, সুবেশ, সুতরুণ, সুগায়ক, সুবাক এবং সর্বোপরি 'সুরসঙ্গতি' নামে নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষালয়ের সুপরিচিত শিক্ষক। এখন বলা বাহুল্য, এই প্রত্যেকটি 'সু' প্রতিযোগী যুবকদের পক্ষে 'কু' স্বরূপ। তাদের মধ্যে অয়স্কান্তর নাম পড়ে গেল - ব্যানানা মার্চেন্ট। সবচেয়ে খুশি হল গোলক রায়, চায়ের টেবিলের গ্রহসমূহের মধ্যে গ্রহরাজ বৃহস্পতি। তার যেমন মেদ তেমনি মেধা, যেমন জ্ঞান তেমনি গর্দান, যেমন ধন তেমনি গোধন (ওটা অনুপ্রাসের খাতিরে, গোরু তার একটাও নাই যদিও সে দৈনিক সের পাঁচেক গোরুর দুধ পান করে থাকে)। সকলেরই বিশ্বাস, তার নিজের সবচেয়ে বেশি যে, অচিরে অনুরাধা তার করগত হবে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেই এখন সে শুধায় কি হে, ব্যানানা মার্চেন্টের খবর কি ? হাঃ হাঃ, কলা বেচেই ওর খেতে হবে। আরে ও কিনা গিয়েছিল একসঙ্গে রথ দেখতে আর কলা বেচতে। গোলকের তেতালা বাড়িটা অবিনাশবাবুর বাড়ির প্রায় সামনা-সামনি। সে বাড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্যে ছাদের উপরে একটা ছোট টেলিস্কোপ ফিট ক'রে ফেলল। বন্ধুরা কানাকানিতে বলে গোলক ডিপ্লোমার বদলে ঐ টেলিস্কোপটা সংগ্রহ ক'রে এনেছে। তা যাক, বন্ধুরা কমন লোক, নিন্দাই রটনা ক'রে থাকে, ওতে কান দিতে নেই।

এমন সময়ে দেশে সত্যযুগ ফিরে এল এবং কলা কাঁদিশুদ্ধ ওজনে বিক্রি হতে শুরু করল। যুদ্ধ অবশ্য বেঁধেছে বছর দুই আগে, কিন্তু সেটা যে কখনো ঘাসের উপরে এসে পড়বে কেউ ভাবে নি। সব্বাই ভেবেছিল ওরা লড়াই করে মরবে, আমরা প্রাতঃকালে সংবাদপত্রযোগে সংবাদ পেয়ে যথাস্থানে দুয়ো কিংবা জয়ধ্বনি করব। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। জাপান মিত্রশক্তিকে আক্রমণ করল, হাজারে হাজারে মার্কিন সৈন্য বাংলাদেশে এসে ঘাঁটি গাড়ল। জিনিস-পত্রের দামের তুলনায় অগ্নি শীতলস্পর্শ বোধ হতে লাগল। বছরখানেক পরে দুর্ভিক্ষে ৩০।৩৫ লাখ মারা পড়ল, শাস্ত্রজ্ঞগণ ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে কলির শেষে এমন ঘটাবার কথা। পাপীদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাক্, পাপীগণ প্রাণ হারাল, যারা বেঁচে রইল বুঝতে হবে তারা পুণ্যাত্মা। পুণ্যাত্মা-পুণ্যাত্মাগণ সানন্দে সকলে জঙ্গী ঠিকেদারি গ্রহণ ক'রে এক টাকার জিনিস কুড়ি টাকায় বিক্রি করে 'টু অনেস্ট পাইস' করতে লেগে গেল। সামরিক কর্তারা উদার, দরাদরি পছন্দকরে না, বাছাই যাচাই তাদের অভিপ্রেত নয়, ঠিক সময় জিনিসটা চাই। তাই ঘিয়ের বদলে টিন বোঝাই কচু-কাঁচকলার মণ্ড, ভেড়া-ছাগলের বদলে যে-কোন চতুষ্পদ এবং কাঁদিশুদ্ধ কলা ওজনে বিক্রি হতে থাকল। উল্লসিত ব্যবসায়ীগণ বলল, সবুর করো না, এর পরে বাছাধনেরা কলার ওজন গাছ শুদ্ধ হবে, এখনি কি হয়েছে।

অবস্থা যখন এই রকম দাঁড়িয়েছে তখন একদিন সুপ্রভাতে অয়স্কান্তের বাল্যবন্ধু বাচ্চু এসে বলল, এখন নাচ-গান কিছুদিন বন্ধ রাখো, আমার সঙ্গে ঠিকেদারিতে নেমে পড়ো, এ মওকা ছেড়ো না, লোহার ব্যাটাকে দেখিয়ে দাও যে ব্যানানা মার্চেণ্ট নামটা এমন কিছু মন্দ নয়। বোমা পড়বার ভয়ে 'সুর-সঙ্গতি'র শিক্ষার্থীগণ শহর ছেড়ে পলাতক, অয়স্কান্তর বেকার দশা। তাই সে বাচ্চুর সঙ্গে ঠিকেদারিতে নেমে পড়ল, এবং হাতের কাছে যা পেল মার্কিন সামরিক ডিপোয় সাপ্লাই দিতে লাগল, তার মধ্যে কলাটা প্রধান, ওরা কলা খায় ভাল।

চায়ের টেবিলে অনুরাধা ও তার মায়ের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

অনুরাধা বলল, মা, চায়ের টেবিলে সব বাজে লোক ডাকো কেন?

মা শুধালো, বাজে লোকটা কে শুনি?

কেন, ঐ অয়স্কান্তবাবু।

শোন কথা একবার মেয়ের ৷ অয়স্কান্ত বাজে লোক ? প্রত্যেক বাড়িতে ওর ডাক পড়ে, জানিস ?

তবে বুঝতে হবে তারা সবাই বাজে লোক পছন্দ করে।

শুনিস নি কি যে ও-পাড়ার মেয়েরা ওর কাছে নাচ শেখে ?

শুনেছি বই কি। পাড়ার মেয়েদের ও নাচাচ্ছে। এবারে নিজে নাচবে, যখন বাবার রাগের মুখে পড়েছে।

তোর বাবার পছন্দ অনুসারে লোক ডাকতে গেলে কালোয়ার ছাড়া আর কাউকে তো ডাকা চলে না।

কেন, এত লোক যে আসে বাবা কাউকে তো অপছন্দ করে না।

এখন থাম, ওরা সব আসছে।

এমন সময়ে চার-পাঁচ জন গুণগ্রাহী যুবক প্রবেশ করল, তাদের চায়ের টেবিলে নানারকম ফল সাজানো ছিল, তার মধ্যে ছিল একছড়া কলা।

একজন সেটা লক্ষ্য করে বলল, ব্যানানা মার্চেণ্টের সওগাত মনে হচ্ছে।

অনুরাধা বলল, বিকাশবাবু, কলা তো কাপড়ের দোকানে পাওয়া যায় না। বিকাশের বাবার মস্ত কাপড়ের দোকান।

অরিন্দম বলল, এ কোন্ জাতের কলা ? নৃত্য-কলা বলে মনে হচ্ছে।

অনুরাধা তার দিকে কলার ছড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, খান না, নাচতে শিখবেন।

এই ভূমিকার পরে সেদিন চায়ের আসর আর তেমন জমলো না, অল্প সময়ের মধ্যেই আসর ভেঙে গেল। অনুরাধা ঘরে গিয়ে খিল দিল।

অয়স্কান্ত এখন পাড়ায় একঘরে প্রায় কেউ তার সঙ্গে মেশে না, তারো মেশবার সময় নেই, সে এখন কাঁদি-শুদ্ধ কলার সাপ্লাই দিতে ব্যস্ত। অবিনাশবাবুর বাড়ি তো চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মন তো মানে না, যাতায়াতের পথে একবার দোতালার বারান্দার দিকে তাকিয়ে যায়। কখনো চোখে পড়ে ভিজে শাড়ি শুকোচ্ছে, কখনো কানে আসে বেতারের কণ্ঠে, 'নৃত্যের তালে তালে, হে নটরাজ।' তার ক্ষীণ আশা ছিল যে , পথে-ঘাটে অনুরাধাকে দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু এ সে আশা সফল হয় নি। ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে চিন্তা করবার অবকাশ কম, কলার সন্ধানে এখন সে ব্যতিব্যস্ত।

ওদিকে গোলক রায়ের প্রভাব বেড়েছে অবিনাশবাবুর বাড়িতে, তার আসা যাওয়া, কথাবার্তা সমস্তই স্বয়ং অবিনাশবাবু কর্তৃক সমর্থিত। রাজনৈতিক নির্বাচনের পরিভাষায় সে পিতা-সমর্থিত পাণিপ্রার্থী।

অবিনাশবাবুর স্ত্রী বলেন, তা, ছেলেটির চেহারা বেশ, কার্তিকের মত।

মেয়ে বলে, কার্তিকের মত নয় মা, বল গণেশের মত।

তা, গণেশের চেহারাটাই বা মন্দ কি, বেশ গোলগাল।

সেই জন্যেই তো ওর নাম গোলক।

একদিন চায়ের টেবিলে উপস্থিত হয়ে গোলক দেখল একটা ছোট্ট গ্লোব রয়েছে।

এটা আবার কেন?

কি জানি বাপু, অনুরাধা রেখেছে। বলল মা।

এমন সময়ে মেয়ে উপস্থিত হলে গোলক শুধাল, অনুরাধা দেবী, এটা আবার কেন?

এ আর বুঝলেন না? যে জায়গায় বাস তার একটা প্রতিরূপ কাছাকাছি থাকা ভাল।

তার মানে পৃথিবীর?

ঠিক বুঝেছেন গোলকবাবু।

আপনার সঙ্গে আমার মতে মেলে মিস চৌধুরী।

বড় আশঙ্কার কথা তো।

আশঙ্কা নয়, আশার কথা।

অনুরাধা মনে মনে ভাবে—কার পক্ষে?

জানেন মিস্ চৌধুরী, আপনি যেমন পৃথিবীর আকৃতি পর্যবেক্ষণ করেন, আমি তেমনি করি আকাশের পর্যক্ষেণ। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্য বাড়ির ছাদে একটা দূরবীন খাটিয়েছি।

তা, শুধু আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখেন, না, পৃথিবীরও কিছু কিছু দেখে থাকেন?

দেখি বইকি। সেদিন দেখতে পেলাম এক লরি বোঝাই কলা নিয়ে চলেছে সেই ভ্যাগাবণ্ডটা।

তা, কলা দেখেই কলার মালিক কে বুঝলেন?

শুধু কলা দেখে নয়, লোকটাও সঙ্গে ছিল। কী নাম, বাপ রে!"

অয়স্কান্ত !

কলার ব্যবসা কি খারাপ ?

খারাপ নয়, তবে ওর মধ্যে কালচার কোথায় ?

টাকা পেলে আর কালচারের কী দরকার।

না, না, একথা সত্য নয় অনুরাধা দেবী, টাকাও চাই, কালচারও চাই।

এ রকম হরগৌরী-মিলন আপনার ভাগ্যে ঘটেছে বলে সকলের ভাগ্যে ঘটবে আশা করা অন্যায়।

ও লোকটার কাছে কিছুই আশা করিনে।

বাবারও তাই মত।

অনুরাধার মা কথাবার্তার গতিক কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, তবু যে বুঝছেন প্রমাণ করার জন্যে মাঝে মাঝে হাসছিলেন। সেই হাসি গোলকের মনে আশার বীজ ছড়াচ্ছিল।

গোলক চলে গেলে মেয়েও চায়ের টেবিল থেকে উঠে গেল, এমন সময়ে প্রবেশ করলেন অবিনাশবাবু।

স্ত্রী একগাল হেসে বলল, তোমার মেয়ের বোধহয় পছন্দ ঐ গোলককে। অবিনাশবাবু বললেন, হতেই হবে, কার মেয়ে !

তা, ছেলেটির আছে কেমন ?

যা আছে তা বেশ। ঐ তো রাস্তার ওদিকে তেতালা বাড়িটা দেখছ।

আর ?

আভাসে জেনেছি ব্যাঙ্কে অনেক টাকা।

নোট না নগদ ?

এরকম প্রশ্নের জন্য অবিনাশবাবু প্রস্তুত ছিলেন না, তবু যখন প্রশ্নটার পুনরুক্তি হল, অবিনাশবাবু বললেন, ব্যাঙ্কে নগদ বা নোট কিছুই থাকে না, থাকে শুধু টাকার অঙ্ক।

ওমা, টাকার অঙ্ক নিয়ে আমার কি হবে ? ভালো করে খোঁজ নাও নগদ কত আছে।

আচ্ছা তাই নেবো, বলে অবিনাশবাবু উঠে পড়লেন।

আদার ব্যাপারীকে জাহাজের খোঁজ রাখতে হয় কিনা জানি না, তবে এ-যুগের লেখকের পক্ষে বিশ্ব-রাজনীতির সংস্রব এড়িয়ে গল্প লেখা সব সময়ে সম্ভব নয়। এই গল্পটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

জাপান দূর-প্রাচ্যে আক্রমণ আরম্ভ করতেই কলকাতার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। কলকাতার ছোট-বড় আলোকমালা তো অনেক আগেই চক্ষু-মুদ্রিত করে ধ্যানস্থ হয়েছিল, এখন কাতারে কাতারে নর-নারী শিশু বৃদ্ধ কলকাতা ছেড়ে পালাতে লাগল। পক্ষকাল মধ্যে শহরের জনসমুদ্রে ভাটা দেখা দিল, আব শৌখীন বালিগঞ্জ-পাড়ায় সন্ধ্যা না হতেই সঙ্গীত-ধ্বনির বদলে শোনা যেতে লাগল শিবাধ্বনি।

লোক পালাল কাজেই বাড়ি খালি পড়তে লাগল। বাড়িঅলা এসে ভাড়াটের হাতে-পায়ে ধরল, ভাড়া লাগবে না স্যর, শুধু পিদিমটা জ্বালিয়ে রাখুন। যে পারল বাড়ি জলের দামে ছেড়ে দিল, বলল, এর পরে থাকলে ইট-কাঠ সরাবার খরচ যোগাতে হবে। শাস্ত্রজ্ঞরা বললেন, কলিযুগ ওল্টাবার সময়ে এমন হয় শাস্ত্রে লেখা আছে।

অবিনাশবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বললেন, চল, বাইরে কোথাও যাই।

অবিনাশবাবু বললেন, পাগল নাকি, লোহার দাম হু হু করে বাড়ছে।

যদি বোমা পড়ে বেঘোরে মারা যাব যে!

বেঘোরেই হোক আর অঘোরেই হোক, মরতে একদিন হবেই, লোহার এমন দর আর হবে না।

অগত্যা, অবিনাশবাবু সপরিবার কলকাতায় রয়ে গেলেন।

এদিকে কলার দর বেড়ে গেল দশগুণ। লোক পাওয়া যাচ্ছে না, বোমার ধোঁয়ায় কলাবাগান শুকিয়ে যাচ্ছে প্রভৃতি অব্যর্থ তথ্যের আঘাতে কলার দর আকাশে উঠল, কলা এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় আহার্য বস্তু। সামরিক বিভাগের জিনিস পেলেই হল, দামের সমস্যার সমাধান তারা করলেন হাতে গরম নোট ছাপিয়ে।

বাচ্চু বলল অয়স, এই মওকায় গোটা কয়েক বাড়ি কিনে ফেল, এখন জলের দর, এর পরে হবে তেলের দর, তারপরে লোহার দর।

অয়স্কান্ত ভাল বাড়ির খোঁজ করতে লাগল।

ওদিকে গোলকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। তার তিনটে বাড়ি ছিল। দুটো ভাড়াটে পালাতেই খালি পড়ল, জলের দামে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হল গোলক। থাকল বসতবাড়িটা। একদিন ভোর-রাতে সামরিক পুলিশ এসে দরজায় ঘা দিল।

দরজা খুলে দিতেই তারা সোজা তেতালার দিকে চলল। পিছনে পিছনে

হাঁপাতে হাঁপাতে চলল গোলক।

তেতালায় উঠে পুলিশ শুধালো, এটা কি ?

গোলক বলল, আজ্ঞে স্যার, দূরবীন।

এখানে কেন ?

গ্রহ-নক্ষত্র স্টাডি করি কি না স্যার।

সামরিক পুলিস বলল,আমাদের ইনফরমেশন, আপনি জাপানী বিমানের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

সেকি কথা স্যার! আমি একজন লয়াল সাবজেক্ট। ঐ দেখুন,আমার ঘরে কুইন ভিক্টোরিয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সম্রাটের ছবি টাঙানো রয়েছে।

সে সব পরে হবে, এখন চলুন আমাদের সঙ্গে।

কোথায় স্যার ?

আপাতত থানায়।

ভারতরক্ষা আইনের ঘটোৎকচ চাপা পড়ে বেচারা গোলক চুপসে গেল। তার বাড়িটা সরকার বাজেয়াপ্ত করে নীলাম করে দিল। ব্যাঙ্কের জমা টাকার ঠিকুজি-কুষ্ঠি না দেখাতে পারায় জাপানী টাকা অজুহাতে বাজেয়াপ্ত হল, কোনক্রমে প্রাণটা তার রক্ষা পেয়ে গেল। লজ্জায় ও দুঃখে গোলক কলকাতা পরিত্যাগ করল।

গোলকের বাড়িটা অয়স্কান্ত নীলামে কিনে নিয়েছিল,এখন মৌলিক তিন-তলার উপরে আরো দুটো তালা চাপাবার আয়োজন করতে লেগে গেল।

অনুরাধা-অয়স্কান্ত-গোলককে নিয়ে যে ত্রিভূজটা সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল, স্বাভাবিকভাবে চললে তার পরিণাম কি হত জানিনে, কিন্তু বিশ্ব-রাজনীতির সংস্পর্শে তাতে অপ্রত্যাশিত পরিণাম দেখা দিল। পাঠক, তুমি রাজনীতি এড়িয়ে চললেও রাজনীতি যে তোমাকে এড়িয়ে চলবে এমন স্থিরতা নেই।

একদিন অবিনাশবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, গোলক দেখছি বাড়িটাকে আরও বড় করছে, চারতলা করছে, বোধহয় পাঁচতলা না করে ছাড়বে না।

স্ত্রী বললেন, আমি আগেই জানতাম, ও বড় কম লোক নয়, তুমি তো জান আমি যাকে-তাকে চায়ের টেবিলে আমল দিই না।

হ্যাঁ, তাই তো দেখছি, সংক্ষেপে উত্তর দিলেন অবিনাশবাবু।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল অনুরাধা। সে বলল, না বাবা, ও বাড়ি আর

গোলকবাবুর হাতে নেই।

তার মানে? একসঙ্গে শুধালেন বাবা আর মা।

ওটা কিনে নিয়েছেন অয়স্কান্তবাবু।

কেমন করে জানলি?

পাড়ার সবাই জানে। তাছাড়া আমি একদিন ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম দরজায় অয়স্কান্তবাবুর নাম আর বাড়িটার নামটাও বদলিয়েছে, আগে ছিল গোলকধাম—

এখন? শুধালেন বাবা

এখন কদলী-ভবন।

কদলী-ভবন!

কলায় জোর আছে দেখছি। হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে যুদ্ধের বাজারে লোকটা কলা সাপ্লাই করে টাকা কামাচ্ছে।

মা শুধালেন, আর গোলকের কি হল কে জানে। তোর সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল?

না, বলল অনুরাধা।

অনুরাধা সত্য গোপন করল। কয়েকদিন আগে ট্রাম-ডিপোর কাছে দেখা হয়েছিল গোলকের সঙ্গে। দেখল তার চেহারায় আর সে জলুস নেই, অনেকটা শীর্ণ, পোশাক ও মুখ দুই মলিন।

সে আগে বাড়িয়ে কথা বলল, গোলকবাবু, আমাদের বাড়িতে আর যান না কেন?

আর যাব কোন্ মুখে? আমার সব বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

আমরা কি আপনার টাকার উমেদার?

না, মিস্ চোধুরী, সমানে সমানে বন্ধুত্ব সাজে, এখন আমি নিতান্ত গরীব।

আছেন কোথায়?

কলকাতায় থাকিনে, থাকি গাঁয়ে, সেখানে সামান্য কিছু জমি-জমা আছে, কোন রকমে চলে। হঠাৎ কাজ পড়েছিল, এসেছি দিন দুয়েকের জন্য।

এমন সময়ে ট্রাম এসে পড়ল, সে উঠে পড়ে বলল, এখন আসি মিস চৌধুরী, নমস্কার।

নমস্কার। যাবেন একদিন।

ট্রাম ছেড়ে চলে গেল।

এসব কথার কিছুই বলল না অনুরাধা, পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে তাই চলে গেল।

কলার ব্যবসায়ে যে এত রস আছে কে জানত।

স্ত্রী বললেন, আমি অবশ্যই জানতাম, আমি কি যাকে-তাকে চায়ের টেবিলে আমল দি!

আরে, তখন তো বেচত নৃত্যকলা, এখন বেচে মর্তমান কলা, দুয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

স্ত্রী বললেন, মেয়ের বিয়ের কিছু ভাবছ?

না হয় যাই একবার অয়স্কান্তর কাছে।

তাকে যে হাঁকিয়ে দিয়েছিলে?

এখন আবার ডেকে নেব। টাকার তো একটা মান-মর্যাদা আছে।

কিন্তু মেয়ে কি রাজী হবে?

অবশ্যই হবে, টাকায় কোন্ মেয়ে না ভোলে।

স্ত্রী বললেন, আমি তো তোমার টাকা দেখে ভুলিনি।

অবিনাশবাবু বললেন, ভুলেছিলেন তোমার বাবা অবশ্য কথাটা তিনি মনে মনে বললেন।

তবে তাই যাও, আর দেরি করো না। পাঁচজনের নিশ্চয় চোখে পড়ছে অয়স্কান্তর উপরে। দেখো, আমি আগেই বুঝেছিলাম, ও একটা মানুষের মত মানুষ হবে।

কিন্তু অবিনাশবাবুকে কষ্ট স্বীকার করতে হল না, হঠাৎ অয়স্কান্ত এসে হাজির হল।

এই হাজিরার মনস্তত্ত্ব কিছু জানা আবশ্যক।

কিছুদিন থেকে বাচ্চু তাকে বলছে, ওহে, এবার একবার যাও অবিনাশ চৌধুরীর বাড়িতে, গিয়ে দাবি কর তার মেয়েকে।

অয়স্কান্ত বলে, অনুরাধার চেয়ে আরও ভাল মেয়ে অনেক আছে।

দেখো অয়স্, আরও ভালর ধাপ্পায় পড়ো না, ওর শেষ নেই। তাছাড়া লোকটা তোমাকে 'কলা বেচে খাও' বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার মেয়েকে বিয়ে করলে তবে এই অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া হয়। এখন লোকটা দেখুক, কলা বেচে খাওয়া যায় কিনা, দেখুক তার মেয়েকে বিয়ে করবার

যোগ্যতা ব্যানানা মার্চেণ্টের আছে কিনা। অপমানের প্রতিশোধ না দিতে পারলে পৌরুষ নিরর্থক। যাও।

অপমানের প্রেরণায় অয়স্কান্ত এসে উপস্থিত হল অবিনাশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়েই বিনা ভূমিকায় বলল, অবিনাশবাবু, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

অবিনাশবাবু পত্নী আশাতীত সৌভাগ্যে আনন্দিত হয়ে বললেন, বাবা, এ তো আমার সৌভাগ্য।

অবিনাশবাবু বললেন, খুব ভাল কথা। শুনেছিলাম বটে তুমি বেশ রোজগার করছ।

কথাটা মিথ্যা নয়, অবিনাশবাবু দেখলেন তো, কলা বেচে টাকা করা যায় কি না।

অবশ্যই যায়, তেমন করে বেচতে পারলে সব জিনিস থেকেই টাকা পাওয়া যায়। তা কেমন করেছ?

করেছ নয়, এখনো করছি। পঞ্চাশ হাজার টন কলা সাপ্লাই দিতে হবে রাঁচিতে, সেখানে কিনা মিত্র-পক্ষের মেন বেস, মূল ঘাঁটি। ফেলে ছেড়েও পঞ্চাশ হাজার টাকার নাফা থাকবে।

বেশ, বেশ, এই তো চাই, বেটাদের ঠকিয়ে যত নিতে পার। তা কি রকম জমেছে?

ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট নম্বর দিচ্ছি, গোপনে খবর নেবেন।

না, না, তার আর কি প্রয়োজন। তোমার কথাই তো সত্য। ব্যবসায়ীর কথনো মিথ্যা বললে চলে।

তা, আমার প্রস্তাবের কি হল?

এর আর হওয়া-হওয়ি কি। এ তো অমুর সৌভাগ্যি। আচ্ছা, আজ তুমি এসো, কাল সকালে তোমার বাড়ি আমি যাব।

ও. কে. বলে আধা-মিলিটারি কায়দায় নমস্কার করে বেরিয়ে গেল অয়স্কান্ত। যাওয়ার সময় থেমে পিছন ফিরে জানাল, দেরি হলে ঠকবেন, অনেক ধনী মেয়ের বাপ আমার পিছু লেগেছে। তবে আপনার মেয়ের ক্লেম সবার আগে। বাই বাই, বলে সে বেরিয়ে গেল।

স্ত্রী বললেন, মেয়ে নিশ্চয় সব শুনেছে আর খুব খুশি হয়েছে।

পাশের ঘরে মেয়ে তখন বিছানার উপরে শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ চেপে

অঝোরে কাঁদছে।

বিকালবেলায় কিছুক্ষণের জন্য অনুরাধা বের হয়েছিল, সন্ধ্যা আসন্ন দেখে তাড়াতাড়ি ফিরছিল, এমন সময়ে বাড়ির কাছে আসতেই সাইরেন বেজে উঠল। সে বাড়িতে ঢুকতে যাবে এমন সময়ে দেখতে পেল গোলক দাঁড়িয়ে আছে।

গোলকবাবু, এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বোমা পড়তে পারে। আসুন, ভিতরে আসুন।

মিস চৌধুরী, আমি কি এমন সৌভাগ্য করেছি যে বোমা আমার মাথায় পড়বে ?

গোলকবাবু, আপনার মাথায় পড়লে আমাদের মাথাও রক্ষা পাবে না। ওর চোট খুব ব্যাপক। আসুন।

কোন্ মুখে সেখানে আমি যাব।

এমন পাগলও তো দেখিনে, আসুন, এই বলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে দুজনে বাড়িতে ঢুকল।

অগত্যা গোলকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে স্থির করতে হল। মেয়ে অন্যত্র বিয়ে করবে না বলে আল্টিমেটাম দিয়েছে।

মা বললেন, আহা, মেয়ের কি সৌভাগ্যি! এবারে সুরটা অবশ্য আলাদা।

বাপ বললেন লোকটা পরিশ্রমী আছে। না হয় কিছু মূলধন দিয়ে কলার ব্যবসায় লাগিয়ে দেব।

কথাটা প্রচারিত হতে বিলম্ব হল না, অয়স্কান্তর কানেও পৌঁছল। একদিন ভোরে দেখা গেল অবিনাশবাবুর বাড়ির দরজায় একখানা কাগজ আঁটা, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, ন্যায্যমূল্যে এই বাড়ি কিনতে চাই, ব্যানানা মার্চেণ্ট।'

ইডিঅলজি

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রসমাজ মনুষ্যসমাজের চেয়ে কম সভ্য নয়, কেননা তাহারা মানুষের মতোই সুকৌশলে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নরহত্যা করতে অভ্যস্ত। তাছাড়া মাঝে মাঝে সভা সম্মেলন ক'রে বিশ্বজনীন সৌহার্দ্য প্রকাশ করে থাকে। এই রকম একটি সভায় বিবৃতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক

বাঙালী সাহিত্যিক প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। তারপরে অনেককাল আর ব্যাঘ্রসমাজের বিবরণ সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি। সম্প্রতি একটি বিবরণ আমাদের হস্তগত হয়েছে, এখানে তা নিবেদন করছি।

কিছুকাল আগে নিখিল সুন্দরবন শার্দূল সমাজের একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে, তাতে পূর্ববৎ ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সভাপতির আসন সংগ্রহ করেছিলেন। সভায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যাঘ্র-ব্যাঘ্রিণীগণ উপস্থিত ছিল। ব্যাঘ্রসমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদক অনেকগুলি প্রস্তাব সমর্থিত হয়ে যখন সভাভঙ্গের উপক্রম হয়েছে তখন ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে একজন ব্যাঘ্র পয়েণ্ট অব অর্ডার তুলে বলল, সভাপতি মহাশয়, আমরা আর সব বিষয়ে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাদের যা আছে আমাদের সে-সব তাদের চেয়ে বেশি আছে, আবার আমাদের কিছু কিছু আছে যা তাদের আদৌ নাই, যেমন এই ধরুন লাঙ্গুল। কিন্তু এক বিষয়ে তারা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে।

কি, কি,— বলে রব উঠল সভায়।

সভাপতি বললেন, কোন্ বিষয়ে মানুষ আমাদের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর প্রকাশ করে বলুন?

ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলল, মহাশয় সে বিষয়টির নাম ইডিঅলজি (Ideology)।

সভাস্থ সকলের মুখপাত্ররূপে সভাপতি শুধালেন, ইডিঅলজি কি বস্তু? সে কি দেহের কোন অঙ্গ, না মানসিক কোন শক্তি কিংবা আধ্যাত্মিক কোন উপলব্ধি জানা আবশ্যক?

ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলল, সে বস্তু যে কি আমিও ঠিক জানি না, তবে মানুষের পুস্তক-পুস্তিকা সংবাদপত্র ও সভার বিবৃতি পাঠ ক'রে ধারণা হয়েছে ও একটি দিব্যশক্তি যার বলে মানুষ বলীয়ান।

সে বস্তু কোথায় পাওয়া যায়, বাজারে না হাটে, গাছে ফলে কিংবা খনিতে জন্মায়, জলে স্থলে আকাশে কোথায় তাহার চাষ হয়, সে বস্তু মণ দরে কিংবা গজ দরে বিক্রয়—খুলে বলুন, দাবী করলেন সভাপতি।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলল, এসব আমি কিছুই জানি না, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি ব্যাঘ্রসমাজ যতদিন না ইডিঅলজির বলে বলীয়ান হচ্ছে ততদিন মানুষের সমকক্ষ বলে দাবী করতে পারে না।

সভাস্থ সকলেই ক্ষুদ্রবুদ্ধির সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন এবং ইডিঅলজির স্বরূপ

জানবার ও তা করায়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী কমিটি তখনই গঠিত হল। কমিটির সভ্যদের উপরে আদেশ হল যে আগামী পূর্ণিমায় এখানে যে মহতী সভার অনুষ্ঠান হবে তাতে তাদের অনুসন্ধানের ফল অবশ্যই নিবেদন করতে হবে। তারপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাভঙ্গ হলে সভ্যগণ বিষয়কর্মের অনুরোধে জনপদের দিকে প্রস্থান করলো। .

॥ ২ ॥

যথানির্দিষ্ট সময়ে এবং যথানির্দিষ্ট স্থানে নিখিল সুন্দরবন শার্দুল সমাজের সভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হলে একজন সভ্য জিজ্ঞাসা করলো, আপনার কমিটির আর চারজন সভ্যকে দেখছি না কেন?

ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলল, তাদের অনুপস্থিতির কারণ অবশ্যই নিবেদন করবো, আগে আমার বক্তব্য শেষ করতে দিন।

এই বলে সে আরম্ভ করলো—আমরা কলকাতায় উপস্থিত হয়ে ইডিঅলজির আড়তের সন্ধান করতে লাগলাম। অনেক অনুসন্ধানের পরে জানলাম যে চৌরঙ্গী, ধর্মতলা, বড়বাজার, বউবাজার ও গেঁড়াতলায় প্রধান আড়ত। আমরা পাঁচজনে একটি আড়তে প্রবেশ ক'রে জানালাম যে আমরা ইডিঅলজি ক্রয় করতে চাই। সেখানকার লোকেরা আমাদের নিতান্ত বন্য বনে ক'রে তাড়িয়ে দিল। তখন অপর একটি আড়তে গেলাম।

এমন সময়ে একজন সভ্য শুধালো, তারা কি আপনাদের বাঘ বলে চিনতে পারলো না?

মোটেই নয়। তবে একজন আমাদের গায়ের ডোরা কাটা দাগ দেখে বিস্মিত হওয়াতে বললাম যে ওটা আমাদের Uniform! তখনি তারা মেনে নিল। আমরাও অবশ্য বিস্মিত কম হয়নি, কেননা, হাবেভাবে আচার-আচরণে এবং ভাষায় ও ভঙ্গীতে বাঘে মানুষে প্রভেদ আমাদের চোখে পড়লো না। এতকাল যে প্রভেদের কথা আপনারা শুনে এসেছেন তা নিতান্ত নিন্দুকের রটনা। আমরা আড়ত থেকে আড়তে ঘুরে ইডিঅলজির সন্ধান করতে লাগলাম। বড়বাজারে গিয়ে শুনলাম যে সেখানে ইডিঅলজিকে বলে 'নাফা'। 'নাফা' কি বস্তু বুঝতে না পারায় আমরা অন্য আড়তে গেলাম। এইভাবে ক'দিন ঘোরাঘুরি ও গবেষণার পরে জানলাম যা

নিবেদন করছি।

ইডিঅলজি কোন বস্তু নয় একটি নীতিমাত্র। যেমন নিজের জন্য পরের দ্রব্য না বলে গ্রহণ করলে চুরি করা হয়, কিন্তু পার্টি বা দলের জন্য সেই কাজ করলে তা আর চুরি বলে গণ্য হয় না, তখন তাকে সৎকার্য ও অবশ্য কর্তব্য বলা হয়ে থাকে।

আবার দেখুন, খামোকা একটা মানুষকে নিহত করলে তাকে খুন বলা হয়। কিন্তু মাননীয় আদালত যখন সেই কাজের হুকুম দেন তখন তা হয় ন্যায়বিচার। আবার পার্টি বা দল যখন ঐ কাজ করায় তখন তার নাম লিকুইডিশেন।

আরও দেখুন, ব্যক্তিগত স্বার্থে শত্রুকে দেশের ভিতরে আহ্বান করলে বলা হয় দেশদ্রোহিতা, কিন্তু পার্টি বা দলের স্বার্থে আততায়ী শত্রু দেশের মধ্যে প্রবেশ করলে তার নাম হয় লিবারেশন। একজন প্রাজ্ঞ আমাকে বুঝিয়ে দিল যে Invasion ও Liberation দেখতে একরকম মনে হলেও আসলে এক নয়।

কেমন কেমন বুঝিয়ে দিন,—অনেকে দাবী করলো।

মনে করুন আমাদের সুন্দরবন যদি ভল্লুকসমাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয় তবে তবে বলবো Invasion, কিন্তু সুন্দরবনের ব্যাঘ্রসমাজের কিয়দংশ যদি যোগ-সাজসে ভল্লুকদের ভিতরে ডেকে নিয়ে আসে তবে তার নাম হবে লিবারেশন (ধিক ধিক ধ্বনি)। আর অন্য বাঘেরা যদি তাদের বাধা দেয় তবে তারাই হবে Invader ও Traitor ! (শেম শেম ধ্বনি)

আপনারা এমন কাজের নিন্দা করছেন বটে তবে সমস্ত মানুষ নিন্দা করে না।

তারা কারা ? সকলে গর্জন ক'রে উঠল।

তারা প্রোগ্রেসিভ ও ইন্‌টেকচুয়াল।

ও কি দুই না এক ?

দু-ই-ও বটে আবার একও বটে।

কেমন ?

যেমন ব্যাঙ ও ব্যাঙাচি। যতক্ষণ না লেজটুকু খসে পড়ছে ইনটেলেকচুয়াল, তারপরেই প্রোগ্রেসিভ।

সেই লেজটুকুর নাম কি ?

সেই লেজটুকর নাম মধ্যবিত্ত সংস্কার। (হিয়ার, হিয়ার ধ্বনি)

তখন সভাপতি মহাশয় শুধালেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো? ইডিঅলজি কি?

আমি আগেই বলেছি ইডিঅলজি কোন বস্তু নয়, ইডিঅলজি একটি নীতি। এবারে সূত্রাকারে ঐ নীতিকে প্রকাশ করা যেতে পারে—"সবার উপরে পার্টি সত্য, তাহার উপরে নাই।" পার্টির স্বার্থের খাতিরে যখন দেশ, ধর্ম, স্বজন, সমাজ, সত্য, ঐতিহ্য বিসর্জন দিতে পারবেন তখন জানবেন যে ইডিঅলজিতে আপনারা বেশ পোক্ত হয়েছেন।

তখন সভাপতি মহাশয় বললেন, আমরা তো চিরকাল এই কাজ ক'রে আসছি তবে এতদিন না জেনে করতাম, এখন থেকে না হয় সচেতন ভাবেই করা যাবে। মানুষকে কিছুতেই এগিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

তখন সভ্য মহোদয়গণ লেজের চটপটা ধ্বনি দ্বারা সভাপতির বক্তব্য সমর্থন করলো। এমন সময়ে একজন বললো, বাকি চারজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করুন?

সে অতি সামান্য কথা। দুইজন slogan হাঁকবার জন্যে দুটি দল কর্তৃক মোটা বেতনে নিযুক্ত হয়েছে।

বাকি দু'জন?

সরকারের গণরঞ্জন শাখায় শার্দুল নৃত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিন বছরের জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

বেতন?

অঢেল পারমিট ও লাইসেন্স পাবে।

তবু তো লোক-দেখানো একটা বেতন থাকে?

আছে। পত্র-পত্রিকায় তাদের ছবি ছাপা হবে। (বেশ বেশ ধ্বনি)।

তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরে সভাভঙ্গ হল, এবং সভ্যগণ সচেতন ভাবে ইডিঅলজি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে জনপদের দিকে ধাবমান হল।

সহৃদয় প্রতিবেশী

যীশুখৃষ্ট যদি আমাদের পাড়ায় পরমানন্দকে দেখতেন তবে কখনোই উপদেশ দিতেন না যে প্রতিবেশীকে ভালবাস। পরমানন্দ প্রসঙ্গে কথাটা

একেবারেই অবান্তর। পরমানন্দ সহৃদয়তম প্রতিবেশী। পাড়ার সকলে বলাবলি করে এরকম প্রতিবেশী পাওয়া পরম সৌভাগ্য।

পরমানন্দর বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। এই বয়সেই তার সহৃদয়তার যে গভীরতা ও বিস্তার তাতে সকলেই আশা করে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয়তার সীমানা বৃদ্ধি পেতে পেতে, যথাসময়ে পাড়া অতিক্রম করে শহরটি, দেশ এবং অবশেষে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করে নেবে তার সহৃদয়তা। তখন সে পরিণত হবে একজন বিশ্ব-মানবে। আপাততঃ সে বিশ্ব-মানবের অঙ্কুর। পরমানন্দ কি করে, অর্থাৎ তার জীবিকার উপায় কি, কেউ জানে না। যতদূর জানা যায় সে কিছুই করে না, অথচ বেশ চলে। আর সবাই যখন অফিস-আদালত স্কুল-কলেজে যায় তখন সে সুস্থ মেজাজে ধীরে-সুস্থে প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর নিতে বের হয়। কার বাড়িতে ডাক্তার ডাকতে হবে, কার জন্য দুষ্প্রাপ্য ওষুধ সংগ্রহ করতে হবে, কার মেয়ের বিয়েতে শামিয়ানা খাটাতে হবে, কার ছেলের পরীক্ষার নম্বর সংগ্রহ করতে হবে— তালিকা প্রস্তুত করে নিয়ে সে বের হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ জীব যে এমন ব্যক্তিকেও ঈর্ষা করে। বাপের টাকা থাকলে নিশ্চিন্ত মনে আমরাও পরোপকার করতে পারি। যুদ্ধের বাজারে চোরা কারবার করে জমিয়েছে এখন পরোপকার করে তার প্রায়শ্চিত্ত করা হচ্ছে। সেদিন যে বিপন্ন রামবাবুর অসুস্থ ছেলের জন্য সমস্ত কলকাতা শহর মন্থন করে ওষুধ নিয়ে এল সেই তিনিই আড়ালে বললেন, আরে, ও পারবে না তো কে পারবে? চোরা-কারবারীদের সমস্ত ঠিকানা ওর জানা। অথচ ওষুধটা প্রকাশ্য দোকান থেকে কেনা, দাম এক পয়সাও বেশি লাগেনি, স্পষ্ট ক্যাশমেমো এনেছে। এমন দু-চারজন নিন্দুক সুন্দরীর গালের তিল, মোটের উপর পাড়ার সকলেই খুশি, মানব স্বভাবের কৃতজ্ঞতা গুণের খাতিরে এ-কথা স্বীকার না-করে উপায় নেই।

যদুবাবু স্টেশনে যাবেন, ট্যাক্সিতে মাল তোলা হচ্ছে, এমন সময়ে পরমানন্দ এসে হাজির। আর সকলে যখন একটি সংক্ষিপ্ত নমস্কার করে বিদায় নেয়, পরমানন্দ তখন কুশলপ্রশ্নের ঝুলি মেলে দেয়। কেন যাচ্ছেন, কবে ফিরবেন; টিকিট কিনতে নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে, আমাকে বলেন নি কেন, এ ভারি অন্যায়; আমি তো এই সব কাজের জন্যই আছি; না, না, কষ্ট হবে কেন, আমাকে না বলা ভারি অন্যায় হয়েছে, কুঁজোতে জল আছে তো;

ঝাঁঝা রেলস্টেশনে জল বদলে নেবেন, ওখানকার জল খুব স্বাস্থ্যকর। যদুবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, ট্রেনের সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু এসব কুশল-জিজ্ঞাসা ভদ্রভাবে লঙ্ঘন করবার উপায় দেখতে পান না, বিশেষ মনে পড়ে এই ক'দিন মাত্র আগে তাঁর মেয়ের বিয়েতে নিজের খরচায় আতসবাজি পোড়াতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে পরমানন্দ। যদুবাবু আপত্তি করলে বলেছিল, কেন, আপনার মেয়ে কি আমার কেউ নয়? এর উত্তর খুঁজে পান নি যদুবাবু। যদুবাবু ট্রেন ফেল করলেন। অনুতপ্ত পরমানন্দ পরদিন সঙ্গে গিয়ে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে এল।

শ্যামবাবু এসে বললেন, পরমানন্দ ভায়া, শুনছি আমার নাতি গণিতে কয়েক নম্বর কম পেয়েছে, তুমি যা হয় একটা গতি করে দাও; তুমি থাকতে কি ছেলেটা ফেল করবে।

পরমানন্দ বলে উঠল, সে কি কথা, আমি এখনি যাচ্ছি। তার পরে পরীক্ষার নাম, কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য সংবাদ জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন নানা জায়গায় ঘুরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরে এসে পরমানন্দ জানাল, চিন্তা করবেন না, সব ব্যবস্থা করে এসেছি। শ্যামবাবুর বন্ধুরা বলল, হাম্বাগ, ওর কথা বিশ্বাস করো না। কিন্তু বিশ্বাস করতেই হল, ফল বের হলে দেখা গেল নাতি পাশ করেছে। শ্যামবাবু কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে উল্টো কৃতজ্ঞতার চাপে অফিস-কামাই করতে বাধ্য হলেন।

সেদিন পাড়ার কাছে একটা বস্তিতে আগুন লাগলো। লোকে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে (এবং আগুন লাগলে ঘর কিভাবে পোড়ে দেখবার আশায়) গিয়ে জুটল। তবে সকলের আগে গিয়েছে পরমানন্দ। লোকে দেখতে পেলো সে বিশ্বরূপ ধারণ করে পরামর্শ দিচ্ছে, জল টানছে, জিনিসপত্র টেনে বের করেছে, খড়ের চাল কেটে নামাচ্ছে, এমন কত কি অবশ্যকর্তব্যে সে নিযুক্ত। ফায়ার-বিগ্রেডের গাড়ি যখন এল তখন আর করণীয় কিছু নেই। দমকল-বাহিনীর লোকে শঙ্কিত হয়ে উঠল, পাড়ায় পাড়ায় এমন জনকল্যাণকামী দেখা দিলে তাদের বেকার হতে হবে। সাধে কি লোকে পরমানন্দকে ভালোবাসে। যীশু একটা উপদেশের অপব্যয় করেছেন। খুব সম্ভব তাঁর প্রতিবেশীগণ ভালো লোক ছিল না।

পাড়ায় বিব্রত প্রেমিক অবিনাশ। তার চেহারাটি ভালো, চাকরিটি আরও ভালো। ফলে দেশের যাবতীয় বিবাহযোগ্যা এবং বিবাহঅযোগ্যা

যাবতীয় মেয়ে ও তাদের জননীগণ সচেতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কুমারী সৌদামিনীর কাছে কেউ নন। পৃথিবীর সৌদামিনী আকাশের সৌদামিনীর মতোই ক্ষিপ্র ও মারাত্মক। তার রূপ? সৌদামিনী যে মেঘমালায় বিকশিত তারই সঙ্গে রঙে ও আকারে মিল পৃথিবীর এই কুমারীকন্যাটির। তার উদ্যমে অবিনাশের প্রাণান্তকর অবস্থা, তাই সে বিব্রত প্রেমিক। কুমারী সৌদামিনীর প্রেম-নিবেদনের স্থান-অস্থান কাল-অকাল ভেদ নাই। কেমন করে সংবাদ পায় অবিনাশ বিশেষ এক সময়ে হাওড়া স্টেশনে গাড়ী থেকে নামবে, সৌদামিনী হাজির। অফিসে গিয়ে তার খাসকামরায় স্লিপ পাঠায়। হঠাৎ চৌরঙ্গীতে অবিনাশের মোটরগাড়ির পাশে উপস্থিত হয়, আমাকে একটা লিফ্‌ট দেবেন? তাছাড়া অবিনাশের বাড়ির ফোন নিরন্তর বেজে ওঠে, কুমারী সৌদামিনী বলছি। অবিনাশ মনে মনে বলে কুমারী না মহামারী। সে ফোন ধরা ছেড়ে দিয়েছে। খামের চিঠি খোলাও বন্ধ করেছে, কেন না শিরোনামায় সর্বদা একটি বিশেষ ধরনের হস্তাক্ষর। ব্যাপারটা সৌদামিনী আন্দাজ করে নিয়ে টেকনিক বদলেছে, শিরোনামায় টাইপ-করা ঠিকানা। বেচারা সর্বদা মন-মরা হয়ে বাড়িতে বসে থাকে।

সবাই ব্যাপারটা জানে, তবে নিরুপায়। বাঘের মুখ থেকে তাকে রক্ষা করবার উপায় কেউ খুঁজে পায় না। এর চেয়ে বাঘ বরঞ্চ ভাল। অবশেষে একদিন অবিনাশের অবস্থা চোখে পড়ল পরমানন্দর। কি হয়েছে অবিনাশবাবু? পরমানন্দর সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তবু বিপদের কথা খুলে বলে ফেলল। মজ্জমান ব্যক্তি কাষ্ঠাকাষ্ঠ বিচার করে না। সমস্ত কথা শুনে সে বলল, এই ব্যাপার, আচ্ছা আমি দেখছি। অবিনাশ তার সান্ত্বনাবাক্যে তেমন গুরুত্ব দিল না, ও আর কি করবে? কিন্তু সহৃদয় প্রতিবেশীর পক্ষে অসাধ্য কিছু আছে কি?

পরমানন্দকে আর পাড়ায় তেমন দেখা যায় না, অনেকের অনেক কাজ পরমানন্দের আশায় বৃথাই পড়ে থাকে। ওদিকে কুমারী সৌদামিনীরও আত্মবিকাশ যেন কিছু কম। অবিনাশ ভাবে শেষে পরমানন্দ কি ওকে খুন করল? ভাবে যা হোক কিছু একটা করুক, নিজে রক্ষা পেলেই হল।

দিন দশেক পরে অবিনাশ একখানা চিঠি পেল পরমানন্দর কাছ থেকে। সে লিখছে, ভাই অবিনাশ, তুমি শুনে নিশ্চয় সুখী হবে যে কুমারী সৌদামিনী আমাকে পতিত্বে বরণ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। আগামী ১০ই

তারিখে গোমোতে আমাদের শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। গোমোতে সৌদামিনীর একখানি বাড়ি আছে। হনিমুনের পর্ব সেখানেই কাটবে। তারপরে পাড়ায় ফিরে তোমাদের সকলকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করবার ইচ্ছা আছে। দয়া করে সকলকে সুসংবাদটা দিও, যথাসময়ে আনুষ্ঠানিক পত্র যাবে।

ইতি তোমাদের পরমানন্দ।

অবিনাশ আপিস কামাই করে সকলকে সুসংবাদ দিতে বের হল, অনেকদিন পরে তার মুখে হাসি ফুটেছে। অবিনাশ সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করল সহৃদয় প্রতিবেশীর এটাই সহৃদয়তম কাজ।

বিবাহ, হনিমুন ও প্রীতিভোজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। অবিনাশ এখন সহৃদয় প্রতিবেশীর মূর্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে চাঁদা-সংগ্রহে ব্যস্ত।

সনাক্ত

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে ইংরাজ শাসন লোপ পেয়েছে। থানা কাছারী হয় দগ্ধ নয় জনশূন্য। ইংরেজ শাসকদের বদলে স্থানীয় লোকের শাসন কায়েম হয়েছে; তারা শান্তিরক্ষা করছে, বিচার করছে, খাজনা আদায় করছে। ক্ষুদ্র স্বাধীন খণ্ড রাজ্য, দেশব্যাপী স্বাধীনতার পূর্বাভাস। কখনো কখনো ইংরাজের পুলিস মিলিটারির সাহায্য নিয়ে-সদলে কোন গ্রামে এসে ঢোকে, ধানের গোলা পুড়িয়ে দেয়, হুলিয়া আসামীর সন্ধানে মারধোর লুটপাট করে, রামকে না পেলে রমেশকে ধরে নিয়ে যায়। এমন সময়ে বিদ্যুৎবাহিনীর বাঁশী বেজে ওঠে, সন্ত্রস্ত পুলিস সরে পড়ে, বিদ্যুৎ-বাহিনীর বৈদ্যুতিক স্পর্শ মারাত্মক অভিজ্ঞতায় জেনেছে। আর কিছু নয়, ভরা নদীতে ফেলে দিলে ডুবে না মরলেও হাঙর কুমীরের মুখে প্রাণ হারানো অনিবার্য। বর্ষাকালে নদী নালা বিল খাল জলে পূর্ণ।

সেদিনে সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে অরিন্দম থড়গ্রামের মোতি মইতির খিড়কি দরজায় এসে তিনটে টোকা মারলো। শব্দ শুনে নিয়ে একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে অবাক্ হয়ে গেল।

দাদাবাবু, তুমি?

হ্যাঁ, মাইতি বউ আমি। মাইতি কোথায়?

মেদিনীপুর গিয়েছে, বিকালে ফিরবার কথা ছিল, হয়তো বা মাঝপথে

পুলিসে ধরেছে।

মাইতি বউ অত্যন্ত সাধারণভাবে বলল, হয়তো পুলিসে ধরেছে, ভয়-ভরের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। অরিন্দম জানতো এদের পুলিসের ভয় ভেঙে গিয়েছে, তবু একটু খোঁচা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, পুলিসে ধরেছে, হয়তো নয় নিশ্চয়, তা তোর ভয় করছে না।

আগে তো করতো, এখন তোমাদের কাণ্ড দেখে ভয় ভয় পেয়ে পালিয়েছে, তোমার নামে তো তিনটে হুলিয়া।

অরিন্দম হেসে বলল, তা বটে, তিন নামে তিন হুলিয়া, অরিন্দম, সনাতন আর পূর্ণানন্দ। আরও দুটো নূতন নাম ভেবে রেখেছি।

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার শতনাম শুনবো, ধীরে সুস্থে, এখন খেয়ে নাও।

চিড়ে মুড়ি খাওয়াবি, না ভাত আছে?

ভাত আছে, তবে যদি খই চাও তো যত খুশি দিতে পারি।

খুব খই ভাজছিস বুঝি, কাজ নেই।

আমাদের আর ভাজতে দিচ্ছে কই, ভাজছে তো পুলিসে। ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, বেবাক খই হয়ে যাচ্ছে—এই বলে হেসে ওঠে।

ভাত খেতে খেতে বিস্মিত অরিন্দম বলে, গোলা পুড়ছে আর হাসছিস।

কাঁদলে কি ফিরে পাবো!

মাইতি থাকলে দেখতিস, এত কষ্টের ধান।

সে আরো এক কাঠি সরেস, বলে, বউ চল্ সব গোলা গুলো পুড়িয়ে দি, আর কিছু না হোক পুলিসের কাজটা হাল্কা হবে। ওর ধারণা কি জানো দাদাবাবু, পুলিসের বিশ্বাস গোলার মধ্যে ফেরারী লুকিয়ে থাকে, তাই জালিয়ে দেয়।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। ক'দিন আগে রামচন্দ্রপুরে ঘোড়াইদের ধানের গোলায় তিন রাত্রি লুকিয়ে ছিলাম।

পুলিসে জালিয়ে দেয় নি?

কী বুদ্ধি। তা হ'লে কি আর এখানে ব'সে ভাত খেতে পারতাম। এই দেখ না, আজ তোদের বড় গোলাটার মধ্যে থাকবো, রাতে জালিয়ে দিলে কাল ভোরে আমাকে বেগুনপোড়া অবস্থায় পাবি।

কী কথার ছিরি তোমাদের।

আমার আর কার ?

তোমাদের সকলেরই, রমেশদাদা, সামন্ত মশাই, চৌধুরীবাবু সকলেরই। আবার তোমাদের দেখাদেখি মাইতিও শিখে উঠেছে।

ক্ষতি কি ?

কাজে যা করছ করো, মুখে ওসব কি অলুক্ষণে কথা !

মাইতিবউ তুই ছেলেমানুষ তাই বুঝছিস না। মরবো মরবো জপ করতে করতে মরাটা সহজ হয়ে আসে। ভালো কথা, ছেলে-মেয়ে দুটোর কি করেছিস ?

ঝাড়গ্রামে মাসীর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছিস, এখন নিশ্চিন্ত মনে স্ত্রীপুরুষে মরতে পারবি।

তোমরা তো আগু বেলায় মরবে।

এখন মনে হচ্ছে তাই বুঝি বা হয়।

কেমন ?

আমাদের সায়েস্তা করবার জন্যে কলকাতা থেকে স্পেশাল ইনস্পেক্টর এসেছে। গোবিন হালদার যেমন সাহসী তেমনি চতুর তেমনি এসব কাজে পটু।

কত ইন্সপেক্টর এলো গেলো, কেউ পারলো তোমাদের সঙ্গে ! সেই যে সেবারে মজুমদার না কি তোমাকে এসে গ্রেপ্তার করলো, তুমি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দেখে কেমন শান্তভাবে বললে, ইন্সপেক্টর সাহেব এতে যে অরিন্দম রায়ের নাম লেখা, আমি সনাতন চৌধুরী। সবাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।

এমন একবার নয় রে। ঐ রকম ধাপ্পা দিয়ে অনেকবার ছাড়া পেয়েছি। ওরা সব বিদেশী লোক, এদিকের মানুষ চেনে না, এদিকের কেউ তো সনাক্ত করতে এগিয়ে আসবে না, বিদেশী লোকের ঐ সুবিধা।

আর গোবিন হালদার বুঝি তোমার বোনাই।

বোনাই হলেও বুঝিবা ভালো ছিল। গোবিন হালদার আর আমি পাঠশালা, ইস্কুল কলেজ সব একত্র পড়েছি।

পুরনো বন্ধু। তা তুমিও পুলিসে ঢুকলে না কেন ?

তার চেয়ে গোবিন যদি বিদ্যুৎবাহিনীতে ঢুকতো নিশ্চিত হতাম। সোনার তাল রে।

পুলিসের এত প্রশংসা ?

মানুষের প্রশংসা করছি রে, পুলিসের নয়।

ইতিমধ্যে তার আহার শেষ হয়ে গিয়েছিল, হাত ধুয়ে শুধালো, বল্‌, কোন গোলাটায় শোব।

গোলাতে নয় দাদাবাবু।

কেন রে ?

বেগুনপোড়ায় আমার রুচি নেই, বড় ঘরের ছাদের সঙ্গে যে পাটাতন আছে সেখানে শোবে চলো, কাকপক্ষীটি টের পাবে না।

তাই হোক, আজ সারাদিন ঘুরে ঘুরে গা হাত পা এলিয়ে গিয়েছে, আর খাড়া থাকতে পারছি না।

চলো। তবে এক কথা দাদাবাবু, রাতের বেলায় পুলিস এসে যদি গোলায় আগুন দেয় তবে যেন বাহাদুরি ক'রে নেমোনি।

এদিকে পুলিস এসেছে নাকি ?

শুনেছিলাম যে বিলের ওপারে পুলিসের গাড়ী দেখা গিয়েছে।

সে অনেক দূর।

মনে থাকবে তো!

আচ্ছা, সময় কালে দেখা যাবে। দে একটা বালিশ টালিশ দে।

অনেক রাতে অরিন্দমের ঘুম ভেঙে যায়, চালের ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় আকাশ রাঙা হ'য়ে উঠেছে। ভোর হল নাকি ? সর্বনাশ! অন্ধকার থাকতেই রওনা হয়ে সুতাহাটা পৌঁছবে ভেবেছিল, কিন্তু এখানেই শেষে এক প্রহর বেলা হল। আর একটু ঠাহর ক'রে দেখে বোঝে, এটা তো পশ্চিম দিক, ভোরের আলোয় পশ্চিম দিক রাঙা হবে কেন ? তবে কি শেষ রাতে চাঁদ উঠল ? তাই বা কেমন ক'রে সম্ভব ? সন্ধ্যাবেলায় চাঁদ দেখেছিল মনে পড়লো। তবে—নিশ্চয় গাঁয়ের ধানের গোলাগুলোয় পুলিসে আগুন দিয়েছে। তখনি মনে হল মাইতিদের গোলাও বাদ যাবে না। পুলিসে তার সংবাদ পেয়ে এসে গ্রাম ঘেরাও করেছে। সঙ্কল্প করে ফেলল পালাবে, ধরা পড়লে গাঁয়ের লোকের সর্বনাশ হবে।

নীচে নামতেই মাইতির সঙ্গে দেখা।

কি মাইতি কখন এলে ?

মাইতি তার উত্তর না দিয়ে বলল, নামলেন কেন ? উপরে যান, পুলিস

আপনার সন্ধানেই এসেছে।

জানি। পালাবো, এখানে ধরা পড়লে তোমাদের গোলাগুলো পুড়িয়ে দেবে।

এই বলে সে খিড়কি খুলে ফেলল, খিড়কি খুলতেই এক ঝিলিক বিজলি বাতির আলো পড়লো তার মুখে।

হুজুর, আসামী অরিন্দম রায়কে মিল গিয়া, বলতে বলতে সিপাহী এসে হাত কড়া পরিয়ে দিল তার হাতে।

কে তোমার আসামী ? আমি অরিন্দম রায় নই।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভারি গলায় জবাব এলো, গ্রেপ্তার করে রাখো, আমি অরিন্দম রায়কে চিনি।

সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল ইন্‌স্‌পেক্টর গোবিন হালদার এগিয়ে এসে বিজলি বাতির ছটা ফেলল তার মুখে।

পাঠান সিপাহী বলে উঠল, হুজুর, শালা এক নম্বর হারামী, বহুৎ হয়রান করিয়েছে।

বিজলি আলোয় গোবিন হালদার ও অরিন্দম রায় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে।

পাঠশালা, ইস্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, ডিবেটিং ক্লাব, পরীক্ষার হল, বরাবর ফার্স্ট সেকেণ্ড, শালা এক নম্বর হারামী, হয়রানি কম করেনি গোবিন হালদারকে, কখনো ফার্স্ট হ'তে দেয় নি, বিজলি আলো, এতদিন পরে চোখাচোখি, হাতে হাতকড়া, কারো মুখে কথা নেই, কেবল অপলক দৃষ্টি।

পাঠান সিপাহী কোমরে দড়ি পরাতে উদ্যত হয়ে বলে, হুজুর, টানিয়ে নিয়ে চলি।

না, এ অরিন্দম রায় নয়, তাকে আমি খুব ভালো ক'রে চিনি, হাতকড়া খুলে দাও, আপনি খালাস, সরি, বলে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে বিজলি বাতি নিভিয়ে অন্ধকারের মধ্যে উল্টো দিকে দ্রুত প্রস্থান করে স্পেশাল ইন্‌স্‌পেক্টর গোবিন হালদার।

কি হল ঠিক বুঝতে না পেরে মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অরিন্দম রায়।

সফল মৃত্যু

ডাক্তারবাবু, কোন রকমে আর দুটো দিন টিকিয়ে রাখুন।

দুটো দিন কেন, দু'-বছর টিকিয়ে রাখতে কি আমার অসাধ। কিন্তু বয়স হয়েছে যে আশীর উপরে।

আশী কবে পার হয়ে গিয়েছেন, দাদুর বয়স চুরানব্বই।

তবেই দেখুন কাজটা কত কঠিন। শরীরের কলকব্জা সব কমজোরি হয়ে গিয়েছে কিনা।

কিন্তু তেমনি আবার আপনাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জোর বেড়েছে, অনেক নূতন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

সে কথা মিথ্যা নয় মিঃ রায়, কিন্তু শরীরে কিছু না থাকলে ওষুধে কি করবে।

ওষুধে না হয় ইনজেকশন দিন, কত ঘাটের মড়া ইনজেকশনের জোরে খাড়া হয়ে উঠছে।

সে কথা সত্যি মিসেস রায়, কিন্তু তেমন ইনজেকশন তো দেখি না।

ভালো করে ভেবে দেখুন, ওঁকে আর দু'দিন টিকিয়ে রাখতে পারলে আমাদের ভীষণ উপকার করা হবে।

দেখুন মিস্টার ও মিসেস রায়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে সকলেই খুশী হয় কিন্তু আপনাদের ব্যগ্রতা দেখে মনে হচ্ছে বিশেষ কারণ আছে।

আছে বইকি ডাক্তার সরকার। নিশ্চয় শুনেছেন যে উনি ইলেকশনে দাঁড়িয়েছেন, দাদুর ভোটটা ওঁর পাওয়া অত্যন্ত দরকার।

অবশ্যই দরকার মিসেস রায়, তবে একটা ভোটে কি আসে যায়।

বলছেন কি ডাক্তার সরকার, একটা ভোটের এদিক ওদিকে কত সময়ে সমস্ত ওলটপালট হয়ে যায়। এবারে বক্তা মিস্টার রায়।

জানেন তো ডাক্তারবাবু বিন্দু বিন্দু বারিকণা নিয়েই মহাসমুদ্র, একটা ভোট হারালে চলবে কেন, বিশেষ সেটা যখন সুনিশ্চিত। এবারে বক্ত্রী মিসেস রায়।

স্বামী স্ত্রীর চাপে পড়ে ডাক্তারকে স্বীকার করতে হল যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদানের সহায়তায় একটা ভোটদানের নিঃসংশয়িত অধিকারী চুরানব্বই বছরের মুমূর্ষু রোগীকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করবেন।

ব্যাপারটা এই। বিধানসভায় আসন্ন নির্বাচনে অরিন্দম রায় নির্দলীয় সদস্যরূপে দাঁড়িয়েছেন। সব দলের দরজায় উমেদার হয়েছিলেন, কোন দল আমল না দেওয়ায় তিনি নির্দলীয়, বললেন আমি দলাদলি পছন্দ করি না, বললেন আমি Independent মেম্বার, কোন প্রলোভনেই Independence বিসর্জন দিতে রাজী নই। তাঁর ঠাকুর্দার অনেক টাকা, তায় তিনি ছয় মাস শয্যাশায়ী, সিন্দুকের চাবি নাতবৌ চম্পাকলির হাতে আর ব্যাঙ্কে তাঁর হয়ে নাম সই করবার অধিকার পেয়েছেন নাতি অরিন্দম, কাজেই টাকার অভাব নাই।

টাকার অভাব না থাকায় আর সব বিষয়ে সদ্ভাব ঘটলো। পাড়ার মুরুব্বীরা এসে বলল, অরিন্দম দাঁড়াও, দেশ তোমাকে চায়। পাড়ার ছোকরার দল জানালো, স্যার দাঁড়ান, খাটবার লোকের অভাব হবে না। সত্যি কিছুরই অভাব হল না, কারণ সব অভাবের অব্যর্থ প্রতিষেধক হচ্ছে টাকা।

অরিন্দম কাজে নেমে দেখল ভালো ভালো প্রতীকগুলো আগেই সকলে দখল করে নিয়েছে, তখন তিনি বাচস্পতি মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে (তিনি কিছু দক্ষিণা নিলেন) প্রতীকরূপে গ্রহণ করলেন ভূমণ্ডল। বাচস্পতি বললেন, বাবা গোরু ভেড়া, কাস্তে হাতুড়ি যে যা গ্রহণ করুক ভূমণ্ডলের চেয়ে বড় তো কিছু নেই। ছোকরার দল আড়ালে বলল, ঐ ভূমণ্ডলই জুটবে তোমার ভাগ্যে। মুরুব্বিরা বলল, এ তোমার উপযুক্ত হয়েছে, যা নেই ভূমণ্ডলে তা নেই এ মণ্ডলে। আর অসহায় পিতামহ দেখতে পেলেন তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ ভূমণ্ডলের পিছনে দ্রুত অপস্রিয়মাণ। আর চম্পাকলি কণ্ঠস্বরে অতলস্পর্শ দরদ মাখিয়ে এসে বলল, দাদু, তোমার ভোটটা ওঁকে না দিয়ে যেতে পারছ না। যেটুকু অব্যক্ত থেকে গেল সেটা হচ্ছে তার পরে আর তোমাকে আটকে রাখছিনে। চম্পাকলি এক পেয়ালা গরম হরলিক্স ও কয়েক টুকরো আপেল নিয়ে এসে বলল, দাদু, নাও খেয়ে নাও, ভোটের আর দু'দিন বাকি, এর মধ্যে যেন কিছু করে বসে আমাদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে যেও না। যারা বলে নারী করুণার বৃষ্টিধারা তারা কম বলে। নারী করুণার শিলাবৃষ্টি, মাথায় পড়লে আর রক্ষা নাই।

কিন্তু হায়, সেই দু'দিনও বুঝি আর কাটে না, তবে তা দৈহিক শক্তির দ্রুত অপহ্নবে কিংবা সিন্দুকের টাকার দ্রুত অপব্যয়ে বলা সহজ নয়। তখন

স্বামী স্ত্রী ডাক্তারকে বিশেষ করে ধরে পড়লো—যার বিবরণ গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে।

ভোটের আগের দিন রাতে ডাক্তার জবাব দিল, বলল, মিস্টার রায়, আপনারা ইচ্ছা করলে অন্য কোন ডাক্তার ডাকতে পারেন, আমার করণীয় আর কিছু নাই।

কেন বলুন তো।

আজকার রাত কাটবে বলে মনে হয় না।

চম্পাকলি বলল, শেষে এমন করে তীরে এসে তরী ডোবালেন। না, না ডাক্তারবাবু এ আপনার অন্যায়।

অন্যায় নয় মিসেস রায় অসাধ্য। আর তরী ডোবাবার মালিক তো উপরে আছেন।

কেন আমরা তো এমন কিছু খারাপ দেখতে পাচ্ছি না।

তার কারণ আপনারা ডাক্তার নন। পাল্‌স্‌ রেট মিনিটে ত্রিশের নীচে, রেসপিরেশন চল্লিশের উপরে, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তরল খাদ্যও গ্রহণ করতে পারছেন না তিন দিন, কেমন করে টিকে আছেন জানি না।

চম্পাকলি বলল, আমরা জানি নাতির পক্ষে ভোটটা দেবেন বলেই আছেন।

ডাক্তার নিতান্ত বিরক্ত হয়ে বলে ফেলল, আপনাদের মনে কি দয়ামায়া নেই!

দয়ামায়া আছে বলেই তো বাঁচিয়ে রাখতে এত চেষ্টা করছি।

আচ্ছা ধরুন যদি শেষ পর্যন্ত টিঁকেই থাকেন তবু নানারকম সমস্যা দেখা দেবে।

কি রকম?

একে একে বলছি। প্রথম এ রুগীকে নাড়াতে গেলেই বিপদ ঘটবে; তারপরে অজ্ঞান রুগীকে পোলিং বুথে ঢুকতে দেবে কিনা সন্দেহ; আর দিলেও আপনার প্রতীকটি বেছে নিয়ে ছাপ দিতে কখনোই পারবেন না। এবারে বুঝলেন তো।

অরিন্দম বলল, আপনার সমস্যাগুলোর সমাধান একে একে দিচ্ছি। অ্যাম্বুলেন্স এনে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি; নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে ডাক্তারে যদি সার্টিফিকেট দেয় যে রুগী জীবিত আছে

তবে পোলিং বুথে ঢুকতে কোন বাধা নেই ; আর আমার প্রতীক ! নিরন্তর তাঁর কানের কাছে নারায়ণ নারায়ণ উচ্চারণ করা হচ্ছে।

বিস্মিত ডাক্তার বলল, এমন রুগীকে তো তারকব্রহ্ম নাম শোনায় ।

সেটা না হয় ভোটের পরে শোনানো যাবে।

পত্নী বলে উঠল, বাচস্পতি মশায় ভোটের আগে তারকব্রহ্ম নাম শোনাতে নিষেধ করেছেন মুমূর্ষু । ঐ নাম শুনলে নাকি আর টেকে না।

তাই তিনি নারায়ণ নাম শোনাতে বলেছেন ?

না, ঠিক তা নয়। নারায়ণ তো শালগ্রাম শিলা। শালগ্রাম শিলা গোলাকার আবার ওঁর প্রতীক ভূমণ্ডলটাও গোলাকার, যাতে সেটা বেছে নিতে পারেন তাই নারায়ণ নামের ব্যবস্থা দিয়েছেন বাচস্পতি মশায়।

এবারে ডাক্তার সরকার সত্য সত্যই বিরক্ত হল, বলল, তবে আপনাদের উচিত ছিল আমাকে না ডেকে বাচস্পতি মশায়কে ডাকা। আচ্ছা এখন আমি চললাম।

ভোরবেলা আসবেন তো ?

আর আসবার দরকার হবে না।

তবু দরকার হল। ভোরবেলাতেও দেখা গেল যে সাড়ে পনের আনা মৃত রুগী জীবিত। বিস্মিত উল্লাসে চম্পাকলি বলল, দাদু তোমাকে সত্যই ভালোবাসেন, ভোটটি না দিয়ে যাবেন না।

তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, মোটে পাঁচটা বাজে, এখনো দু'ঘণ্টা দেরি পোলিং বুথ খুলতে।

অরিন্দম বলল, কিছু খাইয়ে নাও না।

না, না, খাওয়াবার চেষ্টা করতে গেলে কি হয় বলা যায় না। অ্যাম্বুলেন্স স্ট্রেচার সব এসেছে তো ?

সে-সব ঠিক আছে ।

এমন সময় ডাক্তার সরকার প্রবেশ করতেই চম্পাকলি বলে উঠল, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্র মিথ্যা প্রমাণ হল, উনি এখনো আছেন।

তাই তো দেখছি—বলে পাল্‌স্‌, রেসপিরেশন প্রভৃতি পরীক্ষা করে বলল, কিন্তু নিয়ে যেতে গেলে কি হয় বলা যায় না !

কিছুই হবে না। দাদু, নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

অরিন্দম বলল, ডাক্তার সরকার আপনাকে কিন্তু সঙ্গে যেতে হবে।

কেন আমাকে আবার কেন ?

বিরোধী পক্ষ যদি মৃত বলে চ্যালেঞ্জ করে আপনাকে সার্টিফাই করতে হবে।

কি বিপদ—বলে ডাক্তার চেয়ারে বসলো।

আর আমাদের বিপদটা দেখছেন না।

দেখছি বলেই তো বলছি। এ রুগী যে শতকরা ৯৯ ভাগ মৃত।

ডাক্তারবাবু, ভোট দেওয়ার পক্ষে ঐ এক ভাগই যথেষ্ট—

যথাসময়ে অর্থাৎ যথাসময়ের অনেক আগে এক ভাগ জীবিত, নিরানব্বই ভাগ মৃত ভোটারকে নিয়ে অরিন্দম ও চম্পাকলি পোলিং বুথের দিকে যাত্রা করলো। পোলিং বুথ অদূরে। ভোটার অর্থাৎ অনিমেষবাবুকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা সম্ভব হল না, ডাক্তার বলল, স্ট্রেচারে শুইয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হোক। সেই ব্যবস্থাই হল। উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকরা এসে কাঁধ দিল, তারা বলল, কাজটা শেষ হয়ে গেলে সোজা কেওড়াতলা নিয়ে গেলেই হবে। চম্পাকলি পাশে যেতে যেতে জোরে বলতে লাগলো (ডাক্তার সেইরকম পরামর্শ দিয়েছিল) নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

পাড়ার একজন বুড়ী বলল, নাতবৌ, এ সময়ে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করতে হয়।

চম্পাকলি বলল, তুমি এখন চুপ করো তো।

বুড়ী রেগে বলল, ভালো করলে মন্দ হয়। তারকব্রহ্ম নাম না শোনা অবধি প্রাণবায়ু বের হয় না।

আহা কি মুশকিল !

মুশকিল নয় নাতবৌ, আমার সোয়ামীর প্রাণ যখন কিছুতেই বের হয় না, তিনজন ডাক্তারের চেষ্টা সত্ত্বেও বের হয় না, আমি তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করলাম, অমনি তার চোখ উলটে গেল।

আহা থামো না বুড়ী।

তোমরা কলেজ-পড়া মেয়ে শাস্তরের তোমরা কি জানো। এ সময়ে তারকব্রহ্ম নাম যে শোনে যে শোনায় দু'জনেরই পুণ্য হয়। এই বলে সে সজোরে তারকব্রহ্ম নাম করতে লাগলো।

পাছে সময়োচিত নামের প্রতিক্রিয়ায় অনিমেষবাবু ভোটটি না দিয়েই

সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন সেই আশঙ্কায় চম্পাকলি বুড়ীর মুখ চেপে ধরলো।

স্ট্রেচার সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছে। ডাক্তার নাড়ি টিপে ধরে রয়েছে।

হঠাৎ বুড়ী মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠল, আহা-হা যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, হাজার হোক নিজের দাদাশ্বশুর তো।

তারপরেই চীৎকার করে উঠল, আবার ওপথে কেন, এই তো ডানে কেওড়াতলার পথ।

থাম্ অলুক্ষণে বুড়ী।

আমি অলুক্ষণে বটে। কোন্ লক্ষণটা ভালো শুনি, কিগো ডাক্তার বলো না।

স্ট্রেচার পোলিং বুথের কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ ডাক্তার রুগীর নাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলে উঠল, হয়ে গেল।

মিথ্যা কথা, নারায়ণ, নারায়ণ।

তারকব্রহ্ম। নাম বলো নাতবৌ, তারকব্রহ্ম, তারকব্রহ্ম।

চম্পাকলির কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে তীরে নয় একেবারে ঘাটে ভিড়ে শেষটায় তরী ডুববে। বাহকরা স্ট্রেচার নামালো। সকলে বুঝলো জীবিত এক ভাগও লোপ পেয়েছে—ভোটার এখন শতকরা একশ ভাগ মৃত।

তবু আশা ছাড়ে না চম্পাকলি। সে ছুটে পোলিং অফিসে ঢুকে অফিসার-কে শুধালো, স্যার, টাটকা মৃত ব্যক্তি ভোট দিতে কি পারে না?

সে কেমন করে হবে!

এখনো গা গরম আছে, বরঞ্চ বাইরে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখুন।

না, মা, তা হয় না—সহৃদয়ভাবে জানালো অফিসার।

তখন শতকরা একশ ভাগ মৃত ভোটারের শতকরা একশ ভাগ হতাশ নাতবৌ বাইরে এসে মৃতদেহের বুকের উপরে শুয়ে পড়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, দাদু, এমন করে শেষ মুহূর্তে ফাঁকি দিয়ে যেতে হয়!··· ও দাদু তোমার মনে এই ছিল···ও দাদু এমন কঠিন তোমার হৃদয়।

লোক জুটে গেল।

একজন বলল, কেঁদো না মা, তোমাদের সকলকে রেখে গিয়েছেন, বেশ গিয়েছেন।

আর একজন বলল, অনিমেষবাবুর বয়স হয়েছিল, কতজন ওর অর্ধেক

বয়সে মারা যায়।

সেই বুড়ী বলে উঠল, ভাগ্যিস তারকব্রহ্ম নাম করেছিলাম তাই সদ্গতি হল।

কিন্তু চম্পাকলি লাফিয়ে উঠে বুড়ীর গলা টিপে ধরলো বলল, তোর জন্যেই দাদু অকালে মারা গেল, আয় তোকেও সদ্গতি পাওয়াই।

সকলে মিলে ছাড়িয়ে দিল, বলল, বুড়ীমা কিছু মনে করো না, মেয়েটা শোকে পাগল হয়ে গিয়েছে।

ক্ষমাপরায়ণ বুড়ী বলল, হবেই তো বুড়োর ঐ একটিই তো নাতবৌ।

অনেকক্ষণ নাতি অরিন্দমের কথা বলা হয়নি। পোলিং অফিসের সবাই যখন অভাবিত ঘটনায় বিহ্বল সেই সুযোগে পোলিং বুথে ঢুকে নিজের ও দাদুর দুটি ভোট দিয়ে অরিন্দম যখন বের হয়ে এলো তখন তার মুখে স্বস্তির হাসি। তার হাসিমুখ দেখে পত্নী বলে উঠল, এই কি তোমার হাসবার সময় হল!

স্বামী তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গুপ্তকথা ব্যক্ত করলো। শুনবামাত্র সে খিলখিল করে হেসে হাততালি দিয়ে উঠলো।

সকলে তার অবস্থা দেখে বলল,পাগল হয়ে গিয়েছে—বড্ড শোক পেয়েছে কিনা।

দেখা গেল শেষ পর্যন্ত অনিমেষবাবুর মৃত্যু নিষ্ফল হয়নি।

সুবর্ণফলক ও শ্রীমদ ভাগবদ গীতা

দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কারের নাম সুবর্ণ ফলক। যখন সোনার ভরি আঠারো টাকা ছিল, পুরস্কারের সূত্রপাত সেই সময়ে। প্রবীণ সাহিত্যিকগণের বিচারে যে পুস্তক শ্রেষ্ঠ পরিগণিত হত, তার লেখককে দেওয়া হত একখানা সোনার চাকতি, পদকের চেয়ে অনেক বড়, ঢাল বা শীল্ডের চেয়ে ছোট, আর তার উপরে প্রশস্তিবাদ ক্ষোদিত থাকত। এ সুলভ সুবর্ণের সত্যযুগের কথা। কিন্তু বর্তমানে সোনার ভরি দুশো টাকার উপরে তাই আর সোনায় গড়া চাকতি দেওয়া সম্ভব হয় না, রূপোতেও সম্ভব নয়, তামার চাকতি দেওয়া হয়, তবে তাতে সোনার মিশাল থাকে আর থাকে সূক্ষ্ম কারুকার্য—প্রশস্তিবাদ অবশ্যই থাকে, নইলে আর তার সার্থকতা কোথায়!

আর অতিরিক্ত থাকবার মধ্যে আছে পুরাতন নামটা সুবর্ণ ফলক। কলিযুগে নামের চেয়ে বড় আর কি আছে।

সোনা এখন তামায় নেমে এলেও সাহিত্যিক-সমাজে তার মূল্য কমে নি, বরঞ্চ ঐতিহ্যের দৈর্ঘ্যে মূল্য বেড়েছে। বছরের শেষে বিচারসভা বসে, প্রবীণ বিচারকগণ চা কফি ও সন্দেশের সাহায্যে বিচার করে শ্রেষ্ঠ পুস্তক নির্বাচন করেন, তারপরে তা সাড়ম্বরে ঘোষিত হয়, লোকে ধন্য ধন্য করে। আর যে সৌভাগ্যবান সাহিত্যিক পুরস্কার লাভ করল, সে ছাড়া আর সকলেই বলে বিচারকগণ একচোখো।

এ তো গেল পরবর্তী অধ্যায়। এবারে আগের কথা। পুরস্কার লাভের আশায় বই দাখিল হতে শুরু করে এবং মাসখানেকের মধ্যে হাজার হাজার বই, নানা আকৃতির নানা প্রকৃতির, ছোটবড় রঙীন সাদা মহাফেজ-খানায় এসে উপস্থিত হয়। আদালতে বিচারের আগে বন্দিরা যেমন হাজতবাস করে সেই ভাবে বইগুলো কয়েক মাস গাদা হয়ে পড়ে থাকে। আরো আছে। বই থাকলেই একজন লেখক থাকবে, একজন প্রকাশক থাকবে, এবং লেখকের অলেখক বন্ধু থাকবে। লেখকের কখনো লেখক বন্ধু হয় না—সমব্যবসায়ী কি না। এখন এইসব ব্যক্তিগণ ঘোরা-ফেরা শুরু করে। বিচারকদের নাম গোপনীয়—কাজেই সকলেই জানে। আর লেখক প্রকাশক অলেখক বন্ধু সকলে অভীষ্ট গ্রন্থের গুণপণা বর্ণনা করবার উদ্দেশ্যে বিচারকদের বাড়িতে যায়। ইতর ভাষায় একে তদ্বির বলে তবে এখন আর ইতর উত্তর নাই, পুরস্কারের হাতছানিতে লেখক সমাজ এখন হয় তদ্বিরকারক নয় তৈল, প্রদায়ী। এ সব সর্বজনবিদিত কথা না বললেও চলত—তবু যে বলতে হয় তার কারণ একটু মুখপাত না হলে গল্প জমে না।

এবারে গল্প আরম্ভ করা যেতে পারে। সুবর্ণফলক পুরস্কারের প্রধান প্রধান কর্তৃপক্ষ মহাসচিব তাঁর প্রশস্ত কক্ষে গদিয়ান হয়ে উপবিষ্ট, আর চারদিকে নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষ পুরস্কার প্রত্যাশীর দল সংযত ভাবে উপবেশন করে আছে, পাদ্য-অর্ঘ্য আগেই জোগানো হয়ে গিয়েছে, শুধু মহাসচিবের পদপ্রান্তে নয়, বিচারকগণের বাড়িতে। এখন চলেছে শিষ্টালাপের পালা।

স্যার, আপনার ছোট জামাইয়ের সঙ্গে সেদিন দেখা হয়ে গেল—বড় চমৎকার ছেলেটি, যেমন চেহারা তেমনি ব্যবহার।

আরে তবু তো তুমি স্যারের ছোট মেয়েটিকে দেখনি, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

আর স্যারের বড ছেলেটি! তুলনা হয় না, তুলনা হয় না।

স্যার আপনার কোমরের সেই বাতের ব্যথাটা আশা করি সেরে গিয়েছে?

সারল আর কই। কালকে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি।

তাই আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

তখন প্রতিযোগীদের মধ্যে বাতের ওষুধ নির্দেশের পালা শুরু হল। প্রত্যেকে অন্ততঃ পাঁচটা করে কুড়ি জনে একুনে একশোটা ওষুধ নির্দেশ করল।

ও-সব পরীক্ষা করে দেখেছি, কিছু হওয়ার নয়।

সকলে নীরব হয়ে চিন্তামগ্ন হল, ভাবটা এই যে নরাধম বাত কিনা শেষে মহাসচিবের কটিদেশে আক্রমণ করল—স্পর্ধা তো কম নয়।

এমন সময়ে মলিনবেশ এক বৃদ্ধ প্রবেশ করে নমস্কার করে দাঁড়াল।

মহাসচিব শুধালু—কি চাই?

স্যার আপনার কাছে এলাম।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বলি উদ্দেশ্যটা কি?

স্বর্ণফলক প্রত্যাশায় একখানা পুস্তক দাখিল করেছি।

নূতন প্রত্যাশীর আগমনে পুরাতন প্রত্যাশীর দল বিরক্ত হল।

মহাসচিব বলল, দাখিল করেছ, যথাসময়ে ফলাফল জানতে পাবে।

তা পারব জানি তবু একবার দেখা করতে এলাম।

লোকটির বেশভূষার দীনতা ও কথাবার্তায় আনাড়িপনা লক্ষ্য করে মহাসচিব বলল—দেখা করে কি ফল? তদ্বির আমার কাছে চলবে না, আমি বড কড়া লোক।

পুরাতন প্রত্যাশীর দল উক্তিটি শুনে মনে মনে হাসল।

তা জানি স্যার সেই ভয়েই তো আগে আসিনি।

এ-বারে মনে হল যেন মহাসচিব একটু খুশী হল। খোশামোদপ্রিয় লোকের স্বভাব এই যে তাকে কেউ ভয় করে জানলে খুশী হয়—ওটাও এক প্রকার খোশামুদি।

তুমি লিখেছ নাকি?

না, স্যার আমি প্রকাশক।

তা লেখক কোথায় ?

আছেন।

তা তিনি না এসে তোমাকে পাঠালেন কেন ?

আমি দাখিল করেছি, দায়িত্ব আমার কি না।

লেখকের ইচ্ছা ছিল না ?

কেমন করে জানব।

যাক্ গে—বইখানার নামটা কি ?

আজ্ঞে শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা।

কি বললে ?

প্রকাশক আবার নামটি বলল।

এমন অদ্ভুত নাম দিয়েছ কেন ?

আজ্ঞে আমি তো দিই নি।

বুঝেছি, লেখক দিয়েছে। অনেক লেখকের ধারণা, নামের গাম্ভীর্য আর মলাটের জলুস দেখে আমরা ভুলব।

এই ঋষিবাক্য শুনে পুরাতন প্রত্যাশীর দল ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। নবাগত বলল নামটি সংস্কৃত কি না।

সংস্কৃত! বইখানা কি আগাগোড়া সংস্কৃতে লিখিত, না শুধু নামটা ?

আজ্ঞে আগাগোড়াই সংস্কৃত।

তবে দাখিল করতে গেলে কেন ? সংস্কৃত চলবে না।

স্যার যদি মনে না কিছু করেন তবে বলি, ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম ধারায় যে সব ভাষায় উল্লেখ আছে তার মধ্যে সংস্কৃত অন্যতম।

মহাসচিব ঠকে গেল, খোসামোদপ্রিয় লোক ঠকে গেলে চটে যায়। বলল; আবার সংবিধানের সন্ধানও রাখা হয়! লেখকের নামটা কি ?

আজ্ঞে বেদব্যাস।

বেদব্যাস ? কোন বেদব্যাস ?

আজ্ঞে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ।

যে লোকটা মহাভারত লিখেছিল ? সে তো অনেককাল মৃত। মৃত লেখকদের বইকে পুরস্কার দেওয়া হয় না।

আজ্ঞে আমাদের শাস্ত্রমতে তিনি জীবিত।

আবার শাস্ত্রও জানা আছে ?

একজন পুরস্কার প্রত্যাশী বলল, তিনি তো copyist মাত্র লেখক তো শ্রীকৃষ্ণ, তিনি তো জরা ব্যাধের শরাঘাতে বহুকাল মৃত।

তবে—বলে উঠল মহাসচিব, ভাবটা এবার কি উত্তর দেবে শুনি বাছাধন? এখন তাহলে এসো।

কিন্তু প্রকাশক সমস্ত প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল, বলল, কৃষ্ণস্তু ভগবান। আর ভগবানের তো মৃত্যু নেই।

প্রত্যেক প্রশ্নে ঠকে গিয়ে মহাসচিব মহাক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, সকালবেলাতেই ভাল মুশকিলে ফেললে দেখছি!

একজন পুরস্কার প্রত্যাশী বলল, স্যার যদি ইচ্ছা করেন তবে লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দি।

না, তার কাজ নেই, আবার কোন কাগজে কি লিখে বসবে, ওদের তো আর লেখাব বিষয় জোটে না, নিরীহ প্রাণীকে মারতে ওরা আনন্দ পায়।

তা কি আছে বইখানায়?

আজ্ঞে তত্ত্ব-আলোচনা, এই যেমন 'কর্মণ্যেব্যধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—তবে আবার এসেছ কেন, স্পষ্টই তো বললে মা ফলকেষু কদাচন। ফলক নয় স্যার, ফল।

একই কথা। অনেক দিন আগে লেখা ফলকের 'ক'টা পড়ে গিয়ে 'ফলে' দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, এখন তুমি যাও, আমি অবসর মত দেখব।

লোকটি যেতে উদ্যত হলে মহাসচিব বলল, আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি একবার তোমার বইখানা। তার আদেশে একজন পাশের ঘর থেকে একখানা চটি বই এনে তার হাতে দিল। বইখানার চেহারা দেখে মহাসচিব বিস্ময়ে বিরক্তিতে বলে উঠল—তোমার তো আস্পর্ধা কম নয়—এই চোথা বই দাখিল করেছ দেশের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়ার আশায়? আমি তো কোন কবরেজি ওষুধের তালিকা-পুস্তক ভেবেছিলাম।

কি করব স্যার, কাগজ ছাপা সবই আজ দুর্মূল্য।

আর এদিকে দেখছি মাত্র সত্তর পৃষ্ঠা।

তার চেয়ে বেশি হবে কি করে? গীতায় সাতশো শ্লোক—পৃষ্ঠায় দশটি হলে সত্তর পৃষ্ঠায় বেশি তো হয় না। পৃষ্ঠা-সংখ্যা দিয়ে কি বইয়ের গুণ বিচার করতে হবে?

কতকটা হবে বই কি, মাল বেশি থাকলেই গুণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

যে সব বই দাখিল হয়েছে তার মধ্যে এমন বই আছে, রীতিমতো পালোয়ান লাগে তুলতে। আর মলাটের ছবির কি বাহার। না বাপু, তোমার কোন আশা নেই। কোন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সুপারিশ আছে কি?

আছে বই কি। শেষের দিকে দেখুন শঙ্কর কি বলেছেন।

শেষের পৃষ্ঠাখানা পড়ে মহাসচিব বলল, ভালই তো লিখেছে দেখছি। কিন্তু সে আবার আচার্য শঙ্কর হল কবে থেকে?

আজ্ঞে তিনি তো চিরকালই আচার্য শঙ্কর, অনেকে বলে থাকে শঙ্করাচার্য।

ঠকাবার আর লোক পেলে না—আমি চিনি না শঙ্করকে, আমার পাশের বাড়িতে থাকে।

এতক্ষণ প্রসাদ-প্রত্যাশিত দল চুপ করে বসে ছিল, এবারে তারা বলে উঠল, কেন স্যার, এই সব বাজে লোকের পিছে এত সময় নষ্ট করছেন?

না, না, লোকটাকে দেখিয়ে দিই কি রকম সব বই দাখিল হয়।

করণিক আদিষ্ট হয়ে ১০।১২ খানা বই এনে টেবিলের উপরে রাখল।

নাও, এবারে দেখো আর তোমার ঐ কবরেজি ওষুধের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে তুলনা কর।

বইগুলোর সাজসজ্জা রংচং প্রচ্ছদ ছাপা কাগজ সমস্তই রাজকীয়, তার উপরে আবার খান দুই দমে ভারি।

মহাসচিব বলল, দেখলে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এদের পাশে রাখ তোমার ঐ মদ্‌ভাগবদ।

আজ্ঞে শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা।

ও কি একটা নাম হল। নামকরণ কেমন করতে হয় দেখো—এই দেখো 'ছিনতাই', এই দেখো 'পাকেটমার থেকে পুঁজিপতি', আবার দেখো 'সাম্রাজ্যবাদের শ্মশানে', এই নাও 'কাঁচপোকা ও কাঁচকলা', এই যে 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে', আর এই সব শেষে নাও 'হরিবোল ও হরিব্‌ল্' (horrible)। হল তো, এখন বাড়ি যাও। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে প্রধান বিচারকগণ তোমার বইখানার প্রতি অবিচার করবেন না।

কাজেই লোকটি একটি অর্ধস্ফুট নমস্কার করে বিদায় নিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ-প্রত্যাশীর দল বলে উঠল, ধন্য আপনার ধৈর্য স্যার।

হবে না কেন, ওঁর উদার হৃদয়ের কথা তো সর্বজনবিদিত।

আর জ্ঞানের গভীরতা।

আর প্রজ্ঞার পরাকাষ্ঠা।

আর বিচারশক্তির নিরপেক্ষতা।

মহাসচিব বেল টিপল, বেয়ারা এসে দাঁড়ালে আদেশ করল—চা।

নির্জলা খোশামুদিতেই উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়ায় চায়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল।

সপ্তাহান্তে স্বর্ণ ফলক পুরস্কারের ফল ঘোষিত হল, স্বর্ণ ফলক বিজয়ী গ্রন্থের নাম 'আন্দামানের গোয়েন্দা'।

শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌ গীতা ফেল।

দো তিন বাচ্চে বাস

বড় সাহেবের খাস কামরায় বড় সাহেব ও ছোট সাহেব দুজনে নীরবে উপবিষ্ট। বড় সাহেব সাবেকি অভ্যাসে কলমের বদলে পেন্সিল কামড়াচ্ছেন, ছোট সাহেব দুই হাত কোলের উপরে ন্যস্ত করে বসে আছেন। দুজনের মুখ দেখলে মনে হয় গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে। সরকারী আপিসের ব্যাপার মাত্রই গুরুতর কিন্তু এর মাত্রা যেন সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য বড় সাহেব ও ছোট সাহেবের কেউ শ্বেতাঙ্গ নয় তবু তাদের সাহেব বলতে হবে কেননা ওটা চিরাগত প্রথা। কিছুক্ষণ পরে বড় সাহেব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, বললেন, মিঃ রায়, এই যে বিষয়ে দুজনের কথা হলো তাকে শুধু কনফিডেন্সিয়াল বললে যথেষ্ট হয় না, কারণ সরকারী আপিসের সমস্ত কথাই কনফিডেন্সিয়াল। এ অত্যন্ত intimate. এখন কি কর্তব্য বলুন ?

ছোট সাহেব অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে অস্পষ্ট স্বরে যা বললেন তার অর্থ হচ্ছে, আমি কি করব বলুন।

বড় সাহেব একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন কিছু অতিরঞ্জিত আছে কিনা।

ছোট সাহেব ফাইলখানা আগেই দেখেছেন, তবু আরেকবার উল্টেপাল্টে দেখলেন, বললেন, না, কিছু বাড়িয়ে বলা হয় নি।

বড় সাহেব বললেন, যা বাড়াবার তা আপনারাই বাড়িয়েছেন। আপনার স্ত্রী যদি একসঙ্গে তিনটি সন্তান প্রসব করে থাকেন, তবে তার উপরে আর

বাড়াবার দরকার হয় কি ?

কিছুক্ষণ দুজনেরই নিস্তব্ধতা। তারপরে বড় সাহেব গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, অবশ্য তিনটি সন্তান পর্যন্ত সরকারের অভিপ্রেত। সরকার তার কর্মচারীদের যে সব সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন তিনটি সন্তানের পিতামাতা পর্যন্ত তার সীমা। চারটি বা ততোধিক হলে অবশ্য চাকরি যাবে না, কিন্তু আর কোন সুবিধে আপনারা পাবেন না।

ছোট সাহেব নিতান্ত অপরাধীর মত বললেন, আপনার কথা মনে রাখব।

কিন্তু তাতে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। আপনাদের স্বামী স্ত্রী দুজনেরই বয়স কম, আর এই আপনাদের প্রথম সন্তান। সরকারের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। সরকারী কর্মচারীরাই যদি প্রত্যেক চালানে তিনটি করে আমদানী করতে থাকেন, তবে বেসরকারীরা কি করবেন সহজেই অনুমেয়। এমন ভাবে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে সরকারের পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বানচাল হতে কতক্ষণ। আমার কথাগুলো রূঢ় শোনালেও সত্য বলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ?

ছোট সাহেব বললেন, এমন যে হবে তা তো আগে বুঝতে পারি নি।

তা অবশ্য বুঝতে পারার কথা নয়, প্রযোজন বিজ্ঞান এখনও অতটা অগ্রসর হয় নি। অবশ্য এ পর্যন্ত অপরাধ হয় নি আপনাদের। কারণ সরকারী অনুশাসন হচ্ছে 'দো তিন বচ্চে ব্যস্'।

ছোট সাহেব বললেন, আচ্ছা আজ তবে উঠি স্যার। ভবিষ্যতে এমন যাতে না হয় মনে রাখব—এই বলে তিনি চিন্তান্বিত ধীরপদে প্রস্থান করলেন

বড় সাহেব ফাইলান্তরে মনোনিবেশ করলেন।

॥ ২ ॥

এইমাত্র যে পরিস্থিতির বর্ণনা করলাম সে বিষয়ে কিছু বিস্তার আবশ্যক। বড় সাহেব অর্থাৎ মিঃ বাসু সাবেকী আমলের আই. সি. এস. আর ছোট সাহেব হাল আমলের আই. এ. এস.। এ দুই শ্রেণীর চাকরির মধ্যে আকাশের বিদ্যুৎ ও বিদ্যুতের বাতির পার্থক্য—এক হলেও এক নয়, তবে দম্ভাতে কেউ কম নয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের দম্ভ হাওয়ার পালা।

মিঃ রায় অর্থাৎ অনিরুদ্ধ বাড়ি ফিরতে ভাবলেন বিষয়টা স্ত্রীকে জানানো উচিত কিনা, আর উচিত হলে কিভাবে বলা যায়। তবে এটুকু বুদ্ধি তার ছিল

যে স্ত্রীর সহযোগিতা ছাড়া এর প্রতিকার সম্ভব নয়। তখনি মনে পড়ল যে সুপ্রিয়ার মাতা সতেরোটি পুত্র কন্যার জননী। ভাবল, সর্বনাশ, মাতার এক-তৃতীয়াংশ গুণের অধিকারিনী যদি সে হয়ে থাকে তবেই তো চাকুরির দফা খতম। বড় সাহেব অবশ্য বলেছেন চাকুরি যাবে না—কিন্তু অন্য সব সুযোগ-সুবিধা হারাতে হবে। তবে আর থাকবে কি। গাছের ফুল আর তোড়ার ফুল কি এক, যদিচ দুটোই ফুল। তার মনে পড়া উচিত ছিল যে ঐ সতেরোটি সন্তানের দায়িত্ব সুপ্রিয়ার পিতারও বটে। কিন্তু মনে পড়লেই বা কি হত। সবদেশেই এ বিষয়ে স্ত্রীর দোষ, অসন্তান ও অতি সন্তান দুয়েরই দায়িত্ব স্ত্রীর। বাড়িতে এসে শয়নঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল কাঠগড়া দেওয়া একখানি খাটের উপরে তিনটি ছ'মাসের শিশু নিদ্রিত, বায়ুহীন আকাশে তিন গুচ্ছ গন্ধরাজ ফুল, নিস্পাপ, শুভ্র, সুন্দর। অনিমেষনেত্রে সে তাকিয়ে রইল। এমন সময় পিছন থেকে সুপ্রিয়া এসে চোখ টিপে ধরে বলল, অমন করে ওদের দিকে চোখ দিয়ো না।

তবে কি তোমার দিকে চোখ দিতে হবে? সে তো দিয়েই আছি।

সেই জন্যেই আমার শরীর দিন দিন কৃশ হয়ে যাচ্ছে, বলে সুপ্রিয়া হেসে উঠল।

অনিরুদ্ধ আবৃত্তি করল, 'কৃশ বৃষ ধায় শৃগাল তাকায়।

সুপ্রিয়া বলল, মামলা ডিসমিস্‌। আমিও কৃশ নই, তুমিও শৃগাল নও।

কিছুক্ষণ থেমে সুপ্রিয়া বলল, দেখো ওদের নামকরণ করেছ অঞ্জনা, রঞ্জনা, খঞ্জনা, তিনটে নামের কি দরকার আছে?

কেন?

কেন কি, তিনজনকেই ঠিক এক রকম দেখতে। একটা নামেই চলে।

তবে কি জামাইও একটার বেশি করবো না?

নাও, রসিকতা এখন রাখো, খেতে চল।

শিশু তিনটির কথা মনে হতেই আপিসের বড় সাহেবের অভিযোগ ভুলে যায় অনিরুদ্ধ। মনে মনে ভাবে, বেশ করেছি, বড় সাহেবের একটি মাত্র কন্যা। তাই আইনের ভয় দেখিয়ে চোখ দিচ্ছে। সে স্থির করল যে এ বিষয়ে সুপ্রিয়াকে কিছু বলা হবে না।

তারপরে মাস খানেক বাদে সুপ্রিয়া আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল যে, সে সন্তান-সম্ভাবিতা। ভাগ্যিস রাতের বেলায় ঘরে আলো ছিল না, নইলে

স্বামীর মুখে যে ভাবান্তর উপস্থিত হত, ভাবিয়ে তুলত তা পত্নীকে। সারারাত তার ঘুম হল না, বড় সাহেবের শাসন ও সরকারী অনুশাসন বিষম পরিণাম নিয়ে মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। মাঝখানে একবার দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল যেন তার সতেরোটি শালী-শালা ব্যূহ-বদ্ধ হয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে; জেগে উঠে ভাবল একি যা হবে তারই পূর্বাভাস নাকি! সর্ব্বনাশ! পরদিন অফিসে গিয়ে আর একটি ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বন্ধুকে সমস্ত বিষয় অবগত করাল। অনিরুদ্ধের সমস্ত অবস্থা শুনে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, হওয়ারই কথা। কারণ সরকারী নিয়মের মাত্রা ছাড়িয়ে পুত্র-কন্যা হয়েছে এমন চার-পাঁচটি কেস তার মনে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন suspended হয়েছে, দুজনের বেতন ছাড়া সমস্ত সুযোগ সুবিধা কাটা গিয়েছে, আর একজনের এ সমস্তের উপরেও ভবিষ্যতে পেন্‌সন পাবে কিনা তা এখনও বিচারাধীন।

বন্ধুটি সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বলল, তিনটির উপরে আর একটি যদি হয় তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না আপনার।

অনিরুদ্ধ বলল, কিন্তু ভাই ইতিমধ্যে আমি একজন প্রজনন-বিজ্ঞানীর সঙ্গে consult করেছিলাম, তিনি বললেন, কোন কোন মেয়ের একসঙ্গে একাধিক সন্তান হওয়ার ধাত থাকে।

বন্ধুর মুখে উত্তর জোগালে না, কারণ সে-ও সেইরকম শুনেছে। তারপরে সে কতকটা স্বগতভাবে বলে চলল, দেখো অনিরুদ্ধ, সরকারকে বেশি দোষ দিতে পারি না, বিংশ শতব্দীর এই ক'টা বছর শেষ হলে পৃথিবীর জনসংখ্যা, দুহাজার কোটি দাঁড়াবে। তার মধ্যে আবার ভারতের জনসংখ্যার ভাগ সবচেয়ে বেশি। এতদিন ছিলাম হা-ঘরে, এবারে যাকে বলে হা-ভাতে।

অনিরুদ্ধ বলল, না, সরকারকে দোষ দিচ্ছি না, দোষ দিচ্ছি অদৃষ্টকে।

বন্ধুটি বলল, না ভাই, দোষ দাও নিজের অদৃষ্টের। ভেবে দেখো, সহৃদয় সরকার তোমাদের সুবিধার জন্যে 'পনেরো পয়সায় তিনটি'র ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, প্যানের দোকানে অব্দি পাওয়া যায়। এরপরে রেসের পুস্তিকা গুলোর মত ট্রামে-বাসে ফিরি হবে।

অনিরুদ্ধ বলল, কিন্তু ভাই রাজাগোপালাচারী যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে লিখে থাকেন।

তিনি তো লিখবেনই, বয়স হলো ৯৩ বছর। তাছাড়া তিনি যে সরকার বিরোধী। সরকার পক্ষে হলে স্বপক্ষে লিখতেন। এখন তিনি হিন্দী ভাষার

বিপক্ষে। কিন্তু এই 'তিনি' ১৯৩৭-এ মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে হিন্দী না শিখলে লাঠির গুঁতো মারতেন। ওটা পলিটিক্‌স্‌, আর পলিটিক্‌স্‌-এর মূল নীতি হচ্ছে যখন যেমন, তখন তেমন। কিন্তু অবান্তর কথা থাক, তুমি যা বললে, আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপরে বন্ধুটি বলল, Abortion এখন আইন সম্মত হয়েছে, একবার ভেবে দেখ না।

অনিরুদ্ধ ভীতভাবে বলে উঠল, না, না, একথা আমি কিছুতেই সুপ্রিয়াকে বলতে পারব না। মরে গেলেও সে রাজী হবে না।

সেটা খুবই স্বাভাবিক।

বললে তো স্বাভাবিক, কিন্তু এ সঙ্কটের প্রতিকার কি?

চট করে কিছু মাথায় তো আসছে না, ভেবে দেখি।

ভাবলেই যদি সব সমস্যার কূল পাওয়া যেত, তবে আর মানুষ অকূলে পড়ত না। একদিন শুধু আভাসে বিষয়টা সুপ্রিয়াকে জানিয়েছিল। সুপ্রিয়া সংক্ষেপ বললো, সরকারের মুখে আগুন।

ব্যাপারটা চুকে গেল ভেবে যেন অনিরুদ্ধ নিশ্চিন্ত হয়েছিল, তারপরে বিকেলবেলা দেখা হতেই সুপ্রিয়া মস্ত একটা তালিকা বের করে স্বামীর সম্মুখে ফেলে দিল। বলল, দেখে নাও কোন কোন মন্ত্রীর ক'টা ছেলেমেয়ে, কোন কোন সেক্রেটারীর ক'টা ছেলে, ক'টা মেয়ে। সমস্ত আমি ফোন করে নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছি।

স্বামী বলল, এসবআইন হবার আগেকার কথা।

সুপ্রিয়া বললো সে কথাও জেনেছি। আইন আদৌ হয়নি, ওটা সরকারের ইচ্ছা মাত্র। তারা গোগ্রাসে খায়, আর উল্টো ইচ্ছের প্রয়োগ করে নিরীহ মানুষের উপরে।

যথাসময়ে এবারে সুপ্রিয়ার তিনটি পুত্রসন্তান হল। মেয়েদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের নামকরণ করল রঞ্জিৎ, সিজিৎ আর মর-জিৎ।

পুত্রসন্তান লাভ করলে নাকি পুরুষের মন আনন্দিত আর মুখ উজ্জল হয়ে ওঠে।

অনিরুদ্ধ শঙ্কিত মন ও ম্লানমুখ নিয়ে অফিসে রওনা হল।

॥ তিন ॥

যথাকালে আবার বড় সাহেবের খাস কামরায় অনিরুদ্ধর তলব হল। বড় সাহেব বললেন, আবারফ্যাসাদ বাধিয়েছেন—এই নিয়ে যে তিন আর তিনে

ছয় হল, এবার তো উপরে আর না জানিয়ে পারা যাবে না।

আসামী কী উত্তর দেবে—তাই নিরুত্তর হয়ে রইল।

সদয় বড় সাহেব বললেন, আমি ফাইলটা কিছুদিন চেপে রাখছি, আপনি এর মধ্যে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন।

ব্যবস্থা আর কি আছে, স্যার।

ব্যবস্থা অনেকরকম হতে পারে। ধরুন, আপনার নিকট আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নিঃসন্তান যদি কেউ থাকে তবে তাদের একজনকে বা দুইজনকে ভাগ করে তিনটি সন্তানকে দত্তক দিয়ে ফেলুন। তা হলেই জমিবণ্টন নীতি অনুযায়ী সন্তানবণ্টন হয়ে গিয়ে আপনি দায়মুক্ত হবেন।

তাঁরা এ ভার নেবে কেন স্যার?

আহা হা। দায় তো আপনারই থাকল, খরচপত্র আপনি দেবেন।

আমার স্ত্রী রাজী হবেন না।

সে আমি জানি না, আমাকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, বলছি। আর এক ব্যবস্থা হতে পারে, আপনারা স্বামী স্ত্রী আপসে বিবাহ বিচ্ছেদ করে নিন, তিনটি সন্তান তাঁর ভাগে রইল, তিনটি আপনার।

অনিরুদ্ধ সংক্ষেপ বললে—অসম্ভব।

অসম্ভব কেন বলছেন মিঃ রায়? চাকুরির উপরে তো আর কিছু নয়, তাতে কিনা আবার কেন্দ্রীয় সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারি। কালক্রমে তো আপনার ক্যাবিনেট সেক্রেটারি হওয়ার সম্ভাবনা।

এরূপ সম্ভাবনায় মুখমণ্ডল যেমন উজ্জ্বল হওয়া উচিত তেমন কিছুই হল না।

আর এক কাজ করুন। ভবিষ্যতে সাবধান হওয়ার উদ্দেশ্যে নির্বীর্যকরণ করুন।

তাহলে আমার স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ করে যাবেন।

চমৎকার, শাপে বর হবে। চাকুরি আর সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে যাবে।

অনিরুদ্ধ ভাবছিল লোকটা কি হৃদয়হীন, বড় লোকটি ভাবছিল আমি কি সহৃদয়, সহকর্মীকে রক্ষার আশায় কত না প্রতিকারের পথের ইঙ্গিত দান করছি। অনিরুদ্ধ তাড়াতাড়ি পালাবার উদ্দেশ্যে বলল উঠল, ধন্যবাদ স্যার ভেবে দেখব।

॥ চার ॥

ইতিমধ্যে একমাস অতিবাহিত হয়েছে। একদিন দুপুরবেলা অনিরুদ্ধর নামে একখানা মস্ত সরকারী চিঠির খাম এল। সুপ্রিয়া কখনো স্বামীর চিঠি খোলো না, কিন্তু সেদিন কি মনে করে খুলে ফেলল, পড়ে দেখল যে সরকার কৈফিয়ৎ তলব করেছেন, তার সন্তান সংখ্যা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার অপরাধে কেন সরকারী চাকুরির দণ্ডবিধি তার উপর আরোপিত হবে না তা যেন শীঘ্র তিনি জানান। সুপ্রিয়া ব্যাপারটা আগেই আভাসে শুনেছিল স্বামীর কাছে, কাজেই মোটেই বিস্মিত হল না, সরকারী ব্যবস্থার নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। লোহা জুড়োতে দিল না, তখনি সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে অনিরুদ্ধর নাম সাক্ষর করে চিঠি পাঠিয়ে দিল। সুপ্রিয়া লেখাপড়া জানা মেয়ে, এম এ পাস (বাংলায় নয়)। স্বামী ফিরে এলে রাত্রে আহারান্তে চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে জানাল কি করেছে। চিঠি পড়ে অনিরুদ্ধ জানাল, বেশ করেছ। আমি হলেও এ ছাড়া আর কি করতে পারতাম। স্ত্রীর বুকের উপর থেকে পাথরের ভার নেমে গেল।

পরদিন প্রাতে চা খেতে খেতে অনিরুদ্ধ বলল, এখন চলবে কি করে সুপ্রিয়া ?

সুপ্রিয়া বলল, তা কি আমি ভাবিনি মনে করেছ। বাবার যে ষাট বিঘা জমির একটা খামার ছিল, সেটা তাঁর উইল অনুসারে আমার ভাগে পড়েছে— সেই খামারের মধ্যে ছোট একটা বাড়িও আছে, তাতেই আমাদের চলে যাবে।

ঐ জমির ফসলে কি আমাদের চলবে ?

গ্রাসাচ্ছাদন চলবে, তবে দিল্লীর মেজাজে থাকা চলবে না।

দিল্লীর মেজাজ ছেড়ে দাও, গ্রাসাচ্ছাদনও চলবে কিনা সন্দেহ।

না, কোন সন্দেহ নেই। দেখ, সব মূর্খর সেরা যারা পড়াশোনা করে মূর্খ হয়। সরকারী চাকুরেরা তা-ই, আর কিছুদিন চাকরি করলে তুমিও তাই হতে। ওরা জনসংখ্যা বৃদ্ধিটাই দেখে, আর এদিকে বিজ্ঞানের কল্যাণে যে জমির উৎপাদন-শক্তি বেড়ে গিয়েছ তার হিসাব রাখে না। যে জমিতে আগে ছ'মণ ধান হত এখন অনায়াসে ১৫।২০ মণ ধান হয়—কেন না চলবে আমাদের ? ওতেই স্বচ্ছন্দে আমাদের খাওয়া পরা চলবে।

এমন সময় রঞ্জিতা আর দুই বোনের অগ্রগামী হয়ে ঘরে ঢুকে বলে উঠল

—থামো, থামো, থামো। তার সঙ্গে কোরাসে অন্য দুটি মেয়েও বলে উঠল, থামো, থামো, থামো। পূর্ববঙ্গীয় ভাষার প্রমুখাৎ থাম্ শব্দটা তার পশ্চিমবঙ্গীয় মুখে থামো তে পরিণত হয়েছে, ওটা আর কিছুই নয়, থাবো+থাম্।

মেয়ে তিনটি এখন টলমল করে হাঁটে, ছেলে তিনটি এখনো বিছানায় পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাঁটার শখ পূর্ণ করে।

আপাতত খামারের ধান ভবিতব্যের গর্ভে নিহিত বিধায় চায়ের টেবিল থেকে একখানা পিরিচ টেনে ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেলল, অন্য দু'জনেই বা পিছপা হবে কেন। তারাও আর দু'খানা পিরিচ ভাঙল। এবং মস্ত একটা কীর্তি করেছে ভেবে তিন জনে খিলখিল রবে হেসে উঠল, সেই হাসির কোরাসে যুক্ত হল বাপ-মায়ের হাসি।

অনিরুদ্ধ হাসতে বলে উঠল, সকালবেলাতেই একেবারে হ্যাট্-ট্রিক।

সুপ্রিয়া বলল—সুপ্রভাত।

মণ্ডলগিন্নির বৃন্দাবন যাত্রা

তারণ মণ্ডলের মৃত্যুর পরে তার সাকুল্য সম্পত্তি ছয়ভাগ হয়ে গেল। স্ত্রী, দুই কন্যা ও তিন পুত্র সমভাগে সব পেল। সরকারী নূতন আইন অনুসারে আঠারো একর মানে চুয়ান্ন বিঘে জমি রাখবার অধিকারী সে ছিল। সরকারী খাল থেকে জল পেত, তাই ওটাই তার জমির সীমা নির্দিষ্ট হয়েছিল। অবশ্য এই আঠারো একরের মধ্যে সবটাই চাষের জমি নয়, কতকটা ভদ্রাসন আর একটা ছোট পুকুর, আর খানিকটা জমির মধ্যে শাক সবজির চাষ হত। ঐটুকু বাদে পঞ্চাশ বিঘে জমি ছয় ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এই পর্যন্ত আমাদের গল্পের ভূমিকা।

গল্পটাকে সংক্ষেপে সেরে পরিশিষ্টটাকে দীর্ঘ করব ইচ্ছা আছে। এমন মোটেই অসম্ভব নয়, ঘুড়ির আয়তনের চেয়ে তার লেজটা সর্বদাই দীর্ঘ হয়ে থাকে। তারণ মণ্ডলের মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গেছে, তারা দূরে শ্বশুরবাড়িতে থাকে। জামাইরা সম্পন্ন গৃহস্থ। তারা বলল, ওটুকু জমি নিয়ে আর কি করবে, তোমার মাকে দিয়ে দাও। দেখা গেল যে মেয়ে দুজনেই অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়তে তারা রাজী নয়, জমি চাষ না হয়ে যদি

আগাছা ফলায় তবু তা হাতছাড়া করলে পিতার নাকি অসম্মান করা হবে। ছেলে তিনটির মধ্যে বড়টি গাঁয়ে থাকে। অন্য দুটি বিদেশে চাকরি করে। তারা দাদাকে লিখল যে জমিটা তুমি চাষবাস করে ফসলের দামের অর্ধেক আমাদের দিও।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাইদের অনুরোধের প্রথমাংশ রক্ষা করল। যথারীতি চাষ-বাস করতে আরম্ভ করল এবং যথারীতি প্রাপ্য টাকা পাঠাতে ভুলে যেতে থাকল। ভাইরা তাগিদ দিলে জানাত এবারে দারুণ খরায় সব শুকিয়ে গিয়েছে, কোনবার বা লিখত এবার নিদারুণ ঝরায় সব ডুবে গিয়েছে, খরা এবং ঝরা পর্যায়ক্রমে ভাইদের জমি দুই খণ্ডের উপরে প্রতিক্রিয়া শুরু করল। দূরে থেকে চিঠি লিখে টাকা আদায় করবার মত অসম্ভব আর কিছু নেই। অবশেষে ভাইরা দেখল যে ডাকমাশুলের খরচটাও অপব্যয়। হতাশ হয়ে তারা চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করে দিল। জ্যেষ্ঠ অগ্রজের কর্তব্য পালন করে চলল। এই তো গেল তারণ মণ্ডলের জমির পাঁচ ভাগের ইতিহাস। ষষ্ঠ ভাগের মালিক তার স্ত্রী। এবারে আমাদের গল্পের শুরু অর্থাৎ পরিশিষ্ট বা ঘুড়ির লেজ।

॥ দুই ॥

দীনু শেখ নামে এক সম্পন্ন চাষী এতকাল তারণ মণ্ডলের সামান্য জমি চাষ করত এবং যথানিয়মে অর্ধেক ফসল মণ্ডলের বাড়ি পৌঁছে দিত। এখন পাঁচ অংশীদার তার কাছ থেকে জমি ছাড়িয়ে নিলে তার হাতে রইল কেবল তারণ মণ্ডলের পত্নীর অংশ। ' দীনু শেখ এসে বলল, দিদি ঠাকরুণ, তুমি চিন্তা কর না, তোমার আধা ফসল তোমার গোলায় তুলে দেব আমি—যেমন এত কাল করে এসেছি।

মণ্ডলপত্নী বলল, তাই কর বাবা, আমি অসহায়, এখন তুমিই ভরসা।

বছর দুই এই ভাবে চলল। তারপরে একদিন বিকালবেলায় তরণী রায় এসে দেখা দিল মণ্ডলের বাড়ি। মণ্ডলপত্নীর সঙ্গে মামুলি ধরণের আলাপ কিছুক্ষণ করবার পরে বলল, বউ ঠাকরুণ, বলি ফসলের ভাগ পাচ্ছ তো ?

মণ্ডলপত্নী বলল, হ্যাঁ বাবা, দীনু পুরনো লোক, ও ফাঁকি দিতে জানে না।

তরণী রায় মুচকি হেসে বলল, বউ ঠাকরুণ, ফসল তো পাও জানি, কিন্তু অর্ধেক পাও না। সিকি পাও খোঁজ রাখ কি ?

কেন রায় মশায়, সিকি পেতে যাব কেন ?

বেশ বেশ, অর্ধেক পেলেই হল। তুমি অসহায় বিধবা মানুষ তাই একবার খোঁজ নিয়ে গেলাম। সেদিন এই পর্যন্ত বলে তরণী প্রস্থান করল।

এবারে তরণী রায় সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বাংলার প্রত্যেক গ্রামেই এমন ২।৪ জন্ লোক দেখা যায় যারা সেই গ্রামের অসহায় বিধবা ও নাবালকের অছি হয়ে জন্মেছে। নানা ফিকিরে তারা বিধবা ও নাবালকের জমি হস্তগত করে নেয়। অবশ্য জমি মালিকদের নামেই থাকে তবে ফসল আর তাদের বাড়িতে যায় না। তরণী সেই শ্রেণীর লোক। এক সময় তার জমিজমা কিছুই ছিল না কিন্তু এখন অছিদারি করে বেশ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এবারে তার দৃষ্টি পড়ল অসহায় মণ্ডলপত্নীর জমিটার উপরে।

কয়েকদিন পরে তরণী আবার দেখা দিল, বলল বউঠাকরুন, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, একটা কথা মনে পড়ল তাই এলাম। আচ্ছা, দীনু বিঘা প্রতি কত মণ ধান দেয় তোমাকে ?

কেন একথা শুধাচ্ছেন ?

শুধাচ্ছি এই জন্যে যে খালের জল পেয়ে আর সরকারী সারের গুণে জমির ফসল বেড়ে গিয়েছে—খবর রাখ কি ?

আমি মুখ্যু মানুষ, অত কথা জানব কি করে ?

কেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতে। এই ধর না, আগে যে জমিতে দশ মণ ধান হত এখন তাতে হচ্ছে কুড়ি মণ।

তা তো জানিনে, দীনু দশ মণের হিসেবে অর্ধেক দিয়ে যায়।

কথাটা শুনে তরণী যেন স্বগতভাবে হিসাব করতে লাগল। দশ বিঘায় দশ মণ করে হলে অর্ধেক হল পঞ্চাশ মণ। অথচ এখন দশ বিঘায় হচ্ছে দুশো মণ, তাহলেই অর্ধেক হল একশো মণ।

এ পর্যন্ত মৃদুস্বরে বলবার পরে বলে উঠল, কি সর্বনাশ বউ ঠাকরুণ, পঞ্চাশ মণ ধান তোমাকে ঠকাচ্ছে দীনু শেখ।

না বাবা, তা কি হয়—পুরানো লোক, সে অধর্ম করবে না।

হায় বউ ঠাকরুণ, আজকের দিনে ধর্ম কোথায় ?

বেশ, আমি বরঞ্চ দীনুকে শুধিয়ে দেখব।

হায় বউ ঠাকরুণ, চোর কখনো সত্যবাদী হয়।

সেদিন এই পর্যন্ত হয়ে রইল। তরণী জানে এসব কাজে তাড়াহুড়া করতে নেই, সাধনা সময়সাধ্য, এ ও এক রকম সাধনা কিনা।

মণ্ডলগিন্নির প্রশ্ন শুনে দীনু শেখ জিভ কেটে বলল,' কোন শয়তানে এমন বুঝিয়েছে তোমাকে মা ঠাকরুণ। গাঁয়ের অধিকাংশ লোকের জমিতে আট মণের বেশি হয় না, আমি অনেক চেষ্টা চরিত্তির করে দশ মণ ফলাই। তুমি ওসব বাজে লোকের কথায় কান দিয়ো না।

দীনু শেখ প্রণাম করে চলে গেল।

কান তো দিয়ো না বলে গেল দীনু শেখ—কিন্তু যে হিসাব মনের মধ্যে ঢুকেছে তার অস্তিত্ব কানের উপরে নির্ভর করে না, তরণীর হিসাব, দশ মণের স্থানে কুড়ি মণ, মোট পঞ্চাশ মণের স্থানে একশো মণ মণ্ডলগিন্নির মনের মধ্যে ক্রমাগত পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল।

হিন্দু বিধবার মত অসহায় জীব এ সংসারে আর আছে কিনা সন্দেহ। অদৃষ্ট থেকে আরম্ভ করে দৃষ্ট পর্যন্ত সকল শক্তির কাছেই থাকবার জন্য তার জন্ম। এমন সুলভ শিকার আর মেলে না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত অপরিচিত সকলেরই লোভের লক্ষ্য সে, আর তার যদি কিছু টাকাকড়ি ও বিষয় সম্পত্তি থাকে তবে তো কথাই নেই। হিন্দু বিধবার গণিত স্বাস্থ্য, ইতিহাস, ভূগোল সমস্তই আলাদা। তার টাকার মূল্য আট আনার বেশি নয়। এ হেন জীবকে যে না ঠকায় সে মনুষ্য নামের অযোগ্য। এই কারণেই তরণী রায় ঘনঘন যাতায়াত শুরু করল মণ্ডলগিন্নীর কাছে।

হ্যাঁ বউঠাকরুণ, দীনু তোমাকে ধান দেয় না ধান বিক্রী করে টাকা দেয়?

পঞ্চাশ মণ ধান নিয়ে আমি কি করব, মণ কুড়ি ধান দেয় বাকিটা বিক্রী করে টাকা এনে দিয়ে যায়।

তরণী রায় শুধাল, ধানের দাম কত করে ধরে?

মণ্ডলপত্নী বলল, তিরিশ টাকা।

ইস্, বলে চমকে উঠল তরণী রায়। কি ঠকানটাই না তোমাকে ঠকাচ্ছে। খোলা বাজারেই ধানের দাম চল্লিশ টাকা। একটু ব্ল্যাক করলে পঞ্চাশ হেসে-খেলে পাওয়া যায়। বউঠাকরুণ, টাকা তোমার, কিন্তু আমার যে গা কস্‌কস্ করছে।

তা ঠাকুরপো, তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও না।

ব্যবস্থা আর কি করব বউঠাকরুণ, দীনু তোমার পুরনো লোক।

আচ্ছা দেখি কি করতে পারি—বলে তরণী রায় বিদায় নিল, বুঝলে যে মণ্ডল গিন্নী টোপ গিলেছে।

॥ তিন ॥

অবশেষে মণ্ডলপত্নী তার দশ বিঘা জমি দেখাশুনা, চাষবাস করবে এবং নিয়মিত প্রাপ্য টাকা তার হাতে পৌঁছে দেবে এই মর্মে তরণী রায়ের নামে কবালা করে দিল। তরণী বুদ্ধিটি বাতলে দিয়েছিল। আগেকার দিন হলে সোজাসুজি কিনে নিত, কিন্তু এখন কিনতে হলে জমির উচ্চসীমা পেরিয়ে যায়। তাই এই নূতন নীতি অবলম্বন করেছে তরণীর মত স্বনির্বাচিত অছিগণ। এই নিয়ম সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত, কাজেই সরকারের কিছু বলবার নেই। এর মস্ত সুবিধা এই যে কোনবার ফসল না হলে কিছু দেওয়ার দায়িত্ব থাকে না। আর খরা, অজন্ম ও বন্যা নামে তিনটি উপসর্গ তো হাতের কাছেই আছে, যে কোন একটাকে ব্যবহার করলেই হল। তরণী জাতীয় জীবকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন সাধ্য আইনের বাপেরও নেই।

দীনু শেখ অনেক কান্নাকাটি করল, তরণীর উদ্দেশ্য যে সাধু নয় বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখন মণ্ডল গিন্নীর মনের মধ্যে বিঘা প্রতি আধি ফসল দশ মণ একুনে একশো মণ স্থায়ী বাসা বেঁধে গিয়েছে। আর সেই একশো মণকে চল্লিশ দিয়ে গুণ করলে যে কত কুড়ি টাকা হয় সে হিসাব মণ্ডলগিন্নী মনের মধ্যে দশবার করেছে, দশবারই ভিন্ন অঙ্কে পৌঁচেছে, তবে কোন অঙ্কটাই কম লোভনীয় নয়। এই জন্যেই বলেছিলাম হিন্দু বিধবার গণিত শাস্ত্র আলাদা রকমের।

কিছুদিন পরে একবার নগদ টাকা হাতে পাওয়ার পরে মণ্ডলপত্নী তরণী রায়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা দিল। বলল, ঠাকুরপো, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। এখানে আর কী সুখে থাকি। ছেলেরা দেখে না, মেয়েরা আসে না। ভরসা একমাত্র তুমি। আমি কাশী যাই, তুমি আমার পাওনা টাকা মাসের কিস্তিতে পাঠিয়ে দিও। সেখানে জীবনের শেষ ক'টা দিন বিশ্বনাথের পায়ের তলায় বাস করি।

তরণী রায় বলল, বউঠাকরুণ, কাশী নয়, বৃন্দাবন তোমার স্থান, তোমরা আবার বৈষ্ণব বংশ কিনা।

কারণ তরণী রায় বিচার করে দেখেছে কাশী যথেষ্ট দূরবর্তী নয়, তাছাড়া চেনাশোনা লোকও সেখানে অনেক। তুলনায় বৃন্দাবন অনেক নিরাপদ। আগেই বলেছি হিন্দু বিধবার ভূগোল আলাদা। সে কথায় কথায় বলে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন। যেন তিনটি লাগোয়া শহর। কাজেই কাশীর বদলে

বৃন্দাবনে যেতে তার আপত্তি হল না।

তরণী রায় বলল, আমি তোমাকে নিজে নিয়ে বৃন্দাবনে বাসা ভাড়া করে বসিয়ে দিয়ে আসছি, এসব কাজ তুমি একলা পেরে উঠবে না।

তারপর একদিন শুভলগ্ন দেখে মণ্ডলপত্নীকে নিয়ে তরণী রায় বৃন্দাবন যাত্রা করল। রওনা হবার সময় তার আঁচলে দু'শো টাকা বেঁধে দিয়ে বলল, এখন এই রইল, তারপরে মাসে মাসে তো পাঠাবই।

মণ্ডলপত্নী বলল সেই ভরসা আছে বলেই তো তোমার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে যাত্রা করছি, এখন লীলাময় ঠাকুরটি পায়ে স্থান দিলে হয়।

বৃন্দাবনে বাসা স্থির করে মণ্ডলপত্নীকে বসিয়ে দিয়ে তরণী রায় গাঁয়ে ফিরে এসেছে।

॥ চার ॥

তারপর পুরো একবৎসর কাল চলে গিয়েছে, তরণীএক পয়সাও বিধবাকে পাঠায়নি। এই পাঠাচ্ছি, আজ ডাকঘর বন্ধ, ধানের দাম আরেকটু না উঠলে বিক্রী করলে তোমার ক্ষতি, এবারে খরা তারপরে পঙ্গপাল, তারপরে বন্যা প্রভৃতি বিচিত্র ও অনিবার্য কারণ সম্বলিত পত্র নিয়মিত লেখে তরণী রায়। বিধবা প্রথমে মাসে একখানা তারপরে দুখানা, তারপরে চারখানা, তারপরে টেলিগ্রাম দিয়ে তাগিদ দেয়। টাকা আর পৌঁছয় না। এদিকে মণ্ডলপত্নী যা নিয়ে এসেছিল এবং যাত্রাকালে তরণী যা দিয়েছিল কবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এই ভাবে বছর দুই গেলে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এক মঠে এসে অন্নদাস হতে বাধ্য হল মণ্ডলগিন্নী। তরণী রায়কে পত্র লিখবার পয়সাও তার নেই। পত্র লিখে টাকা আদায় করবে সে আশাও ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে পথে পথে খঞ্জনী বাজিয়ে নামগান করে বেড়ায় আর মনে মনে হিসেব করে কত টাকা তার পাওনা হল। ওদিকে তরণী রায়ের গোলায় মণ্ডলগিন্নীর ধান নিয়মিত ওঠে। তার মনের মধ্যে কখনো যদি অনুতাপ হয় তখনই মনকে বোঝায় বিশুদ্ধ ভক্তির পথে টাকাকড়ির মত অন্তরায় আর কি আছে। মণ্ডলপত্নীর ভক্তির পথ সুগম করে দিয়েছে ভেবে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তরণী রায় নিজেও কম ভক্ত নয়, ভোরবেলায় উঠে সারাটা গ্রাম নামগান করে ঘুরে আসা তার নিয়মিত কর্তব্যের মধ্যে। তাতে অবশ্য তার ভক্তিমার্গ কণ্টকিত হয় না।

ভক্তির কি বিচিত্র নিয়ম। একজন বৃন্দাবনে, আর একজন পশ্চিমবঙ্গের

এক অখ্যাত গ্রামে নামগান করে বেড়ায়। যারা দেখে তারা বলে, আহা, ঠাকুর এদের কৃপা করেছে। কিন্তু কেউ মনে মনে সরকারের জমি বণ্টন নীতির প্রশংসা করে না, তলিয়ে দেখলে অবশ্যই তাদের করা উচিত। কারণ সেই নিয়মের ফলেই ভক্তিমার্গ এমন প্রশস্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

জীবনস্বত্ব

মুখুজ্জে ও মুখুজ্জে ব'লি বাড়ি আছো?

মুখুজ্জে জবাব দেয় না কাজেই আবার ডাকতে হয়।

বলি মুখুজ্জে বাড়ি আছে কিনা, জবাব দিচ্ছ না কেন?

এমত স্বগত ডাকাডাকি বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো তবু সাড়া পাওয়া গেল না ভিতর থেকে।

এবারে ডাকাডাকির পরিবর্তে ধাক্কাধাক্কি, আগন্তুক ব্যক্তিটি দরজায় সজোরে করাঘাত করতে শুরু করল। এমন সময় ভিতর থেকে কচি গলায় উত্তর এলো 'বাবার অসুখ'।

আগন্তুক ব্যক্তি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললো, বাবার অসুখ, আর আমারই বা কোন সুখ? দুপুর রোদে চার ক্রোশ পথ হেঁটে এসে এক ঘণ্টা ধরে ডাকাডাকি করছি, না বাবার অসুখ।

তারপরে নিজের মনেই বলে চললো, শরীর থাকলেই অসুখ হয়, তাই বলে কি পুরানো বন্ধুকে জবাবটা দিতে হবে না। আরে বাপু শেষ পর্যন্ত সেই জবাব তো দিতেই হলো। তবে আর আমার কষ্ট বাড়ানো কেন।

ভিতর থেকে সেই কচি গলায় আবার শুনতে পাওয়া গেল আপনি ভিতরে এসে বসে জল খান, হাত, পা, মুখ ধোন, তারপরে দেখা করবেন বাবার সঙ্গে।

আগন্তুক ব্যক্তি ছাতাটি বন্ধ করে ঘরের ভিতরে ঢুকে চারিদিক তাকিয়ে মুখুজ্জেকে দেখতে না পেয়ে শুধালো, খুকি তোমার বাবা কোথায়? খুকি অর্থাৎ কিনা মুখুজ্জের বালিকা কন্যা বললো, বাবা দোতলায় শুয়ে আছে।

কিন্তু অসুখটা কি?

সে তো জানি নে।

ডাক্তার ডাকা হয়েছিল?

ডাক্তারের দরকার হবে না বললেন বাবা।

সর্বনাশ তবে মরবে নাকি?

জ্বর আছে?

না।

পেটের অসুখ?

না।

হাম, বসন্ত?

না ওসব কিছু নয়—বললো মেয়েটি।

জ্বর নয়, পেটের অসুখ নয়, হাম-বসন্ত নয়, তবে আবার কি রোগ?

আমি বলতে পারবো না, সে আপনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

সেই ভালো। চলো দোতলায় যাই।

কি হে মুখুজ্জে! চুপচাপ শুয়ে আছো, মুখ দেখে তো অসুস্থ বলে মনে হয় না।

সে সব পরে হবে, অনেক কথা। আগে একটু জল খেয়ে নাও।

আগন্তুক বললো, জল খাওয়া আমার মাথায় উঠেছে, তোমার অসুখ শুনলে যে আমারও গাটা কেমন করে।

সব শুনতে পাবে চৌধুরী। তুমি যাও ভাই মেয়েটার সঙ্গে, একটু জল খেয়ে এসো।

অগত্যা অপ্রসন্ন মুখে চৌধুরী জলযোগ করতে নেমে এলো।

চৌধুরী জলযোগ করতে থাকুক ততক্ষণ আমরা গোড়ার কথাটা পরিষ্কার করে নিই।

হরেন চৌধুরীর অবস্থা আগে ভালো ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিল একখানি পুরাতন জীর্ণ বাড়ি, একটা পুকুর, যার মধ্যে জলের চেয়ে পানার অংশটা বেশি, লোকে ডুব দিলে তখনই মাথার উপরে এসে পানাজমে যেতো, ভয়ে কেউ স্নান করতে আসতো না, আর ছিল পাঁচ-সাত বিঘে জমি। এমন সময় একদিন ঐ জীর্ণ বাড়ির ভিত খুঁড়তে গিয়ে এক কলসি টাকা পেল। ও টাকা খুব সম্ভব তার কোন পূর্বপুরুষ লুকিয়ে রেখেছিল, হরেন চৌধুরীর ভাগ্যে তা আবিষ্কৃত হলো। ঐ টাকাকে মূলধন করে ব্যবসা করবে সে স্থির করলো। কিন্তু কি ব্যবসা? চৌধুরী জানতো যে শিক্ষা, অভ্যাস ও পরিশ্রম ছাড়া

ব্যবসা সম্ভব নয়। কাজেই সে পথে গেল না। ভাবলো, সে পথে গেলে টাকাগুলো দশভূতের পেটে যাবে। এমন সময় তার মনে পড়লো যে একটা ব্যবসা আছে যাতে ওসব গুণের প্রয়োজন হয় না, কিছু পাটোয়ারী বুদ্ধি হলেই চলে। পাটোয়ারী বুদ্ধি তার পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত। বাপ এক সময়ে পাটের ব্যবসা করেছিল।

হরেন চৌধুরী স্থির করলো সব ব্যবসার সেরা ব্যবসা ধরবে—লগ্নী কারবার। লগ্নী কারবারে নাকি লক্ষ্মীর খাস নিবাস। কথাটা বোধ করি মিথ্যা নয়। দশ বৎসরের মধ্যেই হরেন চৌধুরী সে অঞ্চলের একজন প্রধান মহাজন হয়ে দাঁড়ালো। এমন সময় তার সাক্ষাৎ হলো হরিহর মুখুজ্জের সঙ্গে। তারা পূর্ব-পরিচিত, এক সময়ে একই মাইনর স্কুলে দু'জনে পড়েছিল। গরুর উপরে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পেয়েছিল হরিহর। তারপরে বহুকাল ছাড়াছাড়ি। দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। অনেকদিন পরে তারা দু'জনে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। মুখোমুখি এসে দাঁড়ানো কথাটা বলা বোধকরি ঠিক হলো না। হরিহর মুখুজ্জেই তার কাছে এসে উপস্থিত হলো। গরুর প্রবন্ধ প্রথম না হওয়ার আত্মগ্লানি ভুলে গিয়েছিল চৌধুরী। কারণ তার গোয়ালে এখন অনেকগুলি গরু। হরেন জানতো মুখুজ্জে ধনী ব্যক্তি। তার বেশি আর কিছু জানতো না, সংসারে তার বেশি জানবার আর কি-ই বা আছে।

হরিহর মুখুজ্জে ধনী নিঃসন্দেহ, তবে ভাগ্যের পরিহাসে সেই ধন উপভোগের পথ সীমাবদ্ধ। ব্যাপারটা খুলে বলা আবশ্যক। হরিহরের পিতা দেখলেন যে ছেলের মতিগতি ভালো নয়। যৌবনকে অবলম্বন করে যে সব দোষ দেখা দেয় তার সবগুলিই প্রকট হয়ে উঠেছে পুত্রের আচরণে। আর সবচেয়ে তার মমতার অভাব টাকার উপরে। পিতা দেখলেন যে এর হাতে বিষয়-সম্পত্তি পড়লে দুদিনে সব নষ্ট হয়ে যাবে। ভরসা ছিল বয়সে ভাটি পড়লে পুত্র ক্রমে আর দশজনের মতো টাকার প্রতি মমতাশীল হবে। কারণ পিতার দৃঢ় বিশ্বাস যে টাকার উপরে যার মমতা নেই, সংসারে কিছুই তার অসাধ্য নয়। হরিহরের বয়স পশ্চিম দিগন্তে হেলবার আগেই স্ত্রী বিয়োগ হলো তার। তখন তার দুর্বৃত্তপনা আরো বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে বাপ বুঝতে পারলেন তাঁর সময় হয়ে এসেছে। তখন তিনি এমন এক উইল করলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তির উপরে হরিহরের জীবনস্বত্বের অধিকার মাত্র। দান, বিক্রী, বন্ধক, দেবার ক্ষমতা থেকে সে বঞ্চিত হলো, তার অভাবে

হরিহরের মেয়ে সম্পত্তির অধিকারী হবে। এই উইল সম্পাদন করবার কিছুদিন পরেই তার পিতার মৃত্যু হলো। হরিহর পড়ে গেল নিতান্ত বিপাকে।

ব্যসনে টাকা ওড়াবার কাজে যাদের হাত অভ্যস্ত হয়েছে তারা জানে যে শুধু টাকা উড়িয়ে সুখ নেই। সম্পত্তি ওড়াতে পারলে তবে না মজা। কিন্তু হায়। পরমারাধ্য পিতৃদেব এই মজার পথে কণ্টক আরোপ করে গিয়েছেন। শুধু গ্রাসাচ্ছাদন নয়, স্বচ্ছল ভদ্রভাবে থাকবার উপস্বত্ব তার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হলে কি হয়, গ্রাসাচ্ছাদনের পরেই পান-ভোজন, তার উপায় কি? তাছাড়া আসল বাধাটা মনের মধ্যে। সম্পত্তির সে নিঃস্বত্ব অধিকারী নয়। কিছুদিন এইসব চিন্তায় মুহ্যমানভাবে কাটালো, তারপরে সৎ পরামর্শলাভের আশায় চলে গেল কলকাতায়। কলকাতা শহরে সৎ পরামর্শের আদিম নিবাস। শীঘ্রই সেরূপ পরামর্শ মিলে গেল। বিচক্ষণ এক উকিল কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে বললো, এর জন্যে ভাবনা কি, আপনি জীবনস্বত্ব বাঁধা রেখে ঋণ করুন। আপনার যা সম্পত্তি যথেষ্ট ঋণ পাবেন। তাতে গ্রাসাচ্ছাদন ও পানভোজন সমস্তই সুচারু রূপে নিষ্পন্ন হতে পারবে। এই রূপ সৎ পরামর্শের বলে বলীয়ান হরিহর গ্রামে ফিরে এলো। আর ঠিক গ্রামে ঢুকবার মুখেই দেখা হয়ে গেল হরেন চৌধুরীর সঙ্গে। হরেন চৌধুরী খাতকদের তাগিদ দেবার জন্যে এসেছিল। হরেনকে দেখবামাত্র বিদ্যুৎবৎ হরিহরের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল যে তাকে দিয়েই নিজের কার্য সিদ্ধি হবে। দু'দিন বাদে সে হরেনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো আর জানালো যে জীবনস্বত্ব বাঁধা রেখে ঋণ চায় সে হরেন বললো, আমাকে দু'দিন ভাববার সময় দাও। এই দু'দিনে যা সন্ধান সুলুক সে পেল তাতে বুঝলো হরিহরকে এই সর্তে টাকা দেওয়া যেতে পারে তবে কিনা বিবেচ্য বিষয় দুটি। হরেন অমর নয়, বন্ধকি সম্পত্তির উপরে উত্তমর্ণের অধিকার তার জীবনকাল পর্যন্ত। আশঙ্কা এইখানে। কিন্তু আশার কথাও আছে। হরেনের বয়স তেমন বেশি নয়, আর তার স্বাস্থ্যটা নাকি ভালই। কাজেই এখনও সে দীর্ঘকাল জীবিত থাকবে এরূপ আশা করা অমূলক নয়। তার জীবনকালের মধ্যেই যতটা শুষে নেওয়া যায়, আইনত তাই স্বীকার্য। দু'দিন বাদে হরিহর এসে উপস্থিত হলে হরেন ঋণ দিতে স্বীকার করলো আর সেই সঙ্গে পুরাতন বন্ধুর অধিকারে অনুরোধে করলো, ভাই একটু সাবধানে থেকো, অসুখ-বিসুখে পড়ে আমাকে যেন বিপদে ফেলো না। তোমার বিপদে আমি দেখলাম, আমার বিপদে

একটু দেখো।

হরিহর হাসিমুখে একখানি কুষ্ঠিপত্র বের করে তার হাতে দিয়ে বললো, এই দেখো, আমার আয়ু পঁচাশি বৎসর। কালকেই গণক ঠাকুরকে দেখিয়েছিলাম।

হরেন চৌধুরীর তমস্সুক ছাড়া অন্য কাগজের উপরে তেমন আস্থা না থাকলেও কুষ্ঠি সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটু দুর্বলতা ছিল। ওটাই তো অদৃষ্টের তমস্সুক কিনা।

একদিকে হরিহর যেমন দুই হাতে টাকা ওড়াতে লাগলো তেমনি দশ হাতে টাকা শুষতে লাগলো হরেন চৌধুরী। মাঝে মাঝে হরেন চৌধুরী এসে বন্ধুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে যেতেন। কারণ তার স্বত্বের সীমা ঐ জীবনকাল পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে হরিহর একদিন আবিষ্কার করলে যে ঋণের টাকা প্রায় তলাতে এসে ঠেকেছে। তখন সে আবার সৎ পরামর্শ লাভের আশায় কলকাতায় গেল। কলকাতায় সৎ পরামর্শের কখনো অভাব হয় না। সেখান থেকে ফিরে এসে শয্যা গ্রহণ করলো। ইচ্ছা ছিল লোকমুখে সংবাদটা জানাবে হরেনকে তবে তার প্রয়োজন হলো না। ঘটনাচক্রে হরেন এসে উপস্থিত হলে।

কি ভায়া! জলযোগ হলো? দেখবার শুনবার লোক তো নেই। আছে কেবল ঐ কচি মেয়েটা।

যথেষ্ট খেয়েছি, আর তোমার মেয়ে তো সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কিন্তু তোমার অসুখটা কি? শরীর দেখে তো তোমাকে অসুস্থ মনে হয় না।

না, এ ব্যধি শরীরের নয়, এ ব্যধি মনের, যাকে শাস্ত্রে বলে আধি।

সে আবার কি রকম?

তবে বুঝিয়ে বলি শোন।

হরিহর গম্ভীরভাবে বললো, আমি স্থির করেছি অনশনে দেহত্যাগ করবো।

প্রথমে কথাটা শুনে হরেন কিছুই বুঝতে পারলো না, ভাবলো এ একটা পরিহাস। কিন্তু হরিহরের মুখের দিকে তাকাতে বুঝলো, না, এতো গাম্ভীর্য যার মুখে তার কথা পরিহাস হতেই পারে না। তখন হরেন চৌধুরীর মুখ গম্ভীরতর হয়ে উঠলো। সর্বনাশ অনশনে দেহত্যাগ! তার মানে জীবন

স্বত্বের উপরে অধিকার এখানেই শেষ। আর এক পয়সা আদায় করবার ক্ষমতা থাকবে না হরেনের। কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ থাকার পর সে বলে উঠলো, ভাই কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো।

হরিহর একটি প্রমাণ সাইজ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, বুঝিয়ে আর কি বলবো, চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ না।

হরেন সভয়ে ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো আশঙ্কার কারণ আছে কি না। তারপরে বিহ্বলের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি ভাই সাদামাটা লোক সূক্ষ্ম বুঝি না, অনশনে দেহত্যাগ করবার মতো এমন কি হয়েছে বলো।

কী হতে আর বাকী আছে। দেশময় অনাচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, সমাজ-বিরোধীদের গুণ্ডামী, সরকারের উদাসীনতা, সরকারী কর্মচারীদের অলসতা, কত আর ব্যাখ্যা করে বলবো। আরও আছে—

তা থাক। এসব তো চিরকাল আছে, তুমি অনশন করে কি তার প্রতিকার করবে।

কিছু না করতে পারি দেশের কল্যাণ কামনায় দেহত্যাগ করবো।

হরেনের মন যদি প্রকৃতিস্থ থাকতো তবে না হেসে পারতো না। ঐ যে সম্মুখে লোকটা বসে আছে, যার মতো পাষণ্ড এই দগ্ধ কলিকালেও কম দেখা যায় তার হঠাৎ এমন মানবিক বেদনা সত্যই আশ্চর্য। কিন্তু হাসবার সময় এ নয়। ঐ নরাধমটার জীবনের উপরে তার স্বার্থ নির্ভর করেছে। লোকটা অসুখেই মরুক, আর পরের জন্যেই মরুক তার ভাগ্যে ফলাফল সমান। সে বোঝাতে আরম্ভ করলো, দেখো ভাই, তুমি আমি ছা-পোষা সাধারণ লোক, আমাদের অনশন মৃত্যুতে এসব অনাচারের বিন্দুমাত্র প্রতিকার হবে না। এমন কি জাতির জনকের মতো মহাপুরুষ কতবার অনশন করেছেন। কি তার ফল হয়েছে?

হরিহর বললো, জাতির জনকের কথা ছেড়ে দাও, আরও কতজনে তো অনশন করেছে।

তাতেই বা কি ফল হয়েছে, সংসার যেমন চলছিল তেমনিই চলছে। বরঞ্চ অনাচারের মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়েছে।

আরে সেই জন্যই তো আমার এ প্রচেষ্টা। না, এ জীবন আর রাখবো না।

হরেন বললো, পুলিশে খবর পেলে যে আত্মহত্যার অভিযোগে ধরে নিয়ে যাবে।

সেটাই তো আমার কাম্য। হ্যাঁ ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে। পুলিশে একবার খবর দিতে পারো।

কেন ?

কেন কি ! পুলিশে ধরে নিয়ে গেল খবরের কাগজে ছবি উঠবে, সংবাদটা বেরোবে, দেশের লোক জানবে যে দেশের জন্যে একজন আর কিছু না পারুক দেহত্যাগ করতে উদ্যত।

হরেন বললো আমার কথা শোন ভাই, দেশের তাতে এতটুকু লাভ হবে না, মাঝ থেকে আমিই মরবো।

কেন, তুমিও অনশন করবে নাকি ? চমৎকার, এসো, এই বিছানার একপাশে শুয়ে পড়ো। খবরটা আরো জমাকালো হয়ে উঠবে।

মরবার কথা কে চিন্তা করছে। তোমার বিষয়-সম্পত্তির উপর আমার যা অধিকার তা তোমার জীবিতকালে পর্যন্ত। তুমি মরলে যে আমি পথে বসবো।

ও! এই কথা আমি ভাবছিলুম না জানি আর কি গুরুতর ব্যাপার। পথে মরো, পথের দিকে তাকিয়ে দেখো, কত লোক পথে মরছে। অনাহারে রোগে খুনীর ছোরাতে বাস-চাপা পড়ে এমন কি ক্ষেপা কুকুরের কামড়ে। এর জন্যে ভয় পাচ্ছো কেন ?

হরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, না তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার চেয়ে এক কাজ করো না, লোকে জানুক তুমি অনশন করছো, লুকিয়ে লুকিয়ে খাও না।

কি সর্বনাশ, আত্মছলনা। সে আমার দ্বারা হবে না—এই বলে সে জিব কাটলো।

তখন হরেন বললো, আমি আবার কালকে আসবো। একদিনের মধ্যেই যে কিছু হয়ে যাবে এমন মনে হয় না। তুমি আমার কথাটা ভেবে দেখো।

এই বলে সে বেরিয়ে গেল। তখন হরিহর মেয়েকে ডেকে বললো, রান্না হতে আজ দেরী হচ্ছে কেন রে ? ঠাকুরকে বল তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দিতে। আর ওবেলা যেন শুধু পোলাও খাব মাংস করে, আর কিছু না। আর দেখ দরজা সর্বদা বন্ধ রাখবি, কেউ শুধোলে বলবি, বাবা অনশন করে

শুয়ে আছে।

২

পরদিন যথাসময়ে হরেন চৌধুরী এসে উপস্থিত হলো, দেখলো যে হরিহর তখনও জীবিত আছে। কিন্তু মুখটা কিঞ্চিৎ ম্লান। হরেন যদি বুঝতে পারতো বুঝতো যে ওটুকু মেকআপের ফলে। হরিহর পাড়ার থিয়েটারে একজন প্রধান, কি করে মেক আপ করতে হয় বহুদিনের শিক্ষায় শিখে নিয়েছে।

হরেন বললো, তোমাকে জীবিত দেখে ধড়ে প্রাণ এলো। আমি তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কালকে অবুঝ মেয়েটা ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছিল ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললো, আর খুব বেশী হয় তো চার-পাঁচদিন।

বল কি। তার মানে আর চাব-পাঁচদিন তোমার বিষয়-সম্পত্তিব উপর আমার অধিকার।

ভাই, দেশেব জন্য আমি প্রাণটা দিতে উদ্যত আব তুমি ঐটুকু ক্ষতি স্বীকাব বরতে ভয় পাচ্ছো।

তবে খুলে বলি। মানুষের প্রাণ আর বিষয়-সম্পত্তিব মধ্যে বিষয়-সম্পত্তির গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ প্রাণ তো একদিন যাবেই। বিষয়-সম্পত্তি রাখতে জানলে দু-দশ পুরুষ থেকে যায়। এই জন্যেই তো ডাক্তারের ফি ষোল টাকা, উকিলের ফি সতেরোশো টাকা। যাই হোক দেখো তুমি খাবে আশা কবে উৎকৃষ্ট সন্দেশ কিছু এনেছি—এই বলে থলিব ভিতর থেকে এক বাকস সন্দেশ বের করলো।

হরিহর ব্যস্তভাবে সবে গিয়ে বললো, সরিয়ে নাও সরিয়ে নাও, ও কাছে এনো না।

আচ্ছা কাছে নাই আনলাম, এই রেখে গেলাম। অবসর মতো খেয়ে নিও। এই বলে সে সন্দেশগুলো রেখে দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবলো লোভনীয় গন্ধ নিশ্চয়ই ওর মৃত্যুপণকে শিথিল করে দেবে।

হরিহর মেয়েকে ডেকে বললো, খুকি এক ঘটি জল নিয়ে আয় আর সন্দেশগুলো এগিয়ে দে।

খুকি অদূরে বসে মুগ্ধ নেত্রে দেখলো যে একে একে ষোলটি সন্দেশই পিতার উদরসাৎ হলো, তার জন্য এককণাও রইলো না। সে হয়তো ভাবলো

অনাহারে না মরলেও অতি আহারে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব না। কিন্তু অতটুকু মেয়ের উপরে এমন চিন্তার অভিযোগ আরোপ করা উচিত না।

হরেন চৌধুরীর কাজকর্ম অন্যসব খাতককে তাগিদ দেওয়া, নিজের ক্ষেত খামার পরিদর্শন করা মাথায় উঠলো। এখন তার নিত্য কাজ দাঁড়ালো মুমূর্ষু হরিহরকে পর্যবেক্ষন করা। এদিকে মেকআপের কৃপায় হরিহরের মুখমণ্ডল ক্রমশঃ অধিকতর মৃত্যুপথের ইশারা দিতে লাগলো একদিন এসে দেখলো যে হরিহর শায়িত, বিছানার উপরে উঠে বসবার ক্ষমতাও তার নেই, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যাচ্ছে। তখন নিতান্ত নিরুপায় হরেন চৌধুরী তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে সাশ্রু নেত্রে বললো, কি হলে তুমি প্রাণ রক্ষে করবে বলো।

হরিহর কোনরকমে ক্ষীণস্বরে বলতে লাগলো,

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।
আমি অনশন ক্লান্ত
সেই দিন হবো শান্ত।"

হরেনের যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকতো তবে বুঝতো নিজের প্রয়োজন-মত পরিবর্তন করে যে কবিতা আবৃত্তি করতে পারে তার মৃত্যু আসন্ন নয়। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত উত্তমর্ণের এ কথা বুঝবার মতো মনের অবস্থা কেমন করে হবে। হরেন তার দুই পা জড়িয়ে ধরে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো, না ভাই প্রাণটা দিও না। এই অভিনয় দেখে দরজার আড়ালে লুকিয়ে খুকিটা খিক খিক করে হাসতে লাগলো।

হরিহর বলে উঠলো, কাঁদিসনে রে খুকি, কাঁদিসনে, আমি গেলাম তাতে আর কি, তোর হরেন কাকা তো রইলো।

অনেকক্ষণ কাকুতি মিনতি করেও যখন হরিহরের মৃত্যুপণ টলাতে পারলো না, হরেন বললো, আমি চললাম, কালকে আবার আসবো।

হরিহর বললো, একেবারে ঘাটে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসো, আর বেশিক্ষণ নয়।

হরেন বাড়ি ফিরে এসে আত্মচিন্তায় মগ্ন হলো। হরিহরের জীবনস্বত্ব

বাবদ যত টাকা সে দিয়েছিল তার সিকি অংশও এ পর্যন্ত আদায় হয় নি। এখন সে যদি মরে তবে বাবো আনাই জলে পড়লো। এই সঙ্কটে সৎ পরামর্শ লাভের আশায় সে কলকাতায় গিয়ে এক বিচক্ষণ উকিলের কাছে উপস্থিত হলো। ঘটনাক্রমে সেই উকিলের কাছেই গেল যার কাছে অনশন সম্পর্কে পবামর্শ নেবার জন্যে গিয়েছিল হরিহর। সেই উকিল কয়েকটি মুদ্রা খণ্ডের পরিবর্তে অনশন অভিনয়ের পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল, আপনার উত্তমর্ণ কিছুতেই আপনাকে মরতে দেবে না বিপন্ন বোধ করে আরও কিছু টাকা আপনাকে দেবে। এবারে সেই উকিল হরেন চৌধুরীকে বললো, আইন আদালতে এর প্রতিকার হবে না, বরঞ্চ খবরটা প্রচার হয়ে গেলে সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলগুলো এমনি ঢাক পিটেবে যে আপনি পথে বসবেন। তার চেয়ে যান কিছু টাকা কবুল করে ওকে মৃত্যুপথ থেকে ফিরিয়ে আনুন। উকিল চোর ও গৃহস্থ, আহত ও আঘাতকারী, ছ্যাঁচড় ও সাধু সকলকেই নিরপেক্ষভাবে পরামর্শ দিয়ে থাকে। গীতোক্ত নিষ্কাম পুরুষ দেখতে হলে উকিলের বাড়ি যাওয়া আবশ্যক।

অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পেয়ে হরেন হরিহরের বাড়িতে এসে যখন পৌঁছলো, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। সারাদিন অনাহারের ফলে তখন কেবলই সে ষোলখানি লুচি, এক জামবাটি মাংস ও আধ পাঁইট মদ্য উদরস্থ করে উঠেছে। এমন সময় খুকি এসে সংবাদ দিল হরেন কাকা এসেছে।

তাকে একটু নীচে বসিয়ে রাখ—এই বলে ক্ষিপ্রহস্তে মেক-আপ করে মৃত্যুপথ যাত্রী বিছানায় শুয়ে পড়লো।

হরেন ঘরে প্রবেশ করে বিনা ভূমিকায় হরিহরের পায়ের উপরে পাঁচ হাজার টাকার একটি থলি রেখে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে বললো, ভাই এবারের মতো প্রাণটা রক্ষা করো। ইতিমধ্যেই অত্যাচার, অনাচার অনেক প্রশমিত হয়েছে আজকের সংবাদপত্রে দেখলাম।

তখন উত্তমর্ণে ও অধমর্ণে এক বিষম রেষারেষি পড়ে গেল। দেশের জন্যে প্রাণটা দেবে, উত্তমর্ণ কিছুতেই তাকে এই সাধু সঙ্কল্প সাধন করতে দেবে না। দুঃখের মধ্যে এই যে এই প্রহসন দেখবার দর্শক ঘরের মধ্যে কেউ উপস্থিত ছিল না। অবশেষে উত্তমর্ণের অশ্রুজলেরই জয় হলো। এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা করতে স্বীকৃত হলো হরিহর। আশ্বস্ত হরেন চৌধুরী যখন যাত্রা করতে উদ্যত এমন সময়ে হরিহর বলে উঠলো এবারের মতো বন্ধুর অনুরোধে

প্রাণটা রক্ষা করলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না। হরেন ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, তার চেয়ে ভাই জীবনস্বত্ব বাবদ তোমাকে যে টাকা দিয়েছি সেটা ফিরিয়ে দাও। জীবনস্বত্ব তুমিই ভোগ কর।

মুমূর্ষু হরেন ক্ষীণকণ্ঠে বললো এরকম অসৎ পরামর্শ আমাকে দিও না। আমি দত্তাপহারী হতে পারবো না। ভবিষ্যতের শংকাহত হরেন ধীরপদে গৃহত্যাগ করলো।

এক ট্যাক্সি দুই দরজা

'এই ট্যাক্সি রোখো'। ট্যাক্সিটা দাঁড়াবামাত্র যেমনি দরজা খুলে উঠতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে অন্যদিকের দরজা খুলে এক ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে চেপে বসে ড্রাইভারকে হুকুম করলেন, এই চলো।

সে কি মশায়! গাড়ী আমি দাঁড় করালাম।

তিনি আমার কথায় কর্ণপাত না করে ড্রাইভারকে পুনরপি আদেশ করলেন, জলদি চলো।

ড্রাইভার পাঞ্জাবী হলেও অনেককাল কলকাতায় আছে, বাঙালী ভদ্র-লোকের সৌজন্য সম্বন্ধে তার কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই। কাজেই সে বেচারা আমার দিকে তাকাল, আমি তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আরোহী ভদ্রলোক এবারে বললেন,

কেন দেরী করছ? আমার জরুরী কাজ আছে।

আমি বললাম, জরুরী কাজ আমারও আছে। নতুবা এই দুর্দিনে ট্যাক্সি চাপে কে?

আমার কথায় ভদ্রলোকের কোন প্রতিক্রিয়া হ'ল না দেখে ড্রাইভার বলল, বাবু, আমার পাশে বসুন।

এবারে ভদ্রলোক অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বললেন, বসলেই হ'ল না। আমি দক্ষিণ কলকাতায় যাব। আমাকে পৌঁছে দিয়ে তারপরে অন্য কথা।

আমি বললাম, দক্ষিণে যাই আর উত্তরে যাই, আমি ডেকেছি, আমি চড়ব। বলে গাড়ীতে উঠে তার পাশে বসলাম।

দেখলাম যে গাড়ী দক্ষিণ কলকাতার দিকেই চলল।

ড্রাইভার আমার উদ্দেশ্যে বলল, এঁকে পৌঁছে দিয়ে তারপরে আপনাকে পৌঁছে দেব। অতিরিক্ত ভাড়া লাগবে না। আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলাম, আমারও লক্ষ্য দক্ষিণ কলকাতা।

ভদ্রলোক নিজের মনে বকে যেতে লাগলেন, একজনের সঙ্গে জরুরী বিষয়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি, সময় মত না যেতে পারলে লজ্জায় পড়তে হবে। আর এদিকে সমস্ত তল্লাট খুঁজে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। যেমন হয়েছে গভর্ণমেন্ট—এই বলে সংসারের যাবতীয় কাল্পনিক ও বাস্তব ত্রুটি বিচ্যুতি গভর্ণমেন্ট নামক অশরীরির স্কন্ধে চাপিয়ে তিনি বোধ করি মনে মনে তৃপ্তি

অনুভব করছিলেন।

আমার কাজটাও জরুরী। এক ভদ্রলোক মেয়ে দেখতে আসবেন। অতিকষ্টে যদিবা ট্যাক্সি পেলাম, অপরে তাকে গ্রাস করল। সংসারের নিয়ম এই যে, ভাল মানুষের সহনশীলতা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক। কাজেই হস্তগত ট্যাক্সি হস্তচ্যুত হল, এখন পাত্রের পিতা রমেশবাবু এসে ফিরে গেলেই চরম হয়।

ট্যাক্সির মধ্যে একটি সরব উক্তি ও একটি নীরব চিন্তাধারা পাশাপাশি চলছিল।

ওই ভদ্রলোক অধীরভাবে বলে উঠলেন, দেখ না, আবার বেটা পুলিশ হাত তুলেছে। বোমা, বন্দুক, ছিন্‌তাই রোধ করতে পারে না, কেবল ভদ্রলোকের গতিরোধ করতে ষোল আনা মজবুত।

যেহেতু পুলিশের হাতের শক্তি সীমাবদ্ধ,এক সময়ে তাকে হাত নামাতেই হ'ল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মস্ত লরী সম্মুখে এসে পড়ল।

নাও, ইন্দ্রজিৎ যদি বা গেলেন, পথ আটকে এসে দাঁড়ালেন মেঘনাদ।

বুঝলাম যে ভদ্রলোকের রামায়ণের পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে ধারণা বিদেশী পণ্ডিতদের মতই। অবশেষে মেঘনাদকেও পথ ছাড়তে হ'ল। ট্যাক্সি আবার চলল। ভদ্রলোক মুখে বকবক করেই যাচ্ছেন, আমিও মনে মনে যথারীতি তার মুণ্ডপাত করছি। আর এই দুটি প্রৌঢ় বাঙালীর কাণ্ড কারখানা দেখে পঞ্চনদবাসী, অধুনা কলকাতা প্রবাসী ড্রাইভারটি কি ভাবছে তা অনুমান করতে চেষ্টা না করাই আত্মসম্মানের পক্ষে শোভন।

এমন সময়ে নকুল চ্যাটার্জী ষ্ট্রিটের মোড়ে গাড়ী পৌঁছতেই ড্রাইভারকে বললাম, গাড়ী থামান, এখানেই নামব। নেমে টাকা বের করছি, উক্ত ভদ্রলোক তেতে উঠে বললেন, অনেক হয়েছে আর টাকা দেখাতে হবে না। ওই হিসাব করতে গিয়ে আমার আরও দেরী হয়ে যাক। অগত্যা ভাড়া না দিয়েই বাড়ীর দিকে চলতে চলতে ভাবলাম, এমন অসজ্জন ব্যক্তি সংসারে আছে।

বাড়ীতে পৌঁছে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরে রমেশ বাবু এসেছিলেন?

সে বলল আসেননি, তবে ফোন করে জানিয়েছেন, এখনই আসবেন, মনে মনে ভাবলাম ভগবান রক্ষা করেছেন। ভিতরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময়ে ছেলে ছুটে এসে বলল, বাবা, এক ভদ্রলোক এসেছেন

নাম বললেন রমেশ বাবু।

ওবে পাত্রের পিতা, বিজ্ঞাপন দেখে দুজনের পত্রাপত্রি হয়েছে, এখনও তাঁরে চোখে দেখেনি। আমি পাত্রীর পিতা, কাজেই বুকের মধ্যে একটা ভূমিকম্প অনুভব কবতে করতে দ্রুত বাইরেব ঘরে এসে পরস্পরকে দেখে দুজনেই চমকে উঠে অপ্রস্তুত হলাম। দু এক মুহূর্ত্ত হতবাক থেকে প্রথমে সম্বিত গেলেন রবেশবাবু। দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করতে কবতে বললেন, এই দেখুন এক ট্যাক্সির দুই দরজা থাকলে কিবকম বিড়ম্বনা হয় আমরা দু'জনে একই ট্যাক্সিতে এতক্ষণ পরস্পরের মুণ্ডপাত করতে করতে ’সেছি, তাই আশা হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটি স্থায়ীত্বলাভ কববে পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিবাহ বন্ধনে।

অপারেশন

জিডি হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দু-তিনজন লোক চাপা গলায় কথা বলছিল। তাদের একজনের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সেই লোকটিকে অপর একজন জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপারটা কি হয়েছে খুলে বলুন তো।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা লোকটি বললো, অরুণবাবু সেই সকাল থেকে খুলে বলতে বলতে মুখে ব্যথা হয়ে গেল, আর পারি নে।

অরুণবাবু বললো, অত উত্তেজিত হবেন না, আবার রক্ত বের হতে শুরু করবে।

এখন প্রাণটা বের হলেই বাঁচি। আপনাদের জেরার হাত থেকে রক্ষা পাই।

তৃতীয় ব্যক্তি এতক্ষণ চুপ করেছিল। সে বললো থাক না। চৌধুরী পুলিশের কাছে যে এজাহার দিয়েছে তা থেকে জেনে নিলেই হবে।

তদুত্তরে অরুণ বললো, প্রকাশবাবু সে এজাহার খানাতো সামনে নেই, মানুষটা আছে। উনি ধীরে ধীরে বলুন। দু-চার কথা বললেই চলবে।

অগত্যা চৌধুরী বলতে শুরু করলো, শিলং থেকে ফিরবার মুখে একখানা ট্রাক এড়াতে গিয়ে আমাদের ট্যাকসিখানায় প্রথমে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো, সেই ধাকাতে স্টিয়ারিং হুইলটা ড্রাইভারের বুকে এমনি আঘাত করলো যে তার কণ্ট্রোল চলে গেল। তখন সমস্ত ট্যাকসিখানা গড়াতে গড়াতে নীচে পড়লো। অবশেষে গিয়ে থামলো গোটা দুই বড় বড় গাছের বাধা পেয়ে। অরুণবাবু বললো, কিন্তু শিলংয়ের পথতো একমুখী ছিল।

এখন রাস্তা চওড়া করে দুমুখী করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে শুনুন। আমি তো কোনরকমে ট্যাকসি থেকে ঠেলে ঠুলে বের হলাম। ড্রাইভারের নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম, অবশেষে গায়ে ধাক্কা দিয়ে বুঝলাম তার হয়ে গিয়েছে। তখন গোবিন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখি তার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞান। কর্তব্য স্থির করতে না পেরে আমি একখানা পাথরের উপরে বসলাম। এমন সময়ে দেখলাম দুজন লোক এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। তারা ঐ ট্রাকখানাতে শিলংয়ের দিকে যাচ্ছিল। তখন তিনজনে ধরাধরি করে গোবিন্দবাবুকে নিয়ে এসে ট্রাকে তুললাম।

প্রকাশ শুধালো, আর ড্রাইভার ওখানেই পড়ে থাকলো ?

তাকে আনবার প্রশ্ন ওঠে না। একজনকে ওখানে পাহারা রেখে নংপোতে পৌঁছে পুলিশে খবর দিলাম। গৌহাটি হাসপাতালে এসে যখন পৌঁছলাম, তখনও গোবিন্দবাবু অজ্ঞান তবে প্রাণ আছে। তারপরে পুলিশ এবং হাসপাতালের সহায়তায় একখানা এরোপ্লেন চার্টার করে কলকাতায় নিয়ে এসে উপস্থিত হলাম।

এতক্ষণে বোঝা গেল। আপনার কি মনে হয় গোবিন্দবাবুর কি প্রাণের আশা আছে ?

চৌধুরী বিরক্তি স্বরে বললো, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ভগবান ছাড়া কেউ পারে না। তবে অপারেশন তো হচ্ছে, দেখা যাক।

প্রকাশ বললো, গোবিন্দবাবুর ছেলে বোধকরি প্লেনে তিনেটের মধ্যেই বোম্বে থেকে এসে পৌঁছবে।

এই ভদ্রলোক তিনজন গোবিন্দবাবুর প্রতিবেশী মাত্র। গোবিন্দবাবুর একমাত্র সন্তান ধীরেন বোম্বাইতে কর্ম করে। সংসারে আর তার কেউ নেই।

অপারেশন থিয়েটারে টেবিলের উপর শায়িত গোবিন্দবাবুর সংজ্ঞাহীন দেহ। তিনজন নার্স এবং জন দুই জুনিয়র ডাক্তার নিজ নিজ কর্তব্যে উদ্যত আর সিনিয়র প্রবীণ ডাক্তার মাথার খুলিতে অস্ত্রোপচার করেছেন। একজন জুনিয়র হার্ট ও ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা করে দেখলো ঠিক আছে, আর একজন যথারীতি এ্যানেস্থেসিয়ার ব্যবস্থা করছে।

ব্রেনে গুরুতর আঘাত, জীবনের আশা অতিশয় ক্ষীণসূত্রে ঝুলছে, যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে।

একটা আলোকময় হাজার রকম ফুলে উজ্জ্বল বাগানের মধ্যে বেঞ্চিতে পাশাপাশি দুজন তরুণ-তরুণী উপবিষ্ট। তৃতীয় কোন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকলে বুঝতে পারতো যদি তাদের দুজনের দেহের মধ্যে অর্ধহস্ত পরিমিত ব্যবধান, কিন্তু মনের মধ্যে ব্যবধান অপরিমেয়। অবশ্য একথা চোখে দেখে বুঝবার নয়, তবে যথার্থ চক্ষুষ্মান লোকের দৃষ্টি অন্তর্মুখী কিনা।

মেয়েটি শাড়ির খুঁট নিয়ে আঙুলে জড়াচ্ছিল, এবং খুলছিল যেন এই মুহূর্তে সংসারে সেটাই গুরুতর কর্তব্য। আর পুরুষটি একটা গোলাপ ফুলের দিকে এমন নিবিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করছিল যেন ঐ উদ্দেশ্যেই বিধাতা তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। কিন্তু বিধাতার অসীম রঙ্গ। হঠাৎ একটা অদ্ভুত

আকারের শুঁয়োপোকা কোথা থেকে এসে মেয়েটির পা বেয়ে উঠতে শুরু করলো। সে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে মাগো বলে পুরুষটিকে জড়িয়ে ধরলো।

কি না জানি বিপদ ঘটেছে দেখে পুরুষটিও লাফিয়ে উঠে কি হয়েছে বলে প্রকৃত ব্যাপার দেখে হো হো শব্দে হেসে উঠলো।

মেয়েটি বললো এই কি তোমার হাসবার সময় হলো ?

পুরুষ গম্ভীরভাবে উত্তর করলো, না হাসবার সময় নয়, সেটা তুমিও জানো আমিও জানি। কিন্তু যে নারী প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী, শুঁয়োপোকার ভয়ে তাকে সশঙ্কিনী হতে দেখলে হাসি না পেয়ে যায় না।

তবে তুমি হাসো, আমি চললাম।

হাসির উপলক্ষ্য চলে গেলে কি হাসি পায়, চলো আমিও যাচ্ছি।

নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে বনের ছায়ায় একটি আদিবাসী পল্লী। এসব দিকের নদী যেমন হয় তেমনি, আগাগোড়া বালুকাময়, মাঝে মাঝে পাথর উঁচু হয়ে রয়েছে, তার নীচে জল জমে আছে। সেই পাথরের উপরে দুটি যুবক-যুবতী বসে আছে। কতক্ষণ তারা এভাবে বসে আছে। সে হুঁশ তাদের ছিল না। এমন সময়ে তাদের চোখে পড়ল জন দুই রাখাল অনেকগুলো মোষ তাড়িয়ে নিয়ে পল্লীর দিকে চলেছে। তারা পাথরে উপবিষ্ট মানুষ দুটিকে দেখে বলে উঠলো, বাবু আর এখানে থেকো না, সন্ধ্যা হয়ে এলো, হুড়ার বেরোতে পারে। মেয়েটি ভীতস্বরে শুধালো, হুঁড়ার কাকে বলে ?

পুরুষটি বললো, নেকড়ে বাঘের এদিকে ঐ নাম। তবে চলো যাই বলে মেয়েটি যেই উঠতে গিয়েছে পা পিছলে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। গর্তটায় ডুব জল না হলেও গলা জল তো বটে।

পুরুষটি লাফিয়ে নেমে তরুণীকে টেনে তুললো। তখন দুজনে সিক্ত বস্ত্রে ডাঙ্গায় যেখান তাদের মোটর গাড়ি ছিল সেইদিকে রওনা হলো।

বেগে মোটর ছুটতেই তরুণী বলে উঠলো অত জোরে চালিও না।

গরুর গাড়ির স্পীডে মোটর চালাতে আমি অভ্যস্ত নই।

একদিন দেখছি মোটরেই তোমার বিপদ ঘটবে।

ঘরের বাইরে বেঞ্চির উপরে পূর্বোক্ত তিন ব্যক্তি উৎকর্ণ তটস্থভাবে বসে আছে। ভিতর থেকে কখনো কখনো যন্ত্রপাতির টুংটাং আওয়াজ, চাপা কণ্ঠের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—বুঝতে পারা যায় না, কতদূর কি

এগোলো।

চৌধুরী বলল এত সময় নিচ্ছে দেখে ভয় করছে।

অরুণ বলল, ঠিক উল্টো, ভয়ের হলে এতক্ষণে সব শেষ হয়ে যেতো।

প্রকাশ বলল, ভয় আর ভরসা কিছুই করো না, ডাক্তারে ছোঁয়া আর বাঘে ছোঁয়া সমান, আঠারো ঘা।

যা বলেছ। ডাক্তারে যখন বলে যে অপারেশন সাকসেসফুল তার মানে রুগী নিতান্ত অনুগ্রহ করে টেবিলের উপরে দেহ রক্ষা করেনি, তারপরে যে মরবে না এমন কথা নেই।

আর যদিই বা মরে সেটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।

অরুণ ও প্রকাশ যখন এই রকম বলাবলি করছিল, চৌধুরী ভাবছিল যাক খুব বেঁচে গিয়েছি, আমারও তো ঐ রকম হতে পারতো।

ডাক্তার ও নার্সেরা ক্ষিপ্রহস্তে যে যার কর্তব্য করে যাচ্ছে। রুগীর মাথার খুলী আলগা করে খুলে দেখা হয়েছে—ভিতরে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে কিসের তুলনা দেব জানি না, রক্ত-মাংসের পুঞ্জীভূত বুদ্বুদ বললে অনেকটা যেন মেলে। বলা বাহুল্য রুগীর জ্ঞান নেই তবে প্রাণ আছে, নাড়ী, হৃদপিণ্ড, রক্তের চাপ স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন হওয়া উচিত তার চেয়ে খারাপ নয়!

রুগী অচৈতন্য, তবে চৈতন্যের নীচে একটা জগৎ আছে যাকে বলা যায় অবচেতন লোক। পুরাতন শহরে বাড়ীর ভিত খুঁড়তে গেলে পর পর অনেকগুলো ভিতের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এখন সেসব চাপা পড়া কিন্তু এক সময়ে তো সজীব অর্থাৎ জীবের আশ্রয় ছিল। কোন কারণে যেমন ভিত খুঁড়তে গেলে কিম্বা ভূমিকম্পে নাড়া খেলে চাপা পড়া আলগা হয়ে গিয়ে আলোতে আসে। অবশ্য তাদের আগের সে জলুষ থাকে না, আকৃতিও বিকৃত, কতক ভাঙ্গা কতক আধ ভাঙ্গা কতকটা বা একেবারেই লুপ্ত—আর প্রাণ তো বহুকাল বিগত। বিস্মরণের ছিন্নসূত্র অবলম্বন করে তারা জীবলোকের আলোকে হঠাৎ প্রবেশ করে বিহ্বলবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, সূর্যের প্রখর আলোয় তাদের চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছে। তাদের কেউ চিনতে পারে না, তারাও চিনতে পারে না কাউকে। এই যদি পুরাতন জীর্ণ বাড়ীর প্রকৃতি হয় তবে মানুষের প্রকৃতি আরও কত রহস্যময় সহজেই অনুমেয়। তার মস্তিষ্কের মধ্যে যুগে-যুগান্তরের স্মৃতি অহল্যার মতো পাষাণীভূত, ইন্দ্রপ্রস্থ মহেঞ্জদাড়ো হরাপ্পার চেয়ে প্রাচীনতর স্মৃতির ভাণ্ডারী তারা। মহেন্দ্রের

অজ্ঞাতসারে তার অবচেতনার পর্দায় ক্ষণে ক্ষণে সেই সব স্মৃতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্নভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এ যেন সিনেমার রীল অনর্গল গতিতে দ্রুত খুলে যাচ্ছে অর্থহীন অসংলগ্নভাবে।

ঐ যে ঘোড়সোয়ার একাকী ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে আমবাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লো—এখানেই শত্রু শিবির। কিন্তু একই বন্দুকের গুলী এসে আঘাত করলো কেন পিছন থেকে--ওদিকে তো মিত্রপক্ষ। কিন্তু পিছন ফিরে দেখে রহস্য উদ্ধার করবার আগেই ঘোড়ার পিঠ থেকে টলে পড়ে গেল।

অন্তহীন মাঠের মধ্যে একান্তে এক রাজপুরী। হাজার মজুরের সঙ্গে মাটি খুঁড়ে লাল রঙের পাথর উদ্ধার করে পরিষ্কার করছে—আর একজন মজুর মাথায় করে নিয়ে গিয়ে খাড়া একটা স্তম্ভ তৈরি করছে—এই কদিনেই লম্বা গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। একটু কাজে বিরতি দিয়েছে কি হঠাৎ পিঠে এসে পড়লো প্রহরীর কোঁড়া। আবার লেগে গেল পাথর ঘষতে। রাজার বিজয় স্তম্ভ অনেক অসহায়ের দুঃখের মশলায় গড়ে ওঠে।

কালো কালো নিরেট কালো, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় এমন কালো, এ যেন স্মৃতির কালো, স্লেট পাথর। এ যেন সিনেমার রীলে ছবিগুলো মুছে গিয়েছে, নয় ওঠেনি। ঐ কালোর আড়াল দিয়ে কত যুগ-যুগান্ত পেরিয়ে গেল, কত লোক লোকান্তর।

ছোট ছোট ঘোড়ায় চড়ে গৌরবর্ণ উন্নতদেহী পশুচর্মে আবৃত ঐ যে কারা দ্রুত ছুটে আসছে, অসংখ্য অগণ্য সম্মুখে তাদের কালো অরণ্যের যবনিকায় আচ্ছন্ন বৃহৎ বিশাল বিচিত্র ভূখণ্ড। ঐ মহাব্যূহের মধ্যে রয়েছে সে, রয়েছে তবে অচিহ্নিত, সমুদ্রে যেমন জল বিন্দুটি।

মহা অরণ্যের মাঝে ছোট একটি নদী, জলে কালো আভা, চারদিকের গাছের ডালের লতায় লতায় লাল নীল হলুদ বেগুনী ফুলের পসরা। একটি গাছের নিভৃত শাখায় দুটি পাখী আবহ করছিল, হঠাৎ একি, তীক্ষ্ণধার শর এসে আঘাত করলো। সঙ্গীটি লোষ্ট্রখণ্ডের মতো নদীর জলে পড়ে ভেসে চলে গেল স্রোতের মুখে। করুণ কর্কশ কণ্ঠে আকাশ বিদীর্ণ করবার চেষ্টায় সে বৃথা পাখা ঝাপটে মরতে লাগলো।

অন্ধকার, অন্ধকার কোটি কোটি বৎসরের অন্ধকার গালিয়ে ঢালাই করা অন্ধকার।

অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন সিনিয়ার

সার্জেন। তাঁর গাম্ভীর্য দেখে ভীত কণ্ঠে চৌধুরী শুধালো, তার রুগী কেমন আছে।

অপারেশন সাকসেসফুল বলে জুতো জোড়ায় মসমস শব্দ তুলে ডাক্তার দ্রুত প্রস্থান করলেন।

পুনর্বিবাহ

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে চরাচরে কারণ ছাড়া কার্য ঘটে না, অথচ এই ক্ষুদ্র সংসারে নিত্য নিয়ত বিনা কারণে কার্য ঘটছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত চাই? কত চান? এ বছরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ নানা কারণে বন্ধ ছিল, পড়াশোনা হয়নি বললে কম বলা হয়, অথচ দেখুন, এবারে পরীক্ষায় শতকরা একশো জন পাস, নিরানব্বই জন প্রথম বিভাগে। কার্যের সঙ্গে কারণ মিলল কোথায়? আবার দেখুন, যতই আমাদের জাতীয় ঐশ্বর্য বাড়ছে, ততই কমছে আমাদের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য। কার্য-কারণে মিল পেলেন কি? আরও দেখুন, বইয়ের বাজারে বড়ই মন্দা, আর চলে না, এবারে ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে বাড়ি যেতে হবে অথচ নিত্য নতুন নূতন প্রকাশক আত্মপ্রকাশ করছেন কোন্ সাহসে! কার্য তো দেখছি, কারণটা কোথায়? অতদূরের ঘটনায় প্রয়োজন কি, এই গল্পর নায়ক-নায়িকা অশেষ ও সীমন্তিনীর কাণ্ডটা দেখুন না কেন। কারণ যদি খুঁজে বের করতে পারেন, তবে আর অকারণে আপনাদের জ্বালাতন করব না।

অশেষ ও সীমন্তিনীর বিবাহে কোন প্রকার বাধা ছিল না, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক কোন রকম বাধা নয়। তারা বয়ঃপ্রাপ্ত, সবর্ণ, উপার্জনশীল, সুচরিত্র ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন। এক কথায় এমন পাত্র-পাত্রী হাজার বিজ্ঞাপন দিয়েও জোটে না। উভয়ের পিতৃপক্ষ সাগ্রহে লুফে নেয়। অথচ কোন কারণের প্রেরণায় তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় এসে রেজিস্ট্রি আইন মতে বিবাহ করে ফেলল? কেন? স্বয়ং প্রজাপতি তাঁর দুই পক্ষ সঞ্চালন করে এবং স্বয়ং কন্দর্প তাঁর পঞ্চবাণ উজাড় করে দিয়ে গবেষণা চালালেও কারণ খুঁজে পাবেন না। যখন দেবা না জানন্তি, মানুষের সাধ্য কি? কেন তারা এমন সংসার-বহির্ভূত কাণ্ড করতে গেল বলুন? আর তা যদি না পারেন, তবে আমার কথা শুনুন—মাঝে মাঝে কারণ ছাড়া কার্য হয়,

বলেই দুর্ভর চ্যবনপ্রাশ সত্ত্বেও সংসারটা এখনো একেবারে দুঃসহ হয়ে ওঠে নি।

বলছি মশাই, কারণ খুঁজবার চেষ্টা করবেন না, তার চেয়ে গল্পটা শুনুন।

ওরা আগেই বাড়ি ভাড়া করে, ঝি-চাকর নিযুক্ত করে, সংসার চালাবার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে রেখে তবে রেজিস্ট্রি-অফিসে গিয়েছিল, এমন কি দলিলে স্বাক্ষর করতে পারে তেমন সাক্ষীও নেয় নি। প্রত্যেক সরকারী অফিসে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত সাক্ষী মেলে, তারাই দলিলে সই করল। তারপরে অফিসের বাবুদের মিষ্টিমুখ করবার জন্যে গোটা দশেক টাকা দিয়ে ট্যাক্সিযোগে নূতন বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী এসে পৌঁছুল। ওদের মত হচ্ছে, বিবাহটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার জন্যে এত ঢাক-ঢোল নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ-ভূরিভোজনের ব্যবস্থাটা অপব্যয় না হলেও, অনাবশ্যক। এমন কি তারা কালরাত্রি প্রথাটাও মানল না। সেই রাতেই ফুলশয্যা। তবে তাকে ফুলশয্যা বলা যায় কিনা সন্দেহ, যেহেতু শয্যার ধারে-কাছেও ফুলের নাম-গন্ধ ছিল না। অশেষ বলে, ফুলে বিছানা নোংরা হয়, সীমন্তিনী বলে, পিঁপড়ে কামড়ায়। আহারান্তে নব বর-বধূ শয্যাগ্রহণ করলে অশেষ যখন বাহুবন্ধনে আকর্ষণ করল সীমন্তিনীকে, সীমন্তিনী আত্মসংবরণ করে নিয়ে ছিটকে উঠে শয্যাত্যাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল, অশেষ হতবুদ্ধি।

সীমন্তিনীর আসতে দেরী দেখে অশেষ বাহিরে গিয়ে দেখে সে চেয়ারে বসে রেলিংয়ের উপর মাথা রেখে চুপ করে আছে। অশেষ বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি, হঠাৎ অসুখ-বিসুখ করল নাকি! একটু পরে তার পিঠে হাত রাখল। বলল, ঘরে চল! সীমন্তিনী ঘরে এসে বিছানায় না শুয়ে ইজি-চেয়ারে বসল। অশেষ বলল, কি হল, ওখানে বসলে কেন, বিছানায় এস। সীমন্তিনী না উত্তর দিল, না উঠল।

বিয়ের পরে স্বামীর শয্যায় আসতে সীমন্তিনীর এই অনিচ্ছা অশেষকে ভাবিয়ে তুলল। এ রকম অবস্থায় সাধারণতঃ যে সন্দেহ লোকে করে, তা করবার অবকাশ একেবারেই ছিল না সীমন্তিনীর বিষয়ে। অশেষ জানত সীমন্তিনীর কোন পিছু টান নেই, পাঁচ-ছ বছরের পরিচয়ের মধ্যে আর কোন পুরুষের প্রতি সীমন্তিনীর যে টান ছিল—এমন সন্দেহ কখনো হয় নি। আজ বিকেলবেলাতে যখন তারা ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে ফিরছিল, তখনো সীমন্তিনীর মুখ প্রফুল্ল ছিল, যেমন বরাবর প্রফুল্ল থাকে সে। এখন

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল সেই সুন্দর মুখের উপরে অজ্ঞাতপূর্ব বিষাদের সূক্ষ্ম কালো একখানি ছায়া। হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন বুঝতে পারে না অশেষ। সে অবশ্য শুনেছে এবং পড়েছে যে নারীর মন চিররহস্যময় বস্তু, মহাকবি ও বড় বড় দেবতারা তার তল পান না। কিন্তু সেটা যে হঠাৎ সীমন্তিনী সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে, কখনো ভাবে নি অশেষ। সে অবাক হয়ে বসে থাকে বিছানার উপর। অদূরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে তেমনি অবাক হয়ে বসে থাকে সীমন্তিনী।

সীমন্তিনী নিজের মনোভাব বিশ্লিষ্ট করে ঠিক বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না, তবে গল্প-লেখকের বুঝতে বাধা নেই। তার মনে হল, বিবাহ-দলিলে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও তাদের যেন বিয়ে হয় নি, আর বিয়ে যদি না হয়ে থাকে, অশেষের প্রণয়িনী হলেও তার পত্নী সে নয়। পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয় এই এই তিনধাপে বিবাহ সংস্কার পদক্ষেপ করে। প্রথম দুটো ধাপ তারা এক সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু শেষেরটা হল কই! ওই যে কলকাতার একটা রাস্তায় জীর্ণ একটা বাড়িতে নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে ঢুকল, তারপরে তার জেরার উত্তরে ওঁকে আমি স্বামী বলে গ্রহণ করলাম, অশেষ বলল আমি একে স্ত্রী বলে গ্রহণ করলাম, তারপরে খানকতক কাগজে খস খস করে দুজনে সই করল, ব্যাস, এই কি বিবাহ হয়ে গেল! তখন মনে হয়েছিল বটে আইনের চোখে স্বামী-স্ত্রী হল, কিন্তু এখন শয্যায় এসে শুলে অশেষ যখন তাকে কাছে আকর্ষণ করল, তার মনে হল যেন কোন পরপুরুষের কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। না না ছিঃ, হতেই পারে না, তাই সে উঠে চলে গেল বারান্দায়। নিজের মনটাকে এমন চুলচেরা করে সে বুঝেছিল কিনা জানি না, তবে মোটের উপরে ভাবটা এই রকম।

ঘড়ির পায়ে পায়ে রাত বেড়ে চলল। শহরের ক্ষীয়মান কোলাহলের উপরে নিঃস্তব্ধতার পর্দা আরেকটু ঘন হয়ে নামল, আর এদিকে দুটি সদ্যবিবাহিত নর-নারী স্থাণু মূর্তির মত নীরবে যে যার স্থানে উপবিষ্ট হয়ে রইল। কারও নিদ্রা আসে নি, তবে তন্দ্রা এসে থাকলেও থাকতে পারে। তন্দ্রা যখন ছুটল, তারা দেখতে পেল ঘরের মধ্যে ভোরের আলো পড়েছে, আর আশেপাশের গাছের পাখিগুলো অর্থহীন কাকলি শুরু করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সীমন্তিনী অশেষকে চায়ের টেবিলে ডাকদিল। সে সীমন্তিনীর

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে রাত্রের সে বিষণ্ণতা নেই সে মুখ হাসির অব্যক্ত আভায় চিরপ্রফুল্ল। অশেষ শুধাল, সীমা, কালকে রাতে কি হয়েছিল বলবে আমাকে ?

সে বলল, অবশ্যই বলব, কারণ সেকথা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলা চলে না।

অশেষ ভাবে, এ তো সেই চিরদিনের সীমন্তিনী, যেমন আজ পাঁচ বছর-সাত দেখছি। তবে কাল রাত্রিটা যেন সত্যিই কালরাত্রি।

আগেই বলেছি, বিয়ের কোন সংস্কার ওরা মানেনি বলে বাসরের রাত ও কালরাত্রি দুই-ই বাদ দিয়েছিল।

অশেষ বলল, কখন বলবে ?

তার উত্তরে সীমন্তিনী জানাল, ইচ্ছে তো এই মুহূর্তে বলি, তবে কি জান, সমস্ত সুতোগুলো এখনও মনের মধ্যে গুছিয়ে তুলতে পারি নি।

অশেষ বলে, কালকে রাতে যেমন নিদ্রা হয়েছে, আজকের আহারটাও সেই রকম হবে নাকি ?

সীমন্তিনী হাসে, না, সে ভয় নেই, তোমার ভোজ্যে একটি পদও বাদ পড়বে না।

এবারে ওদের সম্বন্ধের পটভূমি সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বলা আবশ্যক। বলা আবশ্যক, তবে বলা বাহুল্য। কেমন করে দুটি অপরিচিত যুবক যুবতী ধীরে ধীরে নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়, আবার কেমন করে সেই নৈমিত্তিক আকর্ষণ নিত্য হয়ে দাঁড়ায়, কেমন করে একটি লোক নিখিল ভুবন পূর্ণ করে তোলে আবার সেই লোকটির অনুপস্থিতিতে নিখিল ভুবন শূন্য বলে মনে হয়, দুটি চোখ হাজার হাজার চোখের মধ্যে বিশিষ্ট দুটি চোখের সন্ধান করে, কেমন করে এই চার চোখে অকথিত বাণী বর্ষিত হতে থাকে, দুজোড়া ওষ্ঠাধরে কেমন করে অকারণে হাসি চমকে ওঠে—এসব ব্যাপার তত্ত্ব হিসাবে অজ্ঞেয় হলেও ঘটনা হিসাবে সুপরিজ্ঞাত। আদি কবি থেকে বর্তমান কবিগুরু পর্যন্ত সবাই এ রহস্যের তল সন্ধান করেছেন, আর যতদিন মানুষ রোবট-এ পরিণত না হয়, অনাগত-কালের কবিরা সে সন্ধানে নিযুক্ত থাকবেন। আমি সামান্য লেখক, তাই পূজা সংখ্যার সম্পাদকের তাড়ায় বিব্রত, আমি কি করে বোঝাব। সময় সঙ্কীর্ণ, সাধ্য সঙ্কীর্ণতর। অশেষ ও সীমন্তিনীকেও এই সমস্ত প্রক্রিয়ার

ভিতর দিয়ে শনৈঃ শনৈঃ যেতে হয়েছে। পরিচয় ও প্রণয়ের দুটো ধাপ অতিক্রম করেছে তারা এ কথা আগেই জানিয়েছি, বিবাহের ঘাটে এসেই তাদের সম্বন্ধ বানচাল হওয়া—কেন এমন হল ? আজকাল তো রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহের সংখ্যা অবিরল। তারা তো প্রথম রাত থেকেই স্বামী স্ত্রী হিসাবে দিব্যি বসবাস করছে, তবে এদের ক্ষেত্রে, কিংবা বলা উচিত সীমন্তিনীর ক্ষেত্রে এমন ব্যতিক্রম হল কেন ? আসল কারণটা তার স্বভাবের মধ্যে নিহিত।

ওরা দুজন পরিচয়ের প্রথম ধাপে কলকাতার রাস্তায় একত্রে বেড়িয়েছে। পরিচয় আরেকটু ঘনিষ্ঠ হলে ট্যাক্সি চেপে কলকাতার রাস্তায় অকারণে পাক খেয়েছে, অনেক সময় দুজনে প্রিন্সেপ ঘাটে ঘাসে ঢাকা ময়দানে পায়চারী করে বেড়িয়েছে, আবার কখনও বা গঙ্গার ধারে বেঞ্চিতে বসে চিনেবাদাম ভেঙে দুজনে কাড়াকাড়ি করে খেয়েছে। তারপরে সীমন্তিনীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অশেষ যখন বাড়িতে ফিরেছে, তখন সহস্র দীপালোকিত কলকাতা শহর তার চোখে ঘোর অন্ধকার। সীমন্তিনী সম্বন্ধেও এই মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। এটাই বোধ করি দ্বিতীয় ধাপ, অর্থাৎ প্রণয়।

একদিন, এই প্রথম অশেষ সীমন্তিনীর হাতখানা নিয়ে চুমো খেলো। প্রথমটাই প্রধান বাধা, তার পরে নিত্য। কিন্তু কোনদিন সীমন্তিনী সেভাবে প্রতিদান দেয় নি। অশেষের মনে হয়েছিল এটা মেয়েদের স্বাভাবিক সঙ্কোচ—একটু জোর করতে হয়। তাই সে নিজেই হাতখানা তার ঠোঁটের কাছে এগিয়ে দিল। সীমন্তিনী সন্তর্পণে সেই হাতখানা নিয়ে অশেষের কোলের উপরে স্থানান্তরিত করল। তার ব্যবহারে জগৎটা শূন্য মনে হল অশেষের। কিন্তু মূঢ় পুরুষ বুঝতে পারল না, পরদিন কেমন সুকৌশলে কুশলী নারী তার চুম্বনটি সংগ্রহ করে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে সযত্নে সুরক্ষিত করল। ঘটনাটা এই। সেদিন তারা পার্ক স্ট্রীটের একটি রেস্তোরাঁ থেকে চা-পান শেষ করে ট্যাক্সিতে এসে চাপলে সীমন্তিনী তার ছোট্ট শুভ্র রুমালখানি অশেষের হাতে দিয়ে বলল, তোমার ঠোঁটে কি লেগে রয়েছে মুছে ফেল। অশেষ তার রুমালখানি নিয়ে খাদ্যকণা মুছে ফেলতে সীমন্তিনী তাড়াতাড়ি রুমালখানা নিয়ে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরে ফেলল ব্যাগের মধ্যে।

অশেষ বলল, রুমালখানা বাড়িতে গিয়ে কেচে নিও।

সীমন্তিনী সংক্ষেপে বলল, হুঁ, এবং তারপরে নির্বোধ পুরুষের দিকে তাকিয়ে যে প্রচ্ছন্নপ্রায় হাসিটি তার ঠোঁটে খেলে গেল, সেটা চোখে পড়ল না

অশেষের। পুরুষের তারা-সন্ধানী চোখ ঘরের প্রদীপ দেখতে পায় না। সীমন্তিনী এত কৌশলে এত যত্নে যা সংগ্রহ করল, তা কি বাড়ি গিয়ে ধুয়ে ফেলার জন্যে!

সীমন্তিনীর মনে পড়ে কতদিন অশেষের ঘনিষ্ঠ ওষ্ঠাধরকে ফিরিয়ে দিয়েছে, সরিয়ে নিয়েছে নিজের মুখ। কতবার অশেষের প্রসারিত হাত ধীরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে—আকাঙ্ক্ষিত চুম্বনটি মনের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে। পরে বাড়ি ফিরে একা বসে ভেবেছে, কেন এমন করল, রাতে বিছানায় শুয়ে বালিশ ভিজিয়ে দিয়েছে, ভেবেছে কেন সে এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে অশেষের সামান্য প্রার্থনাকে। অশেষের ভালবাসা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সে, তারা বিয়ে করবে স্পষ্টাক্ষরে পরস্পরকে জানিয়েছে। তবু কেন এমন করে সে! এই 'কেন'টির একমাত্র উত্তর যা সে খুঁজে পায়—এক কথায় তার নাম সংস্কার। অনেকদিনের সংস্কার, অনেক জন্মের। জন্ম-জন্মান্তর থেকে সেই সংস্কার রক্তধারা বেয়ে বেয়ে পৌঁচেছে এ জন্মে। তাকে কী অত সহজে অস্বীকার করা যায়? তখনি মনে পড়েছে, কেন, আইনতঃ তারা এখন স্বামী স্ত্রী, তবে কেন কালকে রাতে নিজেকে ছিনিয়ে নিল স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে? তখনি সেই চিরাগত সংস্কার বলেছে—একে কি বিয়ে বলে? রেজিস্ট্রি-অফিসে যে অনুষ্ঠান ঘটল, সে তো উভয়ের প্রেমের স্বীকৃতি মাত্র। সে-স্বীকার তো অনেকদিন হল পরস্পরের কাছে—নূতন আর এমন কি। তার বুদ্ধি বলে, আইন যখন স্বীকার করে নিয়েছে তখন আর আপত্তি কেন? মন বলে, আইনের স্বীকারটাই সব নয়। এই সেদিন যে আইন পাস হয়েছে তার শিকড় তো এখনো প্রবেশ করেনি মনের গভীরে, উপরে উপরে আছে মাত্র। বুদ্ধির সিদ্ধান্তে মনের সিদ্ধান্তে মেলে না। এ দুয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে তার সমস্ত অস্তিত্ব। এই তো দুদিন আগেও ভেবেছিল, রেজিস্ট্রিকৃত বিয়ে হয়ে গেলেই অনায়াসে আত্মসমর্পণ করতে পারবে অশেষের কাছে। সেই আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তার দেহটা ব্যথায় আগ্রহে টন টন করতে থাকে। মন বলে, সাবধান, মন জানায়, এখন যদি আত্মসমর্পণ করবে তবে এতকাল করিনি কেন? মন বলে, গোটা দুই স্বাক্ষর করলেই কি সব বাধা দূর হয়? বুদ্ধি বলে, শালগ্রাম শিলার কাছে কয়েকটা দুর্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র পড়লেই বুঝি সব বাধা খণ্ডিত হয়ে যেত? মন বলে, তার সংস্কার যে চলে গিয়েছে অনেক নীচে, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে,

আর স্বাক্ষর দুটো ভাসছে জলের উপরে কচুরিপানার মত। ওর কোন স্থায়িত্ব নেই, জলের তোড়ে কোথায় ভেসে চলে যাবে।

অশেষ আহারান্তে অফিসে গেল। সেখানে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবের কাছে এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হল। সবাই শুধায়, শুনলাম বিয়ে করেছ। সত্যি নাকি? তা এত গোপনে কেন? কেউ বলে, হঠাৎ রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বসতে গেলে কেন, গোলমাল বাধিয়ে ছিলে নাকি? আবার কেউ কেউ বা স্পষ্টাক্ষরে বলে, আজকার 'পনেরো পয়সার তিনটি'র দিনে সমস্ত গোলমালের প্রতিকার তো সরকার বাহাদুর করেই রেখেছেন। নানা জনের অমূলক সন্দেহের তাড়না সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ফিরে আসে অশেষ। সেখানে এসে দেখে তার জন্যে অপেক্ষা করছে সীমন্তিনীর হাতে লেখা চিঠি। চাকর জানাল, বউদি চিঠিখানা রেখে, আপনার রাতের খাবার তৈরি করে রেখে চলে গিয়েছেন। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে পড়ে অশেষ।

সীমন্তিনী মনের ভাবনাকে যথাসাধ্য প্রকাশ করেছে, তারপরে জানিয়েছে, লক্ষীটি ভুল বুঝো না, তুমি আমার মনের কথা জান, জান যে তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না। কালকে রাতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করেছি, আজকে আর পারতাম না। অথচ এভাবে আত্মসমর্পণ করলে যে শুচিতা এতকাল আমাকে রক্ষা করেছে, তাকে আঘাত করা হত। সংস্কার বড় বাধা। আজ রাতটা কলেজ-হোস্টেলে আমার বন্ধুনী সুপ্রভার কাছে কাটাব, কালকে সকালে আবার আসব। তখন মুখোমুখি কথা হবে—প্রথম লজ্জাটা চিঠির উপর দিয়েই গেল। তোমার সীমা।

আহারান্তে শুয়ে পড়ে অশেষ ভাবতে লাগল। তার মনের মধ্যে যুগপৎ দুঃখ ও আনন্দ। দুঃখটা—যে নূতন সমস্যা তারা দুজনে সৃষ্টি করেছে সেই জন্যে। আর আনন্দের কারণ—সেই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করেছে সেই জন্যে। প্রভেদের মধ্যে—অশেষের লজ্জা বন্ধু-সমাজের ইশারা-ইঙ্গিতে, সীমন্তিনীর লজ্জা তার সংস্কারের গভীরে। অশেষ বুঝল দুটোই সত্য।

পরদিন ভোরবেলা সীমন্তিনী এসে উপস্থিত হল, আর আহারান্তে দুজনে মুখোমুখি কথা হল। তারা স্থির করল রেজিস্ট্রি-কৃত বিবাহ যথেষ্ট নয়। কেননা তাতে লোকের মুখ ও মনের মুখ চাপা দেওয়া যায় না। অতএব—

অতএব যথাশাস্ত্র বিবাহ হল তাদের। 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি

মার্জনীয়' মুদ্রিত পত্র দিকে দিক প্রেরিত হল। ঢোল শানাই বাজল, শালগ্রাম অগ্নি গুরু পুরোহিত এল। স্ত্রী-আচার ও অন্যবিধ আচারে দুজন সমর্থ যুবক-যুবতী নাজেহাল হয়ে গেল এবং সর্বোপরি আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব ভুরিভোজন করল।

তারপরে ফুলশয্যা। এবারে অশেষের আকর্ষণে সীমন্তিনী বাধা দিল না।

পক্ষী রহস্য

যশোর জেলায় গোবিন্দপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। হিন্দু-মুসলমানে মিলিয়ে বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট ঘর লোকের বাস। চাষ-বাস ও সামান্য ব্যবসা তাদের জীবিকা। সুখে-দুঃখে তাদের জীবন চলে। এমন সময়ে একদিন গোবিন্দপুরের লোকে বলল যে দেশের কোন কোন স্থানে সৈন্যদলে হামলা শুরু করেছে। প্রথমে কেউ বিশ্বাস করে নি কিন্তু ক্রমে আর অবিশ্বাস করবার উপায় থাকল না। যশোর ও খুলনা শহর থেকে লোক যাতায়াতে জানতে পারল যে হামলা নয়, খাঁ সাহেবের সৈন্যরা যাকে সম্মুখে পাচ্ছে কচুকাটা করছে। গোবিন্দপুর ভাবল তারা নিরীহ, কোন অপরাধ করেনি, তাদের ভয়টা কি? গোবিন্দপুরের লোকে আর একটু অবহিত হলে বুঝতে পারত তাদের অপরাধের অন্ত নাই। তাদের জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। কিন্তু আর বুঝি চলে না। গাঁয়ের পাশ দিয়েই পাকা বড় সড়ক, সেটা গিয়েছে ভারত সীমান্তের দিকে। সেই সড়ক দিয়ে দলে দলে লোক চলতে শুরু করল, প্রথমে রাতের বেলায়, তারপরে দিনের বেলাতেও। তাদেব জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না, আরও দ্রুত পা চালায়। কেউ কেউ জবাব দেয় গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি। গোবিন্দপুরের একজন শুধাল, অসময়ে গঙ্গাস্নানে! এখন তো কোন পরব নেই। লোকটি বলল, পরব পিছনে আসছে কামান বন্দুক নিয়ে—ভাল চাও তো বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়।

জলে জল বাধে, ভয়ে ভয় বাড়ে। গোবিন্দপুরের অধিবাসীরাও ক্রমে ভীত হয়ে উঠল, আর তারাও দলে দলে গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়ল—ভারত সীমান্ত পার হলে তবে গঙ্গা। দু'চার দিনের মধ্যেই

সে অঞ্চলের আর গ্রামের মত গোবিন্দপুরও জনশূন্যপ্রায় হয়ে উঠল। সবাই যা করছে তাদেরও করা আবশ্যক, কাজেই তারা পথে নামল।

এখন গোবিন্দপুরের সরল অধিবাসীরা যদি রাজনীতির অ আ ক খ জানত তবে জানতে পারত তাদের অপরাধের অবধি নাই। তারা মুজিবর রহমানের দলকে ভোট দিয়েছিল নইলে সে দল শতকরা অষ্টানব্বইটা ভোট পায় কেমন করে! ঐ এক অপরাধেই শত অপরাধ। এ হেন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে নবাব-ই-মুলুক মুল্লুকের নবাব ইয়াহিয়া খাঁ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদল লেলিয়ে দিয়েছে—বাঙালী মাত্রকেই খুন করবার হুকুম দিয়েছে, তা সে হিন্দু-মুসলমান যাই হোক না কেন, বাংলা ভাষা যে বলে সে-ই মুজিবর রহমানের দলে। এ পর্যন্ত সমসাময়িক ইতিহাস, সকলেরই সুবিদিত। কাজেই তাতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই। আমাদের গল্পটি যাদের নিয়ে এবার তাদের পরিচয় দেওয়া যাক।

॥ ২ ॥

গোবিন্দপুরের মধ্যপাড়া নামে অঞ্চলে পাশাপাশি দুই ঘর প্রতিবেশী ছিল। একজনের নাম বৈষ্ণবচরণ দাস, অপরের নাম কালিকানন্দ রায়। একজন যেমন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব, অপরে তেমনি বা ততোধিক নৈষ্ঠিক শাক্ত। একজন কানে অঙুল দেয় কামাক্ষ্যা কালীঘাট শুনলে অপরে দেয় নবদ্বীপ বৃন্দাবন শব্দে। ভক্তির প্ররোচনায় দু'জনে পরস্পরের পরম শত্রু, মুখ-দেখাদেখি নেই। তবে তাদের দু'জনেরই মনে এক এক বিষয়ে দুঃখ। বৈষ্ণবচরণ স্থির করে রেখেছিল যে তার পুত্র হলে সুদাম নামকরণ করবে, একাধিক হলে নামকরণ করবে কানাই-বলাই। আর কালিকানন্দ অনাগত পুত্রের নাম স্থির করে রেখেছিল বগলাচরণ, আর যদি একাধিক হয় তবে কার্তিক আর গণেশ। তবে দুঃখের বিষয় এই যে তাদের কারো সন্তান হল না, না পুত্র না কন্যা। ভক্তদ্বয়ের পূজা ও মানসিকের লোভেও কৃষ্ণ ও কালী বিচলিত হলেন না, তাঁরা না গ্রহণ না বর্জন নীতি অবলম্বন করে উদাসীন হয়ে রইলেন, কারো ঘরে সন্তান প্রেরণ করলেন না। অবশেষে দু'জনেই সন্তান লাভের আশায় হতাশ হয়ে পড়ল। তখন বৈষ্ণবচরণ চেঙুটিয়ার হাটে গিয়ে একটি টিয়া-পাখি কিনে আনল আর তাকে শেখাতে লাগল 'রাধাকৃষ্ণ বল বাছা রাধাকৃষ্ণ বল'। পাখিটার পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল তাই অবিলম্বে সেই বুলি আয়ত্ত করে নিয়ে তারস্বরে বলতে আরম্ভ করল, রাধাকৃষ্ণ বল বাছা রাধাকৃষ্ণ বল।

আর সেই অশ্রাব্য ধ্বনি তপ্ত লৌহশলাকার মত পার্শ্ববর্তী শান্ত প্রতিবেশীর কর্ণরন্ধ্রে গিয়ে প্রবেশ করল। দু'একদিনের মধ্যেই প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করে ফেলল কালিকানন্দ। একদিন সে চেঙুটিয়ার হাটে গিয়ে একটি ময়না কিনে আনল আর তাকে শেখাল 'কালী কালী বল শালারা কালী বল'। গঞ্জিকাপ্রসাদে কালিকানন্দর গলাটি ভাঙা ভাঙা আর কর্কশ, কাজেই প্রভুর দৃষ্টান্তে ময়নাটির গলাও সেই রকম হল। পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতি তারও ছিল, কাজেই অবিলম্বে সেও হেড়েল গলায় মধ্যপাড়া প্রতিধ্বনিত করে চলতে শুধু করল, কালী কালী বল শালারা কালী কালী বল। বৈষ্ণবচরণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রথমে দু'জনেই মনে করেছিল পাড়া ছেড়ে উঠে চলে যায়—কিন্তু অনেক দিনের পৈতৃক পাকা কোঠা বাড়ি—মন সরল না। অগত্যা দুইজনেই পাখি দুটোকে ছোলা-ছাতু ক্ষীর-সর আরও বেশি পরিমাণে খাওয়াতে লাগল যাতে কণ্ঠস্বর অধিকতর জোরাল হয়ে উঠে প্রতিবেশীর উপরে ইষ্টনামের ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ করতে পারে। আমাদের গল্প এই দুই ব্যক্তিকে নিয়ে, কিংবা আরও খুঁটিয়ে বলতে গেলে এই দুই ইষ্টকবর্ষী বিহঙ্গদ্বয়কে নিয়ে। শুধু নাম শক্তির বলে এই দীক্ষিত পাখি দুটি কি ভাবে ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যদলকে নাজেহাল করেছিল তারই বিবরণ আমাদের গল্পটি।

ক্রমে গোবিন্দপুর জনশূন্য হয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে মধ্যপাড়াও। কেবল অবশিষ্ট থাকল নৈষ্ঠিক প্রতিবেশীদ্বয়। গ্রামত্যাগীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বৈষ্ণবচরণ বলত, রেখে দাও তোমার খাঁ সাহেবের সৈন্যদল, সাধ্য কি তারা পীঠস্থানে প্রবেশ করে—তারপরে সুর করে গান ধরত 'ম্লেচ্ছ নিবহনিধনে কলয়সি করবালম্'। অবশেষে সমভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে কালিকানন্দ বলত, কালকে রাতে স্বপ্ন দেখেছি করালবদনী খাঁড়া হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার পরে বলত, কালী কালী বল রে মন। প্রভুর কণ্ঠস্বরে উৎসাহিত হয়ে ময়না চীৎকার করে উঠত, কালী কালী বল শালারা কালী কালী বল। না, খাঁ সাহেবের সৈন্যদল গোবিন্দপুরে প্রবেশ করতে পারেন না, অকারণে লোকে পালাচ্ছে— ভক্তির তেমন জোর থাকলে বাড়িতে নিশ্চিন্তে বসে থাকত। কিন্তু নিশ্চিন্তে আর বসে থাকা বুঝি সম্ভব হয় না। জনশূন্য গোবিন্দপুরে কামানের শব্দ শ্রুত হল। প্রথম কিছুক্ষণ তারা বেশ নিশ্চিন্ত ছিল, অবশেষে সেই বুম্-বুম্ আওয়াজকে যখন আর মুরলীধ্বনি বা ডাকিনী-যোগিনীর গর্জন বলে মনে করা চলল না, তখন একদিন সন্ধ্যায় অসম্ভব সম্ভব হল।

বৈষ্ণবচরণের বাড়িতে কালিকানন্দ এসে হাঁড়িসম্ভূত কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করল, বলি ভায়া হে, কি করবে ?

ভক্তদের একটি নিত্য লক্ষণ এই যে তারা ভাঙে তবু মচকায় না। বৈষ্ণবচরণ বলল, ভাবছি একবার শ্রীপাট নবদ্বীপধাম দর্শন করে আসি।

কালিকানন্দ বলল, মন্দ বল নি, অনেকদিন কালীঘাটে গিয়ে মাকে দর্শন করা হয় নি, তিনি প্রায়ই স্বপ্নে দেখা দিচ্ছেন, মা আগ বাড়িয়ে আর কত দর্শন দেবেন। ভাবছি একবার কালীঘাটে গিয়ে মাকে দর্শন করে আসি।

সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে উভয় পক্ষের গৃহিণীরা বলল, কিন্তু পাখি দুটোর কি হবে ? দেখা গেল যে ভক্তির প্রেরণায় বৈষ্ণবচরণ ও কালিকানন্দ একই সমাধানে উপনীত হয়েছে। তারা সমস্বরে বলে উঠল, যাঁর জীব তিনি দেখবেন, তুমি আমি কে ? খুব সম্ভব গৃহিণীদ্বয়ের ভক্তি স্বামীদের ভক্তির মত প্রবলা নয়—তাই তারা জীব-স্রষ্টার সহায়তাকরণ উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে ছোলা ছাতু জল প্রভৃতির বরাদ্দ করেছিল। আর পাখি দুটোকে খাঁচা থেকে বের করে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে স্বামীদের সঙ্গে নবদ্বীপ, কালীঘাট দর্শনে ভারত সীমান্তের দিকে যাত্রা করল। তারা নিরাপদে গিয়ে পৌঁছল, এবারে আমাদের গল্প আরম্ভ করি।

॥ ৩ ॥

ইতিমধ্যে খাঁ সাহেবের ফৌজ বাংলাদেশকে শিক্ষা দেওয়ার কাজে উদ্যত হল। বাংলাদেশে আর যাই হোক শিক্ষাদাতার কখনো অভাব হয়নি, সেই বখতিয়ার থেকে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত অসংখ্য শিক্ষক এদেশে শুভাগমন করেছে, এবারে জঙ্গী-জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ। তার ফৌজ গ্রামের পরে গ্রামে শান্তিস্থাপন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। যথাকালে মেজর সুলতান খাঁ গোবিন্দপুর অঞ্চলে এসে মাঠের মধ্যে তাঁবু ফেলল। তার হুকুমে সুবেদার দিল মহম্মদ ও ম্রেধম খাঁ গোবিন্দপুরের দিকে অগ্রসর হল।

তারা গ্রামে প্রবেশ করে অবাক হয়ে গিয়ে দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল—বড়া তাজ্জব কি বাৎ, সব বিলকুল ঠাণ্ডা। তখন তারা বলল, চল এবারে মেজর সাহেবকে গিয়ে খোসখবরটা দেওয়া যাক। যখন তারা ফিরছে এমন সময়ে তাদের কানে এল কে যেন বলছে, রাধাকৃষ্ণ বল ভাই রাধাকৃষ্ণ বল।

চমকে উঠে তারা ভাবল, কোই আদমি ছিপকে হ্যায়। তাদের বিস্ময় কাটতে না কাটতেই আবার তাদের কানে এল, এবারে তার স্বরে আর ভাঙা

ভাঙা গলায়, কালী কালী বল শালারা কালী কালী বল।

আগেই বলেছি যে পাখি দুটোকে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছিল মালিকরা, আর পাখি দুটো উড়ে ঘরের মধ্যে নানাস্থান থেকে ঐ রব করছিল, তাতেই মনে হল, মানুষ একটা নয়—ঐ বাড়ি দুটো বোঝাই মানুষ রয়েছে।

এত আদমি, তারা দুজনে কি করবে! দিল মহম্মদ বলল—আমি তো খাস রুস্তাম আছি, কিন্তু একেলা কি করব!

ব্রেধম খাঁ বলল, চল, তুরন্ত গিয়ে মেজর সাহেবকে ফৌজ পাঠাতে বলি গিয়ে।

তখন তাদের গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, ছুটতে ছুটতে মেজর সুলতান খাঁর কাছে এসে সমস্ত নিবেদন করল, বলল, হুজুর, সব তো বিলকুল ঠাণ্ডা, লেকিন দোঠো কোঠি ভর্তি জঙ্গী আদমী ছিপকে আছে।

মেজর মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে রেখে বলল, উল্লু, তাদের শায়েস্তা করলে না কেন?

দিল মহম্মদ বলল, ইচ্ছা তো ছিল, কিন্তু কোঠির দরবাজা বন্ধ।

কত আদমি হবে?

ব্রেধম খাঁ বলল, কোই বিশ পঞ্চাশ হোবে।

মেজর বলল—চল যা'চ্ছ, এই বলে শ'খানেক সিপাহি নিয়ে অগ্রসর হতে উদ্যত হলে ওরা দুজনে বলল, হুজুর একঠো কামানভি লেনা আচ্ছা হ্যায়, কোঠি ভাঙতে হবে।

কথাটা মন্দ নয়—তাই সঙ্গে একটা কামান চলল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গিয়ে ফৌজ এসে দাঁড়াল অকুস্থলে।

এদিকে লোকের সাড়া পেয়ে উড়ন্ত পাখিদুটো আবার ঐ অশ্রাব্য ধ্বনি শুরু করে দিল।

মেজর বলল, কেবল আদমি নয়—বদ লোক, তা না হলে ঐ সব কথা বলবে কেন? হুকুম দিল, যাও তোমরা বাড়ি দুটোর উপরে গিয়ে চড়াও হও।

কিন্তু যাবে কে?

সকলেই সকলের পিছনে যেতে চায়। তখন মেজর সুলতান খাঁ নিজে চলল, তুম লোক সব আওরৎ হ্যায়, হাম যাতা।

এমন সময়ে দুই বাড়ির নানাস্থান থেকে সেই অশ্রাব্য ধ্বনি উঠল, যা

নাকি শোনাও শুণাহ্—রাধাকৃষ্ণ বল রে ভাই রাধাকৃষ্ণ বল, আর কালী কালী বল শালারা কালী কালী বল।

দুই কানে আঙুল দিয়ে মেজর সরে এসে বলল—ইয়া আল্লা! তারপরে অর্ডার দিল দাগো কামান।

কামান বার কয়েক গর্জন করে উঠতেই বাড়ি দুটোর জানালা দরজা দেয়াল ধ্বসে পড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে দু বাড়ি থেকে দুটো পাখি বের হয়ে নিকটবর্তী আমগাছের উপরে বসল।

কই, ভিতরে তো কোন আদমি নাই! সব গেল কোথায়?

ঐ দলের সঙ্গে একজন রাজাকার ছিল, সে স্থানীয় লোক—সে বলে উঠল, হুজুর এ বাংলাদেশকে জাদু হ্যায়। ঐ দেখিয়ে হুজুর, দুশমন আদমি চিডিয়া হয়ে উড়ে গেল।

সকলে দেখল, সত্যই তো গাছের ডালে একটা টিয়া আর একটা ময়না বসে আছে।

মেজর সাহেব সমস্ত ব্যাপার দেখে বলে উঠল—বড়ি তাজ্জবকা বাৎ, দুশমন চিড়িয়া বন গিয়া হ্যায়। ভাবল এ কি রকম দেশ।

লোক-সমাগমে ভীত হয়ে পাখি দুটো মৌলিক মন্ত্রভেদ ভুলে গিয়ে বিশুদ্ধ পক্ষিসুলভ রব করতে করতে উড়ে গেল। বিজয়ী পাক-সেনা সদর্পে দখল করল বাড়ি দুটো।

কি ছিল বিধাতার মনে

"কি ছিল বিধাতার মনে!" কী যে ছিল বিধাতাও কি জানতেন? সব সময়ে জানতে পারেন? জানেন না সে এক রকম ভালোই, নতুবা অনেকখানি রস উবে গিয়ে বিশ্ব সংসার গণিতের পুস্তকের মতো নীরস হয়ে পড়তো। তাই তিনি ঐটুকু হাতে রেখেছেন, জেনেও জানেন না।

উত্তরমেরুর ভাসমান হিমশিলার রাজ্যে যখন একখানি হিমশিলা শনৈঃ শনৈঃ পুষ্ট হ'য়ে উঠে অতিকায়িক ভীষণতা লাভ করছিল তখন যে স্কটল্যাণ্ডের জাহাজ তৈরির কারখানায় একখানি অতিকায় জাহাজ নির্মিত হচ্ছিল, তাদের ভয়াবহ পরিণাম কে জানতো! বিধাতাপুরুষ যদি বা জানতেন তিনি বেমালুম সমস্ত চেপে গিয়েছেন, আগে একটুখানি আভাস দিলে অনেকগুলি মানুষের প্রাণ রক্ষা পেতো। হিমশিলার সংঘাতে টাইটানিক জাহাজ-ডুবি না হয় একটা বিরল আকস্মিক ব্যাপার। কাজেই সেটাকে নিয়ম না বলে নিয়মের ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা উচিত। তবে কথা এই যে নিয়মের ব্যতি-ক্রমেই নিয়মের অস্তিত্বের প্রমাণ। এখন নিয়মানুগ একটি ঘটনা বিবৃত করতে উদ্যত হয়েছি, যেখানে অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষের ফলে পুরুষ ও নারী দুই-ই ডুবলো। টাইটানিক নিমজ্জনে ডুবেছিল শুধু পুরুষ।

শহরের একই পাড়ার দুই বাড়িতে অনুপম ও অনিন্দনীয়ার বাস। কেউ কাউকে চেনে না। চিনবার কারণ ছিল না, কারণ তাদের পথ শুধু ভিন্ন নয় একেবারে বিপরীতমুখী। তবে কি না "কি ছিল বিধাতার মনে!"

অনুপম যখন গীতা পড়ে, অনিন্দনীয়া পড়ে দি ক্যাপিটাল; অনুপমের খদ্দরের ধুতি যখন খাটো হতে হতে হাঁটুর কাছে এসে ঠেকলো, অনিন্দনীয়ার শাড়ির ঝুল তখন মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রায় ধুলোতে এসে ঠেকেছে। অনুপম যখন ভাবে যে লজ্জা নিবারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি গ্রহণ চুরি; অনিন্দনীয়া জানে অশনে বসনে কৃচ্ছ্রতাসাধন বুর্জোয়া বাতিক; অনুপম যখন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেয় অনিন্দনীয়ার ললিত কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয় ইনকিলাব জিন্দাবাদ। এ পর্যন্ত হয়ে থেমে গেলে গল্প না হ'য়ে বিবৃতি মাত্র হ'তো কারণ এমন তো ঘরে ঘরে ঘটছে। নীরস বিবৃতির মাথার উপরে রত্নাকরের

লাঠির মতো হঠাৎ এসে পড়ে 'কি ছিল বিধাতার মনে', অমনি বিবৃতি হ'য়ে ওঠে গল্প; সংবাদ হয়ে ওঠে কাব্য।

এমন সময় শহরে রাজনৈতিক আন্দোলনের দোলনে ভিতরের উষ্মা বের হয়ে পড়লো। চারদিকে সামাল সামাল রব। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। অনুপম নৈষ্ঠিক কংগ্রেসী আর অনিন্দনীয়া ততোধিক নৈষ্ঠিক কম্যুনিস্ট। আমি ভুললেও পাঠক বোধকরি আগেই বুঝে নিয়েছেন। নিষ্ঠা পুরুষের স্বভাব, ওর বদল হয়। বদল হয় না নারীর নিষ্ঠার, ওটা তাদের প্রকৃতি। স্বামী হোক ধর্ম হোক রাজনীতি হোক সেটাকে ধরে মরণ কামড়ে আঁকড়ে ধরে মেয়েরা। অনিন্দনীয়া বলে রাজনীতি বর্তমান যুগের ধর্ম। অজ্ঞাতসারে চাপান দিয়ে অনুপম বলে ধর্ম বর্তমান যুগের রাজনীতি। দুজনের মতে পথে আচারে আচরণে রাজনীতিতে তো বটেই, আসমান জমিন ফারাক, এমন কি চেহারাতেও। অনুপম দীর্ঘছন্দ সুপুরুষ, রঙটি ফরসা দশজনের মধ্যে চোখে পড়ে। অনিন্দনীয়ার ছিপছিপে গড়ন, দেহে চোখে মুখে কেমন একটা ধারালো ভাব, বিধাতা পুরুষ অসিলতা গড়তে মনের ভুলে যেন তনুলতা গড়ে ফেলেছেন। আর রঙটি। কলাগাছের গর্ভ থেকে প্রথম পাতার মোড়কটি সবে যখন উঁকি মেরেছে, রঙটি তারই মতো। কোন রঙের সঙ্গে নামে মেলে না। অরুণোদয়ের প্রথম আভা নিপুণ বুনুনি বুনলে যেমনটি হয় তারই সঙ্গে যেন কিছু মিল। বাপ মায়ের কাছে কত পাত্র বিবাহের ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছে, কত পাত্রের পিতা বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে গিয়েছে মেয়ের এক উত্তর—না সে বিবাহ করবে না।

বিবাহ বিষয়ক সমস্যা হয়তো আরও কিছুদূর গড়াতো এমন সময়ে শহরে বেধে উঠল আন্দোলন। অনুপম ও অনিন্দনীয়ার নেতৃত্বে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট দল মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, চললো বন্দেমাতরম ও ইনকিলাব জিন্দাবাদের উতোর ও চাপান। দলীয়দের হাতে পতাকা ও নানারূপ জনমনোহর বাণী লিখিত ফেস্টুন নেতাদের হাত শূন্য বোধহয় সময়োচিত নির্দেশদানের উদ্দেশ্যে।

এখন দুটি পরস্পরবিরোধী দল মুখোমুখি এসে পড়লে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এটি নিউটন আবিষ্কৃত কোন নিয়মের অন্তর্গত কিনা জানি না, তবে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধ্রুব নিয়ম বটে। মুহূর্ত মধ্যে ফেস্টুনের মানদণ্ডগুলো রাজদণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করলো, বুঝতে পারা গেল ফেস্টুনের কাপড়খানা বহন

তার গৌণ উদ্দেশ্য। একখানা লাঠি অনিন্দনীয়ার মাথার উপরে উত্থিত হতেই হাঁ হাঁ করো কি, করো কি, আমরা যে অহিংস, বলে অনুপম এগিয়ে গেল, তবে তার মুখের কথা শেষ হতে পারলো না, অহিংস আঘাতও যে মারাত্মক হতে পারে তারই প্রমাণস্বরূপ মাথায় আহত হয়ে অনুপম ধরাশায়ী হল। সে লুপ্তচৈতন্য।

ঘটনার অভাবিত চক্রবর্তনে দুটো দলই অপ্রস্তুত হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কেবল সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে করে অনিন্দনীয়ার কণ্ঠস্বরে ধিক্কার ধ্বনিত হল —এই তোমাদের অহিংসা।

কংগ্রেসদলের নেক্‌স্‌ট ইন কম্যাণ্ড বলে উঠল, অহিংসাতত্ত্ব বোঝা তোমাদের কর্ম নয়। শত্রুর প্রতি অহিংস হতে হবে, এই আমাদের উপর হুকুম। অনুপমদা তো আমাদেব শত্রু নয়।

অহিংসা তত্ত্ব বিচার করবার মতো মনের অবস্থা না থাকায় দুই দলের লোক মিলে অনুপমকে হাসপাতালে নিয়ে চলল, সঙ্গে চলল অনিন্দনীয়া। "কি জানি কি আছে বিধাতার মনে।"

পরদিন হাসপাতালে গিয়ে অনিন্দনীয়া দেখতে পেল অনুপম মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে। সে কিছু ফুল ও ফল নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলি পাশে টেবিলের উপর রেখে সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে একবার চোখ খুলে অনুপম তাকালো, মেয়েটিকে দেখতে পেল তবে চিনতে পারলো বলে মনে হলো না। রোগী আবার চোখ বন্ধ করল, অনিন্দনীয়া দাঁড়িয়েই রইল। অবশেষে বিদায় নেবার ঘণ্টা বাজলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চলে গেল।

পরদিন আবার যথাসময়ে অনিন্দনীয়া ফুল ও ফল নিয়ে উপস্থিত হলো। আজকে রোগীর অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। সে তাকিয়েই ছিল। অনিন্দনীয়াকে দেখেই চিনতে পারলো। শুধালো, আপনি কি কাল এসেছিলেন, এ সব ফুল ফল কি আপনি রেখে গিয়েছিলেন? অনিন্দনীয়ার নীরবতাকে স্বীকারোক্তি ধরে নিয়ে অনুপম বললো সাদাফুল কেন, আপনাদের রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে তো ফুলের রঙ লাল হওয়া উচিত ছিল। তারপরে তার হাতের দিকে তাকিয়ে বললো, আজও এনেছেন দেখছি। কিন্তু কেন? এগুলো কি বিজয়ীর অহঙ্কারের চিহ্ন?

অনিন্দনীয়া একটু হেসে বললো, আপনি আগে সুস্থ হয়ে উঠুন তারপরে না হয় বিচার করা যাবে।

আমার স্বাস্থ্য তো আপনাদের কাম্য হতে পারে না, যে লাঠি মেরে-ছিলেন।

অনুপমবাবু আপনি ভুল করছেন। লাঠি তো মেরেছিলো কংগ্রেসী স্বেচ্ছা-সেবক। খামোকা সে লাঠি মাথা পেতে নিয়ে এই বিপদটি ঘটালেন।

ও লাঠি আমার মাথায় পড়লে একেবারেই শেষ হয়ে যেতাম। কংগ্রেসী-দের মাথা নিতান্ত নিরেট বলেই এ-বারের মতো বেঁচে গেলেন।

অনুপই কিছু বলতে যাচ্ছিল, মেয়েটি বাধা দিয়ে বললো, আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। ইচ্ছে যদি করেন কালকে আবার শুরু করবেন।

কালকেও আবার আসবেন নাকি? কিন্তু কেন? আমার উপর গোয়েন্দা-গিরি করবার উদ্দেশ্যে চোখে চোখে রাখবার ভার আপনার উপরে পড়েছে নাকি?

মেয়েটি হেসে বললো, চোখে চোখে রাখবার ভার বলেই মনে হচ্ছে?

ওকি! চললেন নাকি?

হ্যাঁ ঘণ্টা বেজেছে, যাওয়ার সময় হলো।

তাকে যেতে উদ্যত দেখে অনুপম বললো, যদি রাতের মধ্যে পালিয়ে যাই।

সে কথা নয় পালিয়ে যাবার পরে চিন্তা করা যাবে, অজাকে চললাম।

আবার পরদিন যথাসময়ে মেয়েটি এসে উপস্থিত হলো। আজ তার হাতে ফুল ও ফল ছাড়া অতিরিক্তের মধ্যে কিছু সন্দেশ। সে দেখতে পেল অনুপমের মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হয়েছে আর চুলগুলি খুব ছোট করে ছাঁটা বলে তাকে অত্যন্ত কৃশ মনে হচ্ছে। তার মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো।

সে বললো, কেন খামোকা আমাকে বাঁচাবার জন্যে মাথাটা এগিয়ে দিয়েছিলেন বলুন তো।

সত্য কথা বলতে হলে নবকুমারের ভাষায় উত্তর দিতে হয়। পরের দায় বহন করবার জন্যে অনেকে জন্মগ্রহণ করে।

অনিন্দনীয়া বললো, নবকুমারের স্বীকারোক্তির বাকিটুকু চেপে গেলেন। কেন, তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

অনুপম এবার বললো, একে তো প্রতিদিন আসবার কষ্ট স্বীকার করছেন, তার উপর আবার এই খরচান্ত কেন ?

খরচ যখন হয়েই গিয়েছে তবে না হয় কিছু খান, বলে একটি সন্দেশ অনুপমের হাতে তুলে দিল।

অনুপম সন্দেশটি খেতে খেতে বললো, আপনি কি শুধু দৃষ্টিভোগ করবেন ?

অনিন্দনীয়া হেসে বললো, ভোগের তো সবে শুরু, অনেক ভোগ কপালে বুঝতে পারছি।

বিদায় নেবার সময়ে মেয়েটির হাতে একটি গোলাপ ফুল দিয়ে সে বললো, হাসপাতালের বাগান থেকে সংগ্রহ করেছি আপনার জন্যে।

কেন মিছে কষ্ট করতে গেলেন বলুন দেখি।

আপনি প্রত্যহ করছেন, আমি না হয় একদিন করলাম। কষ্টের ঋণশোধ কষ্ট দিয়ে।

মেয়েটি বললো, বুঝেছি, শোধ করে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চান।

সম্পর্ক তো সবে আরম্ভ হলো। এরপরে আবার যখন মুখোমুখি হবো তখন না হয় লাঠিটা আরো জোরে চালিয়ে ভ্রম সংশোধন করে নেবেন, বললো অনুপম।

সে শক্তি আপনাদের অহিংস লাঠির খুব সম্ভব আছে।

দেখুন আপনাকে কি বলে ডাকবো ভাবছি। অনিন্দনীয়া নামটা মস্ত ভারী, বহন করতে মুটের দরকার হয়।

বেশ তো না হয় একটা অক্ষর কমিয়ে দিয়ে নিন্দনীয়া বলে ডাকবেন, তাতে খানিকটা হালকা হবে, কি বলেন ?

অনুপম বললো, তবু যথেষ্ট হালকা হলো না। ভাবছি আরও খানিকটা ঝরিয়ে দিয়ে নিন্দা বলে ডাকবো।

মেয়েটি বললো, ওই নামকরণের জন্যে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে লোকে নিন্দা করবে না। বেশ তাতেই যদি খুশী হন, নিন্দা বলেই ডাকবেন। আজকের মতো চললাম।

পরদিন যথাসময়ে হাসপাতালে এসে অনিন্দনীয়া দেখলো যে অনুপম যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

আজ দশটার সময় আমার ছুটি হয়েছে, ডাক্তারের কাছে অতিরিক্ত

কয়েকঘণ্টা থাকবার অনুমতি চেয়ে নিয়েছি।

মেয়েটি বললো, এ যে নতুন কথা। হাসপাতালে কেউ ইচ্ছে করে বেশিক্ষণ থাকে।

অনুপম যে কেন হাসপাতালে অতিরিক্ত সময়টুকু থাকলো অনিন্দনীয়া তা বুঝতে পারেনি ভেবে তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। সেই ম্লানিমাটুকু অনিন্দনীয়ার চোখ এড়ালো না, মনে মনে সে খুশী হলো। মেয়েরা বোঝে সব, কেবল না বোঝার ভান করে থাকে।

এখানেই কি দাঁড়িয়ে থাকবেন? ছুটি যখন হয়েছে, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

বাড়ির গাড়ি বুঝি? বাস্তবিক বাড়ির গাড়ি না থাকলে কম্যুনিস্ট হয়ে সুখ নেই।

সে কথার উত্তর না দিয়ে মেয়েটি শুধালো, আপনারা মোটর গাড়িতে চড়েন তো?

হঠাৎ এমন অদ্ভুত কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন বলুন তো? অনেকের ধারণা গরুর গাড়ি ছাড়া অন্য গাড়িতে চাপলে কংগ্রেসীদের জাত যায়।

গাড়ি ছুটে চলেছে। হঠাৎ অনুপম বলে উঠলো, যাব মধ্য কলকাতায়। গঙ্গার ধারে নিয়ে এলেন কেন, গঙ্গাপ্রাপ্তি করাবার মতলব নাকি?

গঙ্গার হাওয়া খাওয়া যদি গঙ্গাপ্রাপ্তি হয় তবে না হয় তাই হলো।

কদিন ধরে তো সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন, হাওয়া খাওয়ার জায়গা কি আর পেটে রেখেছেন?

আমাকে তো খেতে বলেন নি, কাজেই হাওয়া খেয়ে পেট ভরানো ছাড়া আমার আর গত্যন্তর কি—বললো অনিন্দনীয়া।

বলবার কথা না থাকলেও মানুষ যখন কথা বলে যায় বুঝতে হবে তাদের অবস্থা পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ নয়। কাজের কথা দু মিনিটে ফুরোয়, অকাজের কথা দ্রৌপদীর শাড়ি। সেই অকাজের কথায় মুগ্ধ হয়ে পনেরো মিনিটের পথ দেড় ঘণ্টায় অতিক্রম করে অনুপমের বাড়ির দরজায় যখন গাড়ি এসে দাঁড়ালো, তখন অনেক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

অনুপম বললো, ভিতরে চলুন।

না, আজ আর নয়, রাত হয়ে গিয়েছে।

ভাবছি, আবার মাথায় চোট লাগিয়ে হাসপাতালেই যাবো নইলে তো

আর আপনার দেখা পাওয়া যাবে না।

আমি কি ফ্লোরেন্স নাইটিন্‌গেল্‌ নাকি, যে হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে রোগীর তদারক করে বেড়াবো।

অনুপম শুধালো, আবার কবে দেখা হবে।

শিগগীর নয় বলে গাড়িতে চালালো অনিন্দনীয়া। অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। যতক্ষণ পিছনে লাল আলোটা দেখা গেল একদৃষ্টে চেয়ে থাকলো অনুপম।

শিগগীর নয় এই ছোট্ট শব্দ দুটি চোর কাঁটার মতো সারাটা রাত তার জাগরণ ও স্বপ্নের মধে খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতে লাগলো। দুদিন আগেও যে অপরিচিত ছিল কিংবা শত্রুপক্ষ ছিল তার জন্যে এমন আকিঞ্চন কেন। মনে হলো ওই ছোট্ট শব্দ দুটি ছোট্ট ছুরির মারাত্মক আঘাতের মত তার মনের মধ্যে বিঁধে বসে গেছে।

সংসারে সুখ দুঃখ দুই-ই অপ্রত্যাশিত এই অতি পুরাতন উক্তির নূতন ব্যাখ্যা পাওয়া গেল যখন পরদিন বিকালে অনিন্দনীয়ার গাড়ি এসে অনুপমের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ালো। দার্শনিক বলেন সময় জিনিসটা স্থিতিস্থাপক। শীঘ্র শব্দের স্থিতিস্থাপকতা অপরিসীম। অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্য পর্বতকে বলে গেলেন শীঘ্র আসছি, আর এলেন না। আবার অনিন্দনীয়া বলে গেল শিগগীর নয়। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাও পেরুলো না। শব্দশাস্ত্রের অপার মহিমা।

অনিন্দনীয়াকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনবার সময় অনুপম ভাবলো কালকে রাতটা না কি দুঃস্বপ্নেই কেটেছে, শিগগীর নয় শব্দে দু-চার বছর কেন ভেবেছিল সে, দুই আর চার যোগে চব্বিশ ঘণ্টাও তো হতে পারতো। হলোও তাই।

মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অনিন্দনীয়ার, বললো, মা, এই মেয়েটি হাসপাতালে গিয়ে আমার দেখাশুনা করতেন, অনেক যত্নও করেছিলেন।

মা যে মেয়েটিকে দেখে কতখানি মুগ্ধ তা পরে জানতে পারা গেল। দু-দিন বাদে তিনি ছেলেকে বললেন, বাবা বেশ মেয়েটি। ওইরকম একটি বউ তোর হলে খুব মানায়। বিবাহযোগ্য মেয়ে তাদের পুত্রবধূরূপে কল্পনা

করা মায়েদের এক বাতিক।

মায়ের কথা শুনে অনুপম বলেছিল, ও মেয়ে বিয়ে করবে না মা, তুমি নিশ্চিত থাকো।

মা বললো, বাবা ষাট বছর বয়স পেরুলো, অনেক দেখেশুনে এমন মেয়ে তো দেখলুম না বিয়ে করবার যার ইচ্ছে নেই। সীতাদেবী ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন তবু তো তার বিয়ে আটকালো না।

অনিন্দনীয়া অনুপমের মাকে বললো, কদিন হাসপাতালে থেকে ওর শরীরটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, গঙ্গার ধারে একটু হাওয়া খাইয়ে আনি। এটাকে ঠিক অনুমতি চাওয়া বলে না, অনুমতি প্রার্থনা ও ইচ্ছা জ্ঞাপনের মাঝামাঝি একটা অবস্থা।

প্রিন্‌সেপ্ ঘাটের কাছে ঘন সবুজ মাঠের মধ্যে দুজনে অনেক্ষণ বেড়ালো। তারপরে গঙ্গার ধারে সানবাঁধানো বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে চিনেবাদাম কিনে খেতে শুরু করলো। অবশেষে প্রত্যেকদিন বিকেলে এটাই দুজনের রুটিন্ হয়ে দাঁড়ালো।

একদিন বিকেলবেলায় প্রিনসেপ ঘাটের কাছে বসে অনুপম ও অনিন্দনীয়া গল্প করছিল। হঠাৎ অনুপম বলে উঠল, নিন্দা আমি মনে বড় গ্লানি অনুভব করছি। দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে আর আমি কিনা পাশ কাটিয়ে রয়েছি।

মেয়েটি বলল, কি করবে পম, তোমার শরীর তো এখনও কাজে যোগ দেবার মত হয়নি।

অনুপম ও অনিন্দনীয়া নাম দুটি যখন সংক্ষিপ্ত হয়ে পম ও নিন্দায় পরিণত হয়, আপনি সম্বোধন যখন তুমি-তে এসে দাঁড়ায় তখন বুঝতে হবে মাঝখানে এমন অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে যা বাইরের লোকে অবহিত নয়। এমনিভাবেই সংসারের গতি অনেক মধ্যবর্তী অংশকে বাদ দিয়ে দিয়ে লাফিয়ে চলে। সত্য কথা বলতে কি সংসারটা মধ্যপদলোপী সমাস।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুপম বলল, শরীরটা আরেকটু সুস্থ হলেই আবার রাজনীতিতে নামব। ধর্মই এ যুগের রাজনীতি।

মেয়েটি বলল, বেশ তো! তুমি সুস্থ হয়ে উঠলেই আমিও আবার রাজনীতিতে যোগ দেব, রাজনীতিই ধর্ম।

তখন কি আর আমাদের দেখাশুনা হবে না?

মেয়েটি উত্তর দিল, এর চেয়ে বেশি ঘনঘন হবে, একেবারে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে।

অনুপম বলে উঠল কি সর্বনাশ. এ যে গীতা আওড়ালে।

তুমিও না হয় মার্কসবাদ আউড়িও আমার আপত্তি নেই, তবে ভবিষ্যতে আমাদের দুই দল মুখোমুখি হলে পরের মাথা বাঁচাতে আর নিজের মাথা এগিয়ে দিও না।

অনুপম বললো, শপথ করতে পারিনে, সমস্তটা নির্ভর করছে কার মাথা তার উপর।

এইভাবে অকাজের কথা অন্তহীন তরঙ্গে সম্মুখের গঙ্গার স্রোতের মত প্রবাহিত হয়ে চললো। অন্ধকারের তুলি সহস্র দীপালোকিত কলকাতা শহরের আকাশকে ম্লানতর করতে চেষ্টা করছে।

এবারে পূর্বোক্ত মধ্যপদলোপী সমাসের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই কদিনে অনুপমের ধুতির ঝুল হাঁটু ছাড়িয়ে নামতে নামতে প্রায় গোড়ালিতে এসে ঠেকেছে আর খদ্দরের সুতোগুলো এমন সূক্ষ্ম হয়েছে যে মিলের ছদ্মবেশী বলে মনে হয়। অন্যপক্ষে অনিন্দনীয়ার শাড়ি রঙিন, বৈশাখের গুলমোরের ফুল ফুটে উঠেছে। অনুপমের চরকাতে নীরুপদ্রবে মাকড়সা জাল বুনছে আর গীতার উপরে এত ধুলো জমেছে যে, একটা ফসল ফলিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়। অনিন্দনীয়ার মার্কসবাদের পুঁথিগুলো বালিশের তলাতে আশ্রয় নিয়ে তার উচ্চতা কিছু বাড়িয়েছে। অনিন্দনীয়ার সঙ্গে বইগুলোর এখন ওইভাবেই যোগাযোগ। অনুপম ভাবে কর্তব্যে ত্রুটি হচ্ছে, দলের লোক না জানি কি মনে করবে, আর অনিন্দনীয়ার দলের লোক এসে ডাকলে সাড়া পায় যে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোই রাজনীতি নয়, যাও ঘরে গিয়ে পুঁথিপত্রগুলো ভালো করে পড়ো গে। আসল কথা এই যে, দুই পক্ষের ঊর্ধ্বে এক তৃতীয় পক্ষ আছেন, তিনি নাকি দেবতা। রাজনীতি যদি বিশেষ যুগের হয় তবে সেই দেবতা নির্বিশেষ যুগের। শত্রুরূপেই হোক আর মিত্ররূপেই হোক দুই পক্ষ মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে তিনি বড় কৌতুক অনুভব করেন আর নিক্ষেপ করেন ছোট্ট একটি বাণ। বলা বাহুল্য সেই দেবতাটি অনুপম ও অনিন্দনীয়ার মাথায় ভর করেছে। তারই মহিমায় অনুপম হয়েছে পম অনিন্দনীয়া হয়েছে নিন্দা আর তাদের পরস্পরের সম্বোধন

আপনি পরিণত হয়েছে তুমি-তে। এত কথা হয়তো তারা জানে না কিংবা জেনেও না জানবার ভান করে। মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনা করবার শক্তি অপরিসীম।

একদিন বিকেলবেলায় নির্দিষ্ট সময়ে অনুপমের দরজায় অনিন্দনীয়ার গাড়ি এসে না পৌছলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল অনুপম। আজ এত দেরী হচ্ছে কেন। পাড়ার লোকে গাড়ির উপস্থিতি দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে শুরু করেছে। এমন অবস্থায় উদ্বেগ না হওয়াই অস্বাভাবিক। সে আর স্থির থাকতে পারলো না, বের হয়ে সোজা কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে হাজির হলো। তাকে দেখে তো কমরেডগণ অবাক। আপনি এখানে? সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য মনে করে অনুপম শুধালো, অনিন্দনীয়া কোথায়? জবাব পেল তিনি তো এখন বড় আসেন না, বোধকরি বাড়িতেই আছেন। তাঁর অকস্মাৎ আবির্ভাবের কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে সোজা চললো অনিন্দনীয়াদের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে বিনা ভূমিকায় বাড়িতে ঢুকতেই দেখতে পেল দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে তন্ময়ভাবে অনিন্দনীয়া কি যেন করছে। পা টিপে টিপে পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল অনিন্দনীয়া ছবি আঁকছে। সে ছবি তার। অনিন্দনীয়া কিছুই টের পেল না, সে ছবি এঁকেই চললো। ছবির মডেল সাধারণত সম্মুখে রাখা দরকার, এ ক্ষেত্রে পিছনে, তবে মনের মধ্যে মডেলটি থাকলে সম্মুখ পিছন দুইই সমান। এমনিভাবে কতক্ষণ চলতো কে জানে। এমন সময় অনিন্দনীয়ার ছোট বোন ঘরে ঢুকে পড়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, দিদি দেখো কে এসেছে। সে পিছন ফিরে অনুপমকে দেখেই তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে ছবিখানাকে ঢেকে ফেললো, অনেক দিন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছি তাই দেখছিলুম হাতটা ঠিক আছে কিনা।

অনুপম ব্যাখ্যাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো, আজ যাও নি কেন?

ছবি আঁকতে গিয়ে সময়ের হুঁশ ছিল না।

এখন তো হুঁশ হয়েছে, চলো জরুরী কথা আছে।

দুজনেই গঙ্গার ধারে নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসলে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে অনুপম বলে উঠলো, নিন্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি।

অনুপম যদি নিতান্ত অবোধ ও অনভিজ্ঞ না হতো তবে বুঝতে পারতো কথাটা অনেক আগেই অনিন্দনীয়া টের পেয়েছে। আর অনিন্দনীয়াই বা কেন, পার্টির ও পাড়ার লোকেরও জানতে বাকি নেই। কেবল নৈষ্ঠিক

কংগ্রেসকর্মী অনুপম সরকারই জানতে পারে নি।

এ হেন স্বতঃসিদ্ধ মনোভাবের কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে অনিন্দনীয়া বললো গঙ্গার স্রোতে আজ এত শব্দ কেন, বোধকরি এখন জোয়ার।

কি প্রত্যাশার কি উত্তর।

অনুপম এবারে বললো, নিন্দা তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

অনুপম আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে।

তার কথা যেন শুনতে পায় নি এমনভাবেই অনিন্দনীয়া বললো, কত দূরে সমুদ্র, তার জোয়ারের ধাক্কায় জল উত্তাল হয়ে ওঠে নদনদীর মধ্যে। এ বড় আশ্চর্য।

নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে অনুপম বললো, ভৌগোলিক সমস্যা এখন রাখো, আমার কথাটার উত্তর দাও।

অনিন্দনীয়া আপনমনে বলে চলে। কোথায় অর্ধযোজন দূরে চাঁদ আর তার অদৃশ্য টানে সমুদ্রের জল জোয়ার ভাটায় মাথা খুঁড়তে থাকে। এ কি আশ্চর্য নয় অনুপমবাবু ?

এতদিন পরে এত অঘটনের পরে পম ফিরে গিয়ে হলো কিনা আবার অনুপমবাবু। সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলো, বুঝেছি এখন বাড়ি চলো, সব মেয়েই সমান।

অনিন্দনীয়া নির্বিকারভাবে বললো, নিশ্চিন্ত হলাম। এবারে যে কোন মেয়েকে বিয়ে করে ফেলুন সব মেয়েই যখন সমান।

মোটর গাড়ির মধ্যে অনুপম একটিও কথা বললো না, বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে প্রকৃতির শোভা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলো। মেয়েরা ছেলেবয়সে পুতুল নিয়ে খেলে,বয়েস হলে খেলে অবোধ পুরুষগুলোকে নিয়ে, সে সময়ে তাদের এমন অবস্থা হয় যে চোখ থাকতে দেখতে পায় না, কান থাকতেও শুনতে পায় না, অবশ্য মুখ থাকতে কথা বলতে পারে তবে সেসব "অর্থহীন কথা"।

পম, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী আছি তবে রাজনীতি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না, রাজনীতিই এ যুগের ধর্ম।

রাজনীতি ছাড়তে তোমাকে কে বলছে নিন্দা, আমিই কি রাজনীতি ছাড়বো, কারণ ধর্মই এ যুগের রাজনীতি।

আরও এক কথা, তোমাদের গীতা আমি পড়তে পারবো না।

কেন বইখানা তো ছোট্ট, মাত্র সাতশ শ্লোক।

আকারে ছোট, প্রকারে নয়। টীকাভাষ্যে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

টীকাভাষ্যের কথা যখন তুললে নিন্দা তবে বলি তোমাদের দি ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের কাছে কেউ নয়, প্রত্যেক পাঠক নিজের মনমত টীকা পড়ে।

না হয় গীতার কথা বাদ দিলাম কিন্তু পার্টি ছাড়ি কি করে?

বেশ তোমার পার্টি তোমার থাক আর আমার পার্টি আমার থাক, বিয়ে আটকাচ্ছে কিভাবে।

অসম্ভব, বলে অনিন্দনীয়া গম্ভীর হলে।

তবে ?

তবে আর কি বলবো অনিন্দনীয়া। শৈব-শাক্তে কি বিবাহ হচ্ছে না, হিন্দু-খৃষ্টানে কি সিভিল ম্যারেজ আটকাচ্ছে? অসম্ভব হতে যাবে কেন?

ও তুলনা চলে না, বললো অনিন্দনীয়া। শৈবশাক্ত দুজনেই হিন্দু, হিন্দু-খ্রীষ্টান দুজনেই ধর্ম মানে।

তুমিও তো ধর্ম মানো, এইমাত্র বললে যে রাজনীতি এ যুগের ধর্ম।

আসল কথা কি জানো, তুমি এ যুগের মানুষ, আমি ভাবীযুগের।

অনুপম হেসে উত্তর দেয়, তবে বর্তমান যুগটা কি হবে?

সে আমি জানিনে। এরকম ক্ষেত্রে বিবাহ হলে দুজনেই অসুখী হবো।

বিবাহ করে কেউ কখনো সুখী হয়েছে বলতে পারো নিন্দা?

অনিন্দনীয়া বললো, অনেকে।

যে কাজ করে সবাই ঠকেছে তার অভিজ্ঞতা কি কখনো কেউ প্রকাশ করে বলে। তবে শোন, বিবাহিত জীবনে সুখ নেই আবার অবিবাহিত জীবনেও শান্তি নেই।

বৃথা তর্ক করে কি ফল। আমাদের বিয়ে হতে পারে না।

ওরা তো এইরকম সিদ্ধান্ত করলো, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে দেবতাটির

হাতে তিনি থামলেন না। তাঁর ধারালো বাণগুলি ওদের লক্ষ্য করে নিয়মিত নিক্ষিপ্ত হতেই থাকলো।

দিনতিনেক পরে অনিন্দনীয়া বললো আমি এক মতলব ঠাউরেছি। তুমি এসো, আর বাধা থাকবে না।

এবারে অনুপমের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পালা। সে বললো অসম্ভব।

আরও তিনদিন গেল। বলা বাহুল্য, প্রতিদিনই তাদের দেখাশুনা হয়েছে কোন কোনদিন একাধিকবার। এবারে অনুপম বললো আমি এক মতলব ঠাউরেছি ভেবে দেখো। রাজনীতি আমরা যখন ছাড়তে পারবো না তখন তোমার পার্টিও থাক আমার পার্টিও থাক। এসো আমরা দুজনে তৃতীয় একটা পার্টিতে যোগ দিই, তাহলেই আর বাধা থাকবে না।

আচ্ছা ভেবে দেখবো কথাটা—বললো অনিন্দনীয়া।

আবার দিনতিনেক পরে দুজনের মধ্যে প্রসঙ্গটা উঠলো। কি ভেবে দেখলে জিজ্ঞাসা করলো অনুপম। ভেবেছি, তবে এমন পার্টি তো দেখতে পাচ্ছি না। অনুপম বললো আমি পাচ্ছি। মাঝামাঝি যাদের রাজনীতি এমন একটা পার্টিতে চলো দুজনে যোগ দিই।

এমন কোন পার্টি আছে?

কেন, পি এস পি আছে। ওরা কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির দুই দল থেকেই সমান দূরত্বে অবস্থিত।

এই অবোধ নরনারী দুটোর যদি প্রকৃতিস্থ অবস্থা হতো, তবে বুঝতে পারতো তাদের সিদ্ধান্তে মস্ত ফাঁকি আছে। সেই অদৃশ্য দেবতারই জাদুতে তাদের এমনি মুগ্ধ মনোভাব যে, যে কোন একটা ফাঁকির রন্ধ্রপথে আত্মসম্মান রক্ষা করে বিবাহের আসরে উপস্থিত হতে ওরা উদ্গ্রীব।

এবারে আমার গল্প ফুরিয়ে এল। সংসারে এমন নিরন্তর ঘটছে। ঘটনার সূচনায় অনেক আয়োজন অনেক সময় লাগলো। সমাপ্তি হয়ে যায় এক মুহূর্তে। সারাদিন পরিশ্রমে যে তুবড়িটি তৈরী হয় তার অগ্নিস্ফুরণ মুহূর্তে ঘটে।

পরদিন অনুপম ও অনিন্দনীয়া পি. এস. পি অফিসে গিয়ে পার্টির ক্রীডে যুগ্মস্বাক্ষর করলো এবং তার পরদিনে ম্যারেজরেজিস্টারড অফিসে গিয়ে করলো যুগ্ম স্বাক্ষর। অবশ্য সেই সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিবাহটাও হলো। এই

ঘটনায় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুই পার্টির লোকই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এতদিন পরে অবশেষে এই কাণ্ড। এই উপলক্ষে তারা একবারের জন্য মিলিত মিছিল বের করে ওদের বাড়িতে সোচ্চার ধিক্কার জানিয়ে এল। তবে সুখের বিষয় এই যে মিছিলের ঠেলায় ট্রাম-বাস বন্ধ হয়নি—কেননা ওদের বাড়ির রাস্তাতে ট্রামও নেই বাসও নেই। 'কি ছিল বিধাতার মনে' জানলে আগে থেকেই অনুপম ও অনিন্দনীয়া সাবধান হয়ে যেতো।

গল্পের সন্ধানে

এই মাত্র সম্পাদক মহাশয় কয়েকখানা নোট পকেটে গুঁজে দিয়ে বের হ'য়ে গেলেন। আপত্তি করেছিলাম, তীব্র আপত্তি; এবারে মাথায় গল্প আসছে না, মাপ করবেন। তিনি বলেছিলেন, বিলক্ষণ, আপনাদের মাথা ঝাড়া দিলে আস্ত উপন্যাস বেরিয়ে পড়ে, তায় কিনা একটা ছোট গল্প! নিন, কাগজ কলম নিয়ে ব'সে যান, আচ্ছা আমি চল্‌লাম, কালকে এই সময়ে লোক পাঠিয়ে দেবো।

এই বলে তিনি বের হ'য়ে চলে গেলেন। কিন্তু আমি এখন কি করি? সম্পাদকের কথা মিথ্যা হ'তে পারে না ভেবে বার কয়েক মাথা ঝাড়া দিলাম, বেশ জোরেই, পাগড়ী থাকলে খ'সে পড়তো। কিন্তু উপন্যাস দূরে থাক, একটা গল্পও বের হল না। তবে দেখা যাচ্ছে যে সম্পাদকের কথাও সব সময়ে সত্য হয় না।

এবারে সত্য সত্যিই মাথায় অজন্মা, ফসল কিছুই নাই। অথচ ওদিকে সম্পাদকীয় টাকা নিয়েছি। অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়, জোর ক'রে পকেটে গুঁজে দেওয়া হ'য়েছে। তা হোক—তবু একই কথা। টাকার নিজস্ব নীতি অনু-সারে ও আমার স্বেচ্ছাতেই গৃহীত। আবার বারকতক মাথা ঝাড়া দিলাম, শেষ মুহূর্ত্তে কিছু বের হলেও হতে পারে। গৃহিণী ঘরে ঢুকছিলেন, বল্‌লেন মাথা ধরেছে নাকি? মনে মনে বললাম, হাঁ, সম্পাদকে ধরেছে। তিনি বল্‌লেন, যাও একটু বাইরে ঘুরে এসো, হাওয়া লাগলে ছেড়ে যেতে পারে।

গৃহিণীর কথা শুনে মনে হ'ল, এ বোধ করি শাপে বর হ'ল, বাইরে একটু ঘুরে এলে মন্দ হয় না। তখনি মনে পড়লো একটি বেদবাক্য। কলকাতার পথে টাকা ও গল্প ছড়ানো, কুড়িয়ে নেবার অবসর মাত্র। ভাবলাম পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্ কলিযুগে বেদবাক্য ফলে কিনা কিম্বা কতটা ফলে কিম্বা কি ভাবে ফলে। সম্পাদকীয় পত্রপুট ভরাবার মতো এক অঙ্গুলি ছোট গল্পের মাল মশলা মিল্‌লেও মিলতে পারে।

তখনি উঠে পড়লাম, সম্পাদকীয় নোট ক'খানা পকেট থেকে বের ক'রে মানিব্যাগে রাখলাম। দেখলাম মানিব্যাগের মধ্যে 'মানি' নাই আছে তাঁর পূর্ব্ব লিখিত পত্রখানা, গল্পের পারিশ্রমিক নিয়ে যাচ্ছি, আপনার গল্প না পেলে এবারে পূজায় 'বঙ্গ-সারথি' প্রকাশিত হবে না মনে রাখবেন।

গৃহিণী চাবি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, ডাকতে সাহস হল না, পাছে তিনি শুধু খোলা হাওয়ার উপরে ভরসা না করে আরও ওষুধের ব্যবস্থা করেন। দেরাজ খুলতে না পারায় মানিব্যাগ পকেটে ফেলে চাদর টেনে নিয়ে পথে বের হয়ে পড়লাম। কল্‌কাতার পথে নাকি টাকা ও ছোট গল্প ছড়ানো থাকে। হায়, তখন কে জানতো যে এ বেদবাক্য এমন ভাবে সত্য হয়ে উঠবে আমার জীবনে।

ঘণ্টা দুই রাস্তায় ও পার্কে ঘুরে যখন বাড়ী ফিরলাম পকেটে হাত দিয়ে দেখি মানিব্যাগটি অন্তর্হিত। বেদবাক্য কখনো মিথ্যা হওয়ার নয়, এমন কি এই দারুণ কলিকালেও নয়। কল্‌কাতার পথেই আমার টাকা খোয়া গিয়েছে!—কিন্তু গল্প! তখনই বিদ্যুৎবেগে মাথায় খেলে গেল—এই ব্যাপার-টাই গল্প আকারে লিখে ফেলা যাক না কেন? গল্পটা অবশ্য নিতান্ত মামুলী হবে, তার আর উপায় কি? যে টাকা পেয়েও পেলাম না তার মূলে এমন আর কি অভিনব গল্প হবে। পরের দিন কাগজ কলম নিয়ে লিখতে ব'সে এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছি হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজা খুলে চমকে উঠলাম —একি অরিন্দম যে।

স্যালুট ও নমস্কারের মাঝামাঝি একটা মুদ্রা করে মৃদুহাস্যে অরিন্দম বল্‌ল, হাঁ, স্যার।

অরিন্দম এক সময়ে আমার কাছে কলেজে পড়তো, তারপরে পুলিশে ঢুকেছে বলে শুনেছিলাম। গায়ে তার পুলিশ অফিসারের পোষাক বটে।

তা এখন কোথায় আছো?

আজ্ঞে এই থানাতেই অফিসার ইন চার্জ।

এসো, এসো, ব'সো। তারপরে কি মনে ক'রে?

স্যার, আপনার মানিব্যাগ হারিয়েছে কি? এই বলে সে একটা মানিব্যাগ, আমারটাই, টেবিলের উপরে রাখলো। (মামুলী গল্প ক্রমে জমে উঠ্‌ছে দেখছি, দেখা যাক আর কতদূর গড়ায়)

এই তো আমার মানিব্যাগ। কাল বিকালে খোয়া গিয়েছিল। পেলে কি ক'রে?

কাল রাতের বেলায় ব'সে আছি, উঠ্‌বো, উঠ্‌বো, করছি, এমন সময় হঠাৎ জানালা দিয়ে কি একটা জিনিষ এসে পড়লো। তুলে দেখি মানিব্যাগ, খুলে দেখি চিঠিতে আপনার নাম। ভাবলাম কাল দিয়ে আসবো, আজ

সকালেই উঠে চলে এসেছি। দেখুন সব ঠিক আছে কিনা? (গল্প ক্রমেই আরও জমে উঠ্‌ছে)

খুলে দেখি নোট ক'খানা আছে, চিঠিটাও।

বল্‌লাম চোরের এমন অদ্ভুত বুদ্ধি হ'ল কেন?

অনেক সময়ে চুরি করবার পরেই অনুতাপ হয়, বিশেষ পাকাচোর যদি না হয়। এমন কেস আরও দেখেছি।

অনেক ধন্যবাদ অরিন্দম। কিন্তু আবার কোর্টে যেতে হবে না তো।

না স্যার, ডায়েরী করি নি। আচ্ছা, এখন আসি।

অরিন্দম চলে যেতেই মানিব্যাগ উপুড় করে ঢেলে ফেল্‌লাম। বের হ'য়ে পড়লো সম্পাদক প্রদত্ত পাঁচখানা দশ টাকার নোট, সম্পাদকের চিঠি। কিন্তু এখানা কি? আর কিছু তো ছিল না। এ যে আর একখানা চিঠি। দেখা যাক কি আছে। (গল্পও ক্রমেই জটিল ও জমাট হয়ে উঠছে) চিঠিতে আছে—স্যার, আমিও একজন গল্প-গবেষক, সম্পাদকের তাগিদের তাড়নায় গল্পের উপাদান সন্ধানে বের হয়েছিলাম। আপনি একাকী রবীন্দ্রসরোবরের* একখানি বেঞ্চিতে বসে ছিলেন আপনার পাশে গিয়ে একজন লোক বসলো, মনে পড়ে কি? আমি সেই গল্পার্থী ব্যক্তি। তখন কি জানতাম আপনিও আমার মতো একজন হতভাগ্য ব্যক্তি। আপনার তন্ময় ভাবের (নিশ্চয় তখন গল্প ভাবছিলেন) সুযোগ নিয়ে আপনার মানিব্যাগটা তুলে নিলাম। কেন; চুরির উদ্দেশ্যে নয়, গল্পের উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, চুরি করবার সময়ে চোরের মনস্তত্ত্ব কি রকম হয় জানবার উদ্দেশ্যে। তারপরে বাড়ী গিয়ে, মানিব্যাগ খুলে সম্পাদকের চিঠিখানা পড়ে বুঝলাম, আপনি আমার সম ব্যবসায়ী, না, তারও বেশি, সমান তাগিদ তাড়িত। তখন বুঝলাম কি ভুলই না করেছি। কাকে কাকের মাংস খায় না আর আমরা লেখকেরা কি কাকেরও অধম। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের ক্ষতিটাও ভেবে দেখবার মতো। টাকা খোয়া গেলে গল্প না লিখবার নৈতিক অধিকার আছে—খুব সম্ভব 'বঙ্গ-সারথির' জন্য গল্প আর লিখবেন না। তাই স্থির করলাম, কোন এক সুযোগে থানায় গিয়ে মানিব্যাগটা ফেলে দিয়ে আসবো। আর এটা ফেরৎ পেলে (থানার অফিসাররা আজকাল ভদ্রলোক, ফেরৎ দেয়ও) সদ্য একটা গল্পের উপাদান হাতে পাবেন—বঙ্গ-সারথি নিয়মিত সময়ে গল্প পাবে। কি লেখেন দেখবার জন্যে পূজা সংখ্যা বঙ্গ-সারথি কিনবো। আমার

বর্তমান অভিজ্ঞতা ধুন্দুমার কাগজের পূজা সংখ্যায় বের হবে, আপনার ঠিকানায় পাঠাবো, পড়ে দেখবেন, তবে চিনতে পারবেন না, কেন না ছদ্মনাম ব্যবহার করবো! নমস্কার, স্যার। ইতি বৃহন্নলা (গল্পে এই নামটিই থাকবে, নইলে বুঝবেন কি ক'রে ?)

চিঠিখানা পড়া শেষ হ'তেই গল্পের বাকি অংশটুকু লিখে ফেললাম, বস্তুতঃ চিঠিখানাই গল্পের শেষাংশ। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আমার গল্পের পারিশ্রমিকের কিয়দংশ তাকে দেওয়া উচিত। কিন্তু না, প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়, কাজটা ভালো করে নাই, হাতে ধরা পড়লে অজ্ঞাতবাসের পরিবর্তে বৃহন্নলাকে হাজতবাস করতে হতো।

সেবারে পূজা সংখ্যার পাঠকেরা বল্‌ল্ 'বঙ্গ-সারথি' ও 'ধুন্দুমার' পত্রের দুটি গল্প যেন একই অভিজ্ঞতার এপিট-ওপিট। লেখকেরা কি পরামর্শ করে লিখেছে নাকি!

কোসি কালানের মাঠে

দিল্লী থেকে রেল গাড়ীতে আগ্রা যাওয়ার পথে মথুরা পৌঁছবার আগে পর পর ছোট দুটো স্টেশন পড়ে, কোসি কালান আর হোদাল। নিতান্ত ছোট স্টেশন, কোন মানী ট্রেন থামে না, তবে কখনো লাইন ক্লিয়ার না পেলে অত্যন্ত মানী ট্রেনেরও থামা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বিপদে পড়লে ধনী কি গরীবের বাড়ীতে আশ্রয় নেয় না! আগ্রা হয়ে দিল্লী যেতে অনেক বার ঐ স্টেশন দুটি চোখে পড়েছে, কখনো বা মানী গাড়ী থেমেছে; তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে স্টেশন দুটির নাম মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছে; প্রথম কারণ ঐ অদ্ভুত নাম 'হোদাল'; দ্বিতীয় বা গুরুতর কারণটাই আসল, বিস্তারিত বলা প্রয়োজন। আগ্রা থেকে দিল্লী পর্যন্ত রেল লাইন ও শাহী-সড়ক সমান্তরালভাবে চলেছে; গাড়ীতে বসে বরাবর পথটা দেখতে পাওয়া যায়; আবার পথে চলতে চলতে রেল লাইনটাও বরাবর চোখে পড়ে। এ দুয়ের মাঝখানে গ্রাম আছে, মাঠ আছে, ঝোপঝাড় জঙ্গল আছে; মাঝে মাঝে চষা ক্ষেত ও জলা আছে। এসব এমন কিছু মনে থাকবার মতো নয়। তবে সে রকমও কিছু আছে। ঐ দুই স্টেশনের মাঝামাঝি একটা মাঠ আছে খুব বেশি হবে তো ৫০।৬০ বিঘা জমি। সেই মাঠে শতাবধি গাছ দেখতে

পাওয়া যায়—বড় অদ্ভুত তাদের চেহারা। গাছ না বলে তাদের গাছের কঙ্কাল বলাই উচিত। বাকল খ'সে যাওয়ায় পত্রপল্লব শাখা প্রশাখাহীন শাদাকাণ্ডগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তবে সোজাভাবে নয়, নানা-রকম বিকৃতভঙ্গী ক'রে যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় নীরবে কাতরাচ্ছে। একটু মনোযোগী যাত্রীর চোখে পড়বেই। আমার প্রায় প্রত্যেকবার যাতায়াতে পড়ে, কেননা মেল গাড়ী দিনের বেলায় অতিক্রম করে। ঐ গাছগুলোর সঙ্গে এই পর্যন্তই যদি আমার সম্পর্ক হ'তো তবে বর্ণনার বেশি গডাতো না। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঐ মাঠখানা আর ঐ গাছগুলো একটা গল্প গ'ড়ে তুলল আমার জীবনে, সেই কথাই আজ বলতে বসেছি। গল্পটা সত্যই কিছু অদ্ভুত, বিশ্বাস করা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন।

আমার বন্ধু শম্ভু দিল্লীতে বড় সরকারী চাকুরে, তাই মাঝে মাঝে দিল্লী যাই, তার বাসায় থাকবার অসুবিধা নাই। সেবার গিয়েছি, তখন নভেম্বর মাস. দিল্লীর প্রসিদ্ধ শীত তখনো হিমালয় থেকে শুভাগমন করেনি ; শম্ভু বলল চলো একবার আগ্রা থেকে ঘুরে আসি। সরকারী উকীল রামশরণ সিং অনেকবার যেতে বলেছেন, তুমি গেলে খুশী হবেন, বাঙালীদের তিনি খুব শ্রদ্ধা করেন।

আমি টাইম টেবল টেনে নিতেই শম্ভু হাত থেকে টাইম টেবল টেনে নিয়ে বলল, ট্রেনে নয় মোটর গাড়ীতে।

শম্ভুর মোটর গাড়ী আছে, নিজেই চালায়। সে বলল, অফিস সেরে পাঁচটায় রওনা হব, ঘণ্টা চারেকের মধ্যে পৌঁছবো, কাল রবিবার সারাদিন থাকবো ; সোমবার সকালে রওনা হ'য়ে অফিসের আগেই এসে পৌঁছবো।

এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কি হ'তে পারে। কাজেই পরদিন যথা-সময়ে, অর্থাৎ যথাসময়ের ঘণ্টাখানেক পরে দু'জনে মোটরে রওনা হয়ে গেলাম।

দিল্লী থেকে আগ্রা চমৎকার শাহী শড়ক, তার উপরে যথাক্রমে ইংরেজের হাত এবং বর্তমান ভারত সরকারের হাত পড়েছে। মসৃণ পথে দামী মোটর গাড়ী নিঃশব্দে এগিয়ে চলছে ; বাঁ দিকে অদূরে একের পর এক রেল স্টেশন-গুলো পড়ছে ; পাশ দিয়ে মোটর গাড়ী ও বিপুলায়তন মোটর ট্রাক আসা যাওয়া করছে, গায়ের কাপড় জড়িয়ে বসে আছি, স্টীয়ারিঙে শম্ভুচরণ। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দিল, ঠিক যাচ্ছি, রাত দশটার আগেই পৌঁছবো

নিশ্চয়। কিন্তু তখন বোধহয় অন্তরীক্ষে ভাগ্যদেবতা হাসছিলেন।

পালওয়াল স্টেশন পার হ'তেই অন্ধকার হ'য়ে এলো, তারপরে শোলাকা স্টেশন যখন ছাড়িয়েছি তখন কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার চেপে এসেছে, শীতটাও বেশ অনুভূত হচ্ছে। দিল্লীর চেয়েও যে আগ্রার শীত প্রবল তা আগ্রার পথে বুঝতে পারছি। একে শীত, তায় অন্ধকার, আবার শুনছি মাঝে মাঝে রাহাজানিও হয়, এখন রামশরণ সিং-এর কুঠীতে পৌছতে পারলে হয়। সামনে পিছনে আলোর পিচকারি ছুঁড়ে পাশ দিয়ে মোটর গাড়ী যাতায়াত করছে, আমরাও চলে ছি। আর কয়েক মাইল চলবার পরে শম্ভু হঠাৎ মোটর থামালো।

থামালে যে।

কি রকম একটা আওয়াজ হচ্ছে।

আমি কিছুই শুনিনি, শুনবার কথাও নয়, পৃথিবীর অন্যান্য রহস্তের মধ্যে মোটরগাড়ীকেও গণনা ক'রে থাকি। ও যে কেন চলে, কেন থামে, দেবতারাও জানেন না, স্বর্গে মোটরগাড়ী নাই। সম্মুখে যতগুলো যন্ত্র ছিল সবগুলো একবার ক'রে টিপলো শম্ভু; তারপরে নেমে বনেট তুলে টর্চের আলোয় কি সব প্রক্রিয়া করলো। তারপরে আবার এসে বসলো, নিশ্চিন্ত হ'লাম। কিন্তু অকারণে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। গাড়ীর স্টার্ট নিলো না, শম্ভুর কৌশল এবং সমস্ত অনুনয় বিনয় উপেক্ষা ক'রে মানিনীর মতো মোটরগাড়ী নীরব হ'য়ে রইলো। শম্ভু একটা সিগারেট ধরালো, (আমি সিগারেট খাই না), এবং গায়ের কাপড়খানা বেশ ক'রে জড়িয়ে নিয়ে ধীরভাবে বলল, গাড়ী চলবে না, আজ রাতটা এখানেই কাটাতে হবে দেখছি।

সে কি, এখানে এই মাঠের মধ্যে।

অগত্যা।

কিন্তু...

আর কিন্তু নেই, বেশ্ থিতু হ'য়ে বসো, জানলার কাচগুলো তুলে দাও।

আর কোন উপায় নাই ?

আছে বই কি! ঠেলে নিয়ে যাওয়া, মাঝপথে এসে পড়েছি, দিল্লী আগ্রা সমান দূর।

মাঠের মাঝখানে চুরি ডাকাতি হ'তে পারে।

অসম্ভব নয়।

তবে ?

শম্ভু বলল, এক কাজ করা যাক।

ভাবলাম বোধ হয় মাথায় নিশ্চয় একটা উপায় এসেছে।

সদর রাস্তার উপরে গাড়ী রাখা কিছু নয়, রাতে ধাক্কা মারলে সব চুরমার হ'য়ে যাবে। এসো দুজনে গাড়ীখানাকে ঠেলে মাঠের মাঝে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখি।

তখন দুজনে ঠেলতে ঠেলতে গাড়ীখানাকে রাস্তা থেকে নামিয়ে বেশ। খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে নিয়ে এলাম। আর তারপরে কোথায় কোন্ পরিস্থিতিতে এসে পড়েছি দেখবার জন্যে টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিলাম। প্রথম নজরেই চোখে পড়লো, না, ভুল হয়নি, সেই কঙ্কাল-বৎ গাছগুলো। আমরা তাহ'লে হোদাল আর কোসি কালানের মাঝখান-কার মাঠে এসে পড়েছি। এতকাল রেলগাড়ী থেকে, যাদের দেখে এসেছি; আজ তাহ'লে তাদের মধ্যেই রাত কাটাতে হবে দেখছি। আর একবার বাত্তির আলো জ্বাললাম।

কি দেখছ হে ?

না কিছু নয়।

শম্ভুকে গাছগুলোর রহস্য কি বোঝাবো ? সে হয়তো আদৌ এগুলোকে লক্ষ্য করেনি, করলেও গাছ তার কাছে গাছ, তাদের অদ্ভুত আকৃতি বোঝালে বুঝবে না। আর বোঝারই বা কি! তাই গাড়ীতে উঠে বসলাম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনের সীটে সে এবং পিছনের সীটে আমি গায়ের কাপড় জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে দারুণ শীতে ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসলাম, দেখলাম শম্ভুচরণ অঘোরে ঘুমোচ্ছে; সে বোধকরি এ দেশের শীতে অভ্যস্ত তাই তার ঘুম ভাঙেনি। তাকে জাগিয়ে কী লাভ! আমার কিন্তু হাড়ের মধ্যে কাঁপন ধরেছে। আবার শুয়ে পড়বো ভাবছি, এমন সময়ে কানে এলো খুব ক্ষীণ, খুব দূরের একটা আর্ত কাতরানির শব্দ। কোথায় ? কে ? এত রাতে এখানে মাঠের মধ্যে কাতরায় কে ? খুন খারাপি হ'ল নাকি ? শম্ভুকে কি জাগাবো ? আচ্ছা আর একটু দেখাই যাক না, কাছে তো নয়। আর্ত রব ক্রমে প্রবলতর হ'তে লাগলো, যেন অনেকগুলো কণ্ঠ, অনেকগুলো মানুষ। মানুষ ? কে বলল ? পশু পাখীও তো হতে পারে। না, ও যে মানুষের কণ্ঠ তাতে আর

সন্দেহ নাই। এরা কারা ? মাঝরাতে এখানে মাঠের মধ্যে ব'সে কাঁদছে কেন ? এ রকম অবস্থায় ভূতপ্রেত ডাকিনীর কথা মনে হওয়া অসম্ভব নয়, তবে ওসবে আমার কখনো বিশ্বাস ছিল না, তাই সে ধারণাকে আমল দিলাম না। কিন্তু তাতে আসল সমস্যার সমাধান তো হ'ল না। কারা আর্তনাদ করছে ? একবার মনে হ'ল কাছেই নিশ্চয় কোথাও শ্মশান আছে, মৃতের আত্মীয় স্বজনের কান্না। এই কথা ভেবে যেমনি নিশ্চিন্ত হতে যাবো, তখনি বাধা পড়লো। না, তা হ'তেই পারে না। এতগুলো কণ্ঠ আত্মীয় স্বজনের হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এ সদ্য শোকের বিলাপ নয়; এ যেন বহুদিন আগেকার বিস্মৃতপ্রায় শোকের নতুন ক'রে মনে পড়া, দূর অতীতের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত। সত্য কথা বলতে কি ভয় আমার করছিল না, অদম্য কৌতূহলের ঠেলায় ভিতরে ভিতরে আমাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। তখনি মনে পড়লো টর্চ আছে, জ্বালিয়ে দেখা যাক না, কিছু চোখে পড়ে কিনা। জানলার কাচ নামিয়ে বাতির আলো ফেললাম। এবং যা দেখলাম তাতে অমনি কাঠ হয়ে গেলাম যে, বাতি নেভাতে বা কাচ নামাতে ভুলে গেলাম; এমন কি চোখ ফিরিয়ে নেবো সে সাহসটুকু হ'ল না: পাথর বনে গিয়ে নীরব নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে থাকলাম। সেই বাকল উঠে যাওয়া গাছের কাণ্ডগুলো যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে, কাতরানি তাদেরই যন্ত্রণার।

কতক্ষণ এভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসেছিলাম বলতে পারি না, চটকা ভেঙে গেল নভোব্যাপী যামঘোষের ডাকে, বোধকরি মধ্যরাত্রির ঘোষণা। শেয়ালের ডাক এমন কিছু মধুর শব্দ নয়, কিন্তু তখন মনের সে অবস্থায়, বড় মধুর লাগলো। ঐ অতিপ্রাকৃত কাতর ধ্বনির তুলনায় জীবিত প্রাণীর কণ্ঠ অপ্রত্যাশিতভাবে বাঞ্ছনীয় মনে হ'ল। ঘড়িতে ঠিক বারোটা। এমন সময় সামনের সীটে শম্ভু জেগে উঠল। আমাকে জাগ্রত ও বাইরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি দেখে শুধালো, কি হে "আঁধারের রূপ" দেখছ নাকি ? কী দেখছি, তাকে দেখানো সম্ভব কিনা ভেবে বাতির সন্ধানী শিখা নিক্ষেপ ক'রে দেখি যে গাছ-গুলো সব স্থির ও নিস্তব্ধ। তবে কি এতক্ষণ ভেল্কি দেখছিলাম নাকি ! কিছুই প্রকাশ করলাম না, জানি যে করলেও শম্ভু বিশ্বাস করবে না। উপরি পাওনার মধ্যে হবে ঠাট্টা, বলবে মাথাটি বেশ খারাপ হয়েছে দেখছি। গোটা দুই সিগারেট পুড়িয়ে সে বলল, নাও ঘুমোও, ভোর হতে এখনো অনেক দেরী। সে শুয়ে পড়লো, আমি শুলাম, কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলাম না,

ভিতরে ভিতরে কৌতূহল ঠেলা মারছিল ; শম্ভু ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে উঠে বসলাম। শিবাধ্বনি অনেক্ষণ থেমে গিয়েছে, তার বদলে প্রান্তরব্যাপী অতিপ্রাকৃত অলৌকিক আর্ত কণ্ঠস্বর। আলো জেলে দেখলাম, এবারে ছ'চারটি মাত্র গাছ নয়, সেই প্রকাণ্ড মাঠের সবগুলো বৃক্ষকঙ্কাল যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে এবং পরিত্রাহি চীৎকার করছে। সে কি নিদারুণ কান্না। একবার ভাবলাম এ কিছুই নয়। গাছগুলোর ভিতর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে তারই করুণ শব্দ! কিন্তু বাতাস কোথায়? এই তো জানালা খুলে বসে আছি, গায়ে এতটুকু হাওয়া লাগছে কই! কানের ভুল নয়, তবে কি চোখেরই ভুল! চোখকেই বা দায়ী করি কিভাবে? স্পষ্ট দেখছি যে গাছগুলো মোচড় খাচ্ছে। এ কি ব্যাপার, এ কোথায় এসে পড়লাম! ঐ গাছগুলোয় কি কোন অতিপ্রাকৃত সত্তার বাস? অতিপ্রাকৃত সত্তাই কি আছে কিছু? থাক বা নাই থাক ; এ যে কতটা অদ্ভুত ব্যাপার, তাতে আর তো সন্দেহ থাকতে পারে না। শম্ভুকে ডাকবো নাকি? সত্য কথা বলতে কি, তখনো আমি ভয় পাইনি। আস্ত একখানা গাড়ীর মধ্যে বসে আছি, সামনে ঐ নিদ্রিত শম্ভুর নিশ্বাসের নিয়মিত ছন্দ! না, ভয় তখনো পাইনি। বোধকরি প্রচণ্ড কৌতূহলে ভয় চাপা পড়ে ছিল, যদি তা মনের মধ্যে একান্তে কোথাও থেকে থাকে। কিন্তু শেষে ভয় পেতেও হ'ল।

হঠাৎ দেখি অন্ধকার ফিকে হ'য়ে উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে অনেক রাতে। ভাবলাম, ভালই হ'ল, এবার চোখের মরীচিকা ঘুচবে। তখনো বুঝতে বাকি ছিল। ঝাপসা থেকে ফিকে, ফিকে থেকে স্পষ্ট, এবারে সমস্ত মাঠখানা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কী দেখা যাচ্ছে? সেই দেখা-না, দেখায় মেশা আলো আঁধারিতে এ কী কাণ্ড চলছে। শত শত বৃক্ষকঙ্কাল মোচড় খাচ্ছে, আন্দোলিত হচ্ছে, বিচিত্র আক্ষেপ করছে, আর সকলে সমস্বরে অত্যন্ত যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে উঠছে। দান্তের নরক বর্ণনা মনে পড়লো, মানুষ মৃত্যুর পরে গাছ হ'য়ে গিয়েছে। এরা কি তেমনি কিছু? কিন্তু এর চেয়ে মানুষের ডুকরে কেঁদে ওঠাও কম ভয়ঙ্কর। ওরা যেন শিকড়ের বাঁধন কাটিয়ে, ভিত্তি উন্মুলিত করে কোথাও ছুটে যেতে যাচ্ছে, পারছে না, তারস্বরে অন্ধ আক্রোশ, চিরসঞ্চিত বেদনা পাঠিয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। আমার কাছেই কি? এমন কি রাতের পর রাত চলে? এমন কতকাল চলেছে? আর কোন পথিকের চোখে পড়েছে কি? আমিই কি ওদের

আবেদনের লক্ষ্য ?

এই কথা যেমনি মনে হ'য়েছে, আমার মতো সামান্য নগণ্য ব্যক্তিকে যে মুহূর্তে বিশ্ব ব্যাপারের এক চিরন্তন অলৌকিক রহস্যের লক্ষ্য বলে মনে করেছি, অমনি এক অনন্যভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সূত্রপাত হ'ল। যুদ্ধের সময়ে সাইরেনের শব্দ শুনবামাত্র যেমন শিরদাঁড়ার মধ্যে শির শির ক'রে উঠত, তেমনি ভাবে তার চেয়েও রহস্যময় এক ত্রাসের অনুভূতি মজ্জার মধ্যে বোধ করতে লাগলাম। আবার ঠিক তখনি অতি শীতল অতি তীব্র তুষারস্পর্শ বায়ুস্রোত বইতে শুরু করলো। হী হী করে কাঁপছি, ওদিকে কপালে স্বেদস্রুতি। বাইরে তাকিয়ে দেখি, চোখ বুঁজে থাকি এমন উদ্যমটুকুও ছিল না, মাঠের যাবতীয় বৃক্ষকঙ্কাল করুণতম আর্তনাদ ক'রে শিরে করাঘাত করছে, আবার তালে তালে মাটিতে মাথা কুটছে। এই মাঠে কোন দূরকালে কোন এক হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি ঘটে গিয়েছে ওরা বুঝি তারই সাক্ষী ; সেই শোকের জ্বালায় ওরা হতশ্রী ; ওরা অগ্নিগর্ভ শমী ; রাত্রির নিঃসঙ্গ প্রহরে যখন চিরকালের ভূমিকা অবারিত হয়ে যায় তখন বিগত বেদনার মূক সাক্ষীর দল মৌন ভঙ্গ ক'রে কেঁদে ককিয়ে ওঠে। তাই বুঝি এ শোকার্তির উৎস ভূতলের কোন্ গভীর কন্দরে, এর লক্ষ্য চরাচরের কোন্ উর্ধতম প্রান্তে, না, না, ওগো অজ্ঞাত শোকের দুর্জ্ঞেয় সঙ্গিগণ, আমি তোমাদের মনোযোগের লক্ষ্য নই, আমি কেউ নই, আমি কোথাও নেই, সহস্র রজনীর এই কৃষ্ণভঙ্গ পালার মধ্যে আমি নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত। আমি এতই সামান্য যে তোমাদের মনোযোগের অযোগ্য।

ঘামে জামা কাপড় ভিজে গিয়েছে অথচ শীতে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে, আর ওদিকে চিরন্তন শ্মশানের অনন্ত হাহাকার ধ্বনিত হ'য়েই চলেছে। বেশ বুঝতে পারছি, মানুষের ইন্দ্রিয় ও মন যতখানি অভিজ্ঞতা ধারণ করতে সক্ষম,সে সীমা ক্রমেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে—বিলীয়মান জ্ঞানের উত্তরীয়ের শেষ প্রান্তটুকু এখনো প্রাণপণ বলে চেপে ধরে আছি, কতক্ষণ পারবো জানি না।

হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম, ওঠো, ওঠো, বেশ বেলা হয়েছে। ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলাম, এবং প্রথমেই সেই গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। পৃথিবীর অন্যান্য গাছপালার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, কেবল ছাল ছাড়ানো ও ডালপালাকাটা, যেমন আগের দিন সন্ধ্যায় দেখেছিলাম।

আকাশ তেমনি প্রসন্ন, বায়ু মণ্ডল তেমনি শান্ত, ভূতল তেমনি নিস্তব্ধ। রাতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোথাও এতটুকু মিল নাই। তবে এ কি ঘটে গেল, কেন ঘটে গেল। সমস্তই কি আমারই মনের মরীচিকা? মরীচিকার জন্যেও তো একটা মরুভূমির আবশ্যক! তবে এ সব কী! কেন! মনের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে মরতে লাগলো।

নাও, এখন নামো, চলো স্টেশনে যাওয়া যাক, অনেক কাজ আছে।

যন্ত্রের মতো শম্ভুকে অনুসরণ ক'রে স্টেশনে চললাম, মনের মধ্যে ঐ চিন্তা, কে? কেন? বুঝলাম, শম্ভুকে বলে লাভ নেই, সে কিছুই বুঝবে না। মনে মনে এবং একা এ রহস্য মন্থন আমাকেই করতে হবে যদি কিছু হদিস মেলে, নিশ্চয় কোথাও কী ও কেন-র একটা উত্তর আছে—যদি না সমস্তটাই আমার মনের ভ্রম হয়। ভ্রম! টর্চ এখনো জ্বলছে, রাতে জ্বেলেছিলাম। আশেপাশে সিগারেটের ছাই এক গাদা, সাহসকে উত্তেজিত করবার আশায় অনভ্যস্ত হ'য়েও সিগারেট খেয়েছি। না, ভ্রম নয়, এত বুক কাটা শোক কখনো ভ্রম হয়!

শম্ভু অমিতকর্মা পুরুষ। স্টেশনে এসে লোক সংগ্রহ করে গাড়ীখানা স্টেশনে এনে দিল্লী:তে বুক ক'রে দিল। এ পর্ব সমাধা হ'লে আমরা রেল গাড়ীযোগে যখন আগ্রা পৌছলাম তখন বিকেলবেলা। রামচরণ সিং আমাদের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অসময়ে দেখতে পেয়ে খুব খুশী হ'লেন। বেশ হাসিখুসী। প্রসন্ন মেজাজের লোক। আমাদের সমবয়সী। স্নানাহার সেরে তাঁর গাড়ী ক'রে বেড়াতে বের হ'লাম। তারপরে রাতের আহারান্তে বেশ জমিয়ে বসলে পরে শম্ভু মোটর বিভ্রাটের কথা পাড়লো, এতক্ষণ কিছু বলেনি, শুধু জানিয়েছিল যে, দিল্লী থেকে আমাদের রওনা হ'তে দেরী হ'য়ে গিয়েছে।

কোথায় ছিলেন রাতের বেলায়?

কোসি কালান স্টেশনের কাছাকাছি একটা মাঠের মধ্যে?

কোসি কালানের মাঠে। মাঠটার বড় দুর্নাম।

কেন বলুন তো? চুরি ডাকাতি?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রামশরণ সিং শুধালেন, কিছু দেখেছিলেন? কিংবা শুনেছিলেন?

ওদের দু'জনের মধ্যে কথা হচ্ছিল, আমি চুপ ক'রে শুনছিলাম।

দেখবই বা কি শুনবই বা কখন! সারারাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।

তবে বোধহয় দেহাতি লোকের বাজে কথা সব।

কিন্তু আপনি কি শুনেছেন মাঠখানা সম্বন্ধে?

ওখানে নাকি রাতের বেলায় কান্না শোনা যায়।

আমি বললাম, সংসারে কান্নার কারণের তো অভাব নেই, শোনা যাবে তাতে আর বিচিত্র কি?

না, না, মানুষেব কান্না নয়, অতিপ্রাকৃত কিছু।

সব বাজে কথা, বলে শম্ভু।

হয়তো। কিন্তু—

কিন্তু কি খুলে বলুন, আমি বললাম।

সেই অদ্ভুত বাকল ছাডানো নেড়া গাছগুলো লক্ষ্য করেছেন, ওরাই নাকি কাঁদে।

হঠাৎ ওরা কাঁদতে যাবে কেন, শুধাই আমি।

লোকে বলে সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে ওই সব গাছে, প্রত্যেক গাছে একটি ক'রে লোককে কোম্পানী ফাঁসি দিয়েছেন।

কেন?

রাতের বেলায় আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে বরযাত্রীর দল যাচ্ছিল বিয়ে বাড়িতে। কাছেই ছিল গোরা ফৌজ। তারা ধরে নিল ওরা রেবেল (Rebel)। আর কথা কি। তখন বিচার আচার সব লোপ পেয়েছে। বরযাত্রীদের ধরে নিয়ে গাছে গাছে লটকে দিল। তারপর থেকে গাছগুলো শুকিয়ে ঐ রকম অদ্ভুত আকৃতির হ'য়ে গেল, আর রাতের বেলায় তারস্বরে কেঁদে ওঠে।

এই পর্যন্ত বিবৃত ক'রে বললেন, তা হ'লে আপনার কিছু শোনেননি অথচ ঐ মাঠেই রাত কাটালেন।

শম্ভু বলে উঠল, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, not a mouse stirring!

রামশরণ সিং আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন, তা হ'লে এতদিনে আমার একটা ভ্রম দূর হল। প্রত্যক্ষ সাক্ষীর কথার মূল্য সবচেয়ে বেশি। কি বলেন মশাই? শেষোক্ত প্রশ্ন আমাকে। আমি বললাম, তা তো বটেই।

কোটা

আষাঢ় মাসে নবমেঘোদয়ে যখন চাতক উন্মুখ হয়ে ওঠে, বহুকাল পূর্বে জনকতনয়া স্নানপুণ্যোদক রামগিরিতে যখন ঐ একই কারণে বেচারা যক্ষ উন্মনা হয়ে উঠেছিল, সেই শুভক্ষণে বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণ উতলা হয়ে ওঠেন, না, ঠিক একই কারণে নয় বটে তবে কারণটা একই জাতের নিঃসন্দেহ। পূজা সংখ্যায় লিখবার জন্যে তাঁরা সম্পাদকীয় চিঠি পান। প্রত্যেকখানা চিঠিকে প্রমিসরি নোট বলে গণ্য করতে হবে, তবে মূল্য নির্ভর করে লেখকের মানমর্যাদা সম্মান পুরস্কারপ্রাপ্তি প্রভৃতির ওপরে। লক্ষ্মীর প্রদত্ত এই প্রমিসরিনোট সরস্বতীর কাউন্টারে ভাঙ্গাইবার অপেক্ষা মাত্র। প্রত্যেক লেখকের একখানি প্রাইভেট ডায়ারী আছে, তাতে আছে আগতগতিকের হিসাব। বারো-চৌদ্দ পনেরখানি পত্রিকার নাম। বছরের মধ্যে কোন নূতন পত্রিকা বের হলে সংখ্যা বাড়ে, কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে নাম বাদ পড়ে। কোন নূতন পত্রিকা বার হলে লেখকগণ নিজেদের মধ্যে আশায় আনন্দে বলাবলি করে একটা নূতন ঘর বাড়লো, কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল মুখ ম্লান করে বলে একটা ঘর গেল। এথেকে প্রমাণ হয় লেখক ও পাঠকের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব ভিন্ন নয়। যাই হোক এই সব আপেক্ষিক মনস্তত্ত্ব আলোচনার জন্য বসি নাই, একটি অভিজ্ঞতা বিধৃত করবার ইচ্ছা।

তুন্‌চুভিশ্চাং নামে একখানি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে আর তার পূজা-সংখ্যায় লিখবার জন্যে একখানি পত্র প্রাপ্ত হয়েছি। ব্যাপারটা সামান্য নয়। প্রথমে যখন ঐ পত্রিকার হোর্ডিং বিজ্ঞাপিত হয় লোক নূতন কোন ছবির বিজ্ঞাপন বলে ভুল করেছিল—বুঝুন কেমন আড়ম্বর! একদফা মারামারিও হয়ে গেল। একদল বলল বোম্বাই ছবি, একদল বলল মাদ্রাজী ছবি। বাস্, তর্ক থেকে হাতাহাতি মারামারি লাঠালাঠি, মাথা ফাটাফাটি, একেবারে ২৮৮ ধারা। ও রকম কোন ধারা নাই জানি তবে দুই-ধারায় মিলে দাঁড়িয়েছে ওটা। পুলিশ এসে জারী করলো ১৪৪ ধারা আর তার আগেই মাথা ফেটেছে ১৪৪টা। এবারে যোগ করে দেখুন ২৮৮ হয় কিনা। তুশ্চুভিশ্চাং রাজ্যময় বেড়াজাল ফেলে প্রবীণ নবীন নরম-গরম সব রকম লেখককে ধরতে সঙ্কল্প করেছেন। এমনকি শোনা যাচ্ছে শেষের দিকে চার

পাঁচখানা ফর্মা থাকবে সেই সব লেখকদের জন্যে যাদের লেখা নিজেরা ছাড়া অন্যে বুঝতে পারে না। সম্পাদক জানেন অগ্নিদেব সব শ্রেণীর লেখাই সমান আগ্রহে গ্রাস করেন। জড়বুদ্ধির দেহ কি চিতার আগুনে পোড়েনা? এহেন পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তর থেকে পত্র পেয়ে পুলকিত হলাম, কিন্তু পত্রখানা পাঠ করে বিস্ময়ের অন্ত রইলো না, একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস চাই। নীচে ফুটনোটে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে কিন্তু লাল কালিতে লিখিত আছে, আমরা বিলাতি কেতামতে লাইনগুণে সম্মান দক্ষিণা দিয়ে থাকি। হুররে! চীৎকার শুনে গৃহিনী এসে সমস্ত ব্যাপার শুনে 'মন উচাটন' শাড়ী দাবী করে বসলো। অবশ্যই দেবো! এ যে লাইনগুণে সম্মান দক্ষিণা। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের বিষয় স্থির করে ফেললাম 'হিড়িম্বা পরিণয়', ওর মস্ত সুবিধা এই যে, গল্পের মধ্যে হিড়িম্বা, হিড়িম্ব, বৃকোদর, ঘটোৎকচ প্রভৃতি যে সব পাত্র পাত্রীকে পাওয়া যাবে তারা সকলেই পূর্ণাঙ্গ। এদের সঙ্গগুণে আমার উপন্যাসখানাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। দেখা যাবে কি পরিমাণ সম্মান দক্ষিণা আছে সম্পাদকের তহবিলে। দিন-তিনেক পরে সশরীরে সম্পাদক এসে উপস্থিত হলেন। হাঁ তিনিও পূর্ণাঙ্গ বটেন। হিড়িম্বা পরিণয় উপন্যাসে অন্যতম পাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখেন সন্দেহ নাই।

লাইন প্রতি টাকাপ্রসূ হিড়িম্বা পরিণয় উপন্যাস যখন অনেকটা লিখে ফেলেছি তখন সম্পাদকের একখানা চিঠি এলো। তিনি বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কাগজ সম্বন্ধে নূতন অনুশাসন জারি করেছেন তার ফলে পত্রিকায় কাগজের 'কোটা' কমে গিয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে উপন্যাসের বদলে একটি বড গল্প পেলেই চলবে। অবশ্য এ রচনার জন্যেও লাইন প্রতি টাকা সম্মান দক্ষিণার ব্যবস্থা বলবৎ আছে। গৃহিণীর মন উচাটন শাড়ী আকাশে বিলীন হল। কিন্তু তবু আশা মরতে চায় না। জাতে বড় গল্প হলেও আয়তনে উপন্যাস করতে বাধা কি। অনেক সময়েই উপন্যাস ও ছোট গল্পের মধ্যে ব্যবধান কেবল টাইপের। পাইকাতে ছাপলে যা উপন্যাস, স্মল পাইকাতে ছাপলে তাই বড গল্প। কাজেই হিড়িম্বা পরিণয়ের মধ্যে থেকে ঘটোৎকচকে বাদ দিয়ে বড় গল্প রচনা করতে সুরু করলাম। অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি অশ্বত্থ-বৃক্ষের শক্ত একখানা ডালে বসে হিড়িম্বা ও বৃকোদর প্রেমালাপ করছে এমন সময়ে সম্পাদকের আবার একখানি চিঠি। বঙ্গভাল সরকার কাগজের কোটা আরও কমিয়ে দিয়েছে কাজেই

এবারের মতো একটা প্রকৃত ছোট গল্প হলেই চলবে। প্রকৃত ছোট গল্প কিনা ছোট হওয়া অত্যাবশ্যক গল্প না হলেও চলবে।

সম্মান দক্ষিণার ব্যবস্থা পূর্ববৎ। নাঃ হিড়িম্বার কাহিনী নিতান্তই বাদ দিতে হল, ছোট গল্পের নস্তের ডিবের মধ্যে ঐ সব পৌরাণিক বীর ও বীরাঙ্গনাদের স্থান কুলীন দৃঢ়প্রজ্ঞ হবে না। অগত্যা একটি আধুনিক কাহিনী নিয়ে ছোট গল্প সুরু করলাম। কিছু দূর অগ্রসর হয়েই বুঝলাম যে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বড় গল্প ছোট গল্প সবই টাইপের খেলা। ছোট গল্পকেই ওস্তাদ কম্পোজিটার মাঝখানে ডবল লেড দিয়ে, এম কমিয়ে দিয়ে, টাইপ বড় করে বড় গল্প বা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস করতে পারে। লেখক Necesary Evil মাত্র। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ছোট গল্পটি যখন ছোটত্বের সীমা লঙ্ঘন করবার মুখে তখন আর একখানি সম্পাদকীয় পত্র। কাগজের কোটা অসম্ভব রকম কমে গিয়েছে কাজেই এবারের মতো একটি রম্য-রচনা হলেই চলবে পাছে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ লিখে ফেলি তাই তিনি একটি বচন উদ্ধার করে দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করেছেন। Brevity is the Soul of Wit।

পূজ-সংখ্যার লেখক না পারে এমন কাজ নাই। সাত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস থেকে কেমন অনায়াসে রম্য রচনায় নেমে এলাম। অপরং কি ভবিষ্যতি? জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে একটি রম্য রচনা ফেঁদে বসেছি এমন সময়ে সম্পাদকের "গোপনীয়" পত্র। ওয়াকিবহাল মহলের খবর এই যে কাগজের কোটা শীঘ্রই আরও কমে যাবে তাই আর কালব্যাজ না করে যা হয়েছে যতটুকু হয়েছে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, অসম্পূর্ণ রচনারও একটি নিজস্ব মাধুর্য আছে, লেখা যদি সম্পূর্ণ না হয় চিন্তিত হবেন না। বাধ্য হয়ে ওমনি রচনাটি পাঠিয়ে দিলাম, কোটা নিয়ন্ত্রণবিধির লেখাটি অবশ্যই ছোট কিন্তু অসম্পূ নয়। এরূপ সম্পূর্ণ রচনা আমি আর লিখি নাই, অপরেও লেখে নাই, কারণ এর চেয়ে পূর্ণতর আর কিছুই হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

"মানুষ জন্মগ্রহণ করে, কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হয়।"

সম্পাদক খুশী, পাঠক খুশী, কেবল গৃহিণীর অসন্তোষের অন্ত নাই। এক-লাইনের রচনার সম্মান দক্ষিণা একটিমাত্র টাকা। তবু তিনি আর দখল

ছাড়েননি, কোটার কৃপায় প্রাপ্ত টাকাটি সযত্নে কৌটায় তুলে রেখে দিয়েছেন।

নীতি-কথা :—পূজাসংখ্যার লেখকের স্থিতিস্থাপকতা বিস্ময়কর। এক-মুহূর্তে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস থেকে এক-ছত্রের শুভাষিতে নেমে আসতে তিনি সক্ষম।

এক তাড়া নোট

কি পেলে ?

হুঁ।

শুধু হুঁ বললে সান্ত্বনা পাই কেমন করে, কত পেলে, কার কাছে পেলে, কি শর্তে পেলে খুলে বল না।

কোন শর্ত নেই।

তবে অমনি দিলে ?

অমনি কেউ দেয় !

তবে ?

তবে এই যে পাইনি।

তবে প্রথমে হুঁ বলেছিলে কেন ?

স্বামী অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, বলেছিলাম বেশ করেছিলাম, যতবার ইচ্ছে আমি বলব।

পত্নীও গলার সুর চড়িয়ে বলল, তখনই বলেছিলাম টাকা ধার করে পিসীমাসীকে তীর্থ ভ্রমণ করাবার মতলব পরিত্যাগ কর। বললে তা কি করে হয়, ওঁদের বয়স হয়েছে। এখন তো তীর্থ দর্শন করবারই সময়। নাও এখন ঠেলা সামলাও। কই কোন পিসী মাসীতো এগিয়ে আসছে না, বলছে না যে, বাবা এই টাকা ক'টা রাখ। তোমার তো এখন দুঃসময় চলছে। সামনে আবার পুজো। স্বামীকে নিরুত্তর দেখে স্ত্রী আরও ক্ষেপে উঠল। বলল, এদিকে ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্র টাকা ধার করা হল, আবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকেও ধার নেওয়া হল। এখন কি করবে শুনি ? ঘরে একটা পয়সা নেই, সামনে পুজো, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে।

বাধা দিচ্ছে কে ? বলে স্বামী চেঁচিয়ে উঠল।

বাধা দিচ্ছ তুমি। দড়ি কিনবার পয়সাটাও বাড়িতে রাখনি।

এমন সময় ছেলে দুটি, দুজনেই বালক, বছর দুয়েকের ছোট বড়। বিকেলে খেলতে বেরিয়েছিল। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে শাস্ত্রে নিষেধ কাজেই এতক্ষণের রুদ্ধ আক্রোশটা ছেলে দুটোর ওপর গিয়ে পড়তেই অনন্তকুমার সবেগে তাদের মাথা দুটো ঠুকে দিয়ে 'হতভাগা পাজি ছুঁচো পড়ার নাম নেই, কেবল খেলা! যা' বলে দুজনকে এমন ধাক্কা মারল যে

তারা সবেগে গিয়ে পড়ল মায়ের উপরে। পিতৃ-ক্রোধের ধাক্কা সামলাতে না পেরে জননী গিয়ে পড়ল বাসনগুলোর উপরে। কাঁসার বাসনগুলো কোরাসে ঝনঝন শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল, চীনামাটির—কাঁচেরগুলো পড়ে গিয়ে শত খণ্ড হয়ে গেল। মুহূর্তমধ্যে সবশুদ্ধ এক কাণ্ড। কিন্তু আবার শাস্ত্রে বলেছে অনেক সময় অমঙ্গল নাকি মঙ্গলের উৎস। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে সকলের চটকা ভেঙে গেল। ছেলে দুটো মাথার ব্যথা ভুলে বাসনগুলো তুলতে লাগল, মা কাঁচের ও চীনেমাটির ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োতে লাগল এবং বাপ একখানা হ্যালেনচা চেয়ারের উপর (সহৃদয় পাঠক হ্যালেনচা বলতে একরকম শাককে বোঝায় কিন্তু এখানে তার নূতন অর্থ সৃষ্টি করলাম, অর্থাৎ যে চেয়ারে হ্যালান দিয়ে বসা যায়। হেলেনচা শাককে অবহেলা না করে আপনারা এই অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করলে ছাপাখানার দেব্‌তাদের শ্রম হ্রাস পাবে) বসে পড়ে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলল, একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।

সংসারী পাঠক-পাঠিকামাত্রেই এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ কখনও না কখনও এরকম সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তবু যদি পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সন্ত সংসারী কেহ থাকেন তাঁদের অবগতির জন্তে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করছি, যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা সাবধান হতে পারেন।

অনন্তকুমার সরকারী অফিসে U/D কেরাণী অর্থাৎ L/D-র চেয়ে বেশী বেতন পান। সরকারের কোন্ অফিস এবং কি কাজ এ দুটি প্রশ্ন দয়া করে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। কেননা সরকারী অফিস যেখানেই হোক, যত বড়ই হোক সকলেরই এক স্বাদ এক গন্ধ। হাওড়া থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর কেউ এ নিয়মের বহির্ভূত নয়। আর কাজ? সত্য কথা বলতে কি রেশন সংগ্রহ, হরিণঘাটার দুধ সংগ্রহ, ইলেকট্রিক, টেলিফোন, কর্পোরেশন প্রভৃতির বিল দানে ক্লান্ত ভারতীয় নাগরিককে দুপুরবেলায় একটু বিশ্রাম দানের উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র ছোট বড় আপিসরূপ বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। সেখানে যাবতীয় কর্মী শ্রেণী ভেদ নির্বিশেষে বিশ্রাম করে, চা খায়, পান খায়, পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করে। প্রত্যেকেই সরকারী খরচে দশ-পনেরোটা টেলিফোন কল করে এবং এসব গুরুতর কাজ করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ভেণ্ডারের কাছ থেকে কাটা ফল কিনে সম্মুখের দেওয়াল সংলগ্ন "কাটা ফল খাবেন না, শহরে কলেরা লেগেছে" সতর্কবাণী পড়তে

পড়তে সেগুলি আত্মসাৎ করে। অবশ্য সত্যের খাতিরে বলতে হবে সরকারী কাগজে স্বকীয় ফাউণ্টেন পেনের স্পর্শ যে একবারে হয় না তা নয়। হাজিরা দেখিয়ে নামটি স্বাক্ষর করতে হয় আবার মাসের শেষে বেতন নেবার সময় পুনরায় সেই কাজ করতে হয়! সবশুদ্ধ মাসে পচিশ-ত্রিশটি স্বাক্ষরের বদলে যে বেতন পাওয়া যায় তা নিতান্তই নগণ্য। গুরু কাজে লঘু বেতন এ গুরুতর সমস্যার কখনও নিবৃত্তি হবে না। যাই হোক এবার নির্বিশেষ থেকে বিশেষে নেমে আসা যাক। অনন্তকুমার এক্ষেত্রে আমাদের অভিষ্ট।

গত বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি তার মাসী, পিসী একযোগে বাড়িতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে গাঁয়ের পুণ্যকামী স্ত্রীলোক। কয়েকদিন ধরে কলকাতায় যাবতীয় ছোট বড় মন্দির ও দেবদেবী দর্শন চলল, তারপরে তারা বলল, বাবা এ জন্যে তো আসিনি, আমাদের একবার গয়া, কাশী, বৃন্দাবন দর্শন করিয়ে দাও। তাদের কথা শুনে অনন্তকুমারের স্ত্রী ভাবল এ মন্দের ভাল। এই যে বাড়ির দুখানা ঘর জুড়ে আজ সপ্তাহ দুই পুণ্য-কামিনীগণ বিরাজ করছে এবারে হয়তো তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। কিন্তু হায়! মন্দের ভাল যেমন আছে, ভালর মন্দও তেমনি সমান ভাবে আছে। তখন যামিনীসুন্দরী কল্পনাও করতে পারেনি যে সব খরচটা তার স্বামীর উপরে পড়বে। পড়লও তাই। অশক্ত আত্মীয়স্বজনকে তীর্থ দর্শন করানো যে পুত্র বা তৎস্থানীয়দের অবশ্য কর্তব্য এই চিরকালীন নিয়মের প্রেরণায় সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থান থেকে, এমন কি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড উজাড় করে দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে ছোটখাটো একটি প্রমীলা বাহিনী সাজিয়ে অনন্তকুমার যাত্রা করল। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের তীর্থের সংখ্যা তো অল্প নয়। কাজেই সমস্ত সেরে যখন ফিরল তখন অনন্তকুমারের পুঁজি নিঃশেষ এবং দরজায় সযষ্টি কাবুলিওয়ালা।

॥ দুই ॥

এই ঘটনার পরে সকল পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই এবারে দ্বিতীয় অঙ্কের সূত্রপাত হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যামিনী এক পেয়ালা চা এনে স্বামার সম্মুখের টেবিলের উপরে রাখল। অনন্তকুমারের চা-এ নেশা, পান-সিগারেট সে স্পর্শ করে না, সকালে বিকালে, ছুটির দিনে দুপুরে চা তার চাই। আর একটি অদ্ভুত সময় তার চা পান। শেষ রাতে জেগে উঠে স্ত্রীকে ঠেলে দেয়—চা কর। স্ত্রী

হাতের কাছেই চায়ের সরঞ্জাম রেখে ঘুমোয়। যাই হোক সম্মুখে ধূমায়মান চা দেখে তার মনটা শান্ত হল। চা পান শেষ করে নীচু হয়ে যেই পেয়ালাটি রাখতে যাবে অমনি তার বুকপকেট থেকে সুতোয় বাঁধা একতাড়া কাগজ পড়ল। সেটা তুলে পকেটে রাখবার আগেই যামিনী হাতে তুলে নিল—এ কি, এ যে একতাড়া নোট। তবে এতক্ষণ পাওনি বলছিলে কেন? মিছিমিছি অস্বীকার করে কি কাণ্ডটাই করলে। এমনি যখন তখন নাটক করা তোমার স্বভাব হয়ে দাড়িয়েছে।

ছেলেদুটো এতক্ষণ কপালে হাত বুলিয়ে মাথার ব্যথার উপশম করছিল। নোটের তাড়া দেখে সমস্ত ব্যথা-বেদনা ভুলে তারা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ছোটটি বড়কে বলল, দাদা, তবে এবার আমাদের পুজোয় নূতন কাপড় হবে।

বাপ-মায়ের কথাবার্তা থেকে তারা বুঝতে পেরেছিল অর্থাভাবে এবার পুজোয় কেউ কিছু পাবে না। তাই এতদিন তারা মনমরা হয়ে ছিল।

এ যে দেখছি সমস্ত একশো টাকার নোট। কে দিলে গো?

যামিনীসুন্দরীর কণ্ঠে কর্কশতা মুহূর্তে দূর হয়ে মধু ঝরতে আরম্ভ করেছে, কত টাকা আছে?

গুণিনি।

বল কি? তোমার এমন বন্ধু আছে বলে তো জানতাম না, যে না গুণে দেয় আর তুমি না গুণে নাও।

বেশ তো এবারে তুমি গোণ না।

যামিনী ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ করে দিয়ে গুণতে বসল। এত টাকা জীবনে একসঙ্গে সে স্পর্শ করেনি। কাজেই "প্রথম পরশ ভীত" তার হাত কাঁপছিল। একবার গুণে হল পাঁচ হাজার, দ্বিতীয়বার গুণে হল সাড়ে পাঁচ হাজার, তৃতীয়বারের গণনায় দাঁড়াল চার হাজার সাতশ। তখন নিরুপায় হয়ে শুধাল, কত আছে বল না?

অনন্ত উদাসীনভাবে বলল, ঐ রকম একটা কিছু হবে।

স্বামীর উদাসীনতা সে ঠিক ধরতে পারল না। কতকটা স্বগতভাবে কতকটা তাকে শুনিয়ে বলতে লাগল, এতে দেনা শোধ তো হবেই, তাছাড়া সারা বছরের কাপড়-চোপড় হয়েও যথেষ্ট বাকী থাকবে। চল না একবার চারজনে মিলে কাশ্মীর ঘুরে আসি।

স্বামী আবার তেমনি উদাসীনভাবে বলল, বেশ তো!

তোমার যেন কিছুতেই উৎসাহ দেখছি না। আচ্ছা, টাকাটা পেলে কোথায় বল তো। আবার ধার শোধের জন্যে ধার করলে নাকি? না কেউ অমনি দিলে? স্বামী যে চুরি করবে না এ বিষয়ে সে এমনি নিশ্চিত ছিল, যে ও প্রশ্নটা আর করল না।

এত পীড়াপীড়ির পরে আর চুপ করে থাকা চলে না, তাই অনন্ত বলল, রাস্তায় পড়ে পেয়েছি।

স্ত্রী খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, এত টাকা কেউ পড়ে পায়? আবার নাটুকেপনা আরম্ভ হল দেখছি।

সত্যি বলছি, পড়ে পেয়েছি। হঠাৎ আলো-আঁধারিতে পায়ে কি একটা ঠেকল। তুলে দেখি একতাড়া নোট। ভাবলাম আপাতত পকেটে থাক, তারপরে দেখা যাবে।

দেখা আর কি যাবে। তোমার অভাব বুঝে ভগবান দিয়েছেন।

অভাবী লোক সংসারে তো আমি একা নই।

তাদের ভাবনা তো তোমার নয়।

না যামিনী, ও টাকা নেওয়া চলে না, ফেরত দিতে হবে।

কাকে দেবে?

ধর থানায়।

বেশ হবে। তারা ভাগযোগ করে নেবে। পূজার আগে সেটা মন্দ হবে না।

সে দায় আমার নয়।

আসল লোকটি যদি না পেল তবে যাকে-তাকে বিলিয়ে দিয়ে কি লাভ?

ধর সংবাদপত্রে যদি বিজ্ঞাপন দিই।

চমৎকার হবে। পরদিন ভোরবেলা পাঁচ হাজার লোক বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াবে। কাকে দেবে তখন?

যে প্রকৃত মালিক।

প্রত্যেকেই বলবে সে-ই টাকার প্রকৃত মালিক। টাকায় তো আর কারুর নাম ধাম লেখা নেই।

যদি ধর কোন প্রতিষ্ঠানে দান করে দিই।

তাহলে আরও বেশি বিপদ। যে লোক না চাইতেই পাঁচহাজার টাকা দান করে তার না জানি কত টাকা। দিবারাত্রি উমেদারীর জ্বালায় বাড়িতে

টিকতে পারবে না।

কিন্তু তাই বলে এ টাকা তো নেওয়া যায় না।

তুমি তো নাওনি। ভগবান তোমার অভাব দেখে পায়ের কাছে এনে দিয়েছেন।

ভগবানের দান ঠেলতে নেই বলে নোটের তাড়াটা যামিনী কপালে ঠেকাল।

আচ্ছা আপাতত বাক্সে পুরে রেখে দাও। ভেবে দেখা যাক কি করা যায়। ক্লান্ত অনন্তকুমার হ্যালেনচা চেয়ারে বসে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে ছেলেদের অঙ্ক কষতে নির্দেশ দিয়ে টাকাটা বাক্সয় তুলে রেখে যামিনী খরচের তালিকা করতে বসল। অনেক প্রকারে হিসাব করে দেখল সমস্ত দেনা শোধ করে, পূজার কাপড়-চোপড় কিনেও দু'হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। চারজনের কাশ্মীর ভ্রমণে কত টাকা লাগে সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা তার না থাকায় মনকে সান্ত্বনা দিল একরকম করে কুলিয়ে যাবে।

শেষ রাত্রে অনন্তকুমার স্ত্রীকে জাগিয়ে বলল, দেখ টাকাটা বাড়িতে এনে অব্দি শান্তি পাচ্ছি না। সারারাত ঘুমাতে পারিনি।

সে কথা আমি বলতে পারি। কারণ তোমার নাক ডাকার শব্দে ঘুম যদি কারও না এসে থাকে তবে সে আমার।

দেখ, অধর্মের টাকায় কখনও মঙ্গল হয় না।

তবে দেনার দায়ে জেলে যাও।

জেলেই বা যাব কেন? একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আরে ব্যবস্থা তো স্বয়ং বিধাতাপুরুষ করে দিয়েছেন।

না, এটা পরীক্ষা।

সবগুলো পরীক্ষাতেই তো পাশ করেছ। না হয় একটাতে ফেল করলে। পাপের টাকায় কখন কারও ভাল হয়েছে শুনেছ?

শুনতে হবে কেন, চোখের উপরে দেখছি।

কী রকম?

ঐ যে মোড়ের উপর বাড়িটা ছিল ভাঙা একতলা দেখতে দেখতে চারতলা হয়ে গজিয়ে উঠল। কোন্ পুণ্যের টাকায়? সর্ষের তেলে ভেজাল মিশিয়ে, রেশনে চালওয়ালাদের জন্যে পাথরকুচি বেচে ওর টাকা—কে না জানে। আর ঐ যে মাষ্টারবাবু পরীক্ষকদের দরজায় দরজায় ঘুরে টাকা

নিয়ে ছাত্রদের নম্বর বাড়িয়ে বেড়ান—সেটা বুঝি খুব ধর্মের টাকা হল ?

অনন্ত বলল, থাক পরের কথা নিয়ে আর আমাদের কাজ কি, এখন ঘুমোতে চেষ্টা করা যাক।

তুমি তো আমার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ, তার চেয়ে আমি যে তালিকাটা করেছি সেটা বরঞ্চ শোন।

পরে শুনব, এখন গোলমাল কর না, ছেলেরা সব শুনতে পাবে। নাও ঘুমাও।

তিন

আজ সাতদিন অনন্তকুমারের চোখে ঘুম নেই, মুখে ভাত নেই আপিসে যায় বটে তবে ম্রিয়মান উদাসীনভাবে বসে থাকে। সহকর্মীরা জিজ্ঞাসা করে যায়, তোমার হল কি হে! বাড়ির খবর সব ভাল তো। আসল কথা ঐ নোটের তাড়া তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে সাতদিন হয়ে গেল কেউ সন্ধান করলে না, সংবাদপত্রেও কোন বিবরণ নেই, তবে ওটা এখন খরচ করা যেতে পারে। ও মনে মনে খরচ করবার ও না করবার হিসেব করেছে। সাহস করে খরচ করতে পারলে একসঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সমস্ত দেনা শোধ, পূজার কাপড় এবং খুচরো ধার মিটিয়েও যা হাতে থাকে তা দিয়ে কাশ্মীর না হোক কাশী-বৃন্দাবন ঘুরে আসা অসম্ভব নয়। অন্য পক্ষে সোজাসুজি এ চুরির টাকা। সিঁদ কেটে নেওয়া হোক আর পথ থেকে কুড়িয়েই নেওয়া হোক, একে চুরি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তারপরে চুরিটা মনের পাপ, আর সেই চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে রাজার দণ্ডাধীন হতে হবে। মামলা মোকদ্দমা, সংবাদপত্রে প্রকাশ, জেল, যায় চাকরি খতম। এই দোটানায় পড়ে তার স্বস্তি, শান্তি সমস্ত গিয়েছে। রাতের বেলা ঘুম আসে না, পথে কোন ভারী জুতোর শব্দ শুনলেই বুক ধড়-ফড় করে ওঠে এই বুঝি পুলিসে খানাতল্লাসী করতে এল। দিনের বেলা কোন অপরিচিত লোক মুখের দিকে তাকালেই মুখ শুকিয়ে ওঠে, এই বুঝি মনের কথা জানতে পেরেছে। একবার মনে হয় একশো টাকার নোটগুলাকে বদলে দশ-পাঁচে পরিণত করলে প্রমাণ লোপ হয় বটে। আবার ভাবে এতটাকা ভাঙাতে গেলেই তো লোকে সন্দেহ করে বসবে। সেদিন দুপুর-বেলা বাইরের ঘরে শুয়ে আছে এমন সময় বাইরে ভারী জুতার আওয়াজ শুনে ভাবল পুলিসের লোক। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিল। সম্মুখে কাবুলি-

ওয়ালা রহিম খাঁ। এর চেয়ে বোধ করি পুলিসের লোক ভাল ছিল। দু'মাসের সুদের টাকা গুঁজে দিয়ে তাকে কোনরকমে বিদায় করে দিল। ওদিকে স্ত্রী এসে বারে বারে তাগিদ দেয়, চল না, পূজার কাপড়গুলো কিনে আনি এরপরে দাম বেড়ে যাবে।

অনন্ত বলে, না, ও টাকা খরচ করা চলবে না।

তবে কি আমি খক্ষি হয়ে আগলাব?

না, আগলাতেও হবে না, আমি দান করে দেব ভাবছি।

দাতাকর্ণ এলেন আর কি! তারপর আরও যেসব কথা যামিনীসুন্দরী বলল তা নিতান্ত সাধ্বী পত্নী ছাড়া আর কেউ বলে না স্বামীকে।

বিকেলবেলা ছেলে দুটো পূজার কাপড়ের বাহানা করতে এসে এমন মার খেল। যাকে মার বলে আর কি।

ছেলেদের আর্তস্বর শুনে গৃহিণী এসে পড়ল স্বামীর উপর। তার রাগের বিশেষ কারণ ছিল সন্দেহ নেই। কেননা সে-ই খুঁচিয়ে ছেলে দুটিকে বাপের কাছে আবদার করতে পাঠিয়েছিল। এখন স্বামী-স্ত্রীর উচ্চকণ্ঠে বচসা এবং পুত্রদ্বয়ের উচ্চতর কণ্ঠে আর্তনাদ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল যা কল্পনা করা সম্ভব হলেও কলমে প্রকাশ সবসময়ে সম্ভব নয়। অবশেষে পরাভূত অনন্ত-কুমার চটি চাদরহীন অবস্থায় দৌড়ে বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। প্রতি-বেশীরা ভাবল নিশ্চয় অনন্তর বাড়িতে কারও গুরুতর অসুখ, লোকটা ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে। তাই প্রতিবেশীর কর্তব্য হিসাবে অনন্তর বাড়িতে এসে শুধাল কার অসুখ?

এমনিভাবে তাদের দিন চলতে লাগল। কিন্তু সুখ-দুঃখ কোনটাই চিরস্থায়ী নয়। একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সমস্যার সুসমাধান হয়ে গেল। শেষ রাতে উঠে অনন্তকুমার চা খেতে চাইল, অল্পক্ষণের মধ্যেই যামিনীসুন্দরী গরম চায়ের পেয়ালা তার হাতে তুলে দিল।

স্বামী শুধালো, এত অল্প সময়ে চা করলে কি করে?

কাগজ পুড়িয়ে।

এত কাগজই বা পেলে কোথায়?

দেখবে এস -বলে স্বামীর হাত ধরে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

একরাশ ভস্মীভূত কাগজ, এখনও আগুনের আভা সব নিভে যায়নি।

স্বামী শুধাল, এ কী!

চাপা গলায় যামিনীসুন্দরী বলল, সেই নোটগুলো।

বিস্মিত অনন্ত শুধাল, হঠাৎ এ মতি হল কেন?

তবে শোন—বলে স্বামীকে পাশে টেনে নিয়ে বসাল। কাল সন্ধ্যের পাশের ঘরে ছেলেরা চুপি চুপি কথা বলছিল, আমি এ ঘর থেকে শুনতে পেয়েছি।

ঘেণ্টু বলল, বাবা কাপড় কিনছে না কেন জানিস?

মিণ্টু বলল, খুব জানি। ওটা চুরির টাকা, তাই পুলিসের ভয়ে বের করতে সাহস করছে না।

অনন্ত শিউরে উঠে বলল, হায় ভগবান, ছেলেরাও শেষে চোর ভাবল। কিন্তু ওরা জানল কি করে?

স্ত্রী বলল, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে রাতের বেলায় আমরা যখন আলোচনা করতুম, তখন নিশ্চয় শুনেছে।

হ্যাঁ, তাছাড়া আর জানবে কি করে। যাক বাঁচা গিয়েছে, ওদের কথা না শুনতে পেলে এ পাপ বিদায় করা কঠিন হত।

একটু থেমে তারপরে আবার বলল, যামিনী তোমার হাতের চা বরাবর মিষ্টি হয় কিন্তু এমন মিষ্টি চা এর আগে আর কখনও খাইনি। এই বলে সে আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর। (দ্রষ্টব্য বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাস)।

কোই বাৎ নেহি

অনেক হাজার বছর সশরীরে স্বর্গবাস করে পৈতৃক রাজ্য দেখবার ইচ্ছা হলো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মনে। তিনি একদিন অলকানন্দার তীরে সন্ধ্যাবেলা পায়চারী করতে করতে ভাবলেন যে বৃহৎ সাম্রাজ্য ফেলে এসেছিলাম, না জানি কি তার দশা হয়েছে। পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে ছিলাম বটে তখনও সে নিতান্ত নাবালক ছিল, রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করবার শক্তি ছিল কিনা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ হয়নি। এখনওকি তার বংশধরেরা সেই সিংহাসনে আসীন কিম্বা অন্য কোন বংশ তাদের তাড়িয়ে দিয়ে সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছে। সিংহাসন কখনও শূন্য থাকে না বটে তবে তার অধিকারী ঘন ঘন বদলায়। দুর্গপ্রাকার পরিখাবেষ্টিত ইন্দ্রপুরীসম ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে উন্নতি হয়েছে কিম্বা আজ তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত কে

জানে। আমার সময়ের রাজপুরুষগণ অবশ্যই অনেককাল গত হয়েছেন। এখনকার রাজপুরুষগণ কি তেমনি কর্তব্যনিষ্ঠ, আদর্শবান, সত্যপরায়ণ ও কর্মকুশলী। আমার সময়ে যেমন অখণ্ড শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল এখনও কি তেমনি আছে। আর প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে কিম্বা তারা রাজপুরুষগণ কর্তৃক অবহেলিত ও প্রবলগণ কর্তৃক উৎপীড়িত কে বলতে পারে। যেমনই হোক একবার দেখে আসতে ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে। এইরকম চিন্তা করতে করতে যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো স্বভবনে ফিরে এসে চার ভাই ও দ্রৌপদীকে মনের ইচ্ছা তিনি জ্ঞাপন করলেন। বললেন, তোমরা কেন চল না আমার সঙ্গে।

মধ্যম পাণ্ডব ভীম বললো, মহারাজ আপনার কাণ্ডজ্ঞান কবে হবে? আবার সেই দগ্ধ পৃথিবীতে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন। রাজত্ব লাভের আশায় যে দুর্ভোগ সকলে সহ্য করেছি তাকি ইতিমধ্যেই সকলে ভুলে গেলেন। লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর ফলে যে রাজ্য লাভ করলেন তা কি ভোগ করতে পারলেন? দেশব্যাপী মৃতদেহ পূতিগন্ধে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে আসবার পথ পেলেন না, যদিচ সুবিবেচক ব্যাসদেব কথাটা চেপে গিয়েছেন। অলংকার দিয়ে লিখেছেন যে বৈরাগ্যই আমাদের রাজ্য ত্যাগের কারণ। ওসব ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন, যেমন আছেন থাকুন, সুখে থাকতে ভূতের কিল যাচ্ঞা করবেন না।

অর্জুন বললো, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি, শুধু ফলের আশা পরিত্যাগ করিনি। শিকড ডালপালা শুদ্ধু সমস্ত গাছটারই আশা ছেড়ে দিয়েছি। আমি বেশ আছি, আমার কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই।

নকুল ও সহদেব একযোগে বলে উঠলো, মাইরি বড়দা আরো ভোগাবার ইচ্ছা আছে দেখছি আপনার মনে। আপনার যেখানে খুশী যান, আমরা তোকা আছি।

দ্রৌপদী বললো, আর্যপুত্র তোমার কাণ্ডজ্ঞান কবে হবে? তোমার সঙ্গে গিয়ে আবার কি পাশাখেলায় বাঁধা পড়বো, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আপনি ও মতলব পরিত্যাগ করুন।

ভ্রাতৃগণ ও পত্নীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির অতিশয় দুঃখিত হলেন তবে সংকল্প পরিত্যাগ করলেন না। যুধিষ্ঠির যতই শান্তশিষ্ট ও ধর্মভীরু

হোন না কেন একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিলেন তার হাজারো দৃষ্টান্ত মহাভারতে লিখিত আছে। তিনি স্থির করলেন যে পরদিন প্রাতেই ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। মনে পড়লো তাঁর আমলে অন্তত দুজন লোক অমরতার সুবাদে এখনও পৃথিবীতে আছে। অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য অমর। কোন গুণে যে তাঁরা অমর, আর সকলে মারা গেলেন এসব গূঢ় তত্ত্ব সাধারণ লোক দূরে থাকুন অসাধারণ লোকেরও বুদ্ধির অতীত।

যুধিষ্ঠির ভাবলেন আগে তাঁদের গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে তারপর তাঁদের নিয়ে চারদিক ঘুরে দেখলেই হবে।

তখন মনে পড়লো তাঁদের কি চিনতে পারবেন, এতকাল পরে নিশ্চয় তাঁদের চেহারার বদল হয়েছে তবু ভরসা হলো বহুকালের চেনালোক বুঝতে ভুল হবে না। তখনই অশ্বত্থামার মাথায় একটু টাক দেখা গিয়েছিল, এখন তা নিশ্চয় সমস্ত শিরোমণ্ডল অধিকার করে নিয়েছে। আর কৃপাচায্য নিশ্চয় তাপসোচিত দাড়ি রেখেছে। তাঁরা অবশ্যই ইন্দ্রপ্রস্থের আশেপাশেই কোথায় আছেন, চেষ্টা করলেই খুঁজে বের করা যাবে। এইভাবে মনস্থির করে পরদিন প্রাতঃকালে ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করলেন এবং দীর্ঘতর পথ অতিক্রম করে অবশেষে আনুমানিক ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থের কাছে এসে পৌঁছলেন।

(২)

চারদিক নিরীক্ষণ এবং একটি প্রমাণ সাইজ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে যুধিষ্ঠির ভাবলেন অহ কালস্য কুটিলা গতি। এ যে সমস্তই অচেনা অজানা, সেদিনকার কোন চিহ্ন কোথাও আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। রাজপথে ঐ যে শকট চলছে তার অশ্ব কোথায়? আর ঐ যে বাষ্প উদ্গীরণ করতে করতে গাড়িগুলি চলছে ও কোন শক্তিতে? আকাশে ঐ সব উড্ডীয়মান ওগুলো কি পুষ্পক বিমান। আর চারদিকে এই যে সব মেঘস্পর্শী অট্টালিকা এগুলিতে কারা বাস করে। আমার রাজত্বকালে ঐশ্বর্যের অন্ত ছিল না, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি সে সব প্রাসাদেরা এদের কাছে কুটীরের মত। তিনি ভাবলেন প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ নিশ্চয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। একবার মনে হলো ভ্রাতাদের কথাই ঠিক, আর অগ্রসর হয়ে কাজ নেই, ফিরে যাওয়াই ভাল। তারপরে ভাবলেন এতদূর যখন এসেই পড়েছি অশ্বথামা ও কৃপাচার্য্যের সন্ধান করা যাক। তাঁদের দেখা পেলে আরও অনেক রহস্য জানতে পারা যাবে।

তখন তিনি দিল্লীর আশে পাশে (জনৈক ব্যক্তির কাছে শুনে নিয়েছিলেন প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের নাম এখন দিল্লী) তাদের সন্ধান করতে লাগলেন। অনেকে তাঁর কথা বুঝতে পারে না, যারা বুঝতে পারে সরকারী গোয়েন্দা বা শত্রুচর বলে মনে করে, অধিকাংশ লোক ভাবে লোকটা পাগল। একজনকে তিনি বলেছিলেন যে একসময়ে এ রাজত্ব আমার ছিল, উত্তর পেয়েছিলেন, কতদিন হলো ছাড়া পেয়েছো? আমাকে যখন পাগলা গারদে নিয়ে যায় তখন মনে হতো সমস্ত পৃথিবীটা আমার রাজত্ব। এইভাবে নানা ঘটনাচক্রের মধ্যে আবর্তিত হতে হতে অবশেষে একদিন তাঁর আশা সফল হলো।

দিল্লী শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে স্বরজ কুণ্ড নামে এক প্রাচীন জলাশয় আছে, পাথরে বাঁধানো তার ঘাটগুলো দেখলে প্রত্যয় হয় যে একসময়ে এখানে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল আর নামের দ্বারা বুঝতে পারা যায় হয়তো বা তীরেই সূর্যদেবের মন্দির ছিল। এখন সেসব কিছুই নেই। সমস্তই রিক্ত, পরিত্যক্ত, জনশূন্য। কেবল জলাশয়টি একচক্ষু দানবের চোখের মত জলজল করছে।

যুধিষ্ঠির পিপাসার্ত হয়েছিলেন, জলপানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবেন এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির যে।

যুধিষ্ঠির এদিক ওদিক তাকালেন, কাউকে দেখতে পেলেন না, আবার শুনলেন, অন্য একটি কণ্ঠ বলে উঠলো, কি সৌভাগ্য, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

যুধিষ্ঠির বললেন, তোমরা কে, তোমাদের তো দেখতে পাচ্ছি না, আমাকেই বা চিনলে কিরকমে তাও বুঝতে পারছি না।

তখন তিনি দেখলেন যে একটি ঝোপের মধ্যে থেকে দুটি মানুষ বেরিয়ে এল।

জয় হোক মহারাজের বলে তারা হস্ত উত্তোলন করলো।

ব্রাহ্মণ দেখে যুধিষ্ঠির দুজনকেই প্রণাম করলেন। বললেন, আমি তো চিনতে পারছি না।

তখন তারা পরিচয় দিল।

আমি অশ্বত্থামা।

আমি কৃপাচার্য্য।

কি আশ্চর্য! চেনা উচিত ছিল তবে চিনবো কি করে? অশ্বত্থামা, তোমার টাক গেল কোথায়?

অশ্বত্থামা বললো, মহারাজ, টাকের কোন অপরাধ নাই। সমস্ত মাথায় আপন আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছিল। অবস্থা এমনই হয়েছিল যে পাকা বেল মনে করে কাকে এসে ঠোকরাতো, তখন এক বৈদ্যের কৃপায় টাকনাশক তেল ব্যবহার করে চুল গজালো।

এবারে কৃপাচার্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচার্য আপনার দাড়ি এরকম যৌবনোচিত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো কি করে?

সলজ্জভাবে কৃপাচার্য্য উত্তর করলেন, তুনম্বর বাদশাহী কলপের কৃপায় মহাশয়।

কিন্তু আমাকে চিনলে কি করে তোমরা?

অশ্বত্থামা বললো, ও চেহারা কি ভুলতে পারি। এত হাজার বছরেও কিছুমাত্র টস্‌কায়নি। তেমনি নাদুস-নুদুস ভাব, মুখে সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বাসপরায়ণতা ও নির্বুদ্ধিতার ছাপ—একি ভুলবার।

কৃপাচার্য জিজ্ঞাসা করলো, তা এতদিন পরে মহারাজের প্রত্যাবর্তনের কারণ কি?

ছেড়ে যাওয়া রাজত্বটা দেখবার ইচ্ছায় এসেছি। তোমাদের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই অনেক খোঁজাখুঁজি করে আজ হঠাৎ তোমাদের সাক্ষাৎ পেলাম।

তখন তিনজনে একত্রে ছায়ায় বসে কুশল সংবাদ আদান প্রদান চললো অনেকক্ষণ ধরে। যুধিষ্ঠির স্বর্গীয় পাণ্ডব ও কৌরবদের সংবাদ সংক্ষেপে দিয়ে বললেন, স্বর্গের বিবর্তন নেই কাজেই সংবাদও নেই। আছে অফুরন্ত একঘেয়ে জীবন। তোমাদের খবর কি এবার বলো।

অশ্বত্থামা বললো, পৃথিবীতে ঠিক উল্টো। এখানে বিবর্তনের গতি এত দ্রুত যে সংবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন সংবাদ। প্রত্যেকদিন একখানা করে মহাভারত লেখা চলে।

কিন্তু মহারাজ এখানে বসে থাকলে কিছুই জানতে পারবেন না। চলুন দিল্লী শহরের দিকে যাওয়া যাক।

ইন্দ্রপ্রস্থের বর্তমান নাম বুঝি দিল্লী?

ইন্দ্রপ্রস্থের নাম এখন পুরানা কিলবার্গ, ওখানে এখন ইঁদুর বাঁদরের বাস,

বর্তমান রাজধানীর নাম নয়া দিল্লী।

যুধিষ্ঠির শুধালো তবে কি আরও দিল্লী আছ নাকি?

আছে বৈকি! অন্ততঃ আরো পাঁচ সাতটা দিল্লীর ধ্বংসাবশেষ আছে। চলুন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাজধানীর দিকে যাওয়া যাক, সেখানে দুশো মজা দেখতে পাবেন।

তখন তিনজনে নূতন দিল্লীর দিকে রওনা হলো।

(৩)

বাস ছুটে চলেছে হরিয়ানা রাজ্য পেরিয়ে দিল্লীর দিকে। দিল্লীর সীমানায় প্রবেশ করে বাস যতই চলতে লাগল, বাড়তে লাগল আরোহীর সংখ্যা। শেষে যখন কালকাধি পেরিয়ে কৈলাশ হয়ে রাজপথ নগরের ষ্ট্যাণ্ড-এ এসে দাঁড়ালো, তখন আর তিলার্ধ স্থান নেই। যুধিষ্ঠির ও তাঁর দুইজন সঙ্গী আগেই বসে ছিলেন, তাঁরা কোনরকমে স্ব-স্থানে টিকে গেলেন, বাস যখন দ্রুত ছুটছে এমন সময় একজন যাত্রী বাস থেকে পড়ে মাথা ফেটে জখম হ'লো।

যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন, হা হা রোখো রোখো।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে নির্বিকার কণ্ঠে বললো, কোই বাৎ নেহি।

যুধিষ্ঠির তো অবাক! অশ্বথামা কানে কানে বললেন, মহারাজ, ড্রাইভার যা বললো তার অর্থ বুঝলেন কি? ওর মানে হচ্ছে এমন খুনজখমে কিছু আসে যায় না।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের সময় তো এমন ছিল না।

সময় বদলেছে মহারাজ, আরো দেখতে পাবেন।

বাস যখন দরিয়াগঞ্জে প্রবেশ করলো যুধিষ্ঠির দেখলেন রাস্তার বাঁদিকে ফুটপাতের উপরে দুজন লোক ছোরা নিয়ে পরস্পরকে খুন করবার চেষ্টা করছে, কেউ বাধা দিচ্ছে না, কাছেই পুলিশ দাঁড়িয়ে, সেও নিশ্চল। যুধিষ্ঠির পার্শ্ববর্তী একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের কেউ থামাচ্ছে না কেন?

সে লোকটি এরকম প্রশ্নে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো কোই বাৎ নেহি। চাঁদনি চকে কাউণ্টেনের কাছে বাস এসে থেমে গেল। সকলে নামলো, কাজেই যুধিষ্ঠিরদের তিনজনকেও নামতে হলো।

যুধিষ্ঠির শুধালেন, এখন কোথায় যাওয়া যায়?

অশ্বত্থামা বললেন, চলুন রাজধানী দেখে আসি।

কি আমার সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নাকি!

না মহারাজ সে তো এখন ধ্বংসাবশেষ। নিতান্ত অরণ্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি বলে অরণ্যের পশু জুটিয়ে এনে সেখানে একটা চিড়িয়াখানা খুলেছে। এ রাজধানী হচ্ছে আধুনিক কালের।

তখন তারা একখানা ট্যাক্সি ঠিক করে তাতে উঠে বসলেন (টাকাকড়ি কোথায় পেলেন এসব অবান্তর প্রশ্ন পাঠক মহাশয় না তুললেই বাধিত হবো, কেবল স্মরণ করিয়ে দিই যে এদেশে টাকার অভাবে মহৎ কার্য বাধাপ্রাপ্ত হয় না)।

কলটপ্লেস ও সরকারী আপিসগুলির উচ্চতা, বিশালতা ও সমারোহ দেখে যুধিষ্ঠিরের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ভাবেন এসব না জানি কোন ময়দানকে তৈরী করেছে।

একটি বৃহদাকার গোলাকৃতি সৌধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অশ্বত্থামা বললেন মহারাজ ঐ বাড়িটার নাম 'সাচ্ কোঠি'।

যুধিষ্ঠির শুধালেন এই অদ্ভুত নামের অর্থ কি?

কৃপাচার্য বললেন, ঐ বাড়ির এমন মহিমা যে ওর ভিতরে দুঃশাসন শকুনির মতো জাত মিথ্যেবাদী ঢুকলেও তাদের মুখ দিয়ে সত্য কথা ছাড়া আর কিছু বেরোবে না।

তবে কি ওটা সত্য কথা বলবার পরীক্ষাগৃহ?

তা জানিনে মহারাজ, কিন্তু বাইরে যারা একশোটা বাক্যের মধ্যে একশো পাঁচটা মিথ্যে বলে, ওই বাড়িতে প্রবেশ করে স্থান মাহাত্ম্যে তারা সত্যবাদীতায় আপনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

অশ্বত্থামা বললেন, মহারাজ চলুন না ভিতরে ঢুকে সত্যভাষণ শুনে কান দুটো পবিত্র করি।

যুধিষ্ঠির বললেন, না ভায়া, দুঃশাসন শকুনির মিথ্যাতে অভ্যস্ত হয়েছি, তাদের সত্যভাষণ সহ্য হবে বলে মনে হয় না।

এইভাবে সারাটা দিন দিল্লী এবং তার চারদিকে তাঁরা ঘুরে দেখলেন। দেখলেন যে দোকানে বাজারে নির্লোভ সাধু দোকানিগণ কেনা দামের চেয়ে কম মূল্যে জিনিস বিক্রয় করছে। দেখলেন যে অফিসে করনিকদল

গাছতলায় বসে কাজের সময়েই গল্পগুজব করছে। দেখলেন যে অফিসারগণ পানশালা ও ভোজনালয়ে বসে অনুপস্থিত উচ্চতর অফিসারগণের নিন্দা করছে। দেখলেন যে বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ সদলবলে শিক্ষকদের তাড়া করে নিয়ে চলেছে, শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের তাড়া করেছে, কর্তৃপক্ষগণ মন্ত্রীদের তাডা করবার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করলেও কার্যত পারছে না, কারণ হালে এক নূতন প্রথা হয়েছে যে প্রত্যেক মন্ত্রী লোহার গরাদ দেওয়া একটি চলমান খাঁচার মধ্যে অবস্থিত থাকেন। যে জায়গা তাঁদের পরিদর্শন করবার ইচ্ছা থাকে আগে পুলিশ গিয়ে মৃদু যষ্টিচালনা করে তা জনশূন্য করে তোলে, তখন মন্ত্রী গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন, রিপোর্ট লেখেন সমস্ত শান্ত, কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, সানন্দে শেষ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন: কোই বাৎ নেহি। এত বাধা ও আয়োজন সত্ত্বেও পাছে কেউ ওই খাঁচার উপরে আক্রমণ করে তাই প্রত্যেক খাঁচায় ইংরেজী ভাষায় লিখিত আছে—

'Please don't poke the animal',

কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে দেখতে পেলেন শত শত ছোটবড় মিছিল ও তাদের জয়ধ্বনি। মিছিল সমবেতকণ্ঠে যা বলছে তার মধ্যে একটি শব্দমাত্র বোধগম্য হচ্ছে—'চাই'।

যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সকলেই তো চাইছে কিন্তু কি চাইছে তাতো বোঝা যাচ্ছে না।

মহারাজ ঐখানেই তো বয়ানের মুন্সিয়ানা। কি চাই বোঝা গেলে জুটে যেতেও পারে, তাই সেটাকে ইচ্ছে করেই অস্পষ্ট রাখা হয়েছে।

তবে কি দাবীপূরণ হোক ওদের ইচ্ছা নয়।

জনতার ইচ্ছা হতেও তো পারে, তবে যারা অদৃশ্য থেকে জনতাকে চালনা করছে তাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছা নয়। তারা চায় যে আন্দোলন চলতে থাকুক, দাবী যেন কখনও পূরণ না হয়।

এতো অদ্ভুত মনঃস্তত্ত্ব!

মোটেই অদ্ভুত নয় মহারাজ। মনে স্মরণ করে দেখুন যে আঠারো অক্ষৌহিনী লোক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল কৌরব বা পাণ্ডব যেই রাজ্য লাভ করুক তাদের কিছু লাভ হতো কি? কৌরবে পাণ্ডবে মিলিয়ে একশো পাঁচ জন। এই একশো পাঁচজনের রাজ্যলাভের উদ্যোগে মরলো সারা ভারতের ক্ষত্রিয়। তাদের কয়জন জানতো যুদ্ধের আসল কারণ। কারণটা

বলেছিলেন স্বর্গে মানুষ যা কামনা করে পৃথিবীতে নিজ নিজ ঘরে বসেই আমাদের আয়ত্তের মধ্যে তা আসবে। এই অসম্ভব সম্ভব হবে অনায়াস মন্ত্রবলে কেবল যদি আমরা প্রাণটুকু দিই। (অবশ্য কৌরবগণও ঠিক এই চিত্র অঙ্কিত করেছিল যদি সিংহাসনে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়) আমরা আপনাদের রাজকীয় ভাঁওতায় ভুলে স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ি জোত-জমি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে একমাত্র যে ঐশ্বর্য আমাদের হাতে ছিল সেই প্রাণটুকু আপনাদের জন্যে দিয়েছিলাম। আপনারা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে কৌরবগণ সিংহাসনে বসলে দেশ শ্মশান হবে, শৃগালের উৎকট রবে কর্ণ বধির হবে, না থাকবে খাদ্য, না থাকবে বস্ত্র, নদ-নদী শুকিয়ে যাবে, শস্যক্ষেত্র চিরন্তন অজন্মার শোষণে মরুভূমিতে পরিণত হবে, সত্যের গলাটিপে মেরে ফেলে অজেয় মিথ্যা ভারতভূমিতে অতিকায় মূর্তিতে বিচরণ করতে থাকবে।

সেই ছায়াবাহিনী বলে চললো আর যুধিষ্ঠির ভাবতে লাগলেন এরা কারা, এরা কি বাস্তব না অতীতের মরীচিকা? ভাবতে লাগলেন এসব কি শুনছি, কানের শ্রুতি না মনের ভাবনা।

মহারাজ আমাদের প্রাণদান সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আপনারা রাজ্য পেয়েও ভোগ করতে পারেননি, ভারতব্যাপী শ্মশানের ধূমে আপনাদের চোখ ভিন্ন হয়েছিল, ভারতব্যাপী অসংস্কৃত মৃতদেহের পুতিগন্ধে আপনাদের নাসা অবরুদ্ধ হয়েছিল, রাজ্য ছেড়ে আপনারা মহাপ্রস্থানের নামে হিমালয়ের পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর স্থানে পলায়ন করলেন। আপনাদের স্তাবকেরা বললো, পাণ্ডবগণের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। এসব তখন বিশ্বাস করেছিলাম, একবার ফিরে এসে যে দেশ রেখে গিয়েছিলেন সেই দেশ দেখবার সুযোগ গ্রহণ করলেন। কি দেখলেন তা আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো না। কিন্তু এ নিশ্চয়ই জানি একদিনে সমস্ত দেখার সুযোগ আপনার ঘটেনি, তাই আমার কাছে শ্রবণ করুন।

অখণ্ড ভারত আজ শতখণ্ড কিন্তু এখানেই শেষ নয়, অচিরকালে সহস্র খণ্ডে দুর্বলতার শেষ সীমায় পৌঁছবে। ধূর্তব্যক্তিরা ছোট বড় বিভিন্ন দলের দলপতিরূপে শক্তি সঞ্চয় করছে। কোনরকমে দশজন লোক সংগ্রহ করতে পারলেই দলপতি হওয়া সম্ভব। এই রকম শত সহস্র দলপতিত্বে ভারতের আসর পূর্ণ। তাদের এমনই বুদ্ধি ও কর্মকৌশল যে নিজের স্বার্থকে 'দেশের স্বার্থরূপে প্রতীয়মাণ করতে তারা সক্ষম। দেশ যায় আর থাকুক নিজের

গদি থাকলেই তারা সন্তুষ্ট। দলে দলে হানাহানি, রাজ্যে রাজ্যে মারামারি এ নিত্যকার ব্যাপার। মহারাজ সে আমলে আপনাদের পিতৃশ্যালক শকুনি একমাত্র পেশাদার রাজনীতিক ছিলেন, তাঁরই কুটচক্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও ভারত মিথ্যাপ্রিয়। আর এখন শত সহস্র পেশাদার রাজনীতিক। এই পেশাদার রাজনীতিকগণের অকরণীয় কিছু নাই। দেশের কল্যাণসাধনের অজুহাতে রসাতলের পথটা তারা প্রশস্ততর করে তুলছে। অথচ লোকের বড় ভরসা তাদের উপরে। সমস্যার উপরেই তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, কাজেই কোন সমস্যার সমাধান তারা করে না। একটা সমস্যার সমাধান যদি বা করেন তার স্থলে দশটা নূতন সমস্যা জাগিয়ে দেন। সমস্ত দেশ আজ সমস্যার শরশয্যায় শয়ান। আর যদি সাধারণ লোকের কথা বলেন তবে সেখানেও কিছু আশা-ভরসা নাই। দলপতিদের দৃষ্টান্তে তারাও বসাতলের পথিক। সত্য বটে, লোকের স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছে, সে কেবল বিদেশ থেকে আনীত শস্য পারিপাক করার উদ্দেশে। সত্য বটে লোকের পরমায়ু কিছু বেড়েছে সে কেবল দুষ্কর্ম সাধনের উদ্দেশে। সত্য বটে শিক্ষার কিছু বিস্তার হয়েছে সে কেবল দলপতিদের প্রশস্তিবাচনের উদ্দেশে। মহারাজ কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা কি ভাল নয়, মূর্খের চেয়ে অজ্ঞ কি কাম্যতর নয়? আপনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দায়ে পড়ে আধখানা মিথ্যাকথা বলেছিলেন সেই পাপে আপনাকে ক্ষণকালের জন্য নরক বাস করতে হয়েছে। আর অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এ দেশে এমন যদি কেউ থাকেন যে মিথ্যা কথা বলেন নাই, নিত্য তাকে ঘরে বসেই নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হচ্ছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে আমাদের ধোঁকা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন জয়লাভ করলে রাজ্যলাভ আর নিহত হলে স্বর্গলাভ। আমরা নির্বোধ বিশ্বাস করেছিলাম। তখন বুঝিনি এ ব্যবস্থা কেবল রথী-মহারথীদের জন্য, পদাতিকদের জন্যে নয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে বেতন পেয়ে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছি, কাউকে এসব কথা বলবার সুযোগ ঘটেনি, আমাদের নিহত করে ফেলে, আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের পথে বসিয়ে আপনারা তোফা আরামে স্বর্গবাস করছেন। আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েছি, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দান করুন—কার পাপে এমন ঘটলো। আপনারা কি সত্যই দেশের উন্নতি চেয়েছিলেন না দেশের উন্নতির নামে নিজেদের স্বার্থ-সাধন করতে চেয়েছিলেন। এ যদি পাপ না হয় তবে আর পাপ কাকে বলে। বেদব্যাস মহাভারত গ্রন্থ রচনা করে

আপনাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন কিন্তু যাদের পরিশ্রমে, যাদের প্রাণদানের ফলে আপনারা মহারাজ, মহাভারতে তাদের কথা কোথায়? মহাকাব্য আপনাদের স্বর্ণ সিংহাসন, আমাদের মত আজ্ঞাবহদের স্থান তার ত্রিসীমানার মধ্যে নাই। আমরা মরে যদি নিঃশেষ হয়ে যেতাম তবু ভাল ছিল, বিগত দুঃখ অনুভব আর করতে হতো না, কিন্তু বেতন পেয়ে সংজীবিত থাকা প্রতি মুহূর্তে অতীতের সেই বুকে বিদ্ধ হচ্ছে। আপনারা চিরকাল স্বর্গবাস করুন আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু যে মৃত্যু সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে সেই মৃত্যু দেশের বর্তমান অবস্থা কোন পাপে কার শাপে তার জবাব দিন মহারাজ, জবাব দিন।

সেই ছায়াবাহিণী যখন এইসব কথা বলছিলেন যুধিষ্ঠির তখন আত্মচিন্তা করছিলেন। ছায়াবাহিণী যখন নীরব হলো তখন তিনি তাকিয়ে দেখলেন কোথাও কেউ নেই, চারদিক সম্পূর্ণ নির্জন, সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, কেবল সুরজকুণ্ডের পশ্চিমদিকে উচ্চ তীরভূমিতে ভাঙা মন্দিরের উপর থেকে পেচকের ভূৎকার ধ্বনিত হয়ে অন্ধকারে অপরিনিয়ন্তা ঘোষণা করছে। তিনি ক্ষণকাল বিস্মিত হয়ে বসে থেকে প্রথমে কৃপাচার্য্যকে ধাক্কা দিয়ে জাগালেন, আচার্য্য জাগুন, শুনুন আমি কি দেখলাম।

কৃপাচার্য্য শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বললেন, মহারাজ, ওরকম আমরা প্রায়ই দেখি, প্রায়ই শুনি।

তখন কি করেন?

আর কি করবো, ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি। কথাগুলো তো মিথ্যা নয়, আপনার তবু ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ একটি দিন শুনতে পেলেন।

তারপর অশ্বত্থামাকে ঠেলে জাগিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, গুরুপুত্র উঠুন।

অশ্বত্থামা বললেন, মহারাজ আচার্যের কথাই আমার কথা। ও আমাদের দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। এতগুলো লোক বেঘোরে প্রাণ দিল আপনাদের জন্যে, আর দুটো কথা মনের ক্ষোভে বলবে না এই কি আশা করেন।

কিন্তু গুরুপুত্র, দেশ যে তলিয়ে গেল।

সেই তো ভরসা তলিয়ে গিয়ে অতলে ঠেকলে আর তলাবে না, যতক্ষণ ভেসে আছে ততক্ষণই আশংকা। নিমজ্জিত নৌকার মতো নিরাপদ আর

কি আছে। এখনও অনেকটা রাত আছে মহারাজ শুয়ে পড়ুন।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল একটু একগুঁয়ে স্বভাব, কাজেই কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার পরামর্শ তাঁর মনঃপুত হলো না। তিনি বললেন, ওরা যে জবাব চেয়েছে কি উত্তর দেব?

অশ্বত্থামা গায়ের চাদরখানা ভাল করে টেনে নিয়ে বললো, উত্তর তো দিল্লীর পথে ঘুরতে ঘুরতে অনেকবার শুনেছেন, যদি আবার এসে ওরা হামলা করে তবে বলবেন, কোই বাৎ নেহি। ও উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর নেই। দেখতে পাবেন ওরা খুশি হয়ে নাচতে নাচতে ফিরে যাচ্ছে।

যুধিষ্ঠির ছায়াবাহিণীর প্রত্যাগমন আশায় জেগে বসে রইলেন। ততক্ষণে ওদের যুগল নাসাধ্বনি পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে।

দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর

রমেশবাবু কয়েকদিনের জন্য মালতীপুরে বেড়াইতে গিয়াছেন। মালতীপুরে তাঁহার বন্ধু অসীমবাবুর নিবাস। মালতীপুর সুন্দরবনের মধ্যে। অসীমবাবু অনেক দিন হইতে রমেশবাবুকে লিখিতেছেন, "একবার এদিকে এসো, নূতন জায়গা, দেখবার অনেক কিছু আছে, লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না।" রমেশবাবু কলিকাতার জীব, উক্ত শহরের বাহিরের ভূভাগ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, সুন্দরবন ও সোমালিল্যাণ্ড কাছাকাছি অবস্থিত বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস; তিনি জানেন যে সংসারের যাবতীয় চোর ডাকাত বাঘ ভালুক সাপ ও কুমীর কলিকাতা কর্পোরেশনের সীমার বাহিরে ওঁৎ পাতিয়া আছে, নর মাংসের জন্য তাহাদের আকিঞ্চনের অন্ত নাই। এবারে বুঝিতে পারা যাইবে কেন তিনি অসীমবাবুর অসংখ্য আহ্বানে দেন নাই। সুন্দরবন। বাপ্‌রে, সেখানে গাছে গাছে সাপ, ঝোপে ঝোপে বাঘ, নদীতে নদীতে কুমীর—ঐ শ্রেণীর আরও অসংখ্য শ্বাপদ ও সরীসৃপ সেখানে বাস করে সুন্দরবন সেই স্থান! অসীমবাবু তাঁহার মনোভাব জানিয়া লিখিয়াছেন, "ও সব তোমার বই পড়া ধারণা। হাঁ এক সময়ে সাপ বাঘের উৎপাত ছিল বটে—কিন্তু সে প্রায় প্রাচীন ইতিহাসের কথা! আর আমরা আছি কি ভাবে? মরি নাই সে তো মিথ্যা নয়।"

যখন এই রকম পত্রাপত্রি চলিতেছিল সেই সময়ে রমেশবাবু ম্যালেরিয়ায় পড়িলেন। অসীমবাবু লিখিলেন, "জর ছাড়লেই এখানে এসো, এখানকার জল ও হাওয়া ম্যালেরিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক।"

ডাক্তার ও আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে রমেশবাবু স্ত্রী পুত্র কন্যার কাছে শেষ বিদায় লইয়া স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় মালতীপুরে রওনা হইলেন আর দেখিয়া তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন যে কিছুমাত্র বিপন্ন না হইয়া যথাসময়ে মালতীপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

অসীমবাবু বলিলেন চলো বেড়িয়ে আসি। রমেশবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—এই রাতে? অসীমবাবু বলিলেন, রাত কোথায়? সবে তো সন্ধ্যা। তা ছাড়া কেমন জ্যোৎস্না, কেমন দক্ষিণে হাওয়া।

সেটা ছিল ফাল্গুনের পূর্ণিমা।

কোন্ দিকে যাবে শুধাইলেন রমেশবাবু।

কেন, সামনেই চল, পাশেই মাৎলা নদী, বেড়াবার এমন জায়গা আর পাবে না।

রমেশবাবু বসিয়া পড়িয়া কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিয়া উঠিলেন, ভাই অসীম সঙ্গে বন্ধু হত্যা ব্রহ্ম হত্যা অতিথি হত্যা করবার মৎলব এঁটেছ।

বিস্মিত অসীমবাবু বলিলেন, ও কি কথা!

নইলে এত রাত্রে বনের মধ্যে নিয়ে যেতে চাচ্ছ কেন যেখানে বাঘ ভালুক গণ্ডার হাতী সাপ কুমীর···

আরো অনেক জন্তুর নাম তিনি করিতে যাইতেছিলেন বাধা দিয়া অসীম-বাবু বলিলেন, ভাই সুন্দরবন তো চিড়িয়াখানা নয় যে এত জন্তু একত্র বাস করবে।

কিন্তু একটাই কি যথেষ্ট নয়।

কিন্তু একটাও যে দেখিনি এ পর্যন্ত এতখানি বয়স হল।

যখন বলছ চলো—এই বলিয়া রমেশবাবু ফাঁসীর আসামীর মত অসীম-বাবুর পিছে পিছে চলিলেন।

বনের মধ্যে দক্ষিণে হাওয়া। চারদিকে হাওয়ায় আর নূতন কিশলয়ে কানাকানি মাতামাতি। সর সর ঝর ঝর মর মর থর থর আওয়াজ। অসীমবাবু বলিলেন, কেমন সুন্দর নয়! (অসীমবাবু উঠতি বয়সে কবিতা পড়িতেন, নিজে ছাড়া কেহ বুঝিতে পারিত না।)

রমেশবাবু অব্যক্ত সম্মতিসূচক হুঁ করিয়াই লাফাইয়া উঠিলেন—ঐ যে।

কি হ'ল ?

ঐ দেখো।

কোথায়, কি ?

বড় শেয়াল, ডোরা কাটা, ঐ যে।

অসীম হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন গাছের ফাঁকে জ্যোৎস্না প'ড়ে ঐ রকম দেখাচ্ছে। কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়াই রমেশবাবু আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সজোরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন আস্তিকস্য মুনির্মাতা পত্নী জরৎকারুস্তথা।

আবার কি হ'ল ?

লতা।

কই ?

দেখতে কি পাচ্ছি ছাই, ঐ যে সর সর শব্দ !

গাছের ডালে বাতাসের আওয়াজ। তারপরে বলিলেন নাঃ তোমার মতো কলকাতার নিরাপত্তাবাসী নিরীহ জীবকে নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়লাম দেখছি। চলো নদীর ধারে যাই সে দিকটায় গাছপালা নেই।

কিন্তু নদীতে যে কুমীর হাঙর !

থাকে জলের মধ্যে থাকবে তোমার ভয়টা কি ?

শুনেছি ওরা ডাঙায় উঠে তেড়ে আক্রমণ করে।

সত্য কি না এবারে দেখবে চলো। নদীর ধারে আসিয়াই রমেশবাবু সলম্ফ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ঐ যে, ঐ যে—

কোথায়, কি ?

ঐ দেখো আদ্দেক ডাঙায় আদ্দেক জলে, এখনি তাড়া করবে।

ওখানা ডিঙি নৌকা, ডাঙায় তুলে রেখেছে।

অমন ক'রে রাখে কেন, এ ওদের অন্যায়, একটা সাজা হওয়া উচিত।

বনের মধ্যে ঘণ্টা তিন চার দুই জনে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল, একটা বাঘ দূরে থাকুক সামান্য একটা শিয়ালও চোখে পড়িল না তাহাদের। রমেশ যেন নিজের চোখ দুটাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেনা, বলিল, অসীম আজ খুব বেঁচে ফিরেছি।

অসীমবাবু বলিলেন আমরা এমন প্রত্যহই ফিরি।

তোমাদের যেমন সাহস তেমনি সৌভাগ্য।

ভাই রমেশ এতে সাহস বা সৌভাগ্য দেখলে কোথায় ?

কেন ধরো যদি একটা বাঘ।

বাঘ এসে পড়লে বিপদ হতে পারতো কিন্তু থাকলে তো আসবে ।

তবে যে শুনি।

অমন অনেক কথাই শোনা যায়। সুন্দরবন সম্বন্ধে তোমাদের নিতান্ত কেতাবীজ্ঞান। এমন সুখের স্থান আর নেই, আর বিপদ আপদ সর্বত্রই আছে, তোমাদের কল্‌কাতায় কি নেই ?

কল্‌কাতায় বিপদ আপদ !

রমেশ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, যেন এমন মজার কথা এমন অবাস্তর কথা জীবনে শোনেন নাই।

তারপরে দিন পনেরো মালতীপুরে কাটাইয়া, সেখানকার দুধ ঘি ও জল-হাওয়ার কল্যাণে দেহে সের কতক মেদ মাংস সংগ্রহ করিয়া এবং মৌলিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অংশ না খোয়াইয়া রমেশবাবু ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলেন। রওনা হইবার আগে তিনি অসীমের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন যে অসীম শীঘ্রই কলিকাতা যাইবেন।

॥ ২ ॥

নিরাপদ শহর কলিকাতা।

অসীমবাবু ও রমেশবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। কলিকাতা শহরের দৃশ্য আর নূতন করিয়া কি বর্ণনা করিব, শুক্রবার বিকালে যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি।

রমেশবাবু বলিলেন এ ভাই তোমাদের বাঘ ভালুকের দেশ নয় স্বচ্ছন্দ-মনে রাত বারোটা অবধি ঘুরে বেড়াও, কোন ভয় নেই।

অসীমবাবু বলিলেন তা বই কি এ যে বঙ্গের তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ শহর, কৃষ্টি কলার রাজধানী।

এমন সময়ে অদূরে হল্লা উঠিল।

কি ব্যাপার ?

রমেশ বলিলেন—কিছুই না এমন হয়েই থাকে।

তবু ?

বোধ করি সংস্কৃতির মহড়া হচ্ছে।

হল্লা ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠিল। ভীত দোকানীরা দরজা বন্ধ করিতে লাগিল, ফুটপাতের উপরে যাহাদের পসরা তাহারা মালপত্র গুটাইয়া পালাইল। এবং নিমিষ মধ্যে ট্রাম বাস বন্ধ হইয়া গেল।

অসীম বলিলেন—ব্যাপার কি রমেশ? সুন্দরবন হ'লে ভাবতাম বাঘ বের হয়েছে।

রমেশ বলিলেন না বাঘ নয় মানুষ।

বন মানুষ?

না, সংস্কৃতিবান সভ্য মানুষ।

তবে এমন ভীতচকিত ভাব কেন?

কেনর উত্তর পাইবার আগেই অসীমবাবুর পিঠের উপরে একটি ঢিল আসিয়া পড়িল আর তার প্রতিক্রিয়া সামলাইবার আগেই পায়ের কাছে একটা কাঁদুনে গ্যাসের কার্তুজ পড়িয়া দম বন্ধের উপক্রম হইল।

দৌড় দৌড়।

কিন্তু দৌড়িবারই কি ছাই উপায় আছে? চোখের জলে দশ দিক অন্ধকার। আর, ইতিমধ্যে সেই অল্প এক দণ্ডের মধ্যে কলিকাতা শহরের চেহারা বদলিয়া গেল।

অবশেষে দুইজনে বাড়ী ফিরিয়া সদর খিড়কি দরজা জানলা বন্ধ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বসিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিল। তখন বাহিরে মহাপ্রলয় কাণ্ড। আলো নিভিয়া পথ অন্ধকার। বোমা ও গুলির দুমদাম। হাজার হাজার মানুষের চীৎকার। দোকান লুঠ হইতেছে, ট্রাম বাস ভস্মীভূত হইতেছে। সংক্ষেপে এই যে কলিকাতা নগরী ছিন্নমস্তারূপে আপন রুধির পান করিতে করিতে প্রলয় উল্লাসে নাচিতেছে।

অবশেষে কাল রাত্রি প্রভাত হইল। কিন্তু কী প্রভাত! পথ জনশূন্য। গোয়ালা দুধ বেচিতে আসে নাই, ফেরীঅলা বাজার হাঁকিতেছেনা ঝাড়ুদার বাহির হয় নাই, দোকানপাট দরজা বন্ধ, বাজার খদ্দের গ্রাহকহীন, পথ ঘাট ভাঙা কাচে ভাঙা আসবাবে পরিকীর্ণ, যানবাহনের চলাচল স্থগিত, প্রাতর্ভ্রমণকারীর দল আজ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। কী এক অব্যক্ত আশঙ্কা কলিকাতা শহরের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, শিশুটাও নীরব, পাখী ডাকিয়া উঠিয়াই থামিয়া যাইতেছে।

অসীমবাবু জানলা খুলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়াই জানলা বন্ধ করিলেন, তাঁহার মনে পড়িল নিরাপদ শহর কলিকাতা, সুন্দরবন বাঘ ভালুকের রাজ্য!

রমেশ, আমি আজই ফিরবো।

যাবে কেমন ক'রে রেল যে বন্ধ।

রেল বন্ধ! কবে চলবে?

কে জানে হয়তো লাইন উপড়ে ফেলেছে।

কেন?

জানিনা।

কারা?

তাও জানিনা।

এখন উপায়?

নিরুপায়, যেখানে আছো চুপ ক'রে বসে থাকো।

এই ঘরের মধ্যে?

বাইরে গিয়ে কি প্রাণ হারাবে?

এর চেয়ে যে সুন্দরবন অনেক নিরাপদ।

রমেশ সংক্ষেপে বলিলেন না।

হতাশ অসীম কবে নিরাপদে মালতীপুরে পৌঁছিতে পারিবে ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল—'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।'

কবিগুরু সব রকম কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

মেঘরাজ্যের কথা

সমুদ্রের সঙ্গে আমার কেমন যেন আড়াআড়ি আছে! ছেড়েও থাকতে পারি না, আবার আঘাতও পাই তেমনি। সমুদ্র দেখলেই জাহাজ ভাসিয়ে বের হ'য়ে পড়তে ইচ্ছা যায়, আবার বেরিয়ে পড়লেই নাকানি-চোবানি খেয়ে ফিরে আসি। কতবার যে জাহাজ ডুবি হ'য়ে ফিরে এসেছি। অনেক সময়ে ভাবি এমন কেন হয়? অবশেষে সিদ্ধান্ত করেছি আর কিছুই নয় বাল্যকালের সংস্কার।

আমার পিতা মস্ত সদাগর ছিলেন। দেশ বিদেশে বাণিজ্য ক'রে বিস্তর টাকাকড়ি ক'রে গিয়েছেন। কোনবার তাঁর জাহাজডুবি হয়নি। আমার বছর পাঁচেক বয়স হ'তেই আমাকে সঙ্গে নিতে আরম্ভ করলেন। লোকে আপত্তি করলে বলতেন, সমুদ্রটা ওর অভ্যাস হয়ে যাক, তবে তো বড হ'য়ে বিদেশে যেতে পারবে বাণিজ্য ক'রে টাকাকড়ি করতে পারবে। বসে খেলে এসব ফুরোতে কতদিন। সেই থেকে সমুদ্রটা আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে।

তারপরে বয়ঃপ্রপ্ত হ'লাম, পিতা গত হলেন, তখন স্বাধীন হ'য়ে নিজেই বের হই, প্রত্যেকবার সব খুইয়ে ফিরে আসি। আত্মীয় স্বজন বলে, আর কেন, অনেক হ'য়েছে, এবারে বসে খাও, তোমার তো অভাব নাই। কথাটা মিথ্যা নয়, সত্যই আমার অভাব নাই। কিন্তু হ'লে কি হয়, সমুদ্র দেখলে, এমন কি সমুদ্রের কথা মনে পড়লে, মন উতলা হ'য়ে যায়। আবার বের হ'য়ে পড়ি। কিছুতেই শিক্ষা হ'ল না। যাক, ভূমিকা দীর্ঘ ক'রে লাভ নেই, যথাসময়ে জাহাজ সাজিয়ে বের হ'য়ে পড়লাম। পাঁচ সাতদিন বেশ গেল, ভাবলাম, এবারে সমুদ্র প্রসন্ন। এই কথা ভাববার পরদিনেই মেঘ ক'রে ঝড় উঠল, ঝড় ক্রমে প্রবলতর হ'তে লাগলো, শেষ অবস্থা এমন দাঁড়াল জাহাজ আর রক্ষা হয় না। হ'লও না। এক মুহূর্তে সব ওলটপালট হ'য়ে আমি অতল জলে ছিটকে পড়লাম। তারপরে যে কী হ'ল মনে নাই। যখন জ্ঞান হ'ল, দেখি আমি শুকনো চড়ার উপরে পড়ে আছি, আর আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন মানুষ। আমার জ্ঞান হ'য়েছে দেখে তারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে, কোত্থেকে আসছ?

আমি বললাম, আমি বোগদাদ শহরের সদাগর, আমার নাম সিন্ধবাদ, জাহাজ ডুবি হ'য়ে এখানে এসে পড়েছি।

তারা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, জাহাজের চিহ্নও তো দেখতে পাচ্ছি না, সঙ্গীরা সব মারা গেছে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, অসম্ভব নয়।

এই বলে উঠে বসলাম, এতক্ষণ শুয়ে ছিলাম।

লোক দুটির মধ্যে যে প্রবীণ, তাকেই প্রধান বলে মনে হ'ল, বলল, তা এখানে বসে থেকে আর কি করবে? আমাদের সঙ্গে বাড়ীতে চলো। বিদেশী জাহাজ এসে পৌছলে তোমার ফেরবার বন্দোবস্ত ক'রে দেব।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ধীরে ধীরে, বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম,

তাদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলাম।

ঐ প্রধান ব্যক্তির বাড়ীটি মস্ত, অনেক দাস দাসী, লোকজন, কোন ধনী ব্যক্তি বলেই মনে হ'ল। সেদিন আর তাদের সঙ্গে বড় আমার পরিচয় হ'ল না, আহারাদি ক'রে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে নিজেকে বেশ সুস্থ সবল স্বাভাবিক মনে হ'ল। সেই সঙ্গে ফিরে এলো আমার প্রবল শত্রু ও প্রবল বন্ধু অদম্য কৌতূহল। এবারে চোখ কান জাগ্রত করে নিয়ে সব দেখতে শুনতে শুরু করে দিলাম।

লোকগুলিকে অদ্ভুত মনে হ'ল। সকলেই মোটা, কালো, গায়ে লোম কিছু অধিক, দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট আবার মাথার তুলনায় কপালটা আরও ছোট; আর দেহের তুলনায় পা দুটো দুর্বল। সমুদ্র যাত্রার ইতিহাসে কতই না বিচিত্র রকম জীব দেখেছি! এক ঠেঙে মানুষের মুল্লুকে গিয়েছি। এক মুণ্ডু মানুষের দেশে গিয়েছি, সেখানে সমস্ত মানুষের মিলে একটি মাত্র মুণ্ডু, তাই দিয়ে ওরা পালাক্রমে কাজ চালায়। আবার গিয়েছি নিম্নাঙ্গদের দেশে যেখানে কোমরের উর্ধ্বে আর কিছু নেই অথচ নিম্নাঙ্গটা পুষ্ট ও সুন্দর। আর একবার গিয়ে পড়েছিলাম বাঁশুরিয়াদের দেশে, সেখানে সবাই বাঁশী বাজায়, ওই ওদের ভাষা, ওতেই উত্তরপ্রত্যুত্তর চলে। আরও অনেক অদ্ভুত জীব দেখেছি। তুলনায় এদের খুব স্বাভাবিক মনে হ'ল। কিন্তু এরা যে বিচিত্রতম, অন্ততঃ তাদের ইতিহাস সম্বন্ধে তখন কিছুমাত্র সন্দেহ হয়নি, সে ইতিহাস তাদের মুখে যেমন শুনেছি, তাই এখানে বিবৃত করছি।

এই বিবৃতি দেওয়ার আগে কিছু বলা আবশ্যক। প্রধান ও আমি (এখন থেকে তাকে প্রধান বলেই উল্লেখ করবো) খেতে বসলে প্রকাণ্ড থালায় অনেক রকম ভোজ্য পরিবেশিত হ'ল, সেই সঙ্গে কয়েকটি কাঁচা ছোলা পাতে দেওয়া হ'ল। আমার চোখে হয়তো কিছু বিস্ময় ফুটে থাকবে লক্ষ্য করে প্রধান বলল, কাঁচা ছোলা দেখে আপনি বোধহয় বিস্মিত হ'লেন।

আমি বললাম, বিস্ময়ের কি আছে কাঁচা ছোলা আমাদের দেশেও খায়, ভিজিয়ে আমিও ছেলেবেলায় খেয়েছি, পালোয়ান হ'ব আশায়। তবে মধ্যাহ্ন ভোজের সঙ্গে কিছু নূতন বটে।

সে বলল, না পাঁচ ছটা কাঁচা ছোলা খেলে পালোয়ান হওয়ার আশা নেই। ওটার একটু ইতিহাস আছে। ওটা আমাদের জাতের একটা প্রাচীন সংস্কার, ঠিক কারণ কেউ জানে না তবে সকলেই প্রথম গ্রাসে ওটা খায়।

এই বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে ছোলা কটিকে কপালে ঠেকিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে দিল। আমিও দেখাদেখি মুখে দিলাম যদিচ কপালে ঠেকালাম না।

খেতে খেতে প্রধান বলল, প্রত্যেক জাতের বিশেষ ইতিহাস থাকে, আমাদেরও আছে। বললাম বিশেষ কৌতূহল অনুভব করছি যদি আপত্তি না থাকে তবে বিবৃত করুন।

অবশ্যই করবো, তবে এখনি নয়। আপনি বড় উপযুক্ত সময়ে এসে পড়েছেন। আজ বিকালে আমাদের সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব। সেখানে আপনাকে নিয়ে যাবো।

আমি শুধালাম, কোথায় সে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়?

জায়গাটা দূরে, পথ বড দুর্গম, গোটা দুই পাহাড পার হ'য়ে একটা বড় নদীর ধারে পৌঁছতে হয়। সেখানে অতি প্রাচীন এক মন্দির আছে, এই মন্দির, এদেশের পবিত্রতম তীর্থ।

মন্দিরে কোন্ দেবতা প্রতিষ্ঠিত?

দেবতা আমরা মানিনে, কাজেই বুঝতে পারছেন কোন দেবমূর্তি নাই!

তবে?

দেয়ালে কয়েকটি ছবি উৎকীর্ণ আছে। একটি ছবিতে একজন মানুষকে পিঠে নিয়ে এক অতিকায় ভেড়া নদী পর হচ্ছে। তার পরেব ছবিতে সেই মানুষটি ভেড়ার চরণ বন্দনা ক'রে পূজা করছে আর ভেডা তার মাথায় পা দিয়ে আছে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে।

আর কোন ছবি আছে?

আছে। তবে সে-সব এমন অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছে যে ভালো ক'রে বুঝতে পারা যায় না।

এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

আশ্চর্য বইকি! আরও অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পাবেন, সেখানে চলুন না কেন?

অবশ্যই যাবো, তার আগে বলুন এসব ছবির অর্থ কি?

নিশ্চয় ক'রে কিছু বলতে পারবো না, কেননা, নানা মুনির নানা মত। পুরাণবিদ, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে সকলেই ঐক্যমত যে এই ছবিগুলির মধ্যে আমাদের জাতীয় সভ্যতার উদ্ভবের ইতিহাস আছে।

যথাসময়ে দুর্গম অরণ্য পর্বত পার হ'য়ে মস্ত এক নদীর ধারে সেই পবিত্র মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি মন্দিরের বৃহৎ চত্বর ও প্রকাণ্ড মাঠ হাজার হাজার মানুষে ভরে গিয়েছে। প্রধানের কৃপায় আমি মন্দিরে বেদীর কাছে বসবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অনাবৃত অঙ্গ এক বৃদ্ধ দেবীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো আর দেহের উপরার্ধ অনাবৃত করে ফেলল। তাদের দেখাদেখি আমিও পিরান খুলতে যাচ্ছিলাম, প্রধান ইঙ্গিতে নিষেধ করলো। তখন মন্দিরের ভিতরে বাইরে চত্বরে প্রান্তরে হাজার হাজার লোমশ বপু মনুষ্য, সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। রক্ষাকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে চাইনে, কিন্তু মনে হ'ল হাজার হাজার অতিকায় ভেড়ায় সমস্ত ভ'রে গিয়েছে।

পুরোহিতের ইঙ্গিতে মশাল ও অনেকগুলি ঘৃত প্রদীপ জ্বালা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম বাদ্য তুরী ভেরী প্রভৃতি বেজে উঠল। তখন সমস্ত জনতা দুর্বোধ ভাষায় উচ্চরবে স্তব পাঠ আরম্ভ ক'রে দিল। সে ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ্য তো বটে এমন কি তাদের পক্ষেও। একথা জানলাম প্রধানের মুখে। সে আমাকে পরে জানিয়েছিল যে এ হচ্ছে তাদের ভাষার আদিমতম রূপ, এখন সম্পূর্ণরূপে বোধের অতীত। সে উচ্চনাদ শুনে মনে হ'ল (আবার বলছি আমি অকৃতজ্ঞ হতে চাই না) যেন হাজার হাজার ভেড়া অব্যক্ত ধ্বনি করছে। যখন তারা স্তব পাঠ করছিল, তখন আমি দীপালোকে দেয়ালে উৎকীর্ণ ছবিগুলি দেখলাম। প্রধান যা বলেছিল সেই রকমটাই বটে। প্রকাণ্ড নদীর মধ্যে অতিকায় একটা ভেড়া সাঁতার দিয়ে চলেছে তার পিঠের উপরে একজন মানুষ উপবিষ্ট। আর একখানা ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, সেই ভেড়া ও মানুষটি তীরে উঠেছে আর ভেড়াটির পায়ের কাছে প্রণত অবস্থায় রয়েছে মানুষটি। তারপরেও অবশ্য আরও অনেকগুলি ছবি আছে, কিন্তু সে-সব এমনি অস্পষ্ট যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। স্তব পাঠ শেষ হ'লে পুরোহিত উপবিষ্ট হলেন, উঠে দাঁড়ালেন একজন বৃদ্ধ। প্রধান কানে কানে বললেন, উনি পুরাণবিদ। এদেশের পুরাণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

পুরাণবিদ দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে নমস্কার ক'রে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, আজ আমাদের জাতীয় মহোৎসব। এ উৎসব দশ বিশ হাজার বছর ধরে চলে আসছে আর যতকাল আমাদের দেশ ও

জাতি থাকবে ততকাল চলবে। আপনারা সকলেই জানেন, মহা ভেটক পুরাণের কৃপায় কারোই অজানা নাই যে নদীতে সন্তরমান ঐ অতিকায় ভেটকটিই হচ্ছেন মহাভেটক আমাদের সকলের আদিপুরুষ। এই কথা শুনবামাত্র সমস্ত জনতা সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল, জয়তু মহাভেটক।

পুরাণবিদ বলে চলেছেন, এমন অনেক দেশ আছে যেখানকার অধিবাসিগণ নিজেদেব চন্দ্রবংশীয় বা সূর্যবংশীয় মনে করে। এ সব বাতুলের প্রলাপ। চন্দ্র বা সূর্য কখনো জীবের পূর্বপুরুষ হতে পারে না, কারণ জীব ও চন্দ্র সূর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। কিন্তু ভেটক বা ভেড়া জীবশ্রেষ্ঠ বিধাতার চবম কীর্তি। অনেক আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এই বলে তিনি ঐতিহাসিকদের দিকে তাকালেন, এ সব ছেলে ভুলনো উপকথা বলে মনে করেন। (এখানে ঐতিহাসিক নড়েচড়ে বসে আপত্তি প্রকাশ করলেন।) তাঁরা মনে করেন সন্তরমান ঐ ভেটক ও তার পিঠের মানুষটি একটি উপকথা বা প্রতীক মাত্র, পরবর্তী কালে কবি ও শিল্পীরা মিলে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমরা দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে জানি এ রূপক বা প্রতীক নয়, নির্জলা সত্য। আর এ মন্দিরটি তৈরি হয়েছে সেই পৌরাণিক যুগে, যখন ঐ ভেটক-পৃষ্ঠ বাহিত ঐ লোকটি যিনি ছিলেন এদেশের তৎকালীন রাজা, তাঁরই আদেশে রাজকারিগব কর্তৃক মহাভেটকের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ ঐ রাজা কর্তৃক মহাভেটকেব উদ্দেশ্যে এ মন্দির উৎসর্গীকৃত হ'য়েছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে অনেক আধুনিক পাথুরে পণ্ডিত বলেন, (এই বলে কটাক্ষ করলেন প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রতি) এ মন্দির খুব বেশি পুরাতন হবে তো পাঁচ শ বছরের মাত্র।

এই কথা শুনবামাত্র প্রত্নতত্ত্ববিদ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, মশায়, আপনি গাঁজাখুরি গল্প শুনিয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে প্রণামী আদায় করতে চান করুন কিন্তু আমরা যারা পাথর নিয়ে ঘাটাঘাটি করি তাদের ভোলাতে পারবেন না।

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজনে বলে উঠল, পাথর নিয়ে ঘাটাঘাটি করে বুদ্ধিটা পাথরের মতো হয়ে গিয়েছে।

"পাথুরে পণ্ডিত" থামবার লোক নন, তিনি সকলের চীৎকারকে ডুবিয়ে দিয়ে সগর্জনে বলে চললেন, এই মন্দিরের পাথর, তার কারুকার্য, গঠন প্রণালী প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে সাড়ে চার শ থেকে পাঁচশ বছরের মধ্যে এ মন্দির তৈরি, তার আগে এক পা যেতে পারে না।

কোন এক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমার ক'খানা পা ?

প্রত্নতত্ত্ববিদ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, তোমাদের চারখানা পা, তোমরা ভেড়ার বংশ।

তখন মহা সোরগোল উপস্থিত হ'ল। কেউ বলল, মহাভেটককে অপমান! কেউ বলল, প্রায়শ্চিত্ত করো! কেউ বলল, আধুনিক শিক্ষার এ ছাড়া আর কি পরিণাম হবে। কেউ বলল হতভাগাটাকে জম্বুদ্বীপে পাঠিয়ে দাও, সেখানে ওর মতো অনেক পাথুরে পণ্ডিত আছে। গণ্ডগোলে অবস্থা এমন হ'ল যে আসর ভেঙে যায় আর কি !

তখন পুরোহিত দাঁড়িয়ে উঠে মহাভেটকের দোহাই দিয়ে সকলকে শান্ত করলেন। সকলে শান্ত হ'লে তাঁর অনুরোধে ঐতিহাসিক দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

আমরা ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে আমরা জীবনকে দেখতে অভ্যস্ত, শোনা কথা, অসমর্থিত তথ্যে আমরা বিশ্বাস করি না, সন তারিখের সুনিশ্চত চিহ্নের উপর পা ফেলে আমরা পথ চলি। আমাদের জাতের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গঞ্জিকাসেবনপরায়ণ ব্যক্তি বলে থাকেন (এখানে পুরাণবিদ লাফিয়ে উঠবার চেষ্টা করলেন) যে কোন অতিকায় ভেড়া থেকে আমাদের জন্ম। বিজ্ঞান এ কথার সত্যতায় বিশ্বাস করে না। ভেড়া থেকে মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, যদিচ অনেক মানুষ শেষ পর্যন্ত ভেড়াতে পরিণত হয় (শ্রোতাদের কণ্ঠে ধিক ধিক ধ্বনি)। ঐ যে দেয়ালে উৎকীর্ণ ছবি দুটি দেখতে পাচ্ছেন, ঐ ছবির ভেড়া আমাদের পূর্বপুরুষ মনে করেন পৌরাণিকগণ। এর চেয়ে গাঁজাখুঁরি আর কিছু হ'তেই পারে না। ঐ ভেড়া কোন আদিম অধুনালুপ্ত অসভ্য জাতির Totem ! ঐ ভেড়াকে যারা নিজেদের পূর্বপুরুষ মনে করেন তাঁরা নিজেরাই ভেড়া। ভেড়ার মতো তাঁদের বুদ্ধি, ভেড়ার মতো তাঁদের দৃষ্টি, কেবল ভেড়ার মতো সুস্বাদু নয় তাদের মাংস। প্রাচীনতম যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন কবি তাতে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, "মানুষ আমরা, নহিত মেষ।" তারপরে লিপিকর প্রমাদের ফলে ঐ কথাটি সরে এসে নহিতো শব্দের পরে বসে দাঁড়িয়েছে, "মানুষ আমরা নহি তো, মেষ"—তাতেই এই মহাভ্রমের সৃষ্টি।

এই কথা শোনবামাত্র সভা মধ্যে এমন প্রচণ্ড সোরগোল আরম্ভ হল যে মুহূর্তে সভা ভেঙে গেল। তখন প্রধান আমাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে

সভার বাইরে এসে উপস্থিত হ'ল। বলল, আর এখানে নয়, চলুন বাড়ী ফেরা যাক। আবার সেই দুর্গম পথ পার হয়ে দুজনে বাড়ী ফিরে এলাম। সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতায় এমন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম রাতটা অঘোরে ঘুমিয়ে কাটালাম।

পরদিন প্রত্যুষে প্রধানকে বললাম, গন্ত্র-কন্যকার সমস্ত ব্যাপারটা প্রহেলিকার মতো ঠেকছে; কিছুই বুঝতে পারিনি। আপনাদের জাতের উদ্ভব সম্বন্ধে সরল ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে বলুন, আমি বড কৌতূহল অনুভব করছি।

প্রধান বলল, অবশ্যই বলবো, তার আগে আহারাদি সমাধা করুন।

আহারান্তে শান্ত হ'য়ে বসলে প্রধান আরম্ভ করলো। কালকের সভায় পুরাণবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে বিতণ্ডা হ'ল তা থেকে আপনি নিশ্চয় কিছু বুঝতে পারেন নি। আর শুধু আপনিই বা কেন, আমরাও কিছু বুঝতে পারিনি, বরঞ্চ এতাবদকাল যা বুঝেছিলাম তাও ঘুলিয়ে গেল। আমাদের জাতীয় উৎসব সভায় প্রতি বৎসর এই রকম চলে, তার ফলে সত্য উদ্‌ঘাটিত না হ'য়ে আরও বেশি ক'রে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ছে। আমি আর পণ্ডিতদেব গবেষণার মধ্যে প্রবেশ করবো না, তার বদলে লোকশ্রুতির সাহায্যে বিষয়টা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করবো। এই বলে তিনি আরম্ভ করলেন।

প্রাচীনকালে এই দেশে এক রাজার রাজত্ব ছিল, মানুষ সেখানে সুখে শান্তিতে বাস করতো। এ দেশের রাজা মহাগুণী ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি শ্বাপদসঙ্কুল এক গভীর অরণ্যে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গীদের হারিয়ে ফেলে তিনি একা একা ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন। এ দিকে মৃগয়াও জুটলো না, তখন তিনি বাড়ী ফিরতে মনঃস্থ করলেন। পথ হারিয়ে ফেলে তিনি প্রশস্ত এক নদীর ধারে এসে পড়লেন, ছবিতে সে নদী আপনি দেখেছেন। নদীর ওপারে অরণ্য, এপারে তাঁর রাজ্য। নদীতে নৌকা দেখতে না পেয়ে ভাবলেন সাঁতরে পার হবেন। কিছুক্ষণ সাঁতার দিতেই বুঝতে পারলেন যে পার হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, এপার ওপার সমান দূর, বুঝলেন আজ তাঁকে ডুবে মরতে হবে। তখন তিনি নিরুপায় হ'য়ে ইস্টদেবতার নাম করতে আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে কোথা থেকে এক অতিকায় ভেড়া এসে তাঁকে পিঠে তুলে নিয়ে সাঁতরে এপারে উঠলেন।

ফরসা রঙ

তারা বললে ভাই, রূপের দাম তো দিতেই হবে। রূপ নেই এমন মেয়ে নিতে চায় কে? কিন্তু লেখাপড়ার মূল্যও দিতে হবে তো। এ মেয়েটি এম. এ পাশ।

কিন্তু ভাই, সেই এম. এ ডিগ্রীর কাগজখানা আর কে দেখছে! মুখের দিকে তাকালেই রূপ চোখে পড়ে, মাথার দিকে তাকালে তো আর বিদ্যা চোখে পড়ে না, মুশকিল যে সেইখানে।

তুমি লাখ কথার এক কথা বলেছ, তবে কি জানো, কালক্রমে রূপের জুলুস কমে, বিদ্যার জুলুস বাড়ে।

কথাটা বলে ফেলেই গীতা বুঝলো যে, নিতান্ত অপ্রিয় একটা সত্য তার মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে, অচিরাৎ সংশোধন আবশ্যক, কেননা, মায়া এক সময়ে সুন্দরী ছিল, এখন আর নয়। পঞ্চাশ বছরের রমণী বোধ করি স্বামীর চোখেও আর সুন্দরী নয়।

গীতা বলল, তবে কি আর ব্যতিক্রম নেই? যদিচ উপস্থিত ব্যক্তির প্রশংসা করতে নেই, তবু সত্যের খাতিরে বলবো তোমার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না।

গীতার কঠিন উক্তিতে মায়ার মনটা শক্ত হয়ে উঠেছিল, এখন সংশোধনের ফলে কিঞ্চিৎ নরম হলেও গলল না। বলল, সত্য কথাই তো বলেছ, আমার আগের সে রূপ কি আর আছে!

গীতা কৃত্রিম বিস্ময়ে বলে উঠল, কী যে বলো ভাই।

তেমন করে বলতে পারলে ঐটুকুতেই অনেক বলা হয়, তবে কিনা তেমন করে বলা আবশ্যক। প্রয়োজন হলে মেয়েরা এ কাজটি পারে। মেয়েরা জন্ম- অভিনেতা।

এবারে মায়া আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলো, বলল, আমাদের শশাঙ্ককে তো দেখেছ, নামেও শশাঙ্ক, গুণেও শশাঙ্ক, রঙটা একটু ময়লা, তবে কিনা—

বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিল না গীতা, বলে উঠল, হলই বা রঙটা অনুজ্জ্বল তেমনি বারো শ টাকা মাইনে পায়।

তার উপরে গাড়ী ভাড়া আছে, বাড়ী ভাড়া আছে, দু' বছর পরে বিলেত যাওয়ার ছুটি আছে।

তবেই দেখো এমন বর কোথায় পাবো—

পুত্রের গুণ ব্যাখ্যানে মায়ের মন কিছু নরম হয়েছিল, সে বলল, পাত্রীও

খুব যোগ্য, আর হবেই বা না কেন, তোমার বোনঝি বটে তো, কিন্তু রঙটা যে—

ময়লা নয়।

ফরসাও নয়, আমি ভাই ফরসা মেয়ে চাই। ছেলেটা কালো বলেই মেয়েটা ফরসা দরকার।

গীতা বলল, কালো ছেলের মা ফরসা মেয়ে চায়, আবার ফরসা ছেলের মাও চায় ফরসা মেয়ে। তবে যেসব মেয়ের গায়ের চামড়া তেমন ফরসা নয়, তারা যায় কোথায়?

দুঃখ করো না ভাই, অমন গুণী মেয়ে পড়ে থাকবে না।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অর্থাৎ যাঁরা কখনো পাত্রের সন্ধানে বিয়ের বাজারে বের হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আনুপূর্বিক বুঝতে পেরেছেন। কালীপূজার সময়ে উজ্জ্বল আলো লক্ষ্য করে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে শ্যামা পোকা উড়ে আসে, সুপাত্র সম্বন্ধে বাঙালী পিতামাতার সেইরূপ মনোভাব। গীতা অন্যতম শ্যামা পোকা, উজ্জ্বল আলো মায়ারানীর পুত্র শশাঙ্ক।

গীতা ও মায়া বাল্যকালে এক পাড়ায় থাকতো, কাজেই এক বিদ্যালয়েই তাদের পাঠ। বিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে "বন্ধুত্বের চিরস্থায়িত্ব" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে গীতা একটি স্বর্ণপদকের প্রতিশ্রুতি এবং অনেক প্রশংসা লাভ করেছিল। সেই ভরসাতেই অনেক আশা করে উমেদার হয়ে আজ এসেছিল মায়ার কাছে—কারণ তখন মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, আর সে কিনা প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিল—"বাল্যবন্ধুত্ব অক্ষয় বটের মত চিরস্থায়ী।" আজ সে আবিষ্কার করলো বাল্যবন্ধুত্ব নয়, বাল্যবন্ধুর জেদ অক্ষয় বটের মতো চিরস্থায়ী।

তবে সত্য কথা বলতে কি মায়ার জেদ করবার হেতু ছিল, শশাঙ্ক সত্যই সুপাত্র। এম. এস-সি পাশ করে বেসরকারী কোন একটা অফিসে মোটা মাহিনায় চাকুরি করে, মাইনে, গাড়ী ভাড়া, বাড়ী ভাড়া সম্বন্ধে তার জননী অত্যুক্তি করেনি। বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থাটা স্বাধীনতার আগে ছিল, এখন উঠে গিয়েছে, কারণ বর্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে মন্ত্রী ছাড়া আর কারো বিদেশ গমনের রাহা খরচকে সরকার অপব্যয় মনে করেন। শশাঙ্ক স্বভাব চরিত্রে ভালো, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়, তবে রঙটা কিছু অনুজ্জ্বল। এত গুণের মধ্যে রঙের এই কলঙ্ক দূরপনেয় মনে না করতে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন

াহাকবি কালিদাস। তাই স্বভাবের নিয়মানুসারে শত শত পাত্রীর পিতা-াাতা, পিতামাতার বন্ধুবান্ধব, পাত্রীর মাসি-পিসি, খুড়ি-জেঠি, মামা-মামী াশাঙ্কদের বাড়ী অবরোধ করেছে। এত উমেদারী সহ্য করেও মায়ারানী যে ধৈর্যচ্যুত হয়নি, সে জন্য ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তার প্রশংসা করা উচিত।

নয়াদিল্লির ঝকঝকে অফিস কক্ষে মিঃ শশাঙ্ক রায় বসে আছে, এমন সময়ে তার পি. এ এবং স্টেনো মিস জোনস প্রবেশ করে সকাল বেলার ডাক াাখলো শশাঙ্কর টেবিলের উপরে। শশাঙ্ক প্রসন্নভাবে বলল, থ্যাংকস মিস জানস, তুমি এবারে যেতে পারো।

অন্যান্য চিঠিগুলোর ঠিকানা দেখে একখানা বড় খাম খুললো, খুলতেই চিঠি ও অনেক কয়খানি ফটোগ্রাফ পড়লো টেবিলের উপরে। এমনটি ঘটবে আশঙ্কাতেই মিস জোনসকে যেতে বলেছিল শশাঙ্ক। চিঠিখানি তার মায়ের। মা লিখছে বাবা কয়েকটি পাত্রীর ছবি পাঠালাম, আমার একটিও পছন্দ নয়, যদিচ মুখশ্রী ও বিদ্যা আছে, তিনজন এম-এ, দুইজন বি-এ অনার্স, বংশও ভালো, কিন্তু হলে কি হয় রঙ তেমন ফরসা নয়। তবু তোমার দেখবার জন্য পাঠালাম। আরও তিনখানি ছবি হাতে এসেছে, পাঁচখানা হলে পাঠাবো। গোবরডাঙার একটি মেয়ের সংবাদ পেয়েছি, সে নাকি জল গিললে দেখা যায়। তার ছবি হাতে এলেই সব একসঙ্গে পাঠাবো।

শশাঙ্ক তখনি উত্তর লিখে খামে পুরলো। সে লিখলো, মা তুমি কি আমার বহু বিবাহ দেবে নাকি! গোবরডাঙার মেয়ের গলার মধ্যে যখন জল দেখা যায়, নিশ্চয় ওর মাথার মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিও দৃশ্যমান। সে বিষয়ে কিছু লেখনি কেন? কিছু নেই বলেই কি। যাকে হয় স্থির করে ফেলো। এদেশের মেয়ের গায়ে মেমসাহেবের রঙ পাবে কোথায়!

চিঠি বন্ধ করে নিজে খামে আঠা লাগিয়ে চিঠির ঝুড়িতে নিক্ষেপ করে। এই নিয়ে ছবির সংখ্যা খান পঞ্চাশেক হল, প্রতিদিন আসে চার পাঁচখানা। পাছে মিস জোনসের চোখে পড়ে—তাই একটু সঙ্কোচে থাকে। হাজার হোক মেয়েছেলে তো, আড়ালে হাসবে।

শশাঙ্কর পিতা কুমুদবাবু বলেন, মায়া, তুমি এ কি আরম্ভ করলে! পথে বের হলে পরিচিত অপরিচিত সবাই হাতে ছবি গুঁজে দেয়, বলে ছবিতে রঙ বুঝতে পারবেন না, একদিন দয়া করে আসুন দেখবেন।

মায়া বলে ওঠে, না, না, তুমি দেখতে যেয়ো না, রঙের তুমি কি বোঝো?

অবশ্যই কিছু বুঝি নইলে তোমাকে দেখে পছন্দ করলাম কিভাবে? আর তাছাড়া আজ দু' পুরুষ রঙের ব্যবসা করছি।

মায়া বলে, তুমি পছন্দ করেছিলে আমার বাবার টাকা দেখে।

আহা সেটাও তো একটা রঙ। রুপোর চেয়ে ফরসা আর কি।

মায়া সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, রুপোয় আমার দরকার নেই, আমি চাই রূপ।

তুমি যেরকম রূপ চাও তাতে শেষ পর্যন্ত না বিলেত থেকে মেয়ে আমদানি করতে হয়।

দেখো সকাল বেলাতেই ওসব খ্রীষ্টানী কথা বলো না। চোখ থাকলে দেখতে পেতে মেমের চেয়েও রঙ ফরসা মেয়ে এদেশে আছে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি সম্মুখে।

ঠাট্টা রাখো।

তোমার বন্ধু বাল্যসখী গীতা এসেছিল শুনেছি তার বোনঝি খুব সুন্দরী।

অমন অনেক কথাই শোনা যায়। আজ যাচ্ছি আমি গোবরডাঙার সেই মেয়েটি দেখতে।

আমাকেও কি সঙ্গে যেতে হবে নাকি! না, না, তার দরকার নেই, তুমি এক দেখতে আর দেখবে।

আচ্ছা, সাবধানে যেয়ো।

এবারে যে খামখানা শশাঙ্কর হাতে পৌঁছলো, সেখানি ডিমেভরা ইলিশ মাছের মতো পেট মোটা।

শশাঙ্ক চিঠির তাড়া মিঃ জোনসের হাত থেকে নিয়ে বলল, থ্যাঙ্কস ডরোথি, তুমি এখন যেতে পারো।

খাম খুলতেই একেবারে খানকুড়ি ছবি পড়লো টেবিলের উপরে, সঙ্গে অপরিহার্য চিঠি।

বাবা শশাঙ্ক এবারে চিঠি লিখতে দেরি হল। প্রত্যেক দিন দু'চারখানা করে পাঠাবার চেয়ে একসঙ্গে খান কুড়ি পঁচিশ পাঠানো সুবিধা, তাতে তুলনা করে মনঃস্থির করতে পারবে। গোবরডাঙার মেয়ে সুন্দরী, তবে যেমন শুনেছিলাম তেমন কিছু নয়। বাবা বাংলা দেশের হল কি! সুন্দরী মেয়ে আর তেমন জন্মাচ্ছে না। জন্মাবেই বা কি করে, একে দেশে শাসন

নেই, তার উপরে বাজার ছেয়ে গেল ভেজালে।

ছবিগুলো তাড়াতাড়ি খামের মধ্যে পুরে (মিস জোনসের চোখকে বড় ভয়) শশাঙ্ক লিখলো, মা, দুঃশাসনের কালেও সুন্দরী মেয়ের অভাব ছিল না এমন পড়েছি মহাভারতে। আর ভেজাল যেমন ভয়ের তেমনি ভরসারও, গায়ের রঙের ভেজাল কিছুতেই ধরা পড়ে না। তুমি দেখছি বাঙালীর ছদ্মবেশে মেম বউ চাও।

কিছুক্ষণ পরে মিস জোনস খানকতক টাইপ করা চিঠিতে সই করাতে এসে মেঝেয় একখানা ছবি কুড়িয়ে পেয়ে শশাঙ্কর হাতে দিয়ে বলল, এখানা বোধ হয় আপনার।

বাধা দিয়ে ব্যস্তভাবে শশাঙ্ক বলে ওঠে, না, না, আমার কেউ নয়। ও আমার মায়ের একটা ফ্যানসী, আদৌ আমার পছন্দ নয়।

মিস জোনস বলে, কেন, বেশ সুন্দর দেখতে।

কী যে বলো!

আমি সত্যই বলছি, আপনাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এমন সুন্দর দেখা যায় না।

সৌন্দর্যের কোন ভূগোল নেই, ডরোথি।

আচ্ছা আমি আসি। সই করা চিঠিগুলো নিয়ে বের হয়ে যায় সে।

শশাঙ্ক কেমন অপ্রস্তুত বোধ করে, যেন কী একটা ধরা পড়ে গিয়েছে। ভাবতে থাকে ডরোথি কি রাগ করলো কিম্বা মনে মনে হাসলো। একবার মনে হয় যেন তার ঠোঁটে চাপা হাসি দেখা গিয়েছিল, আবার মনে হয় গালদুটো লাল হয়ে উঠেছিল। রাগে না লজ্জায়। জানতে পারলে হতো। কিন্তু জানবার উপায় কি। কোন একটা ছুতো করে ডাকা যায় না? সেই ভালো, কিন্তু কোন ছুতো মনে পড়ে না তার, মূঢ়ের মতো বসে থাকে।

না, গোবরডাঙার মেয়ে পছন্দ হল না, তার কানের কাছে একটি আঁচিল, তার সম্ভাবনা কতদূর গড়ায় কে বলতে পারে। অবশ্য চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু চন্দ্র বিবাহের পাত্রী হলে বিবাহ হতো কিনা সে পরীক্ষা তো হয়নি। না ও মেয়ে চলবে না। তবে এবারে বারুইপুরের কাছে একটি মেয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার রঙ নাকি দুধে-আলতাকে হার মানায়। মায়াদেবী দেখতে যাবে জানালে স্বামীকে। তিনি বললেন, যাবে যাও, তবে ব্যাপারটা ক্রমে হাস্যকর হয়ে উঠছে, তা ছাড়া এত বিলম্ব হচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত

শশাঙ্ক নিজের ব্যবস্থা নিজে না করে বসে।

চমকে উঠে মায়া বললেন, সে কি করে সম্ভব?

অসম্ভব কি। সে তোমাদের টাকার উপরে নির্ভর করে না। আর রঙটা চোখের পছন্দ, তার চোখে যদি কাউকে পছন্দ হয়ে যায়।

কিন্তু এমন রঙ থাকতে পারে যাকে সুন্দর বলে সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

হতাশ পিতা বলে উঠলেন মানুষ কি কেবলই রঙ।

স্থিরসিদ্ধান্ত মায়া বলল, কেবল নয় তবে বারো আনা।

তবে দেখে এসো বারুইপুরের মেয়ে।

রঙের ব্যাপারে মায়া এ কয় মাস এমন বিড়ম্বিত হয়েছে যে এবারে আর কোন ফাঁক রাখবে না স্থির করলো। সঙ্গে নিলো শমিতাকে, অবসর সময়ে সিনেমায় অভিনয় করে সে।

তাকে বলল, তোমরা ভাই রঙটা ভালো বোঝো। আজকাল কৃত্রিম রঙ মাখিয়ে কালোকে সাদা করতে তোমাদের জুড়ি নেই, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। কথাগুলো শুনে শমিতা খুশী হয়নি। বটে! আমরা সবই কালো কুশ্রী, কৃত্রিম রঙের জোরে সুন্দরী বলে চলে যাচ্ছি। দেখবো তোমার ছেলের বউ কেমন জোটে।

বারুইপুরের মেয়েটি সত্যই সুন্দরী, নিখুঁত বললে কম বলা হয়। মেয়েদের চোখেও সুন্দর বলাই বোধ করি যথার্থ বর্ণনা। তার উপরে গড়ন, মুখশ্রী, আচার-ব্যবহার কথাবার্তা। তা ছাড়া এবারে বাংলায় স্পেশাল অনার্স দিয়েছে, ফল ল্যাঙড়া আমের সঙ্গে বাজারে বের হবে; দুই-ই সমান উপভোগ্য হবে আশা করছে সবাই।

মায়া শমিতার কানে কানে বলল, চমৎকার, তোমার কেমন লাগছে।

চমৎকার, তবে কিনা—

কি বলবো?

এখন কিছু বলো না, পরে লিখে জানিয়ো। গাড়ীতে ফিরবার সময়ে মায়া শুধালো নিষেধ করলে কেন?

বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে দেখবার জন্যেই তো আমাকে এনেছিলে। ও রঙের বারো আনাই Max Factor-এর কীর্তি।

তার মানে কৃত্রিম!

যা বোঝো।

মায়া সত্য সত্যই হতাশ হল কিন্তু সেই হতাশার মধ্যে একটুখানি আনন্দ যেন কোথায় অনুভব করলো! সব রঙই ঝুঁটো, কেবল সে নিজে Max Factor-এর হস্তক্ষেপ ছাড়া সুন্দরী। তখনি আবার মনে পড়ে শশাঙ্কর শেষ চিঠিখানা। মা যা হয় একটা স্থির করে ফেলো, না হয় আমার হাতে ছেড়ে দাও। মনে মনে ভাবে, বোকা ছেলে ঠকে মরবি যে! আমার চোখকে যারা ফাঁকি দিচ্ছে তোকে ঠকাতে তাদের কতক্ষণ? শেষ পর্যন্ত ঝোলা গুড়ের রঙের মতন একটা মেয়ে বিয়ে করে ঘরে আনবি। দাঁড়া, আর কটা দিন সবুর কর, এমন মেয়ে খুঁজে বের করবো যাতে সকলকেই স্বীকার করতে হবে, হ্যাঁ, ফরসা বটে।

মায়া ও শমিতা যখন মোটরযোগে বারইপুর থেকে কলকাতা ফিরছিল, ঠিক সেই সময়ে শশাঙ্ক ও ডরোথি মোটরযোগে কুতুব থেকে নয়াদিল্লি ফিরছিল। যেহেতু পৃথিবী বিপুল আর মানবচরিত্র বিচিত্র, এমন ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়।

ডরোথি বলেছিল, শশাঙ্ক, তোমার মায়ের আবার যেমন রঙের বাতিক আমার রঙ কি পছন্দ হবে?

শশাঙ্ক বলল, মা তো অন্ধ নন। আর রঙের সঙ্গে যে মানুষটা আছে তাকে?

ছেলের পছন্দ হয়েছে সেটাই কি যথেষ্ট নয়, মা তো শুধু রঙ চান তিনি খুশী হবেন।

শশাঙ্ক, মায়ের মতো তুমিও তো শুধু রঙ দেখে ভুলছো না, ভেবে দেখো!

না ডোরা, আর ভাবিও না, আজ দু'মাস ভেবেছি, দিনে রাতে শয়নে স্বপনে অফিসে বাইরে।

অন্য কখনো ভেবেছ কি না জানি না, কিন্তু অফিসে যে ভেবেছ শপথ করে বলতে পারি।

বিস্মিত আনন্দে শশাঙ্ক বলে, দেখেছ?

না দেখে উপায় কি, চোখ দুটো তো সঙ্গেই থাকে।

কি ভাবতে?

ভাবতাম।

One more unfortunate weary of breath.

দুজনে হেসে ওঠে। পথের দুপাশের গম্বুজ মিনার মসজিদগুলো ছুটে পালায়।

কিছুক্ষণ পরে শশাঙ্ক শুধায়, রেজিগনেশান লেটার পাঠিয়ে দিয়েছ তো? বেশ। আমিও লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে দিয়েছি।

বিবাহান্তে হঠাৎ একদিন শশাঙ্ক ও ডরোথি কলকাতায় এসে উপস্থিত হল। বাপ মা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই হতবুদ্ধি। তবে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হল, এমনকি শমিতাকেও, হাঁ, মেয়ের রঙ ফরসা বটে। শেষ পর্যন্ত মায়া দেবী ঠকেনি।

শাজাহানের মৃত্যু

অবশেষে লোকটার চাকরি গেল। মনিবকে দোষ যাওয়া যায় না, লোকটার গুণের খাতিরে অনেক সহ্য করেছে। তবে সব শক্তির মতো সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে, তাই অনেকবার ছাড়াই ছাড়াই করেও শেষরক্ষা হয়েছে, এবারে আর শেষরক্ষা সম্ভব হল না, বিদায় দিতে হল। না দিয়েও উপায় ছিল না। ঐ একটা লোকের জন্য এত বড় ব্যবসাটা মাটি হতে বসেছিল, আর কিছুদিন এভাবে চললে ব্যবসা তলিয়ে গিয়ে সপরিবারে মনিব এবং দলের এতগুলো লোক পথে বসতো।

মনিবের সিদ্ধান্ত শুনে দু-একজন বলেছিল, কিন্তু স্যাব, মহীদাসবাবুর জন্যেই আমাদের এত নাম, এত পসার।

মনিব মুখ খুলবার আগেই ম্যানেজার বলল, আপনার কথা আগে সত্য ছিল, কিন্তু গত দুই মাসের রিটার্ন দেখেছেন? শতকরা কুড়ি ভাগ কমে গিয়েছে।

পূর্বোক্ত লোকটি বলল, এখন তাঁকে বিদায় দিলে আরও কমবে।

ম্যানেজার বলল, এমনভাবে মাতাল অবস্থায় স্টেজে নামলে দলের সুনাম থাকে? অডিয়েন্সের রি-অ্যাকশন দেখেন নি! তাছাড়া আছে কামাই। আজ শরীর খারাপ, কালকে মামলা আছে, পরশু স্ত্রীর অসুখ।

অপর ব্যক্তি বলল, স্ত্রীর অসুখের জন্যে আর কামাই হবে না, তিনি মারা গিয়েছেন।

ম্যানেজার বলল, তবে তো সোনায় সোহাগা হল, এতদিন রয়ে সয়ে

চলছিল, এবার অষ্টপ্রহর মাতাল হয়ে থাকবে।

তারপরে সে মনিবের দিকে চেয়ে বলল, স্যার, ও'কে বরঞ্চ বসিয়ে রেখে মাইনে দেওয়া ভাল, স্টেজে নামলে ব্যবসা ফেল পড়বে।

মনিব অতক্ষণ নীরবে দুই পক্ষের কথা শুনছিল, এ বিষয়ে আগেই তার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গিয়েছিল. এবারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো, আজ একমাস কাল তো বসিয়ে রেখেই মাইনে দিয়েছি। অন্য লোক হলে বলতাম 'সাসপেনশন', দুঃখ পাবে বলে মহীদাস সম্বন্ধে ও-কথাটা উচ্চারণ করিনি। না, বিদায় দেওয়াই নিশ্চিত। একজনের জন্যে সবাই ডুবতে পারি না। তবে অবিচার করতে চাই না, অনেক দিনের পুরনো লোক, তাতে গুণী, তিন মাসের পুরো বেতন দেবো। ম্যানেজারবাবু, আজই বিদায়ী চিঠি পাঠিয়ে দিন, পরে একসময়ে গিয়ে দেখা করে তিন মাসের টাকা দিয়ে আসবেন।

পূর্বোক্ত ব্যক্তি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, এমন শাজাহান আর হবে না।

ম্যানেজার বলল, কেন, ওই যে কানাইবাবু বলে লোকটি সেদিন যোগ দিয়েছেন, তাঁকে দিয়ে বেশ চলবে, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।

মহীদাসের গুণগ্রাহীদের একজন বলল, স্বীকার করি চলবে, পরীক্ষার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। তবে দুজনে তফাৎ আছে, কানাইবাবু শাজাহানের পার্ট অভিনয় করেন আর মহীদাসবাবু শাজাহান বনে যান, দেখতে দেখতে মনে হয় তাঁর চারদিকে যেন মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

মনিব উঠে পড়লো, বৃথা আলোচনায় লাভ নেই। দেহটাকে বাঁচাবার প্রয়োজন হলে একটা দূষিত আঙুল কেটে ফেলতে হয়। যেমন বললাম সেই রকমটি করবেন।

ম্যানেজার বলল, স্যার, আজ তো থিয়েটার বন্ধ, কাল পরশু শাজাহান পালা বন্ধ থাক, তার বদলে গিরিশ ঘোষের একখানা আর সেই সঙ্গে রসরাজ অমৃতবোসের একটা ফার্সের হ্যাণ্ডবিল লাগিয়ে দিই।

সেই ভাল, বলে মনিব বিদায় হলে ম্যানেজারবাবুও বের হয়ে গেল, রইলো পূর্বোক্ত লোক দুটি।

মহীদাস লোকটি সজ্জন ও সহৃদয়, মাতাল ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সজ্জন ও সহৃদয় হয়েই থাকে। তাই দলের লোকে তাকে ভালবাসতো, এক সময়ে

মালিক ও ম্যানেজারও তার গুণগ্রাহী ছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। সেই আগের ইতিহাস না জানলে গল্পের সূত্র পাওয়া যাবে না। হুগলি জেলার এক গ্রামে কাদম্বিনী থিয়েটার পার্টির জন্ম, তখন তাদের কোন নিজস্ব স্টেজ ছিল না। বড় বড় যে সব গ্রামে স্টেজে অভিনয় করবার সুযোগ আছে সেখানে নানা উপলক্ষে, যেমন দোল দুর্গোৎসব শিবরাত্রি বা জমিদার-বাবুর পুত্রকন্যার বিবাহ—এরা অভিনয় করতো, তখনো মহীদাস রায় দলে যোগ দেয় নাই।

এমন সময়ে বছর পনেরো আগে মহীদাস এসে দলে যোগদান করলো। লোকটা জাতশিল্পী, অভিনয়ে তার স্বাভাবিক দক্ষতা। তারপর থেকেই প্রধানত তারই প্রতিভায় দলের খ্যাতি চতুর্গুণ বেড়ে গেল। শেষে এমন হল যে, কলকাতায় তাদের ডাক পডতে লাগলো। কলকাতার দল মফঃস্বলে অভিনয় করতে যায়, মফঃস্বলের দলের কলকাতায় এসে অভিনয় নূতন বটে। কলকাতার দর্শক তাদের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, মফঃস্বলে যাওয়া তাদের বন্ধ হয়ে গেল, সারাটা বছর কাটতে শুরু করলো কলকাতায়। প্রধান আকর্ষণ মহীদাসের অভিনয়। কলকাতার অনেক থিয়েটার মহীদাসকে আশাতীত বেতনের লোভ দেখালো—কিন্তু মহীদাস দল ছাডলো না। তখন মালিক এন বোস (ঐ নামেই তাঁর পরিচয়) মহাজনের কাছে টাকা ধার করে নিজস্ব থিয়েটাব তৈরী করলো, নাম হল কাদম্বিনী থিয়েটার। মহীদাস ও অন্যান্য অভিনেতার অভিনয়গুণে সে টাকা অনেক দিন শোধ হয়ে গিয়েছে।

কাদম্বিনী থিয়েটার ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, সাময়িক, রঙ্গ, ব্যঙ্গ, ফার্স সব সময় অভিনয় করে থাকে; মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল সকলের গ্রন্থকেই পাদপ্রদীপের আলোয় উপস্থিত করেছে, এমন কি, রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন নি। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বেশী নাম বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটকে, ওই নাটকেই মহীদাসের প্রতিভার চরম বিকাশ হয়ে থাকে। আজ তারা দু'বছর একটানা দ্বিজেন্দ্রলালের শাজাহান অভিনয় করছে। মহীদাস শাজাহান। দর্শক ও সংবাদপত্রের সুচিন্তিত অভিমত, এই ভূমিকার অভিনয়ে মহীদাস রায় পূর্বতন সকলে ছাড়িয়ে গিয়েছে, পরেও আর এমন হবে আশা করা যায় না। কাদম্বরী থিয়েটারের সুনাম ও ঐশ্বর্য এখন ষোল কলায় পূর্ণ।

মহীদাসের এখন অনেক টাকা। শহরের মধ্যে কাদম্বিনী থিয়েটারের কাছে বাড়ি তৈরী করেছে, সেখানেই থাকে। শহরের মধ্যে আরও কিছু সম্পত্তি করেছে, খান দুই বাড়ি, ছোট একটা বস্তি। কিন্তু তার এই দুঃখ যে, ছেলেগুলো মানুষ হল না, বড়টা ওরই মধ্যে একটু ভাল, ছোট দুটো অমানুষ। একটি মেয়ে তার বিয়ে হয়েছে, তবু সে অনেক সময়ে বাপের কাছে এসে থাকে। লোকে বলে সারাদিন থিয়েটার নিয়ে পড়ে থাকলে ছেলেরা তো অমানুষ হবেই। শাজাহান ভূমিকার খ্যাতিতে পাড়ায় তার নাম হয়েছে শাজাহান। মহীদাসের সবই ভাল মদ ছাড়া; আগে সে মদ খেত, এখন মদ তাকে খায়। প্রায় মত্ত অবস্থায় স্টেজে নামে, আগে তার খাতিরে দর্শকে সহ্য করতো, এখন আর করতে চায় না, থিয়েটারের ক্ষতি হতে শুরু করেছে। তার পরের ঘটনা গোড়াতেই বিবৃত হয়েছে।

মালিক ও ম্যানেজার চলে গেলে পূর্বোক্ত ব্যক্তি দুজনের মধ্যে কথা আরম্ভ হল। গোবিন্দবাবু, চলুন একদিন মহীদাসবাবুকে গিয়ে দেখে আসা যাক।

আপনি বরঞ্চ যান, আমি একদিন গিয়ে যে দৃশ্য দেখে এসেছি তাই যথেষ্ট, আর যাওয়ার, ইচ্ছা নেই।

কি রকম ?

রকম ভালই। ঘরে ঢুকে মহীদাসকে দেখে মনে হল বৃদ্ধ বন্দী শাজাহান। ছেঁড়া জামা, মলিন বসন, চুল রুক্ষ, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। প্রথমটা আমাকে চিনতেই পারেন নি, কিছুক্ষণ ঠাহর করে দেখে বলে উঠলেন, গোবিন্দবাবু যে, কি খবর ? suspension থেকে dismissal এর হুকুম নিয়ে নাকি ?

কি করে জানলেন ? suspension তো কেউ বলে নি।

নরেশবাবু, সংসারে অনেক কথা আছে যা না বললেও বোঝা যায়। তা ছাড়া মহীদাসবাবু নির্বোধ নন।

কিন্তু এমন লক্ষীছাড়া অবস্থা কেন ?

লক্ষী ছেড়ে গিয়েছে তাই।

কিছু বললেন ?

অনেক কথাই বললেন। বললেন, শাজাহানের ঐশ্বর্য থাকলে নূতন তাজমহল গড়তাম। আমি বললাম, আপনি বাদশা না হলেও দরিদ্র নন,

মনে শান্তি পান এমন একটা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করুন না কেন? তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, বোধ করি দরিদ্রই হলাম। এমন বলছেন কেন শুধালে বললেন, ছোট ছেলে দুটো যোগসাজসে বাড়িঘর সব বেনামী করে কিনে নিয়েছে, শুনছি এবাড়ি থেকেও বের করে দেবে। আমি বললাম, ভুল শুনেছেন, এমন কি কখনো হয়? কেন হবে না গোবিন্দবাবু, শাজাহানের ভাগ্যে যা ঘটেছে আমার ভাগ্যে তা ঘটতে বাধা কি। ওই তো বললেন, তিনি ছিলেন বাদশা। এবারে হেসে বললেন, তিনি বাদশা, আমি থিয়েটারের অ্যাকটর। হলে কি হয়, তলে তলে সব সমান দুঃখের বাঁধনে সবাই এক। আমি বললাম, ও সব চিন্তা রাখুন, কিছুদিনের জন্যে বাইরে গিয়ে ঘুরে আসুন। যাবো বই কি, dismissal orderটা পেলেই যাবো। আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, আপনার dismiss হলে থিয়েটার চলবে কি করে? কেন, আসল শাজাহানের dismissal হলেও মোগল সাম্রাজ্য চলেছিল। আমি তো সাজা শাজাহান। খুব চলবে, বিশেষ ওই কানাইবাবু এসেছে নূতন শাজাহান। আমি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সত্যি বলছি নরেশবাবু এর উপরে dismissal order গিয়ে পৌছলে পাগল হতে যেটুকু বাকি আছে তা পূর্ণ হবে। আমি যাচ্ছি না, আপনি চান তো যান।

যা শুনলাম তার পরে আর সে ইচ্ছা নাই। আচ্ছা কোন রকমে dismissal orderটা বন্ধ করা যায় না।

নরেশবাবু, ব্যবসা বড় হৃদয়হীন, ও আশা পরিত্যাগ করুন।

এই ঘটনার পরে এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল।

মহীদাস। তাই তো এ বড় দুঃসংবাদ, দারা। মহীদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোহিতাশ্ব বলল, দুঃসংবাদ বই কি বাবা। নবীন আর ছোটন মিলে যে এমন কাণ্ড করবে ভাবতে পারিনি।

মহীদাস বলল, তোমরা বুঝি ওদের নবীন আর ছোটন বলো, বেশ, আপত্তি নেই। ইতিহাসের কাছে ওরা ঔরঙ্গজেব ও মোরাদ।

রোহিতাশ্ব বলল, আপনার যেমন খুশি।

আচ্ছা, আর একবার সমস্ত খুলে বলো, বুঝে দেখি।

বাবা, আপনার স্নেহ আর অনবধানতার সুযোগ নিয়ে ওরা দুজনে দমদমের বাগানবাড়ি, বারুইপুরের চাযের পঞ্চাশ বিঘা জমি সমস্ত নিজেদের

নামে বেনামী করে নিয়েছে।

কেন এমন হল বলতে পারো দারা। এতক্ষণ মহীদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃন্ময়ী অদূরে মেঝেতে বসে একমনে সেলাই করছিল, এবারে বলে উঠল, আমি বলবো বাবা।

বলো জাহানারা, বলো, তুমি আমার রোগের শুশ্রূষা শোকের সান্ত্বনা, সুখের সঙ্গী, পত্নীহীন জীবনের চরম আশ্রয়, বলো জাহানারা।

আপনার প্রশ্রয়ে ওরা দুজন নষ্ট হয়েছে। দাদা আর আমি জন্মেছিলাম আপনার দারিদ্র্যের দিনে, নষ্ট হওয়ার সুযোগ ছিল না। ওরা দুজন ধনের মধ্যে জন্মে গোল্লায় গিয়েছে।

মহীদাস বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, অমন করে বলিস নে জাহানারা, ওদের মুখ দেখলে ওদের মাকে মনে পড়ে যায়, শাসন করতে পারিনে।

আর আমরা বুঝি মাতৃহীন হইনি।

না, না, তোরা ভিন্ন জাতের মানুষ। এখন তুই আমার জননী, দারা আমার পিতা। ওরা যে আমার সন্তান।

তবে বুঝি তোমার সন্তান হওয়াই ভাল ছিল।

এবারে রোহিতাশ্ব কথা বলল, তাই বলে জাল করবে, বেনামী করবে, এর পরে আমাদের সকলকে হয়তো এ-বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

মহীদাস। আমি শুনেছি যে, হিংস্র জন্তুদের মধ্যে একটা দস্তুর আছে যে, পিতা সন্তান খায়। আছে কিনা ?

রোহিতাশ্ব। হাঁ আছে। তাই কি ?

রোহিতাশ্ব। হাঁ আছে। তাই কি ?

মহীদাস। কিন্তু সন্তান পিতা খায়, এ প্রথাটা তাদের মধ্যে নেই বোধ হয়।

রোহিতাশ্ব। এমন তো শুনি নি।

রোহিতাশ্ব বলল, পশুরা আর যাই করুক, জাল, বেনামী তঞ্চকতা এসব করে না। ও সব মানুষের একচেটিয়া অধিকার।

আর ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, পিতাকে বন্দী, এ সবও তাহলে মানুষের একচেটিয়া অধিকার।

তাই তো দেখছি।

কিন্তু কি হয়েছে, কতটুকু নিয়েছে, ভারত সাম্রাজ্য তো এখনো আমার অধিকারে। আজ যদি একবার দুর্গের বাইরে গিয়ে আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারতাম,তা হলে এখনও এই বৃদ্ধ শাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরঙ্গজেব মাটিতে নুয়ে পড়তো। ওই শোনো দারা, ওই শোনো জাহানারা, ওই শোনো জনতার জয়ধ্বনি,—জয় সম্রাট শাজাহানের জয়।

এই বলে মহীদাস দোতলায় বারান্দার দিকে ছুটলো।

বাবা, বাবা, ও পথের গোলমাল।

জাহানারা এই যতক্ষণ বলছে ততক্ষণে মহীদাস গৃহান্তরে প্রস্থিত। রোহিতাশ্ব তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে বলল, থাম বোন, এ তো নিত্যকার ব্যাপার। ও ঘরে গিয়ে বরঞ্চ তিনি শান্ত থাকবেন।

অশ্রুমুখী জাহানারা বলে উঠল, দাদা, এ কি হল। এমন শান্ত লোক হঠাৎ পাগল হয়ে গেল!

হঠাৎ কোথায় বে মৃন্ময়ী, পরস্পর কতগুলো আঘাত এসে পড়লো ভেবে দেখ।

এমন কি আর কারো ঘরে হয় না।

হয় বই কি, নইলে শাজাহান নাটক রচনা সম্ভব হল কি করে? আমি ভাবছি কি জানিস, সেই সঙ্গে যে আমরাও পাগল হতে চললাম।

এ অবস্থায় প্রকৃতিস্থ থাকবার চেয়ে পাগল হওয়াই বোধ করি ভাল।

কেন?

দুঃখটা ভোলা যায়।

তুই কি ভাবছিস বাবা দুঃখ অনুভব করছেন না?

তাই তো শুনি, পাগলের সুখ-দুঃখ বোধ নাই।

কিন্তু তিনি যে পাগল হয়েছেন কে বলল?

পাগল হননি?

আমার মনে হয় কি জানিস, উনি দুঃখকে এড়াবার আশায় পাগলামির মুখোশ পরে বসে আছেন।

তবে যে সেদিন ডাক্তার বলে গেল A clear case of lunacy!

ডাক্তাররা অমন বলে থাকে, পাগল বলতে পারলে তারা দায়িত্বমুক্ত। যাও, এখন তুকতাক তাবিজ-কবচ করোগে, না হয় হাত পা বেঁধে ফেলে রাখো।

শুনেছি যে পাগলের ডাক্তার আছে। তাদেরই একজনকে না হয় ডাকো।

ডেকেছি। ডাক্তার মুৎসুদ্দি, বিখ্যাত পাগলের ডাক্তার, আজ সকালেই আসবেন।

পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছ তা ?

সমস্ত। তিনি সব বিবরণ শুনে বললেন, বুঝেছি শাজাহান Illusion ! তাই হবে, আপনার পরামর্শ মতো দিলদার বলেই নিজের পরিচয় দেবো। তার পরে, এ তো simple case ! একটা কঠিন রুগী পেয়েছিলাম, তার হয়েছিল Crocodile Illusion, কুমীরীভাব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তখন আপনি কি করলেন ? ডাক্তার মুৎসুদ্দি বললেন, আমি হাঙ্গররূপে পরিচয় দিয়ে treatment শুরু করলাম।

মৃন্ময়ী শুধালো, রুগী সারলো ?

এমন সময়ে রোহিতাশ্ব বলে উঠল, ও যে গাড়ির শব্দ, ডাক্তার মুৎসুদ্দি এলেন বোধ করি।

এই বলে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। মৃন্ময়ী মুখটা মুখটা মুছে নিয়ে মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে রোহিতাশ্ব ঘরে ঢুকলো।

মুৎসুদ্দি বললেন, আপনি ভাববেন না, এ রকম পরিস্থিতিতে আমরা অভ্যস্ত, আপনার শিক্ষামতো দিলদার বলেই আমার পরিচয় দেবো প্রয়োজন মতো দিলদারের সুরেই কথা বলবো, শাজাহান নাটক ভাল করে পড়া আছে।

ডাক্তার মুৎসুদ্দি, এই আমার বোন মৃন্ময়ী।

নমস্কার।

নমস্কার।

রুগী কোথায় ?

পাশের ঘরে গিয়েছন, ডেকে আনছি, বলল মৃন্ময়ী।

বরঞ্চ ওঁকে নিয়ে আমি যাই।

সেই ভাল, একটু নিরিবিলি পাওয়া যাবে, বললেন মুৎসুদ্দি।

ওরা বেরিয়ে গেলে মৃন্ময়ী একা বসে রইলো, একা অথচ নিঃসঙ্গ নয়, স্মৃতি-রূপে সগুমৃত জননী, বিবদমান দুই ভাই এবং পিতার প্রকৃতিস্থ মূর্তি মনে

পড়তে লাগল। মহীদাসের যখন যথেষ্ট টাকা ও খ্যাতি হয়নি, সেই ছেলে-বেলার ইস্কুলের সহ পাঠিনীরা তাকে আড়ালে যাত্রাওয়ালার মেয়ে বলতো, কোন কোন মাস্টারনী নীতি শিক্ষা দেওয়ার মানসে ক্লাসের মধ্যে বলতো—যাত্রা থিয়েটারের আবহওয়া নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। মেয়েরা মৃন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে হাসতো। তারপরে ক্রমে মহীদাসের টাকা ও নাম হতে লাগলো, তখন মাস্টারনীরা থিয়েটারের পাসের জন্য মৃন্ময়ীকে ধরতো, সেই নীতিশিক্ষার মাস্টারনী সকলের অগ্রণী। আরও টাকা আরও সুনাম হল। এতদিন যারা মহীদাসকে যাত্রাওয়ালা ও ভাঁড় বলতো, এখন তারা শিল্পী বলতে শুরু করলো। অবশেষে পাড়ার সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ মহীদাসকে সংবর্ধনা জানিয়ে নটভাস্কর উপাধি দান করলো। মৃন্ময়ীর মনে পড়লো, তাদের বাড়িতে কেউ বড় আসতো না, পাসের প্রয়োজন ছাড়া; কোন সহপাঠিনীর বাড়িতে সে গেলে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করতো, সহপাঠিনী বাপ-মায়ের কাছে জবাবদিহিতে পড়তো থিয়েটারওয়ালার মেয়ে তোর কাছে আসে কেন? খুব বুঝি মেলামেশা করিস, সাবধান। এখন পাশা উল্টে গিয়েছে, লোক আসবার কামাই নেই, এলে উঠতে চায় না; কারো বাড়িতে গেলে সবাই ঘিরে ধরে, ছাড়তে চায় না। বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়েদের বলে—মৃন্ময়ীর সঙ্গে মেলামেশা করবি, ওদের কাছে থেকেই তো সংস্কৃত আর সহবত শিখবি। মৃন্ময়ী জানে, এ সমস্তর মূলে পিতার উন্নতি ও প্রতিভা। বেশ চলছিল, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যে অর্থকে ঐশ্বর্য বলে—তার কাছাকাছি এসে তারা পৌঁছলো। মৃন্ময়ীর মায়ের দুঃখ ছিল, কর্তা আজকাল মদ খাওয়ায় বাড়াবাড়ি করছেন; আর এক দুঃখ, ছোট ছেলে দুটো মানুষ হল না। তারপরে একদিন বাঁশি বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে মৃন্ময়ী স্বামীর ঘরে রওনা হয়ে গেল, ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল, স্বামীটিও ভালমানুষ অর্থাৎ স্ত্রীর কথায় ওঠে বসে। এমন সময়ে মায়ের কঠিন অসুখ হল। সেবার জন্য বাপের বাড়িতে এলো মৃন্ময়ী, মানুষের চেষ্টায় যা সম্ভব তার ত্রুটি হল না, তবু তাকে বাঁচানো গেল না। সেই থেকেই দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত।

দিলদার, দেখো, দেখো, সূর্য উঠেছে! যেমন সেই প্রথম দিন উঠেছিল, সেই রকম উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ! আকাশ তেমনি নীল, ওই যমুনা তেমনি ক্রীড়াময় কলস্বরা; যমুনার পরপারে বৃক্ষরাজি তেমনি পত্রশ্যাম পুষ্পোজ্জ্বল, যেমন

আমি আশৈশব দেখে এসেছি। দেখছ দিলদার ?

জি জাঁহাপনা।

ওই শ্যামসৈকতময়ী যমুনার পরপারে কি দেখছ, দিলদার ?

বেগম সাহেবার কবর।

না, না, কবর নয়, পাষাণে গঠিত একখানি দীর্ঘশ্বাস।

জি জাঁহাপনা।

আল্লার মনে কি সঙ্কল্প ছিল জানো ? যমুনার পরপারে কালো পাথরে, ওরই অনুরূপ আর একটি সৌধ নির্মাণ করবো, আর এ-পারে ও-পারে যোগা-যোগ হবে একটি সেতুবন্ধে। এপারে পূর্ণিমার চন্দ্র, ও-পারে অমাবস্যার।

চমৎকার হতো।

কিন্তু হল না। কেন জানো ? ঔরঙ্গজেবের বিরোধিতায়। আচ্ছা, দিলদার, সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলে কি হতো বলতে পার ?

জাঁহাপনা, তবে পশ্চিম দিকটাকেই লোকে পুব দিক বলতো।

চমৎকার বলেছ। আর মানুষ যদি চার হাত পায়ে হাঁটতো তবে কি হতো ?

চতুষ্পদ হতো।

হতো বলছো কেন ? এখনি কি নয় ? ঔরঙ্গজেবের ব্যবহার কি মনুষ্যোচিত ?

পাশের ঘর থেকে সংলাপের টুকরো ভেসে আসে মৃন্ময়ীর কানে। যে সব কথা শুনে হাসি পাওয়া উচিত তাতে জলে ভেসে যায় তার চোখ। এ সময়ে যদি ছোট ভাই দুটো মানুষের মতো ব্যবহার করতো ! একা বড়দা আর কি করবে ?

দারা, ঔরঙ্গজেবের আর কোন খবর আছে ?

না বাবা।

শেষ পর্যন্ত মোরাদকে ও ঠকাবে। যে পিতাকে ঠকায়, জ্যেষ্ঠকে ঠকায়, কনিষ্ঠকে না ঠকিয়ে সে পারে না, ঠকাবেই। দিলদার, আমার একটিমাত্র কি অভাব আছে বলতে পারো ?

আপনি শাহানশাহ, আপনি হিন্দুস্থানের বাদশা, আপনার অভাব ? তাজ্জব কি বাত।

হাঁ, অভাব আছে। আমার দারা, ঔরঙ্গজেব, মোরাদ, জাহানারা, চার

ছেলেমেয়ে আছে, অভাব কেবল সুজার আর একটি ছেলে থাকলে চতুরঙ্গ পূর্ণ হতো।

শোনে আর মৃন্ময়ী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, ভগবান এমন মানুষের এমন অবস্থা করলে। তবু কিনা তুমি দয়াময়।

ওরা তিনজন এ ঘরে প্রবেশ করে, মৃন্ময়ী আড়ালে চলে যায়।

এখন বিদায় চাও? আচ্ছা, যাও দিলদার, একটি অনুরোধ আমার রক্ষা করো, পথে যেতে যেতে প্রজাদের বলো, তোমাদের প্রিয় বাদশা বৃদ্ধ হয়েছে, বন্দী হয়েছে, অক্ষম হয়েছে কিন্তু তোমাদের ভোলেনি, ভোলেনি, ভোলেনি। মনে থাকবে?

জি, জাঁহাপনা।

যাও, আল্লা তোমার কল্যাণ করুন। এই বলে মহীদাস ছুটে চলে গেল গৃহান্তরে।

ডাক্তারবাবু কেমন দেখলেন?

যেমন ভেবেছিলাম তার চেয়ে খারাপ নয়।

আচ্ছা, একেই কি উন্মাদ রোগ বলে নাকি?

দেখুন, উন্মাদ রোগ একটা সাধারণ নাম। তার নানারকম শ্রেণীভেদ আছে। এঁর যা হয়েছে তাকে বলে Split personality। ব্যক্তিত্বের দ্বিখণ্ডিকরণ বলা যেতে পারে।

সেটা আবার কি?

ধরুন, আমাদের মন যেন এক খণ্ড পাথর দিয়ে তৈরি। কোন কারণে সেই পাথর দু' টুকরো হয়ে যেতে পারে। তার পরে নিজের মনের এক টুকরোর সঙ্গে আর কারো মনের এক টুকরো যেন ভ্রমক্রমে জোড়া লেগে গেল! তখন মানুষটা একই সঙ্গে দুই সুরে কথা বলতে শুরু করবে। কোন বিশেষ আঘাতে মিঃ রায়ের মনের একখণ্ডের সঙ্গে তাঁর নিত্যসহচর শাজাহান ভূমিকার একখণ্ড জোড়া লেগে গিয়েছে। তাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে।

এ সারাবার উপায় কি?

আবার একটা উল্টো আঘাত আবশ্যক, তখনি ফিরে পাবেন আপন পূর্ণাঙ্গ সত্তাকে, অমনি চটকা ভেঙে গিয়ে মহীদাস শাজাহানের বদলে পুরো মহীদাস হবেন। এ ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাওয়ার মতো।

সে কেমন করে সম্ভব হবে?

ওই যে বললাম, হঠাৎ আঘাত আবশ্যক। আরও একটা উপায় আছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ধীরভাবে আলাপ আর প্রশ্নোত্তরে ঘাড়ের ভূতটাকে টেনে নামাতে পারে। তবে সেটা সময় ও ব্যয়সাধ্য।

ব্যয়ের জন্য ভাববেন না, বাবার টাকার অভাব নেই।

তবে আমি প্রত্যেকদিন আসবো, বেলা দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত থাকবো।

ডাক্তার বিদায় হয়ে গেলে মৃন্ময়ী বলল, দাদা, বাবা একটু শান্ত আছেন, চলো এই সময়ে তোমাকে খাইয়ে দিই, বেলা অনেক হয়েছে।

আর তুই ?

আমি তো তাকে না খাইয়ে খাইনে।

এইভাবে দিন যায় অর্থাৎ নিসর্গের নিয়মে দিন রাত্রি হয় কাজেই মহীদাসের পরিবারেও দিন রাত্রির ভাগ আছে। এক রকম চলছিল, তবে ইদানীং কিছু অর্থকষ্ট দেখা দিয়েছে। নবীন ও ছোটন মিলে অন্য সব সম্পত্তি বেহাত করে নিয়েছে কাজেই সে দিককার আয় বন্ধ। মহীদাস ভেবেছিল বড় ছেলেকে থিয়েটারে ঢোকাবে পিতাপুত্রে মিলে শাজাহান আর দারার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। সে আশা সফল হয়েছে, তবে অন্যভাবে। নিত্যকার খরচের উপরে আছে ডাক্তার মুৎসুদ্দির ফি, তিনি সপ্তাহে দুবার আসেন। রোহিতাশ্ব আর মৃন্ময়ী মিলে যুক্তি করলো—বাড়ির নীচ তলাটা ভাড়া দেবে, অন্য আয়ের পথ তাদের চোখে পড়ে না। এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটলো। ছোটন একদিন কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে এসে ঢুকলো। ভাগ্য যে তখন রোহিতাশ্ব বাড়ি ছিল না।

তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল মৃন্ময়ী প্রথম কিছুক্ষণ তো তার মুখে কথা এলো না, বিস্ময়ের ভাব কাটলে শুধালো, কি রে ছোটন, খবর কি ?

সে কিছু বলে না, কেবল কাঁদে। ভারি মায়া হল মৃন্ময়ীর মা-মরা ছোট ভাই।

প্রথম কথা তার মুখ দিয়ে বের হল, দাদা বাড়ি নেই তো ?

না, কি খবর বল ?

তার প্রদত্ত বিবরণ থেকে চোখের জল বাদ দিলে দাঁড়ায় এই যে, মেজদা অর্থাৎ নবীন তাকে দলে টেনে বাড়িঘর বেনামী করে কিনে নিয়েছে। তাকে বুঝিয়েছিল যে, এ ছাড়া উপায় নেই, বাবা পাগল হয়ে গিয়েছেন, তাঁর নামে

এ সব থাকলে সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে।

সে বলেছিল সম্পত্তি তো মার নামে।

নবনী বোঝালো, মার নামে বাবার একই কথা। বুঝিয়েছিল, তোর নামে থাকলে আমাদের সকলেরই থাকলো। তার পরে আমি একদিন বললাম যে, সম্পত্তি তো রক্ষা করলে, চলো এখন বাড়ি ফিরে যাই। অন্তত কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও, সকলে নিশ্চয় টানাটানিতে পড়েছে।

মেজদা বলল, তোর ইচ্ছা হয় যা, আমি যাবো না।

আমি বললাম, বেশ আমিই যাচ্ছি, কিছু টাকা দাও।

টাকা চাওয়ার তুই কে?

কেন, আমি তো মালিক, সমস্ত আমার নামে।

মেজদা বলল, তুই মালিক! বটে! তোকে ভোগা দিয়ে সব আমা নামে করে নিয়েছি, এখন তোর যাওয়া ছাড়া আর পথ নেই, এই বলে লা মেরে আমাকে তাড়িয়ে দিল।

আমারও ইচ্ছে করছে লাথি মেরে তোকে তাড়িয়ে দিই, হতভাগা- বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো রোহিতাশ্ব। বলে চলল, লজ্জা করে না, এখা এসেছিল মুখ দেখাতে, বেরো বলছি নচ্ছার।

মৃন্ময়ী বাধা দেয়, বলে, কি করো, বড়দা।

কি করি! দেখ, কি করি। ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবো।

তার দরকার হবে না বড়দা। মেজদা এসে তোমাকে আমা বাবাকে সকলকেই বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

আসুক না, হারামজাদার হাড় মাস আলাদা করে দেবো।

পারবে না। সে একা আসবে না আদালতের পেয়াদা পুলিস নি আসবে এ বাড়িতে কায়েম মোকাম হওয়ার জন্যে। এ বাড়িও বেনামী ক নিয়েছে।

এত বড় শয়তান সে।

মৃন্ময়ী বলল, এ বাড়িখানাও নিয়েছে? কেমন করে নিল রে?

কেমন করে জানবো দিদি? মায়ের আদরের ছেলে ছিল, কি বুঝি অনেক গুলো সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল তারপরে সেগুলো দানপ পরিণত হয়েছে।

কি সর্বনাশ! এ বাড়িখানাও নিয়েছে?

হাঁ, বড়দা।

কই, আমরা তো কোন নোটিস পাইনি।

সমস্ত নোটিস চেপে দিয়ে কাজটি করেছে। তবে অবিলম্বে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিস পাঠিয়েছে।

কই, আমরা তো পাইনি।

বাবার নামে পাঠিয়েছে।

কি সর্বনাশ। মৃন্ময়ী ইতিমধ্যে কি বাবার নামে কোন চিঠি এসেছে?

আমার তো চোখে পড়েনি। তবে যখন তিনি একলা আছেন তখন পিয়ন এসে যদি তাঁর হাতে দিয়ে থাকে।

এমন সময়ে বেগে ছুটে ঘরে প্রবেশ করলো মহীদাস, চুল দাড়ি রুক্ষ, মুখমণ্ডল শুষ্ক চক্ষু রক্তবর্ণ, হাতে প্রলম্বিত সরকারী ইস্তাহার। ভয়ে লজ্জায় মৃন্ময়ী ছাটন আড়ালে লুকালো।

দেখো, দেখো, তোমরা সবাই দেখো, পুত্র ঔরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতা শাজাহানকে ইস্তাহার পাঠিয়েছে। এই দেখো, কি লিখেছে—"অবিলম্বে তামাকে আদেশ করা যাইতেছে যে, কথিত বাড়ি ছাড়িয়া দিবে। নতুবা আইন অনুযায়ী দণ্ডিত হইবে।" তোমরা সকলে দেখো, তোমরা সকলে শোনো, বৃদ্ধ পিতার প্রতি পুত্রের নির্দেশ।

রোহিতাশ্ব বলল, বাবা, আপনি শান্ত হন, এর ব্যবস্থা করবো।

ব্যবস্থা, এর আবার ব্যবস্থা কি? ভগবান তো বিশ্ব সৃষ্টি করে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, টিকছে কি? পিতৃভক্তি, পুত্রবাৎসল্য, দয়া মায়া স্নেহ প্রেম—এ সমস্ত কি ভগবানের ব্যবস্থা নয়? তার মধ্যে কোথাও কি বিদায়ী ইস্তাহারের ইঙ্গিত আছে! তবে, আবার নূতন করে কি ব্যবস্থা করবে?

বাবা, তুমি বসো, বড়দা সমস্ত স্থির করে দেবে।

বৃথা সান্ত্বনা দিয়ো না আমাকে, স্থির করবার আর কিছুই নেই। পুত্র পাঠিয়েছে আমাকে বিদায়ী ইস্তাহার। ইচ্ছা করছে জানাহারা যে, এই রাত্রির ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই সাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা করছে যে, এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে দেখাই। ওই আবার গর্জন! বার বার কি নিষ্ফল গর্জন করছো? তোমার মাথাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পার? অন্ধকার? কি অন্ধকার

হয়েছ? তোমার পিছনে ওই সূর্য, নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলতে পারো? পারো না। তবে কেন মিছে আড়ম্বর, মিছে গর্জন, মিছে অহঙ্কার! হাঃ হাঃ হাঃ! বিদায়ী পরওয়ানা পেয়েছি পুত্রের কাছ থেকে। নাঃ এখানে আর থাকতে পারি না। এখনি বিদায় হব, এখনি। দিই লাফ, দিই লাফ! চীৎকার করতে করতে বৃদ্ধ গৃহান্তরে ছুটলো। বাবা কি করেন, কি করেন, বলতে বলতে পিছনে পিছনে ছুটলো পুত্রেরা ও কন্যা।

মুৎসুদ্দি বলেন. গিঁট অনেকটা আলগা হয়ে এসেছে।

গিঁট আলগা কি ওরা বুঝতে পারে না।

মুৎসুদ্দি বোঝায়, দুটো ভিন্ন ধরণের 'পারসোনালিটি' তে জট পাকিয়ে গিয়েছিল মহীদাসবাবুর মনে, কোন একটা আঘাতে জট অনেকটা আলগা হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে।

শুধায়, সম্প্রতি কোন নূতন আঘাত পেয়েছেন কি?

ওরা মনে বোঝে, ডাক্তারের কথা মিথ্যা নয়, আদালতের নোটিশ গুরুতর আঘাত। মুখে কিছু বলে না।

ডাক্তার অনুমানে বোঝেন আঘাত পেয়েছেন সত্য, তবে কি আঘাত ছেলেমেয়েরা বলতে চায় না। কৌতুহল দমন করে বলেন, দুদিন থেকে অনেকটা শান্ত দেখছি। ঘটনাচক্রের আকস্মিক হস্তক্ষেপে যেদিন জট সম্পূর্ণ আলগা হয়ে গিয়ে পুরনো মানুষটা বেরিয়ে পড়বে, সেদিন একটা সঙ্কটের মুহূর্ত, সাবধানে থাকবেন।

কি রকম সাবধান হতে হবে ডাক্তার বাবু?

সঙ্কট কি মূর্তি গ্রহণ করবে না জানলে কি রকম সাবধান হতে হবে বলা যায় না। আচ্ছা, আজ আসি।

আর একটা অজ্ঞাত ভয় চেপে বসে ওদের মনের উপরে।

ডাক্তারের কথা মিথ্যা নয়, আজ দুদিন মহীদাস শান্ত আছে, ক্ষণে ক্ষণে আর সেই শাজাহানের ভূমিকা নেই, বরঞ্চ মাঝে মাঝে মহীদাসের ভূমিকা প্রকট হয়ে উঠেছে। একবার রোহিতাশ্বকে শুধিয়েছিল, হাঁরে, ছোটন তো একেবারে পথে বসলো, এ কূলও গেল ও কূলও গেল, একবার তার খোঁজ কর না।

ছোটন যে বাড়ি ফিরে এসেছে ওরা জানায়নি। রোহিতাশ্ব বলল, তার জন্য ভেবো না, খুঁজে দেখব এখন।

হাঁরে বুড়ী, কতকাল আর এখানে বসে থাকবি, শশাঙ্কর নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে।

মৃন্ময়ী বলল, তিনি লিখেছেন দু-দশ দিনের মধ্যেই নিতে আসবেন।

বাবার স্বাভাবিক আচরণে ওদের মন খুশী হয়েছিল, কিন্তু ভয় ধরিয়ে দিল ডাক্তারের সতর্কবাণী। আবার আঘাত আসবে; আঘাতের আর বাকি আছে কী? তখন সাবধান হতে হবে! কী আঘাত, কেমন সতর্কতা বুঝতে পারে না।

থিয়েটার আর খেলার মাঠের খ্যাতি অভিনেতা ও খেলোয়াড়ের অন্তর্ধানের সঙ্গেই লোকে ভুলে যায়, বুড়োদের মনে কিছুকাল নামটা থাকে, ক্রমে তাও যায় মিলিয়ে। সাদা রঙের মতো তরুণরা খ্যাতিকে ছড়িয়ে দেয়, বুড়োরা কালো রঙ, সব খ্যাতির সেখানে সমাধি।

কাদম্বিনী থিয়েটার আবার জেঁকে উঠেছে, মহীদাসের অভাবে কিছুদিন ঝুলে পড়েছিল। কানাই পাল নূতন টেকনিক নিয়ে আবির্ভূত, তার চলন প্রবেশ প্রস্থান পতন মূর্ছা সবই নূতন আঙ্গিকের। বুড়োরা যদি কখনো মহীদাসের নাম করতো অন্য সবাই বলে উঠতো, ও সব old Fool old School—এ যুগে অচল। বলতো কানাই পাল গিরিশ ঘোষকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। কানাই পাল শিল্পী যে দরের হোক, ব্যবসায়ী ততোধিক। সে যখন বুঝলো যে, দর্শকসমাজ তার কব্‌জাগত হয়েছে, ঘোষণা করলো শাজাহান নাটকে শাজাহানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। গুণগ্রাহীরা বলল, এই তো চাই, Beard the lion in his own den। বিশেষজ্ঞরা টীকা করলো British lion!

কাদম্বরী থিয়েটার এতদিন ভয়ে ভয়ে শাজাহানে হাত দেয়নি, কানাই পালেরও সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু উভয় দলই জানতো এখনও দর্শকসাধারণের মনে শাজাহান নাটকে শাজাহানের ভূমিকায় মহীদাস রায় অনতিক্রান্ত রয়ে গিয়েছে। ওই খ্যাতিটাকে ডিঙোতে না পারলে কাদম্বরী থিয়েটারে নূতন পর্বের সূচনা হবে না, বাংলা দেশের নটকুলসিংহাসনে কানাই পালের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে না। কাজেই শহরের প্রাচীর অট্টালিকা ও স্তম্ভশ্রেণী সগৌরবে ঘোষণা করলো, বহুদিন পরে গুণীজনের আগ্রহে কাদম্বরী থিয়েটারে শাজাহান নাটক, নাম-ভূমিকায় কানাই পাল। সে রাত্রে কাদম্বরী থিয়েটারে লোক ধরে না, দাঁড়িয়ে দেখবার জন্তে দর্শকে তিন গুণ দাম

দিয়েছে। নূতন দর্শক গিয়েছে মহীদাস শাজাহানের সমাধি দেখবার ইচ্ছায় আর পুরাতন দর্শকেরা গিয়েছে নূতনের মধ্যে পুরাতনের স্বাদ লাভ করবার আশায়। নূতনে পুরাতনে আলোতে সজ্জায় কাদম্বরী থিয়েটার গমগম করছে।

ছেলেমেয়েরা মিলে মহীদাসের কক্ষের জানলাগুলো তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, বাইরের দেয়ালের শাজাহান নাটকের বিজ্ঞাপন যাতে চোখে না পড়ে। ওরা জানে এ বিজ্ঞাপন দেখলে, নাম-ভূমিকায় নিজের বদলে কানাই পালের নাম দেখলে বাবা যে কি কাণ্ড করে বসবেন তার ঠিক নেই, হয়তো তাণ্ডব করে ছুটে বেরিয়ে যাবেন, নয় stroke হয়ে মূর্ছা যাবেন। কোন রকমে শাজাহান নাটক অভিনয়ের খবর তার চোখে বা কানে না পৌঁছয় সে বিষয়ে তাদের সতর্কতার অন্ত নেই। কিন্তু মুশকিল এই যে, কাদম্বরী থিয়েটারের কাছেই তাদের বাড়ি, কোরাস গানের সুর এসে পৌঁছয়। আগে যখন তাদের সুদিন ছিল কোরাস গানের সুর শুনে বুঝতো কোন্ অঙ্ক, কোন্ দৃশ্যের অভিনয় চলছে। ভয়ে ভয়ে সেদিকের জানলা দুটো সন্ধ্যা থেকে বন্ধ করে দিয়ে রোহিতাশ্ব ও মৃন্ময়ী বসে আছে, ছোটন এখনও আড়ালে থাকে। আজ তারা কেউ বাইরে যায়নি, কি জানি কি দরকার হয়। মহীদাস নিজের কক্ষে শান্তভাবেই রয়েছে। রাত গোটা নয়েক হবে, ওরা ভাবছে বোধ হয় ফাঁড়া কাটলো।

এমন সময়ে মহীদাস ছুটে ঘরে ঢুকলো। কি হয়েছে বাবা?

শুনছো না, ওই যে আরম্ভ হয়েছে।

অকৃত্রিম বিস্ময়ে ওরা বলে উঠল, কি আরম্ভ হয়েছে?

গান, গান, ওই যে চিরপরিচিত গানের চিরপরিচিত সুর—সেথা গিয়েছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি। শুনতে পাচ্ছ না?

এতক্ষণ ওরা কিছুই শুনতে পায়নি, এবারে শুনলো বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়বাদ্য বাজছে, কথা ও সুর দু-ই স্পষ্ট এসে পৌঁছচ্ছে।

রোহিতাশ্ব বলল, ও কোথায় কে গান করছে তার ঠিক নেই।

খুব ঠিক আছে, কাদম্বরী থিয়েটার ছাড়া আর কোথাও নয়।

হোক না, আপনি চুপ করে বসুন।

হোক না, আমি চুপ করে বসবো! কাদম্বরী থিয়েটারে শাজাহান পালা হচ্ছে আর আমি চুপ করে বসবে? কি যে বলো।

ব্যথার স্থানে হাত দিয়ে রোহিতাশ্ব বলে ফেলল, ওরা করছে করুক, কাদম্বরী থিয়েটারের দুর্নাম হবে না, কানাই পাল ভালই করবে।

ক্ষুব্ধ গর্জনে মহীদাস বলে উঠল, কানাই পাল ভালই করবে? অ্যাকটিং এর ও জানে কি? শাজাহান অ্যাকটিং-এর ও জানে কি? সেদিনকার ছোকরা।

আর ভাল যদি নাই করে, আপনি করবেন কি?

কি করবো! কেন, এখনি ছুটে গিয়ে কানাই পালকে ঘাড় ধরে স্টেজ থেকে বের করে দিয়ে শাজাহানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ব। সবাই আনন্দে বলে উঠবে—ওই যে মহীদাস রায় ফিরে এসেছে, ওই যে সত্যকার শাজাহান ফিরে এসেছে। শুধোবে কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলাম? বন্দী হয়ে ছিলাম, প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে ফিরে চলে এসেছি তোমাদের মাঝখানে—সবাই জয়ধ্বনি করে ওঠো জয় সম্রাট শাজাহানের জয়।

ওরা দেখলো, বৃদ্ধ রীতিমতো ক্ষেপে উঠেছে, তার এমন ক্ষিপ্ত অবস্থা কখনো আগে দেখেনি। ভাবে, কি করা যায়? পাছে ছুটে বেরিয়ে যান ভয়ে রোহিতাশ্ব দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হল। বুঝতে পেরেই বেগে রোহিতাশ্বর হাত ধরে ফেলল মহীদাস।

ঔরঙজেব বন্দী করেছে, আবার তোরাও বন্দী করবি, দারা আর জাহানারা, তোমরাও?

মৃন্ময়ী কেঁদে উঠে বলল, না, বাবা তোমার যা খুশি করো, আমি আটকাবো না তোমাকে, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

উত্তম। তবে তাই হোক। আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মতো জ্বলে উঠি, তুই বায়ুর মতো ধেয়ে আয়। আমি ভূমিকম্পের মতো সাম্রাজ্যখানি ভেঙেচুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো তাকে গ্রাস কর। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি, তুই মড়ক নিয়ে আয় আয় তো, একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে দিয়ে চলে যাই, তারপর কোথায় যাই, কিছুই যায় আসে না। ধূপের মতো একটা বিরাট জ্বালায় ঊর্ধ্বে উঠে, বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।

বলতে বলতে মৃন্ময়ীর হাত ধরে এক ঝটকায় তাকে টেনে নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল, পিছে পিছে ছুটলো রোহিতাশ্ব ও ছোটন।

বিদ্যুতালোকিত প্রেক্ষাগৃহের নীরবোৎসুক-দর্শকমণ্ডলীর চক্ষু কর্ণ নিঃশেষে গিলে চলেছে শাজাহানের কাতরোক্তি। "দেখো মহম্মদ, এই আমার মুকুট এই আমার কোরাণ। এই কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করছি যে, বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো। কারো সাধ্য নেই যে, প্রতিবাদ করে। আমি আজ জীর্ণ পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে, কিন্তু সম্রাট সাজাহান--" অভিনয়ের হৃদয়গ্রাহিতায় দর্শকে করতালির অভিনন্দন জানাতেও ভুলে গিয়েছে।

এমন সময় রুক্ষ চুল দাড়ি, শুষ্ক মুখমণ্ডল ছিন্ন পরিধেয় মহীদাস প্রকাণ্ড একটা দমকা বাতাসের মতো রঙ্গমঞ্চে ঢুকে পড়ে বুক ফাটা আর্তনাদে অনুবৃত্তি শুরু করলো—"যদি সে একবার তার সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে শুদ্ধ তাদের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরঙ্গজেব ভস্ম হয়ে পুড়ে যাবে। মহম্মদ, আমায় মুক্ত করে দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে। আমি শপথ করছি মহম্মদ, শপথ করছি। আমি শুদ্ধ এই কপটা ঔরঙ্গজেবকে একবার দেখবো।"

কিছুক্ষণ দুই সেট শাজাহান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অভিনয় করে চলল। অভিনেতা, ম্যানেজমেন্ট দর্শক বুঝতে পারলো না, কী হচ্ছে। তরুণ দর্শকেরা ভাবলো এর এক নতুন টেকনিক, পুরাতনদের কেউ কেউ বুঝলো মহীদাস ফিরে এসেছে। তবে এ হতবুদ্ধিভাব দু' চার লহমার জন্যে মাত্র। প্রেক্ষাগৃহ থেকে রব উঠল, মাতাল, পাগল, পকেটমার, লোফার বের করে দাও, ঘাড় ঘাড় ধরে বের বরে দাও, এ কি কেলেঙ্কারি, টাকা ফেরৎ দাও, ড্রপ, ড্রপ, ড্রপ ফেলে দাও। ড্রপ ফেলে দিয়ে ম্যানেজমেণ্ট মহীদাসকে টেনে বের করে নিয়ে এলো। মালিক বলল মাঁরধোর করো না, বুড়ো মানুষ মরে যাবে। নিয়ে যান রোহিতাশ্ববাবু বাড়ি নিয়ে যান। উদ্ভ্রান্ত অচৈতন্যপ্রায় পিতাকে নিয়ে ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরে এলো। গ্রীনরুমে এসে নবোদ্যমে দাড়ি লাগাতে লাগাতে কানাই পাল বলল, দা হক ইন্সপিরেশানটা মাটি করে দিল, রাস্কেল।

আজ দু'দিন আচ্ছন্নভাবে পড়ে আছে মহীদাস, ঘুমে তন্দ্রায়, জড়তায়। মুৎসুদ্দি কড়া ডোজে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন, রোহিতাশ্বকে বলেছেন, এবারে বোধ হয় শাজাহানের ভূত ওর ঘাড় থেকে নেমে যাবে, এইরকম একটা

আঘাতের আবশ্যক ছিল। মুৎসুদ্দি ছিল সেদিনকার দর্শকদের মধ্যে। তৃতীয় দিনে আচ্ছন্নভাবে কেটে গিয়ে উঠে বসলো মহীদাস, মুখচোখ বেশ স্বাভাবিক। ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে না, কিভাবে কথা বলবে, এতদিন যেমন দারা ও জাহানারার ভূমিকার কথা বলেছিল, সেইরকমভাবে কি? তাদের ভয় একটু ভুল হলে আবার না গোল বেধে ওঠে। এ সমস্যার সমাধান নিজেই করে দিল মহীদাস, ডাকলো, মিনু, খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দে। অনেক ক' মাস পরে মিনু বলে এই ডাক, আর খেতে চাওয়া, এতদিন শুনেছে বাবুর্চি, খানা লাগাও।

থিয়েটারের শাজাহান ওর বেশি জানে না।

ও কার ছবি রে?

ভয়ে ভয়ে তাকায় বেগম মমতাজের ছবিখানার দিকে মৃন্ময়ী, একদিন বাবার হুকুমেই টাঙাতে হয়েছিল।

খুলে ফেল, খুলে ফেল। তোর মার ছবি গেল কোথায়?

মমতাজের ছবি খুলে ফেলে সেখানে টাঙিয়ে দেয় মার ছবি।

জানালাটা খুলে দে।

যা ভয় করছিল তাই বুঝি হয়। জানালার বাইরেই প্রাচীরে বড় বড় লাল অক্ষরে বিজ্ঞাপন শাজাহান নাটকের।

খুলে দে, ঘরে রোদ বাতাস আসুক।

ভয়ে ভয়ে খুলে দেয় জানালা, কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মহীদাস বাইরে তাকিয়ে দেখে, ও বিজ্ঞাপন না দেখে উপায় নেই, তবু মুখে এতটুকু ভাবান্তর প্রকাশ হয় না।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলে শরীরটা ভালো নেই, কিছুদিন মধুপুরে গিয়ে থাকবো ভাবছি, তুই সঙ্গে যেতে পারবি?

খুব পারবো বাবা।

আচ্ছা যা তবে রোহিতাশ্বকে ডেকে নিয়ে আয়।

মৃন্ময়ী রোহিতাশ্বের খোঁজে যায়। তারা দুজন দরজার কাছে এসে দেখতে পায় মার ছবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে বাবা, তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

ওরা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, মনে পড়ে মুৎসুদ্দির কথা, জট এতদিনে সম্পূর্ণ আলগা হয়ে গিয়ে মহীদাস মুক্তি পেয়েছে, শাজাহান মরেছে।

কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে ওরা নীরবে মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

যুগধর্ম

ধর্মদাসবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মগ্রহণ করলে সূতিকাগৃহের দ্বারে শঙ্খ বাজলো, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপযুক্ত বিদায় পেলেন, কাঙালীরা পেট ভরে খেল, সকলে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলো পুত্র যেন পিতার যোগ্য হয়। কালক্রমে পুত্র যে পিতাকে অতিক্রম ক'রে যাবে কেউ বুঝতে পারলো না। যথাসময়ে ধর্মদাসবাবু পুত্রের নামকরণ করলেন যুধিষ্ঠির। এই পৌরাণিক নামকরণের হেতু তিনি গোপনে অন্তরঙ্গদের কাছে বললেন, স্বপ্নে দেখেছেন যুধিষ্ঠির তাঁর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন। পাড়ার নিন্দুকেরা কানাকানি আরম্ভ করলো ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হ'লে সে পাঠশালায় প্রবিষ্ট হ'ল। যুধিষ্ঠিরের (আসল) পাঠশালার জীবন সম্বন্ধে বেদব্যাস নীরব, কাজেই আমরাও নীরব থাকতে বাধ্য হ'লাম।

মহাভারতের আদি পর্বটা বাদ দিলেও গল্প বুঝতে অসুবিধা হয় না, কাজেই যুধিষ্ঠির রায়ের (ঐ তার পুরা নাম) জীবনের আদিপর্বটা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন বেশ জ'মে উঠেছে তখন যুধিষ্ঠির বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক। ইতিমধ্যে সে তিনটে পরীক্ষার গার্ডকে ঘায়েল ক'রে বি-এ পাশ ক'রে ফেলেছে। বিদ্যার্জন তার সমাপ্ত, কাজেই এখন অর্থার্জনে মন দিল। তখন বিশ্বযুদ্ধ প্রতিভাবানদের সম্মুখে অর্থার্জনের হাজারটা পথ খুলে দিয়েছে, পথিকেরও অভাব হয় নি। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বিপদ এই যে তার মূলধন নাই, মূলধন নাই কিন্তু প্রতিভা আছে। সে অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলো যে ইংরেজ সৈন্যদলের জন্য রংরুট সংগ্রহে অর্থ ও সুনাম দু-ই আছে। রংরুট সংগ্রহকর্তা গোরা কাপ্তেনের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব জমিয়ে নিল আর নিত্য নূতন লোক সংগ্রহ করে আনতে লাগলো। তখন দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ কাজেই কাজটি কঠিন হ'ল না।

প্রত্যেক রংরুটের কাছ থেকে পাঁচ টাকা ক'রে আদায় করতো যুধিষ্ঠির, অল্পদিনের মধ্যেই তার হাতে অনেক টাকা জমে গেল। এই কাজের সূত্রে জঙ্গী গোরাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

একদিন Cornel Naughty বলল, রায়, কন্ট্রাক্টারি করো না কেন?

মূলধনের অভাব, স্যার।

কিছু প্রয়োজন নাই, আগাম টাকা নাও, টাকা দেওয়ার মালিক আমি, পাশ করবার মালিক আমি, চিন্তা করো না।

কি সাপ্লাই করতে হবে ?

পঞ্চাশ হাজার মন ঘি।

যুধিষ্ঠির ভাবে এদিকে গোরুও খাবে আবার ঘি-ও চাই বেশ তো আবদার। মুখে বলে, দেশে গোরু কোথায় স্যার। কর্নেল বলে, অত চিন্তা করলে যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ হয় না। Bring any damned thing in sealed tins I shall pass it. কিন্তু মনে রেখো লাভের বখরা 50, 50।

নিশ্চয় স্যার।

তারপরে কচু ঘেচু শাক সিদ্ধ, ভাতের ফেন প্রভৃতি উপাদানে প্রস্তুত ঘৃত চালান দিতে লাগলো যুধিষ্ঠির, পাশ করতে লাগলো কর্ণেল নটি, আর ঐ পুষ্টিকারক খাদ্যের তাগদে ভারতীয় সৈন্যদল মিশরে জেনারেল রোমেলকে ঠেলে নিয়ে চলল সিরিয়া ছাড়িয়ে টিউনিশিয়ার দিকে।

এদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা জমে গেল যুধিষ্ঠিরের হাতে। লক্ষ লক্ষকে কোটি কোটিতে পরিণত করবার উপায় চিন্তা করছে এমন সময় যুদ্ধ গেল থেমে। যুধিষ্ঠির ভাবলো এ ভারি অন্যায়। তখন সে অর্থার্জনের নূতন পথ আবিষ্কারের চিন্তা করতে লাগলো। পুত্রের ভাগ্যে অর্থাগমের শুক্লপক্ষের সূচনা হ'তেই পিতার ভাগ্যে অর্থহ্রাসের কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হ'য়ে গেল। যুধিষ্ঠির আজ ধনী, ধর্মদাস দরিদ্র, ধর্মদাস একা নয় সপরিবারে দরিদ্র, পাঁচটি ছেলে তিনটি মেয়ে ও পত্নী সকলের ঘোরতর দরিদ্র্য।

পাড়া-পড়শীরা বলে যুধিষ্ঠির এ কি করছ, বাপ মাকে দেখো।

যুধিষ্ঠির জিভ কেটে বলতো, ছি ছি বাবা মা আমার টাকা নেবেন কেন ?

ভাইদের পড়াও।

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে আমি বিশ্বাস করি না।

অন্ততঃ বোনেদের বিয়ে দাও।

বিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই, তবে বিয়েতে পণ দিতে আমার নৈতিক আপত্তি।

সকলে বুঝলো যুধিষ্ঠির যুগপৎ অর্থনৈতিক ও নৈতিক বীর। তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। টাকায় শুধু টাকা আনে না, ভক্তি-শ্রদ্ধাও আনে।

বলা বাহুল্য যুধিষ্ঠির শহরের অন্যত্র আলাদা বাড়ী কিনে বাস করে, একার-

বর্ত্তী পরিবার আমাদের দেশের উন্নতির পথে কণ্টক সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

তাদের পরিবারের যখন এ-হেন অবস্থা তখন অর্থাগমের নূতন পথ চোখে পড়লো যুধিষ্ঠির রায়ের।

যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গিয়েছে, রাজনৈতিক আকাশে দেশ ভাগাভাগির হাওয়া বইতে শুরু করেছে, যুধিষ্ঠির বুঝলো অচিরে হাজার হাজার অসহায় ব্যক্তি পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসবে। অসামান্য দূরদর্শিতার ফলেই এমন সম্ভব হ'ল। তখনই সে বাঁকুড়া জেলায় গিয়ে নামমাত্র মূল্যে কয়েক মাইলব্যাপী নেড়া মাঠ কিনে ফেলল। সরল গ্রামবাসী মালিকদের বোঝালো সরকার বিনা খেসারতে সব খাস করে নেবে, আমার কাছে তবু কিছু পেলে। তার-পরে কলকাতায় ফিরে এসে কয়েকজন শিল্পী ওভারশিয়ার ধরে মস্ত নকশা আঁকিয়ে ফেলল, জায়গাটির নাম দিল, মহাভারত উপনিবেশ। রাস্তা, ঘাট, জলাশয়, পার্ক, বাজার, ডাকঘর, স্কুলকলেজ, সিনেমা থিয়েটার, বারোয়ারী পূজার মণ্ডপ, দেবালয় হাসপাতাল, ধর্মশালা এবং সর্বোপরি নানা আয়তনের বাস্তু নির্মানের থাকবন্দী জমি প্রভৃতি যথাশাস্ত্র অঙ্কিত হল। তাছাড়া, মহা-ভারত এণ্ড কোং নামে ওখানে যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জমি বন্ধক রেখে মেয়ের বিয়ের ও বাড়ী তৈরীর টাকা তারা দেবে। কাঠা প্রতি জমির মূল্য মাত্র হাজার টাকা। তিন কাঠার কমে প্লট নাই, এক সঙ্গে তিন প্লট জমি কিনলে কন্‌সেশন পাওয়া যায়। মানচিত্র তৈরী হলে এমন শোভন লোভন সর্বাঙ্গমোহন হ'ল যে শিল্পী ও ওভারশিয়ারগণ নগদ মূল্যে একটি করে প্লট কিনে ফেলল। অসহায় ছিন্নমূল নরনারী মহাভারত উপনিবেশকে অদৃষ্টপ্রদত্ত লটারির টাকা মনে করলো।

ওরা যখন উপনিবেশের দিকে ছুটেছে তখন এদিকে যুধিষ্ঠিরেরও ছুটি। ভোজবাজীর মতো এজেন্সী আফিস লোপ পেলো, কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা হ'ল। কোথাও যুধিষ্ঠির রায়ের নাম নেই, কোন আইনে তাকে ধরবার উপায় নেই, মহাভারত উপনিবেশের সে কেউ নয়, খাতাপত্রে যাদের নাম তাদের অনেকে অনেক কাল আগে মৃত, অনেকে অনেক কাল পরে জন্মাতে পারে, ভূতলে কারো কোন অস্তিত্ব নেই। প্রায় দশ লাখ টাকা নীট মুনাফা করে যুধিষ্ঠির বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করলো।

অন্যদিকে তার এক ভাই অচিকিৎসায় মরলো, এক ভাই কুচিকিৎসায় মরলো, ছোট ভাই ছুটো কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে খাদ চাপা পড়ে

মরলো। বড় বোনটিকে কোন সদাশয় ব্যক্তি দয়া ক'রে বিয়ে করলো, পরে জানা গেল দয়াপরবশ হয়ে আগে আরো চার বার সে বিবাহ করেছে। আনুপূর্বিক অবস্থা জানিয়ে যুধিষ্ঠিরকে চিঠি লিখে উত্তর পেলে—

শ্রীচরণকমলেষু, সমস্ত অবস্থা অবগত হইলাম। এই জন্যেই শাস্ত্রে বলিয়াছে নিয়তি কেন বাধ্যতে। আপনিই বা কি করিবেন, আমিই বা কি করিব। আপনার দুঃখ বুঝিতে পারিতেছি, কারণ আমার হৃদয় দেশের অগণিত ভাই বোনদের দুঃখে সতত দগ্ধ হইতেছে, নিজের ভাই বোনদের দুঃখ যেন বোঝার উপরে শাকের আঁটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার অবস্থা এমন নয় যে আপনাকে সাহায্য করি যদিচ সে ইচ্ছা সর্বদাই আছে। অধিক কি সুখদুঃখ ভগবানের হাত, তাঁহাকে স্মরণ করুন। লক্ষ কোটি প্রণামান্তে, সেবকাধম যুধিষ্ঠির।

পত্র পেয়ে ধর্মদাস বুঝতে পারলো সংসার জীবন তার শেষ হয়েছে। সে হরিদ্বার যাত্রা করলো। মহাপ্রস্থানের পথই এখন তার একমাত্র পথ।

পূর্বোক্ত ঘটনার পরে বছর কুড়ি গিয়েছে। স্বনামধন্য যুধিষ্ঠির রায় হৃষিকেশ লছমনঝোলা হয়ে কেদারবদ্রী চলেছে। যথেষ্ট টাকা হলে তীর্থ দর্শনের আকাঙ্খা মনে দেখা দেয় প্রধানতঃ এই কারণে সে তীর্থভ্রমণে বহির্গত। হরিদ্বার গিয়ে একখানা জীপ যাতায়াতী ভাড়া করা হল, সঙ্গে রইলো cook, valet আর পীগমি নামে বিলীতি কুকুর পূর্বপুরুষের সূত্র আলফ্রেড দি গ্রেটের প্রিয় কুকুরটিতে গিয়ে পৌছেছে। জীপে করে নাকি এখন বদ্রীনাথের মন্দির পর্যন্ত পৌছানো যায়, তাড়াতাড়ি ফেরা আবশ্যক, হাতে মস্ত দুটো কনট্রাক্ট আছে।

বদ্রীনাথের পথের সুতোয় অসংখ্য ছোটবড় মাঝারি তীর্থস্থানের গুটি পরানো, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ আরো কত।

যথাসময়ে পাণ্ডুকেশ্বর পৌছে যখন বিশ্রামান্তে আবার জীপে চাপতে যাবে পীগমিকে দেখতে পেলো না যুধিষ্ঠির। শিস দিয়ে, নাম ধরে ডাকাডাকি করলো, না, তার দেখা পাওয়া গেল না। তখন অগত্যা ছড়িহাতে, পাইপমুখে কুকুরের সন্ধানে বের হল। বদ্রীনাথের পথে পীগমি গেলে পথিকের কাছে সন্ধান পাওয়া যেতো, তাই পাহাড় বেয়ে সুঁড়ি পথ ধরে নেমে পড়লো, নীচে মস্ত উপত্যকা। ওদিকে আর একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, পীগমির নাম ডাকতে ডাকতে সেই দিকে চলল সে। পাহাড়ের কাছে এসে দেখতে পেলো

একটা গুহা, গুহামুখে পীগমি নীরবে উপবিষ্ট। প্রভুর ডাকে সাড়া দিল না পীগমি। গুহার মধ্যে উঁকি মেরে দেখতে পেলো একজন সন্ন্যাসীকে।

কিছু উষ্মাসহকারে যুধিষ্ঠির বলল, আপনি আমার কুকুরটাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন।

সন্ন্যাসী বলল, কাউকে ভোলাতে পারি এমন বিদ্যা আমার জানা নেই। ও আপনি এসেছে।

শুনতে পাই সন্ন্যাসীদের অনেক গুপ্ত বিদ্যা জানা থাকে।

ওসব শুনতেই পাওয়া যায়। ওসব কথায় বিশ্বাস করো না।

ওসব বিদ্যা যদি জানা না থাকে তবে কেন এখানে এসে তপস্যা করছেন।

কে বলল তপস্যা করছি, নিরিবিলি বাস করছি।

শান্তি পেয়েছেন?

শান্তির আড়ৎ কি বাপু হিমালয় পাহাড়ে?

তবে?

যেখানে যে পায়।

কি জানি মনে কি ভেবে একখানা পাথরের উপরে যুধিষ্ঠির বসলো, বললো আপনার তো অনেক বয়েস হল, অনেক দেখেছেন, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি বলতে পারেন?

সকলের জীবনের তো এক উদ্দেশ্য নয়, কারো অর্থ, কারো সম্মান, কারো জ্ঞান, কারো ভক্তি এই রকম।

আচ্ছা বলতে পারেন সে যুগের যুধিষ্ঠির যদি এ যুগে জন্মাতেন তবে কি হতেন?

খুব সম্ভব একটা কালোবাজারী, কি ঠিকেদার, কি একটা মহাপাষণ্ড!

বলছেন কি! তিনি যে স্বয়ং ধর্মপুত্র!

সেই ভরসাতেই তো বলছি, ধর্ম যে বদলেছে, যুগভেদে ধর্ম বদলায়।

মুখে রা সরে না যুধিষ্ঠিরের।

সন্ন্যাসী বলে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে একই মনুষ্যের দল লীলা করে চলেছে, তবে যে একালে তাদের চিনতে পারি না, তার কারণ যুগধর্মভেদে স্বভাব বদলে গিয়েছে। যুধিষ্ঠির মহাপাপিষ্ঠ কালোবাজারী।

কি সর্বনাশ!

সর্বনাশ বলছ কেন? সব ধর্মের উপরে যুগধর্ম, তার প্রভাব অব্যর্থ।

ঠিক এই প্রশ্নই বছর কুড়ি আগে এক বৃদ্ধ আমায় করেছিল, বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরের কথা, যুধিষ্ঠির এযুগে জন্মালে কি হতো ?

চমকে উঠে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করে কোথায় তিনি ?

এখানেই থাকতো। অনেক কাল আগে দেহরক্ষা করেছে, আমি নিজের হাতেই সমাধিস্থ করেছি।

কোথায় ?

ঐ যেখানে তোমার কুকুরটা শুয়ে রয়েছে ঠিক সেইখানে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, যুধিষ্ঠির রায়ের মুখের অবস্থা দেখতে পাওয়া গেল না, সে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো।

ওলট কম্বল দেশের কথা

অনেক দিন পরে নৌ-যাত্রা থেকে সিন্ধবাদ নাবিক দেশে ফিরে এসেছে। তার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে বন্ধু-বান্ধবেরা বৈঠকখানায় এসে জমিয়ে বসেছে। সকলেরই মুখে এক কথা, এবারকার অভিজ্ঞতা বলো, কোথায় গেলে কোন্ কোন্ আশ্চর্য দেশ দেখলে খুলে বলো, তুমি ফিরবে বলে আমরা অপেক্ষা করে আছি।

সিন্ধবাদকে বেশি অনুরোধ করতে হয় না, বলবার জন্যই সে উৎসুক। সে আরম্ভ করলো। অন্যান্যবারের মতো এবারেও বিচিত্র সব দেশ দেখেছি, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা আগে বলবো সে এক সমস্যা। প্রথমে গিয়েছিলাম ছত্রীপদদের দেশে। সেখানকার মানুষগুলো অদ্ভুত। তারা মাটিতে শুয়ে পা দুটো উঁচু করে মাথার উপরে তুলে ধরে। তাদের পায়ের পাতা এমন চওড়া যে ছাতার মতো ছায়া বিস্তার করে। সেই ছায়ায় নিশ্চিত মনে তারা শুয়ে থাকে। তারপরে গিয়েছিলাম সুবর্ণ দ্বীপে, সেখানে মাটির তলায় সোনা বোঝাই। আর পিঁপড়েরা সোনার কণা মুখে করে উঠে আসে লোকে তাই সংগ্রহ করে। তারপর গেলাম লবঙ্গ দ্বীপে সেখানে বালকেরা শিক্ষক, বুড়োরা ছাত্র। একটি বালককে ঘিরে পলিতকেশ বৃদ্ধের দল উপবিষ্ট। সেই বালক শিক্ষক জ্ঞান বিতরণ করছে বৃদ্ধেরা খাতায় টুকে নিচ্ছে। এসব কথা আর একদিন বলবো, আজকে বলা যাক ওলট কম্বল দেশের কাহিনী।

এবারকার যাত্রায় সমুদ্র আমার প্রতি প্রসন্ন ছিল দু-একবার ঝড় উঠলেও ক্ষতি করেনি। লবঙ্গ দ্বীপ থেকে যাত্রা করে দিন দশেক পরে আমাদের জাহাজ গিয়ে ঠেকল ওলট কম্বল রাজ্যে। জাহাজ নোঙর করে আমরা তীরে নামলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল, পরে জেনেছিলাম, সে লোকটি শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, ধনী ও পণ্ডিত, পেশায় উকিল। তাকে এখন থেকে উকিল সাহেব বলে উল্লেখ করবো। উকিল সাহেব পরিচয় পেলে যে আমিই জাহাজখানার মালিক। তখন সে বললো, এখানে এখন কিছুদিন থাকতে হবে তো, কষ্ট করে জাহাজে থাকার প্রয়োজন নেই, আমার বাড়ীতে চলুন। আমি ভাবলাম এ প্রস্তাব মন্দ নয়, আরামে থাকা যাবে, তাছাড়া উকীল সাহেবের বাড়ীতে থাকলে সে দেশের রাজনীতি আচার ব্যবহারও জানতে পারা যাবে। বাণিজ্য আমার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও দেশ-বিদেশের খবর সংগ্রহও নিতান্ত অপ্রধান নয় আমার মনে। আমি তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম।

ধনীর প্রকাণ্ড বাড়ী আর ধনীর বাড়ী যেমন হয়ে থাকে বা হওয়া উচিত তেমনি বটে। অনেক অনাবশ্যক জিনিষপত্র এবং অতিরিক্ত দাসদাসী।

আহার ও বিশ্রাম শেষ হলে গৃহস্বামী কাছে এসে শুধালো, জাহাজে খুব কষ্ট হয়েছে কি?

আমি বললাম না, এ যাত্রায় সমুদ্র তেমন বেগ দেয় নি, তবে মানুষে দিয়েছে বটে।

সে শুধালো, সে আবার কি রকম?

সুবর্ণ দ্বীপ থেকে জাহাজ ছাড়বার পরে আবিষ্কার করলাম কোন্ ফাঁকে এক বেটা চোর উঠে পড়েছে জাহাজে।

কিছু চুরি করেছিল কি?

করেছিল বই কি। তবে নিয়ে পালাতে পারেনি, জাহাজ থেকে পালাবে কেমন করে?

তখন কি করলেন?

বেটাকে একটা ছোট ঘরে আটকে রেখে দিয়েছি। ইচ্ছে আছে ফিরবার পথে সুবর্ণ দ্বীপে কোটালের হাতে সমর্পণ করবো।

আমার কথা শুনে উকীল সাহেব বলল ভাগ্যিস এ দেশের চোর ধরা পড়েনি আপনাদের জাহাজে, তাহলে বিপদে পড়তেন।

চোর যে দেশেরই হোক কিছু বিপদ তো অপরিহার্য।

আমার কথা আপনি বুঝতে পারেন নি, এদেশে চোর ধরা পড়লে গৃহস্থের দণ্ড হয়, চোর বেকসুর খালাস পায়।

চমকে উঠে বললাম, সে কি রকম। তখনি মনে হল পরিহাস, হেসে উঠলাম।

উকীল বলল, হাসির কথা নয় সদাগর সাহেব। এদেশে চুরি হয়ে গেলে গেরস্তর সাজা হয়, চোর হয় বাদী, সরকার তার পক্ষে, আর গেরস্তকে দাঁড়াতে হয় আসমীর কাঠগড়ায়।

বড় তাজ্জব ব্যাপার।

আদৌ তাজ্জব নয়। দেশ ভেদে যেমন ভাষা, পোষাক, আচার-ব্যবহার ভিন্ন তেমনি আইনও ভিন্ন। এতে আশ্চর্য হলে চলবে কেন?

চুরি, খুন এসব যে নৈতিক অপরাধ।

নীতি ভিন্ন হলে নৈতিক দৃষ্টিও ভিন্ন হতে বাধ্য। তাছাড়া নীতির মাপ-কাঠি যে সর্বত্র এক হবে তার মানে নেই।

তার কথা শুনে আমার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না আমি শুধাই চুরি প্রমাণ হলে আসামীর কি দণ্ড হয়!

চোরাই জিনিষের মূল্যের উপর তার নির্ভর। আবার দিনে চুরি এবং রাতে চুরির মূল্য সমান নয়। এই রকম নানা অবস্থার হিসাব করে দণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে।

আর চোরের?

বেকসুর খালাস। কখনো কখনো সামান্য তিরস্কৃত হয় চুরি করতে গিয়ে অকৃতকার্য হলে।

এ রকম ক্ষেত্রে চুরি হয়ে গেলে সে খবর গেরস্ত কেন দেবে কোটালকে?

দেয় তো না।

তবে?

চোর নিজে দেয়। অনেক সময়ে প্রতিবেশীরা দেয়। তারা আছে কি করতে?

আমি বললাম মশায় নূতন কিছু দেখব বলে আশাকরেছিলাম আপনাদের দেশে। তবে এতটা নূতন আশা করিনি। এ একেবারে নূতনত্বের চরম।

এ নূতন নয় সাহেব, এ সনাতন। আমাদের ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করে

দিয়েছেন যে কৃত্রিম সভ্যতার ফলে মানুষের সমাজ বিকৃত হওয়ার আগে সমস্ত পৃথিবীতে এই নীতি প্রচলিত ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সেই ধারাটি এখনো অবিকৃত আছে।

আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

তার প্রয়োজন নেই। আজকার রাতটা ধৈর্য অবলম্বন করুন। আগামী কল্য আপনাকে আদালতে নিয়ে যাবো, সেখানে এই রকম একটি মামলা আছে। সত্য কথা বলতে কি আমি চোরের পক্ষের উকীল। আমি সরকারী উকীল, সরকার চোরের পক্ষে।

আর গেরস্ত আসামীর পক্ষে সেও একজন বড় উকীল। আমারই বন্ধু। সেই মামলাটি দেখলে আপনি এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করবেন, এখন বক্তৃতা করে আর কত বোঝাবো।

কাজেই এক রাত্রের মতো কৌতূহল দমন করে নিদ্রার আয়োজন করলাম। পরদিন যথাসময়ে উকীল সাহেবের সঙ্গে আদালতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আদালত যেমন হয়ে থাকে ঠিক তেমনি। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আদালতের বোধ করি এক রকম চেহারা। মস্ত একটা ঘর, ইতিমধ্যেই অগণ্য লোকের আনাগোনায় মেঝেতে ধূলো জমে গিয়েছে। উকীল মোক্তার আরদালি, চাপরাশিগণের মলিন বেশ, রুক্ষ চেহারা, কেবল চাপরাশিদের তকমাগুলি উজ্জ্বল থেকে সরকারী মহিমা ঘোষণা করছে। একদিকে উচ্চ আসনে চেয়ারে উপবিষ্ট বিচারক, জড়মূর্তি পাশে পেশকার মোটা এবং মূর্তিমান লোভ, সামনে নথীর স্তূপ। পাশে নয়জন ব্যক্তি উপবিষ্ট, সকলেরই চেহারা নিতান্ত মামুলী ধরণের। একদিকে কাঠগড়ার মধ্যে খিন্নবেশ এক ব্যক্তি।

বুঝলাম যে আসামী, আর একদিকে ভদ্রবেশী আর এক ব্যক্তি মুখে চোখে চপলতা ও চাতুরী এই লোকটাই বোধ হয় বাদী। আগের দিন যা শুনেছিলাম তাতেই বুঝলাম এ হচ্ছে চোর, কাঠগড়ার ব্যক্তিটি গৃহস্থ, তার বাড়ীতে চুরি হয়েছে তাই আসামী।

যথাসময়ে অর্থাৎ যথাসময়ের অনেক পরে মামলাটি শুরু হল, পেশকার প্রাসঙ্গিক নথী বিচারকের সম্মুখে দিয়ে সরকারী উকীলের (আমার গৃহস্বামীর) দিকে তাকান। উকীল সাহেব সশব্দে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আরম্ভ করলো—

হুজুর ও ছোট হুজুরগণ (জুরিগণ) আমাদের দণ্ডবিধি আইনের ৪৪০ ধারা অনুযায়ী এই মামলা দায়ের হয়েছে। বাদী যার পক্ষে সরকার থেকে আমি নিযুক্ত একজন সৎ চোর আর শুধু তাই নয় তিনি একজন অত্যন্ত বনিয়াদী চোর, ঊর্ধতন তিন পুরুষ ধরে তারা চুরি করে আসছেন আর আশা করা যায়, স্বয়ং বাদীও আশা করেন (এই বলে বাদীর দিকে তাকালো উকীল) তাঁর ছেলেটি ইতিমধ্যেই যে রকম লায়েক হয়ে উঠেছে ভবিষ্যতে বংশের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারবে।

এখানে আসামী পক্ষের উকীল বাধা দিয়ে বলল, হুজুর বাদী সৎ চোর কিনা সেটাই বিচার্য বিষয়। যা বিচার্য বিষয় গোড়াতেই তা সিদ্ধান্তরূপে ঘোষণা আইন বিরুদ্ধ কাজ। আর তার ঊর্ধতন তিন পুরুষ যে চুরি করতো তার স্বপক্ষে কেন প্রমাণ দেওয়া হয়নি। কাজেই মুখের কথা যথেষ্ট নয়।

এবারে বাদীর উকীলেও আসামীর উকীলে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হল।

বাদীর উকীল—বাদী নিজে স্বীকার করছেন।

আসামীর উকীল—সেটাও তো মুখের কথা। প্রমাণ থাকলে অবশ্যই দাখিল করতেন।

বাদীব উকীল—একজন সৎ চোরের মুখের কথাই কি প্রমাণ নয়?

—আমার বিজ্ঞবন্ধু আবার সিদ্ধান্তকে পূর্বাহ্নে ঘোষণা করছেন। বাদী যে চোর ও সৎ চোর তাও তো প্রমাণ সাপেক্ষ।

—আমার বিজ্ঞতর বন্ধু ধুলো উড়িয়ে আঁধি সৃষ্টি করে আদালতকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কোটালে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে তবু চোর নয় একথা কে বলবে?

—হুজুর, দণ্ডবিধি আইনে সৎ চোরের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। যে চোব অকুস্থলে বা হাতেনাতে ধরা পড়ে তাকে সৎ চোর বলা যায় না। বিশেষতঃ বনেদী চোর তো নয়ই। এইজন্যেই আমি গোড়াতেই আপত্তি করেছিলাম।

এবারে হুজুর মুখ খুললেন—একথা সত্য, বাদী সৎ বা বনেদী চোর নয়। অন্য অভিধা তাকে দিতে পারেন।

বাদীর উকীল বলল, হুজুরের আদেশ শিরোধার্য। আমার মক্কেল সৎ চোর বা বনেদী চোব নয়, সে একজন অভিজাত চোর।

আসামীব উকীল রেগে উঠে বলল, অভিজাত নয় বজ্জাত।

আমি আপত্তি করি—বলল বাদীর উকীল।

আসামীর উকীল—আপত্তি করলেও সে আপত্তি যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কেননা অভিজাত ব্যক্তি দেখলে আমার বিজ্ঞ বন্ধু বুঝতে পারতেন অভিজাত চোর কি বস্তু। তারা টাকার থলি চুরি করে না তারা ঘরে ঢুকে চুরি করে না তারা হাতেনাতে ধরা পড়ে না। তাদের চুরির পন্থা স্বতন্ত্র, কখন চুরি হল, কিভাবে চুরি হল বুঝতে পারা যায় না, অথচ গেরস্ত হঠাৎ দেখে সে সর্বস্বান্ত, এ যেন হাঙ্গর কর্তৃক পা কেটে নেওয়া। কাজেই বাদীকে এ সম্মান দেওয়া অনুচিত।

তখন বিচারক বললেন, আচ্ছা তাকে শিক্ষানবিশি চোর বলা যাক। এবারে উকীল সরকার আপনি গোড়া থেকে ঘটনা বিবৃত করুন।

সরকারী উকীল আরম্ভ করলো, হুজুর সংক্ষেপে মামলার বিবরণ আপনাদের সম্মুখে বিবৃত করছি। আমার মক্কেল এই সৎ চোরটি, যাকে হুজুর বিজ্ঞতাবশত শিক্ষানবিশি চোর আখ্যা দিয়েছেন গত মাসের ১৫ই তারিখে ওই আসামী যাকে আমি নরাধম গৃহস্থ বলতে চাই তার বাড়ীতে চুরি করতে গিয়েছিল। দুজন সৎ ও সত্যবাদী সাক্ষী একথা এখনি হুজুরের কাছে স্বীকার করবেন। আসামী এমনি অপদার্থ যে বাড়ীর দরজা বন্ধ রেখেছিল, ফলে আমার মক্কেলকে কষ্ট স্বীকার করে সিঁধ কাটতে হয়। এ কাজে তার হাত পাকা। সিঁধ কাটা শেষ হলে ঘরের মধ্যে ঢুকে এক থলি টাকা নিয়ে বের হয়ে আসে। তখন আসামী জেগে উঠে বাইরে আসে এবং বাদীকে পাকড়াও করে। বাদী তখন হাঁকডাক শুরু করে কাছেই একজন পাহারাওয়ালা ছিল সে এসে পড়ে এবং সমস্ত ঘটনা শুনে আসামীকে গ্রেপ্তার করে। কাজেই হুজুর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঘটনা অতিশয় সরল এবং দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এখন আমার আর্জি এই যে ওই নরাধাম আসামীর যথোচিত দণ্ডের আজ্ঞা দিয়ে বাদীর সুনাম ও রাষ্ট্রের ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করুন।

উকীল সরকারের বিবৃতি শেষ হ'লে প্রথম সাক্ষী এসে উপস্থিত হল। বাদীপক্ষের উকীল জিজ্ঞাসা আরম্ভ করলো—

আপনার পেশা কি ?

আমি একজন সৎ গাঁটকাটা।

কতদিন এ ব্যবসা করছেন ?

তিন চার পুরুষ হবে।

আপনি পথে বের হয়েছিলেন কেন ?

পথই যে গাঁটকাটার ব্যবসার স্থান।

এই সৎ চোরকে আপনি চেনেন?

বিলক্ষণ।

কি উপলক্ষে চেনা হয়?

একদিন ওর গাঁট কেটেছিলাম।

ধরা পড়েছিলেন?

না।

আপনি কি দেখলেন?

ঐ সৎ চোর টাকার থলি নিয়ে বের হয়ে আসছে আর ঐ আসামী তাকে ধরে ফেলেছে।

তারপর কি হল?

পাহারাওয়ালা এসে আসামীকে গ্রেপ্তার করলো।

উকীল সাহেব বলল, আমার শেষ হয়েছে। তখন আসামীর উকীল জেরা আরম্ভ করলো বলল, আমি একটা প্রশ্ন করবো, তখন রাত ক'টা?

উকীল সরকার আপত্তি করলো, এ রকম উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন চলতে পারে না। কিন্তু তার প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই সাক্ষী বলল মাঝ রাত হবে।

আসামীর উকীল বলল, আমার আর প্রয়োজন নেই।

তখন দ্বিতীয় সাক্ষী এসে উপস্থিত হলে বাদীর উকীল আরম্ভ করলো, আপনার পেশা কি?

আমি একজন সৎ বাটপাড়।

কত কাল এ পেশা করছেন?

এ আমাদের বংশগত।

পথে বের হ'য়েছিলেন কেন?

ঘরে তো বাটপাড়ি চলে না।

বাদীকে চেনেন?

চিনি।

কিভাবে?

উনি আমার কাছে বাটপাড়ি শেখেন। বেশ পোক্ত হয়ে উঠলে চুরি ছেড়ে বাটপাড়ি ধরবেন।

বৃত্তি পরিবর্তন করবেন কেন?

চোরের উপরে বাটপাড়ি। চোর গেরস্তের চুরি করে, আমরা চোরের ধন চুরি করি। যে কাঁচা সে চুরি করে, পাকা হয়ে উঠলে বাটপাড় হয়।

আসামীকে চেনেন ?

না। উনি চোরও নন, বাটপাড়ও নন, চিনবো কি করে ?

আপনি কি দেখলেন ?

ঐ সৎ চোরটি কয়েকখানা রেশমী শাড়ী চুরি করে পালাচ্ছিলেন এমনঃ সময়ে আসামী তাকে ধরে ফেলল।

তারপরে ?

পাহারাওয়ালা এসে আসামীকে গ্রেপ্তার করলো।

আমার আমার দরকার নাই, বলল বাদীর উকীল।

আমার কিছু দরকার আছে বলে আসামীর উকীল জেরা আরম্ভ করলো, তখন রাত না দিন ?

সাক্ষী অবিচলিতভাবে বলল, দিন।

বেলা ক'টা ?

দুপুর হবে।

এবারে ঠিক ক'রে বলুন, গ্রেপ্তার করলো কে ? কোটাল না পাহারা-অলা।

কোটাল, সঙ্গে পাহারাঅলা ছিল।

আসামীর উকীল থামলে সাক্ষী প্রস্থান করলো।

অতঃপর বাদীর উকীল জুরিদের সম্বোধন করে মামলার ব্যাখ্যা সুরু করে দিল।

জুরি মহোদয়গণ, আপনারা সকলেই কৃতবিদ্য, সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, আর আপনাদের মধ্যে যদি কেউ সৎ চোর থাকেন তবে তো আরও ভালো, অনায়াসে এই মামলার মর্মগ্রহণ করতে পারবেন। মামলার বিষয়টি দিবা-লোকের মত স্পষ্ট। বাদী একজন সৎ চোর। সে স্বীকার করছে চুরি করতে গিয়েছিল আসামীর বাড়ীতে। একজন সৎ গাঁটকাটা আর একজন সৎ বাট-পাড় সাক্ষী দিয়েছে, তারা স্বচক্ষে দেখেছিল। এর পরে আর সন্দেহের অব-কাশ কোথায় ? এখন আপনারা অভিমত ব্যক্ত করুন, আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করুন এবং তার যাতে যথোচিত দণ্ড হয় তার ব্যবস্থা করে দিয়ে সমাজ রক্ষায় সহায়তা করুন। আপনাদের অধিক বোঝাবার চেষ্টা অনা-

বক্তব, এখন বাদীর অনুকূলে মত দিয়ে আইনের মর্যাদা রক্ষা করুন, এই আমার প্রার্থনা।

বাদীর উকিল থামলে আসামীর উকিল আরম্ভ করলো—জুরি মহোদয়গণ, আপনারা সমস্ত মামলার বিষয়টি এতক্ষণ অনুধাবন করেছেন। এবারে আপনাদের মন্তব্য করার পালা। এদেশের দণ্ডবিধির ৪৪০ ধারা অনুসারে এই মামলা। ৪৪০ ধারা অনুসারে চুরি প্রমাণ হলে আসামীর অর্থাৎ যার বাড়ীতে চুরি হল সে দণ্ডযোগ্য। জুরি মহোদয়গণ, এই দুনিয়া বড় বিচিত্র, নানা দেশে নানারকম আইন ও দণ্ড ব্যবস্থা। এমন অনেক দেশ আছে, যে-সব সভ্যতায় অনেক পিছিয়ে আছে, যেখানে চুরি প্রমাণ হলে চোরের দণ্ড হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, তারা ভ্রান্ত, তবে আশা করা যায়, সভ্যতায় অগ্রসর হলে নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পেরে তারা আমাদের দেশের পন্থা অনুসরণ করবে এবং চোরকে খালাস দিয়ে গেরস্তকে দণ্ড দেবে। তবে সে সময় আসতে এখনো কিছু বিলম্ব আছে। কিন্তু বিদেশ থেকে যে রকম খবর পাই তাতে আশা হয় অধিক বিলম্ব নাই তারাও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং শীঘ্রই ওলট কম্বল দেশের আইন স্বীকার করে নেবে। এখন এই হল আইন। আইনের মূলে যে সামাজিক নীতি আছে অবশ্যই তা আপনারা অবগত। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে যে, যতদিন বাঁচবে,ততদিন ধন সঞ্চয় করবে,ধন উপার্জনে যে অমনোযোগী সে কেবল পাপী নয়, সমাজের ভারস্বরূপ কাজেই দণ্ডযোগ্য। এখন কথা হচ্ছে ধনোপার্জনের উপায় কি? অনেক পথ আছে তবে তার মধ্যে চুরিটাই প্রকৃষ্টতম উপায়। কারণ চুরিতে স্বল্পতম সময়ে ন্যূনতম আয়াসে ধনার্জন সম্ভব। ডাকাতি, জালিয়াতি, তঞ্চকতা, গাঁটকাটা, বাটপাড়ি প্রভৃতি চুরির নামান্তর। চোর বললেই ঐ সকল ব্যবসায়কে বোঝায়। কাজেই চোর শব্দটি সর্বাত্মক। কাজেই যে চুরি করছে, সমাজ রক্ষায় ও শাস্ত্রানুসরণে সে সহায়ক। এখন তর্ক উঠতে পারে তবে সবাই চোর হয় না কেন? সহজেই উত্তর দেওয়া যেতে পারে, সবাই চোর হলে কে কার চুরি করবে? কাজেই চোরের স্বকার্যসাধনে সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে কতক লোককে গৃহস্থ হতে হয়। সেইজন্য গৃহস্থেরও আবশ্যক। কিন্তু সে গৃহস্থ যখন চোরকে ধরে ফেলে সমাজ রক্ষার ও শাস্ত্রানুশাসন পালনের হন্তারক হয়, তখন সে অবশ্যই দণ্ডযোগ্য। অনেকে শব্দের ব্যুৎপত্তিতে অজ্ঞাতবশতঃ সাধু শব্দকে চোর শব্দের বিপরীত মনে করেন। সাধু শব্দের মূল অর্থ ব্যবসায়ী আর ব্যবসায়ী শব্দের স্থূল অর্থ চোর। মহাজন শব্দ সম্পর্কেও

এই রকম ভ্রান্তি আছে। এতক্ষণ আইন ও সমাজ নীতির ব্যাখ্যা করেছি প্রয়োজন ছিল না। কারণ, জুরি মহোদয়গণ আপনারা সকলেই আশা করি হয় সৎ চোর, নয় সাধু, নয় মহাজন।

এবারে দেখা যাক সত্যই চুরি হয়ে ছিল কিনা। বাদীর পক্ষে দুজন সাক্ষ্য দিয়েছেন, একজন সৎ গাঁটকাটা একজন সৎ পাচপাত। দুজনেই সৎ নাগরিক। তবে তাদের কথার মধ্যে মিল নেই। প্রথম সাক্ষী বলেছেন চুরি হয়েছিল রাতের বেলায় আর চোরাই মাল টাকা। দ্বিতীয় সাক্ষী বলেছেন চুরি হয়েছিল দিনের বেলায় আর চোরাই মাল রেশমী কাপড়। তারপরে আবার দেখুন প্রথম সাক্ষী বলেছেন গ্রেপ্তার করলে পাহারাঅলা, দ্বিতীয় সাক্ষীর মতে কোটাল সঙ্গে পাহারাঅলা ছিল। এক সঙ্গে দুজনের কথা কখনই সত্য হতে পারে না। মিলিত ভাবে দেখলে সবগুলই মিথ্যা, কাজেই ঘটনা আদৌ ঘটেনি। মিছামিছি আসামীকে হয়রান করবার উদ্দেশ্যেই তার বাড়ীতে চুরি করেছি অভিযোগ তুলে তাকে দণ্ডিত ও সমাজে হীন প্রতিপন্ন করবার এই জঘন্য ষড়-যন্ত্র। অভিযোগ প্রমাণ হলে আসামীর শুধু কারাদণ্ড হবে না, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নষ্ট হবে। এক্ষণে আপনারা সুবিচার করে আসামীকে খালাস দিন এই প্রার্থনা। আপনাদের সম্মুখে তিনটি পথ। আসামীকে বেকসুর খালাস দিতে পারেন,আসামীকে দণ্ডিত করতে পারেন অথবা প্রমাণ অপ্রমা-ণের আলো আঁধারি সন্দেহের সুযোগে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি বলে তাকে খালাস দিতে পারেন। এ তিন ছাড়া চতুর্থ পন্থা নাই। এবার আপনারা ধীরভাবে চিন্তা করে এমন ভাবে অগ্রসর হন যাতে আইনের মর্যাদা ও সামা-জিক নীতি লঙ্ঘিত না হয় অথচ নিরপরাধের অকারণ দণ্ড না পেতে হয়।

এই বলে তিনি বসে পড়লেন।

এবার বিচারক আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আসামী, তোমার পক্ষে ও বিপক্ষে যাবতীয় বক্তব্য শুনেছ, এখন আদালত ও জুরি মহোদয়ের কাছে ঘোষণা করো তুমি নিজেকে দোষী বা নির্দোষ কি মনে করো।

আসামী বলল, আমি নির্দোষ।

তখন বিচারক জুরিদের মামলার বিষয়টি বোঝাতে আরম্ভ করলেন।

মামলার বিষয়টি বিজ্ঞ উকিলেরা বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নূতন কিছু বলবার নাই। আসামী পক্ষের উকিল সৎ চুরির মূলে যে সামাজিক নীতি আছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। কেবল একটি বিষয়ে, উল্লেখ তিনি করেন নি।

চুরি যে দেশ বিশেষের সামাজিক নীতি তা নয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন চুরি একটি নৈসর্গিক নিয়ম। জগতে চুরি না করছে কে? না বলে পরের দ্রব্য গ্রহণ যদি চুরি হয় তবে জগতে চুরি না করেছে কে? চন্দ্র সূর্যের আলো চুরি করছে। পৃথিবী সূর্যের আলো চুরি করছে। সমুদ্র বাষ্পায় নদ নদীর বারিরাশি চুরি করছে। উদ্ভিদ মৃত্তিকার রস চুরি করছে। ভ্রমর ও মৌমাছি ফুলের মধু চুরি করছে। ফল ফুল সূর্যের তাপ চুরি করছে। মানুষ ফল ফুল, উদ্ভিদ আলো বাতাস চুরি করছে। কেউ কারো অনুমতি নিচ্ছে কি? এভাবে যতই চিন্তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করবেন দেখতে পাবেন জড় জীব উদ্ভিদ এবং সর্বোপরি মানুষ চুরির দ্বারা জীবনযাপন করছে। এই নৈসর্গিক নিয়মেরই প্রতিফলন হয়েছে আমাদের সমাজ জীবনে। কাজেই চৌর্য অপরাধ নয়, অপরাধ গৃহস্থ বা যার দ্রব্য অপহরিত হচ্ছে সে। নৈসর্গিক নিয়মের মর্মভেদে আমাদের দেশ এগিয়ে আছে বলেই চুরিকে স্বাভাবিক অধিকার বলে স্বীকার করে নিয়ে গৃহস্থকে দণ্ডার্হ মনে করেছে। জুরি মহোদয়গণ, আপনাদের বিচার্য বিষয় সত্যই চুরি হয়েছে কিনা। অপরাধ যদি প্রমাণ হয়ে থাকে তবে তা বলুন, যদি না হয়ে থাকে তবে তা-ও বলুন, আর যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে সে কথাও প্রকাশ করুন। এবার আপনারা বিবেচনার জন্য গৃহান্তরে গমন করুন।

তখন জুরিরা গাত্রোত্থান করে গৃহান্তরে গেল।

আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে কখন বেয়ারাদের বেঞ্চির উপরে বসে পড়েছি, গোড়াতে অরো সকলের মতো দণ্ডায়মান ছিলাম। বেয়ারা গুঁতো দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সম্বিৎ হল, এতক্ষণ মোহগ্রস্তের মতো অচেতন ছিলাম, চিন্তার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। এবারে চিন্তাশক্তি ফিরে পেতেই সন্দেহ হল, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছি, না মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক নেই। এতদিন যা জানতাম বিশ্বাস করতাম সমস্ত কেমন গোলমাল হয়ে গেল ভাবলাম, এ কোন্ দেশে এসে পড়েছি। তাজ্জব বটে এই দুনিয়া। এইরকম এলোমেলো কত কি ভাবছি এমন সময়ে জুরিগণ পুনঃ প্রবেশ করতে সকলেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল, না জানি কি অভিমত তাঁরা ব্যক্ত করবেন। জুরিগণ উপবিষ্ট হ'তেই বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের অভিমত কি?

জুরিদের মুখপাত্র দাঁড়িয়ে উঠে বলল, সন্দেহের অবকাশে আসামীকে খালাস দেওয়া হোক এই আমাদের অভিমত।

তখন বিচারক গম্ভীরভাবে বললেন, কাঠগড়ায় আসামী তুমি সন্দেহের অব-

কাশে খালাস।

আসামী মস্ত একটা সেলাম করে কাঠগড়া থেকে বের হ'য়ে দ্রুত প্রস্থান করলো।

ইতিমধ্যে প্রমাণ সাইজের একটি জনতা ফুলের মালা নিয়ে আদালতে প্রবেশ ক'রে বাদীর কণ্ঠে সেই মালা পরিয়ে দিল আর তাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল ওলট কম্বল দেশের আইনের জয়।

তখন আমার গৃহস্বামী আমাকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, দেখলেন।

দেখলাম বই কি! আপনাদের দেশে না এলে ঠকতাম।

তারপর দিন জাহাজে ক'রে দেশে ফিরে এলাম।

এখানে সিন্ধবাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনার শেষ হ'ল, কিন্তু শ্রোতাগণ এমনি মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল যে কাহিনী শেষ হ'লেও তাদের সম্বিৎ ফিরলো না, তারা পাষাণ মূর্তির মতো স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছে। দীর্ঘকাল পরে তারা নড়ে চড়ে উঠে প্রমাণ করলো যে তারা এখনো সজীব আছে। কেবল একজনের বিস্ময় বিস্ফারিত মুখের হাঁ আর কিছুতেই বন্ধ হয় না, তখন ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে হাতুড়ি ঠুকে তার মুখ বন্ধ করতে হল।

তদন্ত

স্বর্গে দেবতাদের একটি অভ্যাস এই যে, তাঁহারা নিয়মিত সময়ে মন্দাকিনী তীরে পরিজাত-কুঞ্জে সমবেত হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিত যজ্ঞধূম আঘ্রাণ করিয়া থাকেন, এমন আবহমান কাল হইতে চলিতেছে। সেই যজ্ঞধূম বড মধুর ও স্বাস্থ্যপ্রদ, কেননা যজ্ঞানলে বিশুদ্ধ হবির্নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ ঘৃত স্বাস্থ্যপ্রদ বস্তু, কাজেই তাহার ধূমও অবশ্য স্বাস্থ্যপ্রদ। দেবতারা অবশ্য অমর, কিন্তু অমর হইলেই স্বাস্থ্যবান হইবে এমন নয়। দেবতারা ঐ ধূম হইতে স্বাস্থ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আশঙ্কা করিতেছি, এ যুগের পাঠকের স্বর্গ সম্বন্ধে জ্ঞান অধিক নয়, তাই উপমাচ্ছলে ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কলিকাতার অধিবাসীরা যেমন সকালে ও বিকালে ময়দানে বা রবীন্দ্র সরোবরে সমবেত হইয়া দক্ষিণ বাতাস হইতে স্বাস্থ্য সংগ্রহ করিয়া

থাকেন ; স্বর্গের দেবতাদের পূর্বোক্ত অভ্যাস অনেকটা সেই রকম।

আগেই বলা হইয়াছে যে, দেবতারা এইভাবে স্বাস্থ্যসংগ্রহ করিয়া রীতিমতো স্বাস্থ্যবান। যদিচ তাঁহারা মাঝে মাঝে অসুরদের কাছে পরাজিত হইয়াছেন, সেটা স্বাস্থ্যের অভাবে নয়, অসুরদের বেয়াড়াপনার জন্যই। কিন্তু সম্প্রতি দেবতাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় ও শারীরিক কৃশতা প্রভৃতি বাঙালী সুলভ লক্ষণ দেবসমাজে অবিরল হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এসব লক্ষণ এমন ব্যাপার হইয়া উঠিল যে, দেবরাজ ইন্দ্র বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কেন এমন হয়? ইহা অমৃতপানের আধিক্যবশত? কিংবা মন্দারপুষ্পের আসব আর তেমন বিশুদ্ধ নয়? এইরূপ নানা আশঙ্কায় দেবরাজের মন্ত্রীমণ্ডলী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে বিষয়টার আমূল তদন্ত করিবার ভার পড়িল স্বর্গের বৈদ্যযুগল অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের প্রতি। তাঁহারা রীতিমতো তদন্ত আরম্ভ করিলেন। বিশ হাজার পৃষ্ঠা পুরাতন নথীপত্র পাঠ করিয়া পঞ্চাশ হাজার সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া দেবতাগণের পেট বুক টিপিয়া কিছুই কিনারা করিতে পারিলেন না। অবশেষে মন্দাকিনী তীরে গিয়া পৃথিবী হইতে আগত যজ্ঞধূম আঘ্রাণ করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। একি যজ্ঞধূমে এমন দুর্গন্ধ কেন? তবে কি বিষাক্ত ধূম নিশ্বাসে গ্রহণ করিবার ফলেই দেবতারা স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে? নিশ্চয় তাই। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবরাজ সমীপে গিয়া নিবেদন করিল, স্যার, দেবতাদের স্বাস্থ্যহানির কারণ অবগত হইয়াছি। মানুষে আগের মতো বিশুদ্ধ হবি আর যজ্ঞানলে দিতেছে না, ভেজাল ও কৃত্রিম ঘৃত যজ্ঞে দিতেছে, সেই ধূম নিশ্বাসে গ্রহণ করিবার ফলেই দেবতারা দিন দিন ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে। সমস্ত শুনিয়া উদ্বিগ্ন দেবরাজ বলিলেন, এখন উপায়? সিনিয়র দেবতাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, যজ্ঞের ধূম আসা বন্ধ করা আবশ্যক। ইন্দ্র বলিলেন, তাহা কি প্রকারে সম্ভব? যজ্ঞে ঘি ঢালিলে সেই ধোঁয়া উপরে উঠিয়া স্বর্গে পৌঁছিবেই। অবশেষে এইভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা, প্রতিচিন্তা, দুশ্চিন্তা চলিবার পর দেবরাজ বলিলেন, ঘি সত্যই ভেজাল কিনা তাহার তদন্ত আবশ্যক এবং সে তদন্ত করিতে হইবে এখানে নয় পৃথিবীতে। তারপরে তিনি একান্ত সচিব চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন, পৃথিবীতে রাজার কাছে এখনি বিজ্ঞপ্তি পাঠাও তিনি যেন অবিলম্বে ঘৃতের বিশুদ্ধিতা সম্বন্ধে সম্যক তদন্ত করিয়া স্বর্গে

রিপোর্ট প্রেরণ করেন, আর ঘৃত ভেজাল বলিয়া প্রমাণ হইলে যেন যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইতিমধ্যে তদন্ত সাপেক্ষ মন্দাকিনী তীরে দেবগনের গমন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ প্রচার করিয়া দাও। জায়গাটা ফেলিয়া না রাখিয়া সরিষা বুনিয়া দাও বাংলাদেশে চালান দিলে ভালো মুনাফা পাওয়া যাইবে।

স্বর্গের বার্তা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত হইয়া রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরদিন প্রাতে তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীকে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া অবিলম্বে তদন্ত আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন, ঘৃতে ভেজাল মেশানো বন্ধ করিতে হইবে, ভেজাল যাহারা দেয় তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে হইবে, গ্রেপ্তার করিয়া গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাজার কুলগুরু বলিলেন, মহারাজ ইহা অবশ্য ও আশু কর্তব্য কারণ আপনি পুণ্যবান, তাহাতে আবার প্রবীণ হইয়াছেন, শীঘ্রই স্বর্গে গিয়া দেবত্ব লাভ করিবেন তখন ভেজাল ঘৃতের গন্ধে আপনার ব্যাধি হওয়া অসম্ভব নয়। নিকটেই রাজবৈদ্য বসিয়া ছিল, সে বলিল, মর্ত্যে থাকিতে মহারাজের অসুখ হইতে দিই নাই, তিনি স্বর্গে গেলেও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিব। বৃদ্ধ মন্ত্রী বলিল, তুমি স্বর্গে যাইবার আশা করিও না, তোমার স্থান অন্যত্র স্থির হইয়া আছে। রাজা সকলের কথা শুনিয়া বলিলেন, মরার পরের কথা এখন থাক, বিশেষ আমি শীঘ্র মরিতেছি না, আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। আপাততঃ তদন্তের ব্যবস্থা করো। তখন মন্ত্রীগণ উঠিয়া পড়িয়া তদন্তের আয়োজন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিন থাকে কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়া গেল। নীচের থাক তদন্ত করিবে, মাঝের থাক নীচের থাকের তদন্ত করিবে আর উপরের থাক মাঝের থাকের তদন্ত করিবে। মন্ত্রী বলিল, মহারাজ রাজ্য জুড়িয়া জাল ফেলিয়াছি, পালাইবার উপায় নাই। কিন্তু মহারাজ, এখানেই শেষ নয়, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় কমিটি গঠিত করিয়া তদন্তের একশেষ করিয়া ছাড়িব, কেহ না বলিতে পারে যেন যে তদন্তের ত্রুটি হইয়াছে। রাজা বলিলেন, সার্থক তোমার প্রধানমন্ত্রী পদ। তখন অর্থমন্ত্রী বলিল, মহারাজ, আমার একটি প্রস্তাব আছে। তদন্ত কমিটিগুলিতে কিছু ব্যবসায়ী লইতে হইবে, বিশেষ করিয়া ঘৃত-ব্যবসায়ী। কারণ ঘৃতের অন্ধি সন্ধি তাহাদেরই জানিবার কথা। কুলগুরু দীর্ঘ শ্মশ্রুতে কর সঞ্চালন করিয়া বলিলেন অর্থমন্ত্রী

যথার্থ বলিয়াছেন, কারণ শাস্ত্রেই আছে কণ্টকেনৈব কণ্টকম। রাজা বলিলেন, আর বিলম্ব নয়, তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও। তখন রাজাদেশে রাজ-পুরোহিত মঙ্গলাচরণ করিয়া শুভমস্তু শুভায় ভবতু বলিয়া আদেশ করিলে তদন্ত আরম্ভ হইয়া গেল। এবং কিছুদিনের মধ্যেই তদন্তের দাপটে সমস্ত রাজ্য ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে আরম্ভ করিল।

না, স্বপ্নের সংবাদ মিথ্যা হইবার নয়, সমস্ত বিষয়ে ভেজাল, অবস্থা এমন যে ঘিয়ে ভেজাল মেশানো হইয়াছে কি ভেজালে ঘি মেশান হইয়াছে বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়। তদন্তের প্রাথমিক ফলে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, উত্তম, এবারে ভেজালকারীকে আবিষ্কার করিয়া গ্রেপ্তার করো। তখন তদন্তের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হইল। কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, ভেজালের চেয়ে ভেজালকারীকে খুঁজিয়া বাহির করা অনেক কঠিন, কারণ প্রত্যেকে সুকৌশলে নিজের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়।

ঘিয়ের আড়তদার বলিল, আমি কি জানি, আমার গুদামে ঘি জমা আছে, ভেজাল কি খাঁটি আমার জানিবার কথা নয়, পাইকারকে শুধান। পাইকার বলিল, রাম কহো, আমি কি জানি? পাঁচজনে আমার কাছে ঘি বেচিয়া যায়, ভেজাল কি খাঁটি আমি কি জানি। খুচরা বিক্রেতাকে শুধান। খুচরা বিক্রেতা বলিল, রাধা কেষ্ট! আমি পাইকারের গুদাম হইতে কিনিয়া আনি, ভেজাল জঞ্জালের কথা জানি না। তাহার কথা শুনিয়া তদন্তকারীরা আবার পাইকারের কাছে ছুটিল, পাইকার আবার তাহাদের প্রেরণ করিল খুচরা বিক্রেতাদের কাছে। এমনিভাবে তাহারা মাকুর মতো দুই প্রান্তে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে লাগিল—অপরাধী কে ভাবিয়া পাইল না। এদিকে রাজার জোর আদেশ, আসামী না পাইলে তদন্তকারীদের প্রাণদণ্ড হইবে। এখন উপায়? পাইকারগণ ধনী, তাই প্রবল, খুচরাগণ জোটবদ্ধ, তাই প্রবল, অতএব সুবিধা মতো দুর্বলকে আবশ্যক। কোথায় তেমন দুর্বল? তখন একজন বলিল, ঘরে ঘরে যাহারা ঘি তৈরী করে, তাহারা ধনীও নয়, জোট-বদ্ধও নয়, তাহাদের গ্রেপ্তার করি না কেন? এই পরামর্শে দিগ্‌ভ্রান্ত পথি-কের দিগ্‌দর্শন হইল, তাহারা একযোগে ছুটিয়া গিয়া দক্ষবুড়ীর কুটীরে উপ-স্থিত হইল।

দক্ষবুড়ীর বাস গাঁয়ের প্রান্তে, থাকবার মধ্যে তার ভাঙা এক কুঁড়ে, আর

একটি গাভী। গাইয়ের দুধ বেচে, দুধ জমিয়ে ঘি বেচে তার সংসার চলে, কুঁড়ের মধ্যে দক্ষ থাকে, কুঁড়ের দাওয়ায় থাকে গরুটি। বুড়ীর তিনকুলে আর কেউ নেই। গাভীটি সুলক্ষণা, পুরুত ঠাকুর নাম দিয়েছেন সুরভি, বুড়ী বলে সুরি। তদন্তকারিগণ যখন দক্ষর কুটীরে পৌঁছাল তখন বুড়ী ঘুঁটে দিচ্ছিল। তাদের দেখে বুড়ী ভাবলো এক পাল গোরু আসে কেন? বুড়ী চোখে কম দেখে। তদন্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট বলল, বুড়ী তুমি ঘিয়ে ভেজাল দাও কেন?

বুড়ী বলল, কি জাল দি? সন্ধ্যা বেলা ঘি জাল দি, তাও সব দিন নয়, সাত আট দিন পরে একদিন।

বুড়ী কানে কম শোনে।

প্রেসিডেণ্ট বলে, বাজে কথা রেখে দাও, তোমাকে গ্রেপ্তার করবো।

বুড়ী বলল, জাবনা রেখে দেব, দেবই তো। আগে তোমাদের গরু ভেবেছিলাম এখন দেখছি তোমরা মানুষ।

পরিহাস রাখো, গর্জন করে প্রেসিডেণ্ট। ততোধিক উচ্চস্বরে ডুকরে কেঁদে ওঠে বুড়ী, ওরে আমার পরি রে, কোথায় গেলি রে মা।

তার মনে সাইত্রিশ বৎসর আগেকার মৃত কন্যার স্মৃতি উদিত হয়েছে।

তদন্তকারীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, এমন মায়াকান্নায় ভুললে চলবে না, মহারাজার আদেশ, আসামী চাই। এমন দুর্বল আসামী আর পাওয়া যাবে না। তখন প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী বুড়াকে চ্যাং দোলা করে নিয়ে চলল, সকলের অলক্ষ্যে পিছু পিছু চলল বুড়ীর গোরু সুরভি।

আমড়াগাছি মহকুমা হাকিমের এজলাসে দক্ষ বুড়ীর বিচার আরম্ভ হ'য়েছে, অপরাধ সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ঘৃতে ভেজাল মিশিয়ে দেবতা ও মানুষের স্বাস্থ্যনাশ। সরকারী উকীল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা, অর্থাৎ খুন করার অপরাধ, দাবী করেছিল, কিন্তু হাকিম স্বাধীনচেতা ও সুবিচারক তাই স্বীকার করেননি, তবে যে-সব ধারা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, অপরাধ প্রমাণ হলে জেল ও জরিমানা দু-ই হতে পারে। দক্ষ বুড়ী আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান, ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝতে পারছে মনে হয় না। সরকার পক্ষে পাঁচ সাতজন স্থূলদেহ সূক্ষ্মবুদ্ধি উকীল, আসামীও নিরাশ্রয় নয়, জন দুই স্বেচ্ছাসেবক উকীল তার জুটে গিয়েছে, তারা নিখিল ভারত ভেজাল নিরোধ কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত. অন্য উকীল জোটে নাই, কারণ বুড়ীর টাকা নাই,

তাছাড়া ভেজালের উপরে তাদের জাতক্রোধ। এজলাসের বারান্দায় একজিবিট সুরভিগাভী, একজন কনেস্টবলের হাতে তার গলার দড়ি। এজলাস-কক্ষ দর্শকে পূর্ণ, তার মধ্যে দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রের রিপোর্টার, ও ছবিঅলা আছে।

উভয় পক্ষের উকীলদের মধ্যে বাদবিতণ্ডা চলেছে, ইনফ্লেশন, ব্ল্যাকমানি, এন্টিসোশাল, সমাজের শত্রু, রুই কাৎলা ধরুন, স্বাস্থ্যনাশ হত্যার সমতুল্য অপরাধ, আইন বদলিয়ে ফাঁসির ব্যবস্থা করুন, D I R প্রয়োগ করুন, চূড়ান্ত দণ্ড আবশ্যক—ইত্যাদি শব্দ ঘন ঘন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এমন কয়েক ঘণ্টা চললে পরে মহামান্য হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, বুড়ী তুমি দোষ কবুল করছ?

দক্ষ বুড়ী বলল, বাবা মকবুলকে তো চিনি না, তবে জৈনুদ্দিকে জানি, সে ঘাস কাটে।

বুড়ীর উকীল বলল, স্যার কানে কম শোনে। সরকারী উকীল চটে উঠে বলল, বোগাস, কোন আসামীই অপরাধের কথা শুনতে পায় না।

এবারে হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, বুড়ী, দোষ স্বীকার করছ?

বুড়ী বলল, আজ তো বাবা একাদশী নয়।

কি আপদ, হাকিম বলেন।

এ সব শেখানো, বলে সরকারী উকীল, হুজুর আপনি রায় পড়ুন।

শুনতে পাবে না যে।

ওর হ'য়ে ওর উকীল শুনবে।

আর মেয়াদটাও খাটবে, বলে ওঠে একজন। আসামীর উকীল বলে, হুজুর এই গ্রাউণ্ডেই আমরা আপীল করবো।

তা করবেন, বলে হাকিম রায় পড়েন। বুড়ীর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড তিন হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড। তবে হাকিম সুবিচারক তাই দুই দণ্ড এক সঙ্গে চলবে। আদালতে ধন্য ধন্য রব উঠল, সেই সঙ্গে অনেকগুলো ছবি। হাকিম এজলাস ছেড়ে উঠতে যাবেন, কনেস্টবল বুড়ীকে টেনে নিয়ে যেতে যাবে, এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটলো যা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি রোমাঞ্চকর, আর তেমনি অবিশ্বাস্য। হঠাৎ সুরভী গাভী হেঁচকা টানে কনেস্টবলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শিঙ বাগিয়ে তাড়া করলো, আর অমনি ভিড়ের মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা প্রকট হ'য়ে উঠল। সুরভির প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য মহামান্য মহকুমা হাকিম

বাহাদুর। দূরদর্শী হাকিম গরুর দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে যা করলেন অ-সকলেই ক'রে থাকে, অন্তত করা উচিত। আর হাকিম বাহাদুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণে অন্যান্য সকলেও সেই পন্থা অনুসরণ করলো—

তখন হাকিম ছোটে ছাড়ি এসনাস
পিছনে পেস্কার ছোটে ঘন বহে শ্বাস,
নাজির উজীর আর সেরেস্তাদারেরা
বাপ বাপ বলে ছোটে যে যাহার ডেরা,
ছুটোছুটি করে মরে উকীল মোক্তার
সবজজ জেলা জজ আর চোপদার,
পিছনে বিষম রবে তেড়ে আসে গোরু
কপালে তিলক কাটা ঠ্যাঙ সরু সরু,
একি সর্বনেশে গোরু ভীষণ বেয়াড়া
ন্যায়াধীশ দলে দেয় অশাস্ত্রীয় তাড়া
রোদ্দুরেতে শিঙদুটো করে জলজল
যেমন ধরালো আর তেমনি সবল,
ভেজাল খেয়েও তবু ছিল বটে প্রাণ
ও শিঙের গুঁতো খেলে চির পরিত্রাণ,
থাম্ থাম্ রাখ্ রাখ্ পালটিব রায়
না হয় আপীল হবে বুড়ী যদি চায়,
কে জানিত ওরে বাবা গোরুর প্রতাপ
দণ্ডেকের মধ্যে হ'ল আদালত সাফ।
ওদিকে টনক নড়ে সুদূর ত্রিদিবে
শলা পরামর্শ করে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে,
গাঁজা খাই ভাঙ খাই, খাইযে অমৃত
মর্তে হ'লে লোকে যারে Wine বলিত,
আর যাহা খাই তাহা নাহি আর চাপা
পুরাণে নবেলে সব হইয়াছে ছাপা,
হলাহল খেয়ে দেখো দিব্যি আছি বেঁচে
হেন শক্ত প্রাণ যাবে ভেজালেতে কেঁচে ?
বাতুলের কথা বাপু তুলিও না কানে

ও শিঙের গুঁতো খেলে বাঁচিবে না প্রাণে,
তারা চেয়ে মাথা পেতে নাও না ভেজাল
ফিরুক বুড়ীর গোরু ঘুচুক জঞ্জাল,
তখন দেবতা সবে দিল নব পাঁতি
আজ হতে ভেজালের ঘুচিবে অখ্যাতি,
খাঁটি ভেজালের হবে সমান আদর
বরঞ্চ ভেজালের কিছু বেশি দর।
কে করিতে বলেছিল এমন তদন্ত
মাঝে থেকে আমাদের বিষম প্রাণান্ত,
পাঁতি পেয়ে গোরু মর্ত্যে করিল প্রয়াণ,
ভেজাল তদন্ত কাব্য অমৃত সমান।

দশমিক বিন্দু

আমাদের গল্পের নায়ক হরিহরের কোন দিকে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। বংশ, বিদ্যা, রূপ, গুণ সব দিকের বিচারেই সে নিতান্ত সাধারণ। আবার চেহারাটিও এমন যে দশজন লোকের মধ্যে চোখে পড়ে না, এমন কি পিতা-মাতা নিখরচায় যে নামটি তাকে দিয়েছিল সেটাও নিতান্ত সাদামাঠা। এমন লোককে নায়ক করে গল্প রচনা করা সম্ভব নয়। তবে কিনা মাঝে মাঝে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। এই গল্প সেই সম্ভাবনার উদাহরণ। এহেন উদাহরণ সত্ত্বেও বলতে হবে যে হরিহর সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসের উপেক্ষিত। সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছিল, সকলের আশা সত্ত্বেও একবারেই পাস করেছিল, তারপরে সেই যে, কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ঠেকে গেল আর পারলো না এগোতে। তার সহপাঠীরা যখন লেনিন, মুসোলিনী, হিটলার হচ্ছিল, যখন তারা মনে মনে ইংরেজকে সুয়েজ খাল পার করে দিয়ে শহীদ সাজছিল তখন হরিহর নির্বিকার। গঞ্জনা, ভর্ৎসনা উৎসাহে প্ররোচনায় কিছুতেই সে শহীদ সাজতে সম্মত নয়। আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যখন শহীদ সাজবার রাস্তা নিরাপদ ও প্রশস্ত হয়ে গেল তখনও সে নির্বিকার। এমন

কি উদ্বাস্তুত্রাণের নামে চাঁদা সংগ্রহ করে আত্মত্রাণ করতেও সম্মত হল না। আর এত বিস্তারিত করে বলবার আব শুরুই বা কি, শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে আমাদের কাহিনীর নায়ক হরিহর না সাহিত্যিক, না শহীদ, না রাজনীতিক, না সাংবাদিক, না বিদ্বান, না ব্যবসায়ী, না উন্নাসিক, না প্রতিক্রিয়াশীল, না—না এমনভাবে নেতিবাচনের মালা গেঁথে চললে অনন্তকাল অবধি চলতে হবে, তাই শেষ করবার চেষ্টা করা যাক। হরিহর উদ্যমহীন, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন বিদ্যাবুদ্ধি বৈশিষ্ট্যহীন একজন সাধারণ ভালো-মানুষ। সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই এবং সাত পাঁচ বারোতেও নেই—অর্থাৎ সংসারে বারোভূতের যে নিত্য লীলা চলছে হরিহর সেই গোষ্ঠীরও অন্তর্গত নয়। এমন লোককে বর্ণনা করে বোঝানো কঠিন স্ফটিকের উপরে জলবিন্দুর ন্যায় সে দৃষ্টির অতীত প্রায়।

কিন্তু বোধ করি একটু ন্যূনোক্তি করেছি, সেইটুকু সংশোধন করে নেওয়া আবশ্যক। বলেছি যে তার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, একথা সর্বৈব সত্য নয়। জীবনে তার একটি মাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তবে পাঠক তাকে উচ্চ বলবেন কিনা নির্ভর করে তাঁর নিজের আকাঙ্ক্ষার উচ্চতার উপরে। বল্মীক স্তূপের কাছে দেওঘরের নন্দন পাহাড় উচ্চ, আবার নন্দন পাহাড়ের কাছে অদূরবর্তী ত্রিকূট পাহাড় উচ্চ, আর সকলের কাছেই হিমালয় উচ্চতার আদর্শ। সংসারে আর দশটা গুণের মতোই উচ্চতা নিম্নতা আপেক্ষিক। কাজেই হরিহরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সকলের কাছ উচ্চ মনে না হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন কি সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা যার বর্ণনার জন্য এতখানি ভূমিকার প্রয়োজন তবে উপসহিত হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও বলবো যে আর কিছুই নয়, মরবার আগে তার ইচ্ছা যে সে এক হাজার টাকা জমাবে। তার-পরে নির্দিষ্ট দিন যখন সমাগত হবে তখন শান্তিতে বিদায় নিতে তার বাধবে না; জনতার স্রোতে তার নাম জল বুদ্বুদের মতো মিশে যাবে—কেবল ব্যাঙ্কের খাতায় জমা থাকবে নগদ এক হাজার টাকা আর মৃতদেহের অধরে একটি তৃপ্তির স্নিগ্ধ হাসি। একে কি সত্যই আপনারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলবেন —এই মুদ্রাস্ফীতির বাজারেও।

হরিহরের একটি "কর্ম" জুটে গেল। "কর্ম" আর চাকুরিতে কিছু প্রভেদ আছে। চাকুরি কি সবাই জানে, কর্ম এমন একটি ব্যাপার যার বেতনের

অল্প অকথ্য আর কাজের চাপ অসহ্য। তবে সুবিধার মধ্যে এই যে হরিহরের গায়ের চামড়া পুরু আর সে কিনা সংসারে একক। বাপ মা ভাই বোন না থাকায় সে ভাবলো ২।৪ বছরের মধ্যেই হাজার টাকা জমিয়ে উচ্চাকাঙ্খা সফল করতে পারবে। প্রথম মাসে বেতন পাওয়ার পরে ব্যাঙ্কে দশ টাকা দিয়ে একটা সেভিংস একাউন্ট খুলে ফেলল আর নয়শ' নব্বই টাকা জমা দিতে পারলেই হাজার পূরণ হয়।

সে থাকে মেসের একটি ঘরে। ঘরটা সিঁড়ির কাছে একতলায়, তাতে আলো বাতাস প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ের বালাই না থাকায় আর আগন্তুক-গণের জুতো রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় ভাড়া দেওয়ার দায় থেকে রেহাই পেয়েছে হরিহর। দুবেলা যে খাদ্য তার বরাদ্দ তাতে এই সনাতন দেশ ছাড়া অন্যত্র কোথাও জীবন ধারণ সম্ভব হয় না। পিতার পুণ্যে লোকে বাঁচে, হরিহরের পিতা খুব পুণ্যবান ছিলেন সন্দেহ নাই।

মাস গেলে হরিহর টাকা জমায়, ব্যাঙ্কের হিসাবের স্ফীতি তার শরীরের স্ফীতির অভাব পূরণ করে। মুখে তার তৃপ্তির হাসি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে সে অগ্রসর।

যারা টাকা জমাতে পারেন নি, অথবা পেরেছেন কিংবা পেরেও পারেন নি বলে ঘোষণা করেছেন তাদের সকলেরই অবগত্যার্থে দু'একটা কথা বলতে চাই।

টাকা জমানো একরকম সাধনা এবং সব সাধনার চেয়ে কঠিন। এ সাধনায় অনেকেই অগ্রসর হয় তবে সিদ্ধিলাভ "কোটিকে গোটিক।" পরমার্থ লাভের উদ্দেশ্যে সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে হয়, দেহপাত করতে হয় কৃচ্ছ্রসাধনার আর অন্ত নাই। অর্থলাভের উদ্দেশ্যেও সেই বিধান। রক্তবিন্দুকে মুদ্রাবিন্দুতে পরিণত করতে হয়—জপ করতে হয় শরীরং ক্ষণ-বিধ্বংসী কল্পান্তস্থায়িনো মুদ্রাঃ। কিন্তু সিদ্ধিলাভ! হায় বাধার অন্ত নাই। উর্বশী মেনকা প্রভৃতি খ্যাতনাম্নীগণ, মার ও ডাকিনী যোগিনীগণ যজ্ঞ পণ্ড করতে সর্বদা উদ্যত। এক্ষেত্রেও তাই। সংসারে যার কেউ নেই যথাকালে অর্থাৎ উপার্জনশীল দেখলে তার সবাই জুটে যায়। সে হঠাৎ হিসাবের খাতা থেকে চোখ তুলে দেখতে পায় অনেকগুলি হস্ত তার সম্মুখে প্রসারিত। এই সব ছলনায় মন বিগলিত হল কি সর্বনাশ! বিগলিত হলে কর্তব্যের স্রোতে নিঃশেষ হয়ে যাবে কঠোর সাধনায় সঞ্চিত তোমার যৎকিঞ্চিৎ। মন শক্ত

করতে হবে, দয়া মায়া প্রভৃতি তুচ্ছ সাংসারিক গুণের সম্মুখে মুদ্রিত নয়ন হয়ে মনকে কঠিন করতে হবে। তবে না টাকা জমবে। আর যদি হতভাগ্য সাধক অবিবাহিত হয় তবে তো কথাই নাই। যার ঘর খালি তার ঘর পূর্ণ করে তুলবার দায়িত্ব গ্রহণ করে দূর ও নিকট আত্মীয়গণ। প্রকৃতি যে শূন্যতা বরদাস্ত করতে পারে না—এ তারই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

হরিহরের আজ সেই পরীক্ষা। তিন বছরের সাধনায় তিনশ' পঁচাত্তর টাকা যেদিন তার হিসাবের খাতায় উঠেছে ঠিক সেই সময় এক সঙ্গে ছিটে গুলির মতো পাঁচখানি পোস্টকার্ডের চিঠি তার হস্তগত হল— একটা না একটা লাগবেই। ছিটেগুলির ঐ সুবিধা।

যে জ্যাঠামশাই-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতকাল সে অনবহিত ছিল তাঁর বাবদ জ্যাঠাইমা লিখেছেন যে, হরিহর কুলের সুপুত্র, কাজেই তার কর্তব্য গয়ার কার্য্য সম্পন্ন করবার জন্যে অবিলম্বে জ্যাঠাইমাকে একশ পঁচিশ টাকা প্রেরণ করা। ব্যাখ্যাচ্ছলে উক্ত জ্যাঠাইমা জানিয়েছেন যে সেই সঙ্গে সে স্নেহ-ভাজন দেবরের অর্থাৎ হরিহরের পিতারও পিণ্ডদান ক্রিয়া সমাধা করবে। কাজেই এ তো একরকম তার নিজেরই ক্রিয়া করা হল। অতএব। দুই পিসতুতো ভাই পরীক্ষার ফি'র প্রার্থী, তারই ভরসায় তারা পরীক্ষা দিতে উদ্যত। একজন গ্রাম্য সম্পর্কে ভাই চিকিৎসার খরচ চায়। গ্রামের লোকের সেবা করতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও জাতির জনক সকলেই যখন বলেছেন তখন হরিহরের পক্ষে তার অন্যথা করা উচিত হবে না। হরি-হর হিসাব করে দেখল যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে হলে দুই শত পঁচাত্তর টাকা লাগে। সে দিতে মনঃস্থির করলো।

হরিহরের সাধনমার্গে কিছু গলদ ছিল, সে 'না' বলতে শেখেনি। অথচ নেতি বচনের পথেই টাকা জমে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এ রহস্য জানতেন, এ নয়, এ নয়, এ নয়, অনন্ত নেতি বাচনের দ্বারা তাঁরা পরম প্রাপ্তি পথের নির্দেশ করেছেন। অর্থ প্রাপ্তির নির্দেশও সেই পথে। নেই নেই নেই বলতে হবে। ছেলের অসুখ টাকা কোথায়? মেয়ের বিবাহ টাকা কোথায়? বাড়ী তৈরী করতে হবে—টাকা কোথায়? কাপড় ছিঁড়েছে— টাকা কোথায়? কুটুম্ব সমাগত সন্দেশ আনতে হবে—টাকা কোথায়? লৌকিকতা আবশ্যক —টাকা কোথায়? "দারা পুত্র পরিবার, কে বা কার, তুমি কার?" খবর-দার মোক্ষকালীর ব্যাঙ্কের খাতায় সন্ধান যেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা না পায়

বিশেষ করে স্ত্রী। স্ত্রী যতই সতীসাধ্বী হোক না কেন তারা তো ঐ উর্বশী মেনকা ডাকিনী যোগিনীরই সমজাতীয়া। সকলকেই অবিচ্ছিন্ন না বলতে হবে। নেতি বাচনের অব্যর্থ অস্ত্র সঞ্চয়কারীর প্রধান সহায়। কিন্তু হায় আমাদের নায়ক হরিহর না বলতে শেখেনি তাই দুচার দিনের মধ্যেই মনি-অর্ডারযোগে দুইশ' পঁচাত্তর টাকা বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হল। তার উচ্চা-কাঙ্ক্ষার উন্নীয়মান প্রাসাদ থেকে খসে পড়ে গেল অনেক ইট পাথর গম্বুজ। মনে মনে সে ভাবলো যাক আপাততঃ চুকে গেল—বছর দুই পিছিয়ে গেলাম বটে, তবে এখনো সময় আছে। অবোধ হরিহর জানতো না মোটেই চুকে গেল না—এ কেবল আরম্ভ। দক্ষ শিকারী দু'চারবার চার ফেলে দেখল যে পুকুরে মাছ আছে আর সেগুলো মোটেই সতর্ক নয়। কাজেই তারা পুকুর পাড়ে ছিপ হাতে বেশ কায়েম হয়ে বসলো।

কয়েকদিন পরে পূর্বকথিত জ্যাঠাইমা গয়া ফেরৎ কলকাতায় এসে উপস্থিত হল। স্থানভ্রষ্ট আবিষ্কারক না হলে কেউ হরিহরের মেসটি খুঁজে বের করতে পারে না। জ্যাঠাইমা খুঁজে বের করে সেই অন্ধকার ঘরের বদ্ধ কৌটার মধ্যে সাত রাজার ধন মাণিকরূপী হরিহরের সাক্ষাৎ পেলো। গয়ার নির্মাল্য ও স্বকীয় আশীর্বাদে অভিভূত করে ফেলল তাকে। এবং দেশে ফিরবার আগে তার ব্যাঙ্কের খাতা থেকে আরও একশ পঁচিশটি টাকা আদায় করে তৎ-পরিবর্তে ধনপুত্রে গৃহপূর্ণ হয়ে উঠুক আশীর্বাদ করে বিদায় নিল। সেই শূন্য ঘরে বসে শূন্যপ্রায় খাতাখানি নিরীক্ষণ করে হরিহর দেখলো মাত্র পঞ্চাশটি টাকা অবশিষ্ট আছে। তার বক্ষকুহর থেকে অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হল মানব ভাষায় তাকে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় হায় হাজার টাকা জমানো কত কঠিন। লক্ষপতিদের অতিমানব বলে তার ধারণা হল।

গ্রামে ফিরে কথিত জ্যাঠাইমা পাঁচ কাহন করে হরিহরের চাকুরির, অর্থের ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রচার করলো। শুনে গ্রামের অর্ধেক লোক নেচে খাড়া হল। কলকাতায় গিয়ে একটা উঠবার জায়গার অভাবে এতকাল যারা গঙ্গাস্নান, কালীঘাট দর্শন, দাঁত বাঁধাই, চোখ পরীক্ষা প্রভৃতি করতে অসমর্থ ছিল এবারে সুযোগ উপস্থিত হল। কোন রকমে রেল মাশুলটা সংগ্রহ করতে পারলেই হয়। তারা মনে মনে হেসে বলল আসবার খরচ অবশ্যই লাগবে না, হরিহর কর্তব্যপরায়ণ আর ফিরবার খরচ প্রাণের দায়ে সে-ই জোগাবে।

কলকাতাবাসীদের সম্বন্ধে পল্লীবাসীদের বিচিত্র ধারণা। "সেখানে নাহি দুঃখ তাপ জরা" সেখানে অঢেল বিলাসিতার উপকরণ আর উদার আতিথ্য ; আর সেখানে যারা "কর্ম" করে তারা তো আলাদীনের প্রদীপ হাতে উপবিষ্ট। বস্তুতঃ কলকাতায় জল ও হাওয়া ছাড়া আর সমস্তই যে পণ্য একথা বুঝতে তারা নারাজ। অর্বাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে সনাতন গ্রামগুলির ঈর্ষা মজ্জাগত।

একজন বলল, একখানা চিঠি লিখে হরিহরকে জানিয়ে দাও গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষে আমরা যাচ্ছি।

কথাটা শুনে অপর একজন বলল, এমন কাজটি করো না। ফাঁকা আওয়াজে পাখিকে সচেতন করে দেওয়া উচিত নয়, যখন গুলি ছুঁড়বে দেখবে সব উড়ে গিয়েছে।

তার এ উক্তি অভিজ্ঞতাজাত। একবার চিঠি লিখে জানিয়ে গিয়ে দেখেছিল যে চিড়িয়া পলাতক। অবশ্য হরিহর কর্তব্যপরায়ণ, তার কথা আলাদা, তবু সাবধানের মার নেই কারণ কর্তব্যপরায়ণতার ও সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে।

অদৃষ্টকে যতই নিষ্ঠুর মনে করা যাক—সে তত নিষ্ঠুর নয়, সংসারে চূড়ান্ত বিপদ কদাচিৎ ঘটে। হরিহরকে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিল অদৃষ্ট, অবশ্য তার কপাল গুণে নয়। কলিকাতা দর্শনার্থী গ্রামবাসীদের রেলমাশুল জুটে উঠল না। তাই আপাততঃ কিছুদিনের জন্য বেঁচে গেল হরিহর ও ভুক্তাবশিষ্ট পঞ্চাশটি টাকা।

এমন সময়ে এক অঘটন ঘটল হরিহরের জীবনে। অঘটন আজো ঘটে। একদিন একখানি রেজিস্ট্রি পত্র মারফৎ অবগত হল যে লটারিতে নয়শ' টাকা পেয়েছে সে। অবিলম্বে টিকিটখানি দেখিয়ে টাকা আদায় করতে লিখেছে কর্তৃপক্ষ। তার মনে পড়ে গেল মাস তিনেক আগে রেড ক্রশ লটারিতে একখানি টিকিট কিনেছিল বটে। টিকিট দেখিয়ে টাকা আদায় করে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়লো হরিহর, ক্লান্তিতে নয় আশাতীত সৌভাগ্যোদয়ে। আর একটি ধাপ উঠতে পারলেই উচ্চাকাঙ্খার শিখরে সে দণ্ডায়মান হতে সক্ষম হবে—আর একটি মাত্র ধাপ।

এত অনায়াসে, এত সহজে, প্রায় অজ্ঞাতসারে দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে গেল, হিমালয়ের দুরধিগম্য শিখর প্রান্তে উপনীত হল, মরুভূমির দিগন্তে

মরীচিকা বলে প্রতীয়মান জলাশয় সত্য সত্যই নির্মল শীতল নদীতে পরিণত হল! যতই চিন্তা করে বিস্ময়ের অন্ত পায় না। অবশেষে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল ঠনঠনের কালীমাতা বলছেন আমায় পূজো দিতে ভুলিস না, আমার এলাকাতেই তোর বাস।

হরিহর বলল, মা, তুমি তো সব সময়ে জিভ বার করে থাকো তবে কথা বলো কি করে?

মা বলতেন—একথাগুলো না বললেই বুঝি খুশী হতিস। তে-রাত্রিরের মধ্যে পূজো না দিলে মহা অনর্থ ঘটবে জানিস। এই বলে তিনি অন্তর্ধান করলেন।

জেগে উঠে হরিহর স্থির করলো পূজো একটা অবশ্যই দিতে হবে, তবে মাসান্তে মাইনেটা পেয়ে নি, ব্যাঙ্কের হিসাবে আর হাত দেব না।

মাতার অভিশাপের শাসানিটা সে ভুলে গেল, কিন্তু মাতা ভুললেন না। তে-রাত্রির গত হতে না হতেই হরিহরকে কালব্যাধিতে ধরলো।

হরিহরকে কালব্যাধিতে ধরেছে। এ ব্যাধির ঔষধ নাই তবে নামান্তর আছে। আত্মার ক্ষেত্রে আরোপিত হলে এর নাম তিতিক্ষা, বুদ্ধির ক্ষেত্রে আরোপিত হলে গবেষণা, চিত্তের ক্ষেত্রে আরোপিত হলে কবিত্ব, দেহের ক্ষেত্রে আরোপিত হলে রাজযক্ষা, আর হৃদয়ের ক্ষেত্রে আরোপিত হলে, এর নাম প্রেম। প্রেমের ঔষধ নাই। কে কবে প্রেমে পড়ে রক্ষা পেয়েছে? সর্বনাশ পর্য্যন্ত ওর শেষ সীমানা নয় কি? ও ব্যাধিতে পড়লো কি মরলো। উদাহরণ পৌরাণিক আমলের পুরুষরা থেকে আধুনিক আমলের হরিহর রায়।

এতকাল সে নগণ্য ছিল এখন অগ্রগণ্য, আগে ছিল কঃ কস্য এখন নমস্য, আগে ছিল মেসের জুতা বর্দার এখন প্রধান মেম্বার। আর কিছুই নয়, লটারিতে টাকা প্রাপ্তির কথা কানাকানিতে রটে গিয়েছে আর এসব কথা যেমন অতিরঞ্জিত হয়ে রটে তাই হয়েছে। নয়শ' টাকা মুখে মুখে নয় হাজার নব্বই হাজার শেষ পর্যন্ত নয় লক্ষে পরিণত হয়েছে। সঠিক উত্তর হরিহর দেয় না, সে কেবল মোনালিসার হাসিতে প্রশ্নকর্তার মনে ঈর্ষার বীজ বপন করে। অন্য সকল অপবাদের প্রতিবাদ করবে কেবল ধনাপবাদ ছাড়া—এই ঋষি বাক্য পালন করে হরিহর। এই ক'বছরে অনেক ঠেকে কিছু শিখেছে।

একদিন মেসের ম্যানেজার হরিহরকে বলল, মিঃ রায় (এখন আর সে হরা বা হরিহর নয়) আজ এক গানের মজলিসে যাচ্ছি, চলুন না।

কত দূরে, কখন ? শুধালো হরিহর।

পাড়াতেই, সন্ধ্যাবেলা।

তা চলুন না।

ম্যানেজার কৃতার্থ হয়ে গেল।

মজলিস শেষে ম্যানেজার তাব মাসিমা ও মাসতুতো বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মাসিমা পরবর্তী রবিবারে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করলো। এবং তারপর থেকে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় দ্রুত গড়িয়ে চলল হরিহরের মনোরথ। প্রকাশ থাকে, কথিত মাসতুতো বোনটির নাম মনোরমা। আর ও প্রকাশ থাকে যে, স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রীয় সাত্ত্বিক লক্ষণের পরিবর্তে আধুনিক সাত্ত্বিক লক্ষণ সিনেমা, পার্কষ্ট্রীটের চায়ের দোকান শাড়ীর দোকান ও রবীন্দ্র সরোবর। সেই সহস্রের রথচক্র চিহ্নিত পথ অনুসরণ করে একদা হরিহরের মনোরথ বিবাহ মণ্ডপের কাছে এসে পৌছল।

এই শুভ সংবাদ পেয়ে শুভার্থীর দল জুটে গেল, তাদের অধিকাংশকেই সে দেখেনি পরেও দেখবার আশা করে না। ইতিমধ্যে মেসের ম্যানেজারের উদ্যোগে হরিহরের জন্য বাড়ী ভাড়া হয়েছে—বাড়িটি ছোট হলেও সুবিধার মধ্যে এই যে, সেটি মেসবাড়ী ও মাসিমার বাড়ী দুয়েরই কাছে।

শুভার্থির দল খরচের যে ফর্দ করলে তাকে অন্তর্ভেদী বললে অন্যায় হয় না। তাদের সম্মিলিত হস্তক্ষেপে লটারিতে প্রাপ্ত নয়শ' টাকা খরচ হয়ে গেল। জোয়ারের উচ্ছ্বাসে যে জল পুকুরে ঢুকেছিল, ভাঁটার টানে তা নিঃশেষে বের হয়ে গেল, থেকে গেল সিন্দুর বিজয় রথে আসীন হয়ে যে চক্রটি হরিহরের সংসার সরোবরে প্রবেশ করেছিল।

লটারির টাকা পেয়ে হরিহর যখন ভেবেছিল আর পঞ্চাশটি টাকা সংগ্রহ করতে পারলেই জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় সেই সময়ে ঠনঠনের মা কালীর অধরে না জানি কি ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছিল। হায়, মূঢ় হরিহর যদি সেদিন ঠনঠনের উদ্দেশ্যে পাঁচসিকার বা সোয়া পাঁচ আনার পূজা দিত (দয়াময়ী জননীরা গরীবের Token পূজাতেই সন্তুষ্ট হন; বড় লোকের ঘাড় কিভাবে ভাঙতে হয় সে তাঁদের অজানা নেই) তবে এই দুর্দৈব ঘটতো না। কিন্তু দুর্দৈবের এখানেই শেষ নয়, আরও আছে!

মনোরমা স্বামীগৃহে এসে দেখল নয় লাখ টাকা দূরে থাক নয়শোর চিহ্নও

দেখা যাচ্ছে না। করুণ কণ্ঠে মাকে জানালো, মা তোমাদের বোধ করি ঠকিয়েছে।

স্নেহময়ী জননী বললেন. বাছা, পুরুষরা বড় কৃপণ, স্ত্রী কন্যার জন্য অলঙ্কার গড়তে ওদের হাত চায় না। তাই বলে মনে করা উচিত নয় যে ওদের কিছু নেই। চেপে রাখাই ওদের অভ্যাস। গোপনে খুঁজে দেখো ব্যাঙ্কের বা ডাকঘরের খাতা পাও কিনা।

উপযুক্ত জননীর উপযুক্ত কন্যা গৃহে ফিরে এসে স্বামীর অনুপস্থিতিতে গবেষণা শুরু করলো আর দুই তিন দিনের মধ্যেই আশাতীত সাফল্যের প্রমাণস্বরূপ ব্যাঙ্কের একখানা পাশবুক পেলো। খাতার পাতা উল্টে টাকার অঙ্ক দেখে বুঝলো যে নগদ জমা পাঁচ হাজার টাকা। এখানে একটু সমাজ সচেতন হয়ে অগ্রসর হতে হবে অর্থাৎ দেশের ধারাপাতের যে পরিবর্তন হয়েছে তার কথা ভুললে চলবে না।

আসলে হারিহরের জমার ঘরে ৫০·০০ টাকা। কিন্তু দশমিক বিন্দুর রহস্য না জানায় মনোরমার মনে হল ৫০০০ টাকা। মনোরমাকে দোষ দেওয়া যায় না। বিদ্যালয়ে দশমিক বিদ্যার শ্রেণী পর্যন্ত ওঠবার ক্লেশ স্বীকার করেনি সে। তাছাড়া ঐ অতি ক্ষুদ্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিন্দুর মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিহ্নটির যে এত মহিমা দশমিক বিন্দুর অপরিমেয় রহস্যবেত্তা যারা নয় কেমন করে তারা বুঝবে।

নয় লাখ নয়, নয় হাজার নয়, তবু তো পাঁচ হাজার, তাই বা পাড়ার কয়জন মুখ পুড়ীর আছে ভাবতে ভাবতে এক দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে খাতাখানা খুলে ধরে বলল, এই দেখো মা, তোমার জামাইয়ের কীর্তি। টাকা চেপে রেখে নেই নেই করে কেঁদে মরে।

মায়ের দশমিক বিন্দু সম্বন্ধে জ্ঞান কন্যার অনুরূপ তবে সে ইংরেজি অঙ্কগুলো চেনে, বলল, আমি তো আগেই বলেছিলাম বাছা।

আরও আগে তো বলতে পারতে মা। এতদিন কি মনের দুঃখে না কেটেছে।

আমি বলছি বাছা আরও খাতা আছে, খুঁজে দেখো।

সে তোমাকে বলতে হবে না মা, ক্রমে ঐ নয় লাখ টাকাই উদ্ধার করবো। তবে আগে এর একটা গতিক করবো।

ও ইঙ্গিতটা স্ত্রীলোক মাত্রেই বোঝে। টাকার পরমাগতি শাড়ী

অলঙ্কারাদি ক্রয়।

তখন মাতা ও কন্যা মিলিত হয়ে যে ফর্দটি প্রস্তুত করলো, মিলিত চেষ্টা সত্বেও তাকে সাড়ে চার হাজারের উপরে তোলা সম্ভব হল না।

কন্যা সখেদে বলে উঠল, মা তবু যে কিছু বাকি রয়ে গেল।

মা বললে—পাত্রশেষ রাখতে হয়।

সে তো এক টাকা বাকি থাকলেও চলতো।

কন্যার বিচক্ষণতায় বিস্মিত মাতা বলে উঠল—ঠিক ঠিক ঠিক।

ঠিক সেই সময়ে আফিসে হরিহরের মাথার উপর পড়ে একটা টিকটিকি সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠল টিক টিক টিক।

পাশের টেবিলের অতুলবাবু সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল, চাপা ঈর্ষায় জিজ্ঞাসা করলো আরও টিকিট কিনেছেন নাকি মিঃ রায়।

হরিহর কথাটার তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বলে উঠল ভাবছি কিনবো।

কিনুন কিনুন। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। বলবো কি মশায় আমার বাড়িতে একটা টিকটিকি থাকবার উপায় নেই।

কেন ?

আমার স্ত্রীর বড় ভয়। বরঞ্চ সে বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকতে রাজি আছে। কিন্তু টিকটিকির ডাক শুনলে মূর্ছা যায়। ক্ষতি কি হয়েছে অতুলবাবু।

বাড়িতে না থাকলে মাথায় পড়বে কি করে।

রাতের বেলায় আহারান্তে কন্যা ও মাতা হরিহরকে নিয়ে পড়লো। আহারের ও রাত্রিবাসের নিমন্ত্রণ মনোরমার মাতা করেছিল। অভিজ্ঞ রমণী হিসাবে জানে গুরুতর বিষয় উত্থাপনের ভূমিকা হিসাবে এ দুটি আবশ্যক।

মনোরমার মা বলল, বাবা, বিয়ের সময়ে মনোরমাকে তো একরকম ফাঁকি দিয়েছ বললেই হয়, এবারে কিছু দাও।

হরিহর ইচ্ছা করলে বলতে পারতো—মনোরমার পিতৃকুলেই ফাঁকিটার সূত্রপাত। কিন্তু কিছুই বলল না, কেন না সে ভালো মানুষ।

এবারে মনোরমা বলল, আর মাকে একখানি ভালো বেনারসী দিতে হবে।

অতঃপর এই ত্রিভুজের মধ্যে যে চিত্তাকর্ষক কথোপকথন হল তা আমরা সংলাপ আকারে লিপিবদ্ধ করছি।

মা ॥ কী বা আর দেবে। সোনার যা দর।

এই ধরো এক জোড়া আড়াইপেঁচি, আর এক জোড়া ব্রেসলেট, আর এক সেই জড়োয়ার হার, দুল সীঁথি!

মনোরমা ॥ আর মার জন্যে শাদা বেনারসী

আর আমার জন্যে রেশমী বালুচরী শাড়ী।

মা ॥ আর ঘর সাজাবার জন্যে পালঙ্ক, লোহার আলমারী, ড্রেসিং টেবল।

মনোরমা ॥ ড্রয়িং রুমটার কথা ভুলো না।

সোফাসেট, বুক শেলফ্ এসব না থাকলে মুখ দেখানো চলে না।

হরিহর ॥ এ যে অনেক দাম।

মা ॥ কতই বা, হাজার চারেকের মধ্যেই কুলিয়ে যাবে--সব চেনা দোকান আমাদের।

হরিহর ॥ মাইনের টাকা তো খেতেই ফুরিয়ে যায়।

মা ॥ মাইনের টাকা দিয়ে এসব আবার কে করে?

হরিহর ॥ তবে!

মা ॥ পুঁজি ভাঙো। এইজন্মেই তো লোকে টাকা জমায়।

হরিহর ॥ আমার যে ওর দশ ভাগের একভাগও নেই।

মনোরমা ॥ বটে! (এই বলে সে সদম্ভে ব্যাঙ্কের পাশ বইখানা সম্মুখে নিক্ষেপ করলো)।

হরিহর ॥ এ কি, এ খাতা কোথায় পেলে?

মনোরমা ॥ লুকিয়ে রাখলেই লুকানো থাকে না।

মা ॥ ছিঃ বাবা, কথায় বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন, স্ত্রী কিনা অর্ধাঙ্গিনী, তার কাছে কি লুকোতে আছে।

হরিহর ॥ যা বলছেন সত্য। কিন্তু জমা যে মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

মনোরমা ॥ পঞ্চাশ টাকা। আমাদের কি চোখ নেই? না বি-এ, এম এ পাশ করিনি বলে সাধারণ অঙ্কটাও বুঝতে পারিনে।

হরিহর ॥ কি বুঝেছ?

মনোরমা ॥ নগদ পাঁচ হাজার টাকা। কি চুপ করে থাকলে যে।

হরিহর ॥ এ যে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। না হয় আর কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

মা॥ ছিঃ বাবা, নিজের আয় আর আয়ু কাউকে বলতে নেই।

মনোরমা॥ জিজ্ঞাসা আবার করবো কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পাঁচের পরে তিনটা শুন্য। একক দশক শতক সহস্র—তাহলেই পাঁচ হাজার দাঁড়ালো। কি ঠিক হল কিনা।

হরিহর॥ কিন্তু পঞ্চাশের পরে ঐ বিন্দুটা দেখতে পাচ্ছ না?

মা॥ লিখতে গেলে ওরকম কালির ছিটেফোঁটা পড়েই থাকে।

মনোরমা॥ বেশ তো, ওটাকে আর একটা শুন্য বলে যদি ধরাই যায়, তবে তো দাঁড়ালো পঞ্চাশ হাজার টাকা।

হরিহর॥ মনোরমা, ওটা দশমিক বিন্দু—দেশে এখন দশমিক প্রথা চলছে কিনা—ওর পরের শূন্য দুটো পয়সার অঙ্কের।

মনোরমা॥ আবার ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা। তুমি কি মানুষ না কি?

মা॥ ছিঃ বাবা, স্ত্রীর কাছে ভাঁড়াভাঁড়ি করতে নেই, শাস্ত্রে বলে ওতে মহাপাপ।

হরিহর॥ আপনি যা বলছেন সত্য কথা। কিন্তু কোন শাস্ত্র অনুসারেই তো পঞ্চাশকে পাঁচ হাজার করা যায় না।

মনোরমা॥ (ডুকরে কেঁদে উঠে বলল) মাগো, তোমরা জেনেশুনে কোন্ পাষণ্ডের হাতে আমাকে দিয়েছ। পাঁচ হাজারকে পঞ্চাশ বলে যে ফাঁকি দিতে চায়। (এই বলে সে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল)।

মা॥ অত জোরে নয় মনু, পুরানো গাঁথনি ফেটে যাবে।

মনোরমা॥ তুমি তো মা তোমার দেওয়ালের কথাই ভাবছ, আমার কপালের কথা কখনো ভেবেছ। আমার যে কপাল ফেটেছে।

মা॥ বাছা, ফাটা কপালে ওষুধ জোগাবার জন্যে জামাই আছে, কিন্তু আমার দেয়াল ফাটলে কে আছে বলো।

অতঃপর জামাতাকে মন্থন দণ্ডরূপে ব্যবহার করে কন্যা ও মাতা সংসার সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করলো। সেকালে সমুদ্র মন্থনে হলাহল উঠলেও অমৃত উঠেছিল বলে শোনা যায়—একালে কেবলই হলাহল। হরিহরের পিতৃকুল মাতৃকুল ইহকাল পরকাল প্রভৃতির ইতিহাস আর তার সঙ্গে মাতা ও কন্যার দুর্ভাগ্যের বিবরণ। মানুষ নাকি এমন প্রতারক হয় যে শাশুড়ী ও পত্নীর কাছে ধন গোপন করে পাঁচ হাজারকে পঞ্চাশ টাকায় পরিণত করবার চেষ্টা করে। উপায়ান্তর না দেখে শেষে বিনা দশমিক বিন্দুর অবতারণা করে। কে

তারা কি ধারাপাত পড়ে নি, কড়াকিয়া শতকিয়া—কোথায় এর মধ্যে দশমিক বিন্দু। মাতা ও কন্যা যখন উতোর চাপান ইতিহাস আবৃত্তি করছিল তখন নীরবে হরিহর ভাবছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের বিষময় পরিণাম। তার মনে হল কন্যা ও তস্যা জননী সামান্য দশমিক রহস্য অবগত থাকলে এমনটি হতো না। সাহসে ভর করে সে বলল এটা পঞ্চাশ কি পাঁচ হাজার কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন না। কাল সকালে ডেকে পাঠান পরেশবাবুকে (সেই মেসের ম্যানেজার)।

এই কথাগুলি শুনে মনোরমা বলে উঠল, তার চেয়ে খোঁজ নেবো তোমার আর কেউ আছে কিনা। মা, নিশ্চয় ওর রক্ষিতা আছে নইলে স্ত্রীর কাছে কেউ ধন গোপন করে না।

মা বলল—কথাটা মন্দ বলিস নি মনু, খোঁজ নিতে হবে। তা ছাড়া একবার উকিল মামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এর কোন প্রতিকার আছে কিনা।

মনোরমা॥ প্রতিকার বলতে যদি থাকে ফাইভোর্স (ডাইভোর্স) বলে ভেবে থাকো আমি তার মধ্যে নেই।

মা॥ আহা সে কথা কে বলছে! টাকাটায় তোর অধিকার আছে কিনা সেটা সাব্যস্ত হওয়া দরকার।

মনোরমা॥ যা বলেছ মা, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আজ রাতে ও না পালিয়ে যায়।

মা॥ পালালেই হল। দরজা বন্ধ করে রাখবো না।

তখন বাইরে থেকে হরিহরের শয়নঘরের দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত মনে মা ও মেয়ে গৃহান্তরে গিয়ে সুখ সুপ্তিতে নিমগ্ন হল।

শেষ রাতে কোনরকমে দরজা খুলে হরিহর বাড়ি থেকে বের হয়ে কলকাতা পরিত্যাগ করে চলে গেল।

আপনারা যদি মনোরমা ও তার মাকে না বলেন, তবে আপনাদের কানে কানে বলতে পারি যে হরিহর আজ বছর পাঁচেক হলো রুদ্রপ্রয়াগে আশ্রম স্থাপন করেছে। এখন তার নাম সহস্রানন্দস্বামী। বত্রিশ বছর সংসারে থেকে যে হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারেনি, পাঁচ বছরের সন্ন্যাসের ফলে তার চেয়ে অনেক জমিয়েছে। যে দশমিক বিন্দুটির অজ্ঞানতায় তার জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে—এখন সেই দশমিক প্রথা পাহাড়ীদের মধ্যে

প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি পাঠশালা খুলেছে। সব খরচ সে নিজে যোগায়। ছেলেদের নামমাত্র বেতন, মেয়েদের বেতন লাগে না।

তবে শোনা যাচ্ছে টাকার গন্ধ পেয়ে মনোরমা ও তার মাতা হরিহরের সন্ধানে অনেকদিন হল বের হয়েছে।

সুলতার বিয়ে

অনির্বাণ একজন বনেদী লেখক। তার লেখা সম্পাদকগণ চেয়ে নিয়ে আগ্রহ সহকারে ছাপে; প্রকাশকরা এবেলা-ওবেলা তার বইয়ের সংস্করণ ছাপতে ব্যস্ত; ছাপার কালি শুকোতে সময় পায় না, গ্রাহকে এসে লুফে নিয়ে যায়। সর্বোপরি তার লেখা না থাকলে পূজা সংখ্যার পত্রিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার লেখা এসে পৌঁছবার আশায় পত্রিকা-প্রকাশ বন্ধ থাকে, যেমন মন্ত্রীরা এসে না চাপা অবধি রেলগাড়ি ছাড়ে না। কাজেই অনির্বাণ রায়কে বনেদী লেখক না বলবো কেন!

এ হেন অনির্বাণ সম্প্রতি পূজা সংখ্যার জন্য লেখায় ব্যস্ত, বাঙালী লেখক মাত্রেই এখন ব্যস্ত, অনির্বাণ কিছু বেশী ব্যস্ত। গত ১৫ দিনে সে একান্নটি গল্প নামিয়েছে, আর একটি হলেই গল্পের বাহান্ন পীঠ সম্পূর্ণ হয়ে এবারের মতো পূজা সংখ্যার কাজ শেষ হয়। সেই শেষ লেখাটি এখন তার হাতে। এই পনেরো দিনে লেখার মেজাজে গিন্নীর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছে, গিন্নী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। পর পর তিনটি চাকর তাড়া খেয়ে চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ছেলে মেয়েরা কেউ ধমক কেউ কিল চড় খেয়েছে। পাড়ার লোকে নিশ্বাস রোধ করে গম্ভীর। অনির্বাণ রায় পূজা সংখ্যার রচনায় ব্যস্ত।

সন্ধ্যাবেলায় সে বাহান্নতম গল্পটির গোড়াপত্তন করেছে। এমন সময়ে কয়েকজন বন্ধু এসে টেবিলের চারপাশে চেয়ারে জাঁকিয়ে বসল। অনির্বাণ মনে মনে তাদের মুণ্ডপাত করল, কিন্তু বন্ধুরা উঠল না, গল্প আর বেশীদূর

অগ্রসর হল না। রাত্রি এগারো। নায়ক খাওয়াদাওয়ার পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, লেখা শেষ হলেও এখন শোয়া যায় না। ভাবলো একটু ঘুমিয়ে নিই, শেষ রাতে উঠে শেষ করে দিই। অসমাপ্ত রচনা টেবিলের উপরেই পড়ে রইল। অনির্বাণ নিদ্রিত।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল চেয়ারগুলো শূন্য নয়, লোক বসায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এরা কারা কেমন করে এলো কেন এলো শুধাবেন না গল্প শুনবেন শুনুন, আর তা ছাড়া আপনারা যতটা জানেন আমি যে তার চেয়ে বেশী জানি তা নয়। আটখানি চেয়ারে আটজন ব্যক্তি। আর এঁদের লোক বলা চলে না, কারণ চেহারায় ও পোশাকের বর্ণনা দিতে পারি। একজন বাদে সকলেই প্রৌঢ় বৃদ্ধ বলাই উচিত, কিন্তু বৃদ্ধকে বৃদ্ধ বলাই অন্যায়।

চেয়ার সারির প্রথমখানিতে যিনি উপবিষ্ট, তাঁর গোঁফ দাড়ি কামানো, মাথায় চারিদিকটাও কামানো, মাঝখানে সাদা কালো চুল, যেন একটা চুলের টুপি। গায়ে মোটা চাদর, পরনে মোটা ধুতি, পায়ে শুঁড় তোলা চটি। দ্বিতীয় ব্যক্তিরও মুখমণ্ডল গুম্ফ শ্মশ্রুরহিত, বর্ণ গৌর, মাথায় শালের পাগড়ি, গায়ে চাপকান, পায়ে নাগরা, নাকে মুখে চোখে খড়্গের ধার, ওষ্ঠাধরে সর্বদা যেন একটা চাপা হাসির আভাস। এঁদের তুলনায় তৃতীয় ব্যক্তির বয়স অনেক কম, ত্রিশ পার হয়েছে কিনা সন্দেহ। তিনি যুবক হলেও চেহারায় প্রেমাতুর ভাব, দিব্য ফরসা, গোলগাল বয়েব বয়ের [illegible] মুখ, গায়ে শাদা উড়ুনী। চতুর্থ ব্যক্তির চেহারা একটা রাজবহুমত [illegible] ভাব, যেন হিমালয়ের শৃঙ্গমালার মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা মুখে গুম্ফ শ্মশ্রু, মাথায় দীর্ঘ পক্ক কেশ গায়ে আগুলফ লম্বিত জোব্বা। পঞ্চম ব্যক্তি রঙটা তেমন গৌর নয়, দেহ [illegible] স্থূল, চিবুকে এক গুচ্ছ দাড়ি, যাকে ফ্রেঞ্চ কাট বলা হয়, গায়ে কোট, তার উপরে পাট করা চাদর। ষষ্ঠ ব্যক্তি গৌরবর্ণ হাস্যোজ্জ্বল মুখ, দাড়ি গোঁফ কামানো চেহারা। সপ্তম ব্যক্তি গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ, সুপুরুষ দাড়ি নাই তবে বেশ পুষ্ট গুম্ফ আছে, মুখে চোখে কৌতুক ও কৌতূহল মিশ্রিত। অষ্টম ব্যক্তির রঙটা গৌর নয়, মাথার চুল এলোমেলো, পাড় চওড়া, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবি, হাতে বাবুলাঠি।

প্রথমে সেই মাথার চারিদিক কামানো ব্যক্তি কথা বললেন আহা বেচারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, টেবিলের উপরে কাগজপত্তর দেখছি, এগজামিনের পড়া বোধ করি। আমার বন্ধু প্যারী সরকার আর হেয়ার সাহেবে মিলে কী

প্রথাই না সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

তাঁর কথা শুনে জোব্বাধারী ব্যক্তি বললেন, এ ব্যক্তি পরীক্ষার পোড়ো নয়, আজকালকার ছেলেরা পরীক্ষার জন্য ভাবে না, তার সহজ ব্যবস্থা তারা ক'রে নিয়েছে। এ লোকটা একজন লেখক, পূজার লেখা লিখতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

পূর্বোক্ত ব্যক্তি শুধালেন পূজার লেখা কিরকম। অন্য সময়ে কি লেখে না?

এবার শালের পাগড়ি উত্তর দিলেন, ওসব আপনি বুঝবেন না, আমাদের সময়ে ও উপদ্রব ছিল না। তখন পত্রিকার সংখ্যা মাসে মাসে বের হতো না, অনেকে গ্রাহকের টাকা নিয়ে কোন সংখ্যাই বের করতো না, আবার অনেক গ্রাহক বিনামূল্যে বছরের পর বছর পত্রিকা আদায় করে নিত। তখন সাহিত্য ছিল শখ, এখন ব্যবসা। এখন নিয়মিত সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করতে হয়, পূজা সংখ্যায় বিশেষ ব্যবস্থা।

উনি যা বললেন তার সাক্ষী আমি। ব্যবসার যুগে শখ ক'রে কাগজ বের করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। সকলে দেখলো বক্তা গুম্ফবান ষষ্ঠ ব্যক্তি।

এবারে শুড় তোলা চটিধারী প্রথমোক্ত ব্যক্তি বললেন, বুঝলাম সবই। বেচারাকে সাহায্য করা যায় না।

যায় বই কি, ওর অসমাপ্ত লেখাটা সবাই মিলে শেষ ক'রে দিলেই হয়।

বেশতো তুমি দাও না, উপন্যাস লিখে তুমি তো খুব নাম করেছ।

কেন, আপনার সীতার বনবাসখানাও তো উত্তম উপন্যাস।

পরিহাস করছ।

কি সর্বনাশ, আপনার সঙ্গে! আপনার লেখা পড়েই বাঙালী লিখতে শিখেছে।

বটে! আলালের ঘরের দুলাল পড়ে নয়।

শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়ায় দেখে জোব্বাধারী ব্যক্তি বললেন, এক কাজ করা যাক। আমরা সবাই অল্পবিস্তর লিখতে পারি। সবাই মিলে বারোয়ারি প্রথায় বেচারার লেখাটা শেষ করে দিই না কেন!

এ অতি উত্তম প্রস্তাব সকলে বলে উঠলেন।

চটিধারী ব্যক্তি বললেন, তার আগে জানা আবশ্যক ছোকরা কতদূর কি

লিখেছে।

সে তো জানতেই হবে। আচ্ছা তুমি পড়ো তো। বলে টেবিলের উপর থেকে লেখা কাগজগুলি নিয়ে জোব্বাধারী ব্যক্তি ষষ্ঠ ব্যক্তির হাতে দিলেন।

তবে শুরু করি বলে তিনি আরম্ভ করলেন।

গোড়াতেই লিখে রেখেছে অনির্বাণ রায়, তবে বুঝতে পারছি না গল্পের নাম না গল্প লেখকের নাম! মোদ্দা কথা ঐ শব্দ দুটির উপরে লেখকের ভরসা সবচেয়ে বেশী। যাক্ এবারে শুনুন:—

সুলতার স্বামী আজ প্রায় বারো বছর নিরুদ্দেশ। বিয়ের পরেই অনিমেষ যুদ্ধে যায়। প্রথমে গিয়েছিল বর্মায়, তারপরে সিঙ্গাপুরে, তারপরে আর কিছু জানা যায়নি। হঠাৎ একদিন সামরিক কর্তৃপক্ষ সময়োচিত দুঃখ সহকারে জানিয়ে দিল যে, অনিমেষ চৌধুরী missing, কিনা নিরুদ্দেশ। সে আজ প্রায় বারো বছর হতে চলল। তখন সুলতার বয়স ছিল ষোল, এখন আটাশ, তখন সে ছিল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, এখন চাকুরি করে এক কলেজে, থাকে বাপের বাড়িতেই, শ্বশুরের অবস্থা তেমন ভালো নয়। সুখে দুঃখে এক রকম চলে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে সুলতার পিতার মনে হল মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়া উচিত। স্ত্রীকে রাজী করতে কিছু বেগ পেতে হল। অবশেষে সুলতার মা যখন রাজী হলেন প্রস্তাব শুনে সুলতা একেবারে বেঁকে বসল। না, না, না, কিছুতেই সে বিয়ে করবে না। হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ কি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। বিনোদিনী কি বিয়ে করেছিল?”

সপ্তম ব্যক্তি জোব্বাধারীর দিকে তাকাল।

জোব্বাধারী বললেন, কেন দামিনী?

শুনুন, “কেন রমা কি বিয়ে করেছিল?”

সকলে সপ্তম ব্যক্তির দিকে তাকাল।

তিনি বললেন, কেন কখন?

“সুলতা ভাবলো কুন্দনন্দিনীর দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার কি বিষময় ফল।”

কুন্দনন্দিনীর কৃতকার্যের জন্য কি আমি দায়ী! সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? বক্তা শালের পাগড়ীধারী ব্যক্তি।

আলবত বিবাহ হবে, এক শ' বার বিবাহ হবে, কারণ শাস্ত্রেই আছে

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে। আইন পাশ হয়েছে, আমার ভাই শম্ভু বিধবা বিবাহ করেছে, আমার ছেলে নারায়ণ বিধবা বিবাহ করেছে, আরও শত শত হিন্দু বিধবার বিবাহ হয়েছে, সুলতা ও হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি, এই যার বরের মতো চেহারা সে বলল, আচ্ছা ওসব তর্ক পরে শুনবো, এখন পড়ুন আর কি লিখেছে শুনি।

আর কিছু লেখেনি, এই পর্যন্তই লিখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শালের পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তি বললেন, তবে নিন আপনি ওর পর থেকে শুরু করুন।

আমাকেই আগে লিখতে হবে, আচ্ছা তবে তাই হোক এই বলে তিনি কাগজখানা টেনে নিলেন। এ তোমাদের কলের কলমে আমার সুবিধা হয় না।

খাগের কলম আর কোথায় পাবেন, যুগটাই কলের, ওতেই যা হয় করুন।

তখন তিনি মুঠ কলমে ফাউন্টেন পেন ধরে খস্ খস্ করে লিখতে লাগলেন। মিনিট দশেক লিখে মাথা তুললেন, বললেন নাও হয়েছে, আর মাথায় কিছু আসছে না, পড়ে দেখো শ্রাদ্ধ কতদূর গড়িয়েছে।

ওটাও আপনি সারুন, আপনিই পড়ুন।

আমাকেই পড়তে হবে, আচ্ছা। তিনি পড়তে শুরু করলেন—

'সুলতার পিতা কহিলেন, বৎসে, তুমি আমাদের নয়নের মণি, আদরের ধন তোমার দুর্ভাগ্য আমাদের দুঃখের অবধি নাই। যতকাল আমি ও তোমার মাতা জীবলোকে আছি সেই সন্তাপে দগ্ধ হইতে থাকিব, কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মৃত্যুর পরেও তোমার দুঃখে আমাদের হৃদয় সন্তাপিত হইতে থাকিবে। এখন চিন্তা করিয়া দেখ, পিতামাতাকে এই দুঃখানল হইতে উদ্ধার করা তোমার কর্তব্য কি না। সুলতা বিনীতভাবে বদ্ধাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, পিতঃ, আপনি ও জননী ঠাকুরানী আমার কাছে ভগবান ও ভগবতী, আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য! কিন্তু এরূপ অশাস্ত্রীয় আদেশ করিবেন না। কে না জানে যে হিন্দু বিধবার পক্ষে পুনরায় স্বামী গ্রহণ স্বামী হত্যার তুল্য।

পিতা কহিলেন উত্তম, যখন শাস্ত্রের কথাই তুলিয়াছ, তখন সেই বিচার হউক। দেখ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবারিধি মন্থন করিয়া প্রমাণ

করিয়াছেন স্বামী যদি মৃত হয়, সন্তানোৎপাদনে অক্ষম হয় এবং প্রব্রজিতে অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয় তবে রমণীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত।

সুলতা বিনীতভাবে কহিল, পিতঃ ক্ষমা করিবেন। আপনার শ্রীচরণ তলে বসিয়া কিছু কিছু শাস্ত্রালোচনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ঐ যে প্রব্রজিতে শব্দের অর্থ করিলেন নিরুদ্দেশ, তাহা কি শাস্ত্রসম্মত। তিনি তো প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই।

পিতা বিগলিত আনন্দাশ্রুলোচনে কহিলেন, ধন্য, ধন্য পুত্রী। তোমার মতো বিদুষী কন্যার পিতা হইয়া সৌভাগ্যবান হইয়াছি। সত্যই প্রব্রজিত শব্দের অর্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ, কিন্তু তাহা প্রাথমিক অর্থমাত্র। পরবর্তীকালে অর্থব্যাপ্তিতে নিরুদ্দেশ দাঁড়াইয়াছে, কাজেই উহাও শাস্ত্রসম্মত।

সুলতা কহিল, পিতা আপনার তুলনায় আমি কীটাণুকীট, আপনার সঙ্গে শাস্ত্র ব্যাখ্যায় পারিয়া উঠিব সাধ্য কি! শাস্ত্র যদি সম্মত হয়, তবু মন যে সম্মতি দান করে না। ঐ যে বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, তিনি তো শুধু পণ্ডিত নন, তিনি দয়ার সাগরও বটে।

বৎসে দয়ার সাগর বলিয়াই তিনি হিন্দু বিধবার দুঃখে গলদশ্রু হইয়াছিলেন। বলেন, অকাল বৈধব্য অশেষ দোষের আকর। কুলত্যাগ, ভ্রূণহত্যা কত না মহাপাতক ঐ আকর হইতে সৃষ্টি হইতেছে। শাস্ত্র-সম্মতভাবে পত্যন্তর গ্রহণ উহার একমাত্র প্রতিকার। আর যদি শাস্ত্রা-নুশাসনে মন না সাড়া দেয় তবে ইহাকে পিতার আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবে। স্মরণ রাখিও যে পিতার আদেশে রামচন্দ্র বনবাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। পিতৃ আদেশ সুসন্তানের পক্ষে অলঙ্ঘ্য।

সুলতা উত্তর দিল না, নতমুখী হইয়া উপবিষ্ট রহিল।

তখন পিতা কহিলেন, বৎসে, অনেক বেলা হইয়াছে, মার্ত্তণ্ডদেব মধ্যগগনারূঢ় হইয়াছেন, ক্ষুৎতৃষ্ণায় তোমার মন এখন বিকল, যাও এখন স্নানাহার সমাপন কর, পরে পুনরায় আলোচনায় বসিব।

তখন সুলতা বিনীতভাবে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া ধীরে পদে স্নান গৃহে প্রবিষ্ট হইল।

পাঠ শেষে লেখক মাথা তুলে বললেন, ওঃ অনেকটা লিখে ফেলেছি, নাও, এখন তোমার হাতে শ্রাদ্ধ গড়াক—এই বলে তিনি কাগজখানা শালের

পাগড়ীধারী ব্যক্তির দিকে অগ্রসর ক'রে দিলেন।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি, লিখিত অংশ পাঠ সমাপ্ত ক'রে শুধালেন, কেমন লাগল।

সেই বরতুল্য ব্যক্তি বললেন, আহা কি মধুর! তুমি কি বলো হে—এই বলে লেখক সেই এলোমেলো চুল অষ্টম ব্যক্তির দিকে তাকালেন।

জুতিয়ে ছেড়েছেন স্যার, জুতিয়ে ছেড়েছেন।

বৃদ্ধ রাগতভাবে বললেন, তার মানে? কে কাকে জুতো মারল?

আপনি মেরেছেন আর কার এমন সাহস আছে।

বিন্দুটা খুশী হয়ে বলেন, কাকে মারলাম হে জুতো।

পাঠক সমাজকে। আমাদের রচনায় যদি এমনভাবে বিধবা বিবাহের পথে ওকালতি করত তবে পাঠক ক্ষেপে উঠত, বই বিক্রি বন্ধ হতো, প্রকাশক আর বই ছাপত না।

আজকাল অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে নাকি?

তা ছাড়া আর কি বলবো স্যার। দেখুন না, রোহিণী, বিনোদিনী, ননীবালা, রাজলক্ষ্মী, রমা, সাবিত্রী কারো এমন বুকের পাটা হল না যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে।

তার মানে লেখকদের সাহসের অভাব।

ও একই কথা হল, বক্তা সেই ষষ্ঠ ব্যক্তি যার নাকি পুষ্ট গুম্ফ ও প্রশস্ত ললাট।

জোব্বাপরিহিত ব্যক্তি এবারে বললেন, আগে গল্পটা শেষ হয়ে যাক, তারপরে আলোচনা, ডাক্তারের পালা শেষ হলে উকীলের সওয়াল। নিন আপনি।

শালের পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তি বললেন, তবে আমাকেই এখন লিখতে হবে। তিনি কাগজ টেনে নিয়ে মাথা নীচু করে মিনিট পনেরো লিখলেন, মাথা তুলতেই সকলেই বললেন, পড়ুন পড়ুন।

মুণ্ডিত গুম্ফ শ্মশ্রু হাস্যোজ্জ্বল মুখ সপ্তম ব্যক্তি বললেন, দেখা যাক কি দাঁড়ালো। বিষবৃক্ষ না চোখের বালি না শ্রীকান্ত।

পড়া শুরু হল।

'সুলতা স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া একখানা জলচৌকির উপরে

বসিয়া মাথায় জল ঢালিতেছে। কিন্তু হাত দিয়া অনুভব করিলে দেখা যাইবে যে ঐ জলের মধ্যে একটি উষ্ণ ধারা আছে। সুলতা কাঁদিতেছে। কুন্দনন্দিনী বাপীতীরে বসিয়া কাঁদিতেছে, রোহিণী বারুণীর ধারে বসিয়া কাঁদিয়াছিল তবে সুলতা কেন চৌবাচ্চার কাছে বসিয়া না কাঁদিবে। কুন্দনন্দিনী ঘাসের উপরে বসিয়া কাঁদিয়াছিল, রোহিণী ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া কাঁদিয়াছিল তবে সুলতা কেন জলচৌকির উপরে বসিয়া না কাঁদিবে। কোথায় শ্যামল ঘাস ও পাথরের সিঁড়ি আর কোথায় কাঁঠাল কাঠ নির্মিত জলচৌকি। দিনে দিনে এই প্রভেদ ঘটিয়াছে। দিন বসিয়া থাকে না। তুমি সুখী, তোমার ও দিন যাইবে, তুমি দুঃখী তোমারও দিন যাইবে; তুমি নূতন সম্পত্তি অর্জন করিবে তোমারও দিন [illegible] সম্পত্তি [illegible] তোমারও দিন যাবে। দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না, সুখী হোক দুঃখী হোক সকলেরই দিন যায়। [illegible] একটি দিন তাহার যাইবার মুখে, জলচৌকীতে বসিয়া চোখের জলের সহিত মিশাইয়া চৌবাচ্চার জল মাথায় ঢালিবার সময় [illegible] আর একটি দিন যাইবার মুখে।

হায় জলচৌকী, তুমি কত না সুখ দুঃখের নীরব সাক্ষী। কত না জনে তোমার উপরে বসিয়া কুন্দ শুভ্র আনন্দের হাসির সঙ্গে মিশাইয়া মাথায় জল ঢালিয়াছে, আবার কত না জনে তোমার উপরে বসিয়া দরবিগলিত নয়নাসার সহিত মিশাইয়া মাথায় জল ঢালিয়াছে। কত না জনের কুসুম তুল্য দেহভার তোমার কাছে আদৌ ভার মনে হয় নাই। ভাবিয়াছ, বসিল যদি তবে আবার ওঠে কেন! আবার কত না জনের মেদবহুল মাংসপিণ্ডের পেষণে ভাবিয়াছ, যদি বসিল তবে ওঠে না কেন? যখন তুমি সজীব কাঁঠাল গাছের অংশরূপে কোন বাগানে বিরাজমান ছিলে সেদিনে আর এদিনে কত প্রভেদ! কিন্তু সত্যই কি খুব দুস্তর প্রভেদ। সেদিন তোমার শাখায় বিরহী পাখি বসিয়া আর্তনাদ করিয়াছে, আর আজ বিরহণী সুলতা বসিয়া টার্কিশ বাথসোপ মাখিতে মাখিতে নীরবে আর্তনাদ করিতেছে। তবু বোধ হয় আজকার দিনটাই ভালো, কেন না স্নান সাঙ্গ হইয়া গেলে সুলতা তোমাকে সযত্নে তুলিয়া রাখে; পাখি উড়িয়া চলিয়া

যাইবার সময়ে ফিরিয়াও তাকাইত না। আহা জলচৌকি, তুমি নিরুদ্ধ স্নানাবজ্ঞাশ্রয়ী মানুষের একান্ত নির্ভব।

পাঠক মহাশয়ের বোধ করি এ বর্ণনাটুকু বড় ভালো লাগিল না। তা আমি কি করিব। গল্প লিখিতে বসিলে মাঝে মাঝে এমন বসন্তের কোকিল বা কাষ্ঠনির্মিত জলচৌকিব বর্ণনাব প্রয়োজন হয়, ঐ সময়ে গল্প ভাবিয়া লওয়া যায়।

এমন সময়ে সুলতা শুনিতে পাইল মা ডাকিতেছেন।

সুলতা মা শীঘ্র বাহিরে আইস, তোমার শ্বশুব বাড়ি হইতে জরুরী সংবাদ আসিয়াছে। সে ত্বরায় গাত্রমার্জনা ও বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া বাহির হইল।

এ আবার এক শ্বশুর কোথা থেকে আমদানী করলে হে—বক্তা সেই চুলের টুপি পরা প্রথম ব্যক্তি।

দিলাম এক গুরুতর সমস্যা। নিন এবারে আপনি। দেখা যাক নক্সা কিরকম দাঁড়ায়।

সেই বরতুল্য ব্যক্তি লিখতে আরম্ভ করলেন, লেখা শেষ হ'লে পাঠ করলেন।

শ্বশুর বাড়ি থেকে পত্তর এসেছে বটে, তবে খোদ শ্বশুর পাঠাননি, তাঁর পক্ষে পাঠানো সম্ভব নয়। তিনি ধরাধামে পটল তোলা-সাঙ্গ করে এখন বৈকুণ্ঠে গিয়ে পটল তুলছেন। পত্তর পাঠিয়েছে তাঁর ইস্তিরি। সুলতার ছোট ননদের বে তাই তাকে একটিবার পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন তার বাপকে।

পত্তর এয়েছে শুনে সুলতা ভেবেছিল বুঝি বা পূবের সূয্যি পশ্চিমে উঠেছে, অনিমেষের বুঝি বা খবর এয়েছে। ঐটি তার সোয়ামীর নাম। সে একা বিছানায় শুয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। এইমাত্র ন'টার তোপ গুপুস ক'রে পড়ে গেল। এখন আবার বুঝি তোপ পড়ে না, কোম্পানীর রাজত্বের বিদায়ের সঙ্গে ওটাও গিয়েছে। বালাই গিয়েছে।

ওদিকে রাস্তায় একদল উনপাঁজুরে জুটে হৈ হল্লা ক'রে ভেঁপু বাজিয়ে 'ভোট ফর' হাঁকছে। কার জন্যে ফর, কেউ বুঝতে পারছে না, ঐ ভোট ফর শুনেই সকলে খুশি। এমন সময়ে রাস্তার মোড়ে শ্মশানযাত্রীদের রব উঠল হরিবোল। সেই বিকট আওয়াজে ভড়কে গিয়ে কাঁদুনে খোকা চুপ করল, ঘুমুনে শিশু জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করল, বুড়োবুড়ীর পিলে চমকে

চমকে উঠতে লাগল, দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে পেন্নাম ক'রে মনে মনে বলল, মা, আমার ঐ দিনটা যেন শীগ্‌গীর না আসে। এদিকে ভোট ফরের গাজুনে সঙের দল হরিবোল রব শুনে ভাবলো ওরা বুঝি আর একজনের জন্য ভোট ফর হাঁকছে। তখন তারা দশদিন চোরের একদিন সেঠের বলে তাড়া করল। তাই না দেখে হরিবোলের দল ঐ রে মাতালে তাড়া করছে, কামড়ে দেবে বলে মড়া ফেলে চোঁ চাঁ বাড়ির পানে ছুটল। ইতিমধ্যে ভোট-ফরেরা এসে দেখল এক বেটা শুয়ে আছে। তারা দাবী করল বেটা বল্ আমাদের দলকে ভোট দিবি কিনা। উত্তর না পেয়ে একজন বলল দেখোনা বেটা মরার ভান ক'রে রয়েছে। তখন সকলে মিলে বলল বেটার রকম সকম দেখো, মরার ভান ক'রে প'ড়ে রয়েছে, দে বেটার কান ধরে তুলে। কান ধরে টানতেই মড়া খানিকটা উঠে ধপাস ক'রে প'ড়ে গেল। ওরে এ যে সত্যি মড়া! বেটা ভোট দিয় না হয় মরতিস। একজন বলল ভাই মড়া ছুঁয়েছিস হরিনাম কর নয়তো ঘাড়ে চাপবে। তখন সকলে ভয় পেয়ে হরিবোল রব করতে করতে ছুটল।

এদিকে বিরহিণী সুলতা জানালার কাছে বসে সব শুনছিল, কতক দেখছিল। মড়ার কাণ্ডটি ঘটল তার জানালার নীচেই। সে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, আচ্ছা আমার মৃত্যু হয় না। তখনি মনে পড়ল মা বলেছিল কালকে আমচুর দিয়ে অড়র ডাল রাঁধবে। ভাবল মৃত্যুটা যেন তার পরেই হয়। মৃত্যুকে যে ওয়াদা করে তার মরণ শীঘ্র হয় না।

পড়া শেষ করে লেখক শুধালেন কেমন হল?

শালের পাগড়ী বললেন, এ হুতোমকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, একেবারে কালপেঁচার নক্সা।

জোব্বাধারী বললেন, বাংলা ভাষার যে এত তোড় কে জানতো। বাদবিচার না ক'রে ভালমন্দ সমস্ত শব্দকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

এবারে তো আপনাকে লিখতে হয় বললেন অষ্টম ব্যক্তি।

জোব্বাধারী ব্যক্তি কিছু না বলে কাগজগুলো নিয়ে পঞ্চম ব্যক্তির হাতে দিলেন, সেই যার রঙটা কালো চিবুকে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির গুচ্ছ।

বেশ, বলে তিনি কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখ ষষ্ঠ ব্যক্তি বললেন, দেখা যাক কি হয় নব কথা না ষোড়শী।

তাঁর লেখা শেষ হ'তেই সকলে মিলে বলে উঠল, পড়ুন পড়ুন।

"শ্যামবাজারে আদ্যনাথ বসুর গলির একটি বাটীর দ্বিতল কক্ষে এক যুবক ঘন ঘন পায়চারি করিতেছিল। যুবক বলিষ্ঠ, দোহারা চেহারা, রঙ শ্যামবর্ণ, বয়ঃক্রম অনুমান দ্বিত্রাংশৎ বৎসর। এক দিকে আর একটি যুবক চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল, তাহার গায়ে কোটের উপরে উড়ুনি।

সেই যুবকটি বলিল, অনিমেষ একবার সব দিক চিন্তা করিয়া দেখ, একবার হঠকারিতা করিয়ে পশ্চাত্তাপ অনুভব করিবে।

অনিমেষ বলিল কেন?

পূর্বোক্ত যুবক বলিল, একবার আমাদের পরামর্শ না শুনিয়া হঠকারিতায় যুদ্ধে গমন করিলে এখন অনুতাপ করিতেছ।

অনুতাপ করিতেছি এই জন্য যে আমার মৃত্যু হয় নাই।

কেন? বা কি হইয়াছে? দ্বাদশ বৎসর বনবাসান্তে বাড়িতে ফিরিলে। ইতিমধ্যে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, পত্নী পিতৃগৃহ নিবাসিনী ও জীবন্মৃতু। কোথায় তুমি সোজা তাহার কাছে যাইবে, না নানারূপ বাহানা তুলিতেছ।

বাহানা কি অকারণে তুলিতেছি। কেমন করিয়া জানিব যে সে ইতিমধ্যে দ্বিচারিণী হয় নাই।

আজকাল তো দ্বিচারিণী হইবার প্রয়োজন নাই, যেমন আইন হইয়াছে স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিতে পারিত।

আজ শ্বশুর মহাশয়ের কাছ হইতে মাতৃদেবীর কাছে যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে তো তাহার বিবাহেরই আভাস আছে।

তাহাতেই তোমার বোঝা উচিত যে, সে দ্বিচারিণীও নয় আর বিবাহও করে নাই।

এবারে করিবে।

দ্বিতীয় যুবক রাগতভাবে বলিল, অনেক আগেই করা উচিত ছিল। স্বামী বারো বছর নিরুদ্দেশ, মৃত বলিয়াই গণ্য, সে যুবতী, রূপসী ও বিদুষী এমন অবস্থাতেও যে সে বিবাহ করে নাই তাহাকে ধন্য ধন্য বলিতে হইবে।

বেশ ভাই তোমার কথাই স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার আগে তাহাকে একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

কি, অগ্নিপরীক্ষা করিবে নাকি! তাহা হইলে যে তোমাকে রামচন্দ্র

হইতে হয়।

এত দুঃখেও অনিমেষের হাস্যরসবোধ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। সে বলিল, কেন, আমি কি রামচন্দ্রের মতো যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিতেছি না।

তবে আইস রামচন্দ্রের মতো কুল পুরোহিত বশিষ্ঠের সঙ্গে পরামর্শ করো।

তখন দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আমরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ সারিয়া লই।

অনিমেষ ১৯৪০ সালে যুদ্ধে যায়। প্রথমে যায় বর্মায়, সেখান থেকে মালয়ে। তারপরে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন এক ক্ষুদ্র দ্বীপে। ঐ মহাসমুদ্রে এমন অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, যাহাদের উল্লেখ কোন মানচিত্রে নাই, সেই রকম একটি দ্বীপে সে প্রেরিত হয়। জাপানীদের সঙ্গে সেখানে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। যথাকালে সমস্ত জাপানী মরিয়া নিঃশেষ হইয়া গেলেও সেখানে সে থাকিতে বাধ্য হয়; কারণ, তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার কথা কাহারো মনে পড়ে না। অবশেষে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল তবু তাহারা সেখানে রহিল। জাপানী নিঃশেষ হইয়া গেলে তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল, কেননা বীরত্ব একবার মাথায় চাপিয়া গেলে সহজে নামিতে চায় না। ইতিমধ্যে অনিমেষের বাড়িতে সংবাদ আসিল সে নিখোঁজ—ওটার সহজ অর্থ মারা গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া সুলতা বাপের বাড়ি চলিয়া আসিল। তাহার পরবর্তী ইতিহাস আগেই বলা হইয়াছে। এবারে আবার অনিমেষ ও তাহার বন্ধু রমেশের কাছে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে।

অনিমেষ কহিল, রমেশ তুমি এক কাজ কর না কেন। গুরুচরণবাবুদের বাড়িতে যাও, সেখানে তোমাকে কেহ চেনে না। তুমি গিয়া গুরুচরণবাবুকে বল যে, শুনিলাম আপনার কন্যার আবার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন? আমার হাতে সর্বগুণোপেত এক পাত্র আছে। দেখো, তাহারা কি বলেন। অবশ্যই তাঁহারা সুলতাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাদের মুখে সুলতার মনের কথা জানিতে পারিবে। সুলতা যদি এখনো আমার প্রতি অনুরক্ত থাকে তবে অবশ্যই বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবে।

রমেশ কহিল, তুমি মন্দ বলো নাই। কিন্তু মুশকিল এই যে, সুলতার বাবা প্রবীণ লোক তাঁহার সঙ্গে ছলনা করিতে মন চায় না।

তাহার প্রয়োজন হইবে না। গুরুচরণবাবু অন্য মাকে পত্র প্রেরণ

করিয়াছেন যে, তিনি কয়েকদিনের জন্য কাশী চলিলেন। কাজেই তুমি গিয়া দেখা পাইবে সুবীবের, সে সুলতার ভাই। তাহার সঙ্গে সত্নদ্দেশ্যে এই ছলনাটুকু করিতে বাধা নাই।

না তাহা নাই। তবে সেই কথাই রহিল, আমি সেখানে চলিলাম, ফিরিয়া আসিয়া ফলাফল তোমাকে অবগত করাইব।

এই পর্যন্ত লিখিয়া তিনি পাঠ সাঙ্গ করিলেন, নিন এবারে কে লিখিবেন আসুন

তখন সপ্তম ব্যক্তি সেই যার প্রশস্ত ললাট ও পুষ্ট গুম্ফ বললেন, আমাকে দিন। আমি আবার আপনাদের মত গল্প বুনতে পারি না। আমি যে দু'চারটে গল্প লিখেছি তা গল্পে প্রবন্ধে মিলন একপ্রকার বস্তু। এই বলে কাগজ টেনে নিয়ে তিনি কিছুটা লিখে পাঠ করলেন।

"ওদের দেশে মানে সুয়েজখালের পশ্চিমে লোকে বিবাহ করে, আমাদের দেশে বিবাহ হয়, বিবাহে ওরা নিষ্ক্রিয়, আমরা সক্রিয়। ওদের বিবাহে আছে লজিক, আমাদের ম্যাজিক। তবে ব্যুৎপত্তিগত বিচারে আমাদের বিবাহটাই সার্থক। বি পূর্বক বহ্ ধাতুর উত্তরে সঙ এই হল বিবাহ। অর্থাৎ বিশেষভাবে বহন করা। আমরা বলদের মত পিঠে বোঝা বহন করি, বোঝায় চিনি আছে কি তুলো আছে কি কয়লা আছে আমরাই সবচেয়ে কম জানি। আমাদের কাছে বিবাহ আর্ট, আট প্রকার বাঁধনে আমাদের বাঁধে, ওদের কাছে বিবাহ সায়ান্স, ওদের সারা জীবন ছেয়ে আছে বিবাহের রস। আমাদের বিবাহ পারিবারিক, পরিবারের মধ্যে এনে নামাই পুঁটুলির মত বধূকে, সেই সঙ্গে টাকার পুঁটুলি, ওদের বিবাহ ব্যক্তিগত, ব্যক্তি সেখানে ব্যক্তিকে লাভ করে। আমাদের বিবাহ ক্লাসিক, কিনা সংক্ষিপ্ত আর সবল, ওদের বিবাহ রোমান্টিক, রোমে রোমে তার আনন্দ। তবে অনিমেষের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ আছে তাতে লেগেছে রোমান্সের রস। অদৃষ্ট ছিনিমিনি খেলেছিল তার ভাগ্য নিয়ে এবারে সে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত তার বধূকে।"

নিন এবারে কে নেবেন।

দিন তো দেখি কতদূর কি করতে পারি, আমি ওঁরই মত একজন কৃষ্ণ-নাগরিক, গল্প বুনতে তেমন জানি না, লিখিনি কখনো। তবে খানকতক নাটক লিখেছি, সহজেই কিছু ডায়োলগ ছাড়তে পারবো, বললেন সেই ষষ্ঠ ব্যক্তি যাঁর মুণ্ডিত গুম্ফ শ্মশ্রু হাসোজ্জ্বল মুখমণ্ডল।

করছে। —জানো জগৎ সিংহ আমি কে? জানো না, তবে শোনো। আমি ঝঞ্ঝা, আমি ধূমকেতু, আমি কালবৈশাখীর অকাল প্রলয়, আমি গঙ্গায় কোটালের বন্যা, সমুদ্রের টাইফুন, ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাত, আমি হাওড়ার পুল, জলে ভেসে যাওয়া কলকাতার রাজপথ আমি, আমি—

শঙ্কিত সুবীর বলিল, আপনার পরিচয় বুঝিতে পারিয়াছি, পিতা প্রত্যাবর্তন করিলে দয়া করিয়া আসিবেন।

বেশ তাই আসিব, সংবাদ দিতে ভুলিবেন না। তারপরে বলিল, আমার উক্তি প্রত্যুক্তি শুনিয়া বোধ হয় আশঙ্কা করিয়াছেন আমার মাথা খারাপ! না, মহাশয়, আমার মাথা আপনার ও দশ জনের মতোই ঠিক আছে। তবে কেন এমন বলিলাম! আসল কথা কি জানেন, কোন একটা কঠিন সমস্যা বুঝাইতে হইলে এইভাবেই বুঝাইতে হয়। নয়তো লোকে বুঝিবে কেন? আর বুঝিলেও সমস্যাটি যে কঠিন সে বোধ হইবে কি প্রকারে! বিশ্বাস না হয় বাংলা নাটক পড়িয়া দেখিবেন। আচ্ছা আজ আসি, নমস্কার, খবর দিতে ভুলিবেন না।"

লেখক পাঠ সাঙ্গ করতেই অনেকে একযোগে বলে উঠল, এবারে তো আপনাকে লিখতে হবে।

তখন সেই জোব্বাধারী ব্যক্তি বললেন, আচ্ছা, দেখা যাক কতদূর কি হয়, আমার শরীরটা আজ আবার অপটু। এই বলে কাগজ টেনে নিয়ে উদাত্ত হয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে লিখতে শুরু করলেন।

"সুলতা শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে অতল বেদনা ঘনাইয়া উঠিতেছিল, পাশে ঝাউগাছটিতে হাওয়ার হাহাকার অনাদি-মধ্যে সেই নূপুরের ধ্বনি গুমরিয়া গুমরিয়া বাজিতে লাগিল। আর তাহারই তালে অনিমেষের স্মৃতি গুঞ্জরিত হইতে থাকিল। আজ যেন সেই দূরের মানুষ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ, তাহার ছোটখাটো কথাগুলি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কথাগুলি দিব্য মূর্তি ধরিয়া তাহার চোখের উপরে নাচিতে লাগিল। না, না, কিছুতেই পত্যুত্তর গ্রহণ তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কখন যে রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে সে বুঝিতে পারে নাই, যখন ভোরের আলোর প্রথম আভাসে তারাগুলি একে একে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, একটা শীতল হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল শয্যা ত্যাগ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। কর্তব্য তাহার স্থির হইয়া গিয়াছে।

ভোর বেলাতেই রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। আগেই তাহাকে সংবাদ দিয়া দিয়াছিল সুবীর যে কাশী হইতে পিতা ফিরিয়াছে। রমেশ সুলতার পিতাকে প্রনাম করিয়া তাহার আগমনের কারণ নিবেদন করিল। তিনি বলিলেন, আপনি, আমি সুলতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি—এই বলিয়া তিনি পাশের ঘরে গেলেন।

মা, কি উত্তর দেব বলো।

প্রথমে কিছুক্ষণ সুলতা কথা বলিতে পারিল না, অবশেষে নিরুদ্ধ আবেগে চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, বাবা, আমি কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছি না, আমাকে ক্ষমা করুন। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পাশের ঘরেই পিতা ও কন্যায় কথা হইতেছিল রমেশ শুনিতে পাইল। সে আর অপেক্ষা করিল না ছুটিয়া চলিয়া গিয়া অনিমেষকে সমস্ত জানাইল। সুলতার পিতা আসিয়া দেখিলেন যে রমেশ নাই।”

—দিন আমার শেষ হয়েছে। সকলের অনুরোধে পড়া শেষ করিয়া বলিলেন, নাও এবার তোমার উপরেই শেষ করে ফেলার ভার।

কেহ কেহ বলিল, দেখা যাক এবারে শেষের পরিচয়টা কি রকম পাওয়া যায়।

অষ্টম ব্যক্তি সেই যাঁর এলোমেলো চুল তিনি আরম্ভ করিলেন।

“কিছুক্ষণের মধ্যে অনিমেষ প্রবেশ করিল, তখনো সুলতার পিতা সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সুলতা মা শীগগীর এসো, দেখো কে এসেছে। সুলতা ঘরে ঢুকিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চোখে আঁচল চাপিয়া গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু পারিল না মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অনিমেষ তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ঠিক সেই মূহুর্তে পাশের বাড়ীতে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিল।”

সকলে শুনে বলল, বাঃ শেষ প্রশ্নের চমৎকার সমাধান।

প্রথম ব্যক্তি বল্‌লেন এদিকে বিধবা বিবাহ সমর্থন করা হল অথচ বিবাহ দিতে হল না, শ্যাম ও কুল দু-ই বজায় থাকলো। চমৎকার! এ আমাদের সমাজেরই যোগ্য বটে।

শালের পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তি বললেন, চলুন এবারে যাওয়া যাক, ভোর হয়ে এসেছে, এখনি লেখক জেগে উঠবে।

মূর্তিগুলি মিলাইয়া গেল।

অনির্ব্বাণ তাড়াতাড়ি জেগে উঠল, ওঃ এখনি লেখাটা শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু একি, সে এক পাতা মাত্র লিখেছিল, এতগুলো পাতা লেখা হল কি করে? কে লিখলো? অবশ্যই সে লিখেছে, রাতে ঘুমের ঘোরে লিখে ফেলেছে, এখন খেয়াল হচ্ছে না। এমন মাঝে মাঝে হয়ে থাকে বলে সে শুনেছে। কোলরীজের কুবলাই খাঁ কবিতা রচনারই ইতিহাস তার মনে পড়লো। গল্পটা আগাগোড়া পড়ে তার ভালোই লাগলো। আর কারো হাত দিয়ে এ জিনিস বের হত না।

গল্পটি সে সম্পাদকের দপ্তরে দাখিল করল এবং যথা সময়ে পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

গল্পটি পাঠ করে পাঠক সমাজ একবাক্যে স্বীকার করল, এটি এবারকার পূজাসংখ্যা সমূহের শ্রেষ্ঠ রচনা। বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ বললো, না হবে কেন পড়তে পড়তে মনে হয় বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র অবধি যেন একযোগে কলম ধরেছেন।

খুঁৎ

বছরখানেক পরে বরদাবাবু বাড়িতে এসে নির্দিষ্ট আরামকেদারায় হাত পা ছড়িয়ে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, হাঁক দিলেন, রামচরণ, ভালো করে চা তৈরি করে নিয়ে আয়। এই এক বছর কাল তিনি বাড়িছাড়া। নেপাল থেকে ভূপাল, গোরক্ষপুর থেকে মেদিনীপুর ঘুরে বেড়িয়েছেন মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধানে। অবশেষে পাত্র মিলেছে, একেবারে বাড়ির কাছেই মিলেছে, কিন্তু অদৃষ্টে বোধকরি ভ্রমণযোগ লিখিত ছিল, তাই বৃথা ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছেন। পাত্র দমদমে থাকে। কথা একেবারে পাকা করে এসেছেন, বরদাবাবু পাকা লোক।

চা ও গৃহিণী একসঙ্গে এসে উপস্থিত হল। বরদাবাবু বললেন, সব ঠিক করে এলাম, পাত্র দমদমে থাকে।

গৃহিণী বললেন, আমি আগেই জানতাম, সুখদার পাত্র কাছে ভিতেই কোথাও আছে।

এই বলে পাত্র প্রাপ্তির কৃতিত্বটুকু আত্মসাৎ করে স্বামীকে বললেন, আমি কতবার তোমাকে বলেছি, দূরে সন্ধান করবার প্রয়োজন নেই, তোমার কেবল ঐ অছিলায় শখের ভ্রমণ।

বলা বাহুল্য এ সব কথা তিনি আদৌ বলেননি, বরঞ্চ উল্টে গঞ্জনা দিয়েছেন একটু নড়ে চড়ে দেখো, পাত্র কি পাড়ার মধ্যে বসে আছে। বরদাবাবু দীর্ঘকাল বিয়ে করেছেন, এখন মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে স্ত্রীর কোন্ কথার উত্তর দেওয়া উচিত আর কোন্ কথার উত্তর দেওয়া উচিত নয়।

তাঁকে নীরব দেখে উত্তর পক্ষের অভাবে বিচলিত না হয়ে নিজেই পূর্বপক্ষ করে বললেন, সুখদার সিঁথিটা খাটো কিনা।

এ সব নারীশাস্ত্র পুরুষের অবোধ্য বিবেচনায় ব্যাখ্যা করে বললেন, লম্বা সিঁথি মেয়েদের দূরে বিয়ে হয়! বরদাবাবু একবার কটাক্ষে পত্নীর সিঁথিটা লক্ষ্য করে ভাবলেন, আহা, এ রকম দীর্ঘ সীমন্তিনী দূরে না গিয়ে কিভাবে তাঁর উপরেই নিক্ষিপ্ত হল, ভাবলেন, এরও বোধ হয় একটা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা আছে।

পত্নী এবারে প্রসঙ্গান্তর উপস্থিত করলেন, তারপরে কি রকম কী দেখলে।

বরদাবাবু ইতিমধ্যে তিন পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করে কিঞ্চিৎ বল লাভ

করেছেন, বললেন, তা ভালোই। পাত্ররা তিন ভাই, এটি ছোট। উপরের দুই ভাই কর্ম উপলক্ষ্যে বাইরে থাকে। দুটি বোন, তাদেরও বিয়ে হয়েছে, তারাও দূরে থাকে। বাপ মা দুজনেই বর্তমান। ছেলেটি লেখাপড়া জানে, ভালো কাজ করে!

পত্নী অবান্তর বাদ দিয়ে মর্মস্থান লক্ষ্য করে প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন—মাইনে।

তা হাজার টাকার মতো হবে।

উপরি অবশ্যই আছে।

না গো না, এ জজের পেশকারি নয় যে উপরি থাকবে।

পত্নী ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর প্রতিবাদের পথ বন্ধ। কেননা এক ভাই জজের পেশকারি করতো, উপরির দায়ে আদালতে সোপর্দ হয়ে চাকুরি খুইয়েছে এমন নিশ্চিত প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিরর্থক। তাই তিনি অপ্রিয় প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে শুধালেন—বাড়িটা?

নিজের।

স্ত্রী স্বগত হিসাব করলেন, ভাইবোনে পাঁচটি, পাঁচ ভাগ হবে, সুখদার ভাগে আর কতটুকুই বা পড়বে।

তা ভালোই পড়বে। পাঁচতলা বাড়ি।

কথা পাকা তো?

একেবারে পাকা।

তবু একটু গোপনে রেখো, তোমার মুখের তো আড় নেই, কথা চেপে রাখতে জানো না। আচ্ছা, আমি আসি।

বরদাবাবু লক্ষ্য করলেন মুহূর্ত মধ্যে বেশ পরিবর্তন করে পত্নী পাড়ায় বের হলেন। বরদাবাবু বুঝলেন যে মোক্ষদা (ঐ তাঁর পত্নীর নাম) কথা চেপে রাখতে জানেন।

২

এ হেন আয়াসলব্ধ সর্বজন কাম্য পাত্রেও খুঁৎ বের হয়েছে, বিয়ে প্রায় ভেঙে যায় মতো অবস্থা—পাত্র ইংরাজি জানে।

এবারে পাঠককে কিছু অবহিত করা অবশ্যক। আমরা এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পরবর্তী কালের কথা বলছি। পঞ্চাশ বছর হল দেশে ইংরাজি পঠনপাঠন আইনযোগে বন্ধ হয়েছে। পঞ্চাশ বছর মানে প্রায় দু জন্ম প্রজন্ম

কাল। কাজেই দেশ এখন ইংরাজি সম্বন্ধে প্রায় নিরক্ষর। দেশ ইংরাজি ভুলেছে, তবে মাতৃভাষাও শেখেনি—যদিচ এখন যাবতীয় শিক্ষা মাতৃভাষা-বাহিনী। কিন্তু হলে কি হয়। যে ব্যক্তি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না, সে মাতৃভাষাও জানেনা এ একটি নির্ভরযোগ সত্য। কিন্তু শাসক কর্তৃপক্ষ এত সহজে নিরস্ত হওয়ার লোক নয়। তারা শুধু মাতৃভাষাপ্রীতির উপরে আস্থা করতে পারেনি, তাই ইংরাজি জ্ঞানকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে জরিমানা থেকে শূলে দেওয়া হয়ে থাকে। ফাঁসিটা ইংরাজের আমদানি বিধায় বাদ পড়েছে, তার বদলে এসেছে শূল, ওটা বিশুদ্ধ ও সনাতন দেশজ ব্যাপার, প্রায় মাতৃভাষার সমতুল্য। ব্যক্তিগত ও গ্রন্থাগারগত ইংরাজি গ্রন্থসমূহ বনানলে (ওটা Bon fire-এর মাতৃভাষা) সমর্পিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি ইংরাজি জানলে সামাজিক একঘরে হয়, সরকারী বা বেসরকারী চাকুরি পায় না, এমন কি দণ্ডের মেয়াদ শেষ হলেও সেই অবস্থা। কাজেই এখন দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান ম্লেচ্ছ স্পর্শদোষ রহিত হয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ। দাশরথি রায় এখন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিকীর্তিত, কেননা রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি স্পর্শদোষে দুষ্ট, আর দাশরথি রায় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্মল নির্মুক্ত। মধুসূদনের স্থান এখন অধিকার করেছে ঘনরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গল কাব্যের মহাকবি। বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের যোগ্য ঔপন্যাসিক এখনো মেলেনি, তবে আশা হচ্ছে বেশি দিন শূন্য থাকবে না। ফলকথা, মাতৃভাষার ন্যাতা দিয়ে দেশটাকে আচ্ছা করে রগড়ে দেওয়া হয়েছে, ইংরাজি জ্ঞান ত্রাহি ত্রাহি বলে সুয়েজ খাল পার হয়ে দেশের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। দেশের আগাগোড়া অজ্ঞতার পর্দায় আচ্ছন্ন করতে রাজনীতিকগণের আনন্দ ধরে না। পেশাদার রাজনীতিকের মতো দেশের শত্রু আর নাই। ষোল আনা রাজনীতিক পনেরো আনা শয়তান।

সহৃদয় পাঠক, আমি মাতৃভাষার সেই সত্যযুগের কথা বিবৃত করছি! আপনাদের মধ্যে যাঁদের বয়স ত্রিশের নীচে নিঃসন্দেহ তাদের সত্যযুগের প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হবে। এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করুন, ইংরাজি ভুলুন, ইংরাজি ভুলুন। এবারে সহজেই পাত্রের খুঁত ও বরদাবাবুর পরিবারের সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

মোক্ষদা পাড়ায় প্রতিবেশিনীদের কাছে গিয়ে পত্রপ্রাপ্তি সুসংবাদ গোপনে ঘোষণ করলেন। উঠবার সময়ে বললেন, দিদি কথাটা শুধু তোমাকেই

বললাম, দেখো চার কান করো না। প্রতিবেশিনী বিষয়োচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বলল, দিদি সে কি আর আমি জানিনে।

প্রবীণারা পরস্পরকে দিদি বলে, কেউ কারো চেয়ে বয়সে বড় স্বীকার না করবার ঐ সহজ উপায়।

বলা বাহুল্য প্রত্যেকেই নিজ স্বামীকে ঘটনাটি পল্লবিত আকারে জ্ঞাপন করলো। কথিত স্বামীগণের একজন অবনীবাবু। তিনি শুনে বললেন বটে। বরদা এরই মধ্যে পাত্র জোগাড় করে ফেলল। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হচ্ছে তো। অবনীবাবুতে সামাজিক উপচিকির্ষা কিছু প্রবল, আঁঠি ভেঙে শাঁস বের না করা অবধি তিনি নিরস্ত হন না। বরদাবাবুর মেয়ের পাত্র জুটলে তাঁর কোন ক্ষতি ছিল না, কেননা তাঁর মেয়ের বিয়ে অনেক দিন হয়ে গিয়েছে এবং ভালো পাত্রের সঙ্গেই হয়েছে। কিন্তু সামাজিক উপচিকির্ষা বস্তুটাই আলাদা। তিনি বের হয়ে পড়লেন। ভরসার মধ্যে দুটি মাত্র তথ্য, দমদমে বাড়ি ও বাড়িটা পাঁচতলা তবে অধ্যবসায়ে কি না হয়। মাসখানেকের মধ্যেই সুরেশ চৌধুরীর বাড়িটা আবিষ্কার করে ফেললেন। সুরেশ চৌধুরী পাত্রের পিতা; পাত্রের নাম রমেশ।

সেটা কোন ছুটির দিন ছিল, অবনীবাবুর ভরসা ছিল আজ দেখা মিলবে। মিললও তাই। তিনি দরজায় ঘা দিলেন। একটি সুবেশ যুবক দরজা খুলে দিল। ঘরের জানলা দরজা বন্ধ, আলো জ্বালা। দিনের বেলায় এমন কেন সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হল অবনীবাবুর। হঠাৎ লোক সমাগমে যুবকটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, বিদ্যুৎ বেগে একখানা বই লুকিয়ে ফেলল। কিন্তু সেই খণ্ডিত মুহূর্তকালের মধ্যেই অবনীবাবুর সত্যদর্শী নেত্র দেখে ফেলল যে বইখানার মলাটে অপরিচিত অক্ষর। নিশ্চয় ইংরাজি! তবে একেবারে অপরিচিত নয়। বাল্যকালে তিনি ফার্স্ট বুকের গাধার গল্প পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, তারপর আইন হয়ে ইংরাজি বন্ধ হয়ে যায়। তাই সেই বহুপূর্বে অর্জিত আগর্দভপ্রসারী জ্ঞানের বলে তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন, ভাষাটা ইংরাজি। গাধা যার সহায়, তার দ্বারা কিনা সম্ভব।

ভুল ঠিকানায় এসে পড়েছেন বলে নমস্কার করে অবনীবাবু বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাই বলি দিনের বেলায় আলো জেলে দরজা জানালা বন্ধ করে কী করা হচ্ছে। হুঁ হুঁ বাবাজীর এ গুণটি তো এখনই গিয়ে প্রচার করতে হচ্ছে।

যেমন সঙ্কল্প তেমনি কাজ। পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করলেন কথাটা। বলা বাহুল্য সকলেই খুশী হন। প্রতিবেশীর সঙ্কটে আহ্লাদিত যে না হয় সে নরাধম। এমন নরাধম দু চারজন ছিল, তারা অনুরোধ করলো ব্যাপারটা চেপে যান, ও নিয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।

অবনীবাবু বললেন, তা কি করে হয়! রাষ্ট্রকে সাহায্য করা যে সৎ নাগরিকের কর্তব্য।

প্রতিবেশিনীগণ আহার নিদ্রা এমন কি সিনেমা দেখা বন্ধ করে ঘরে ঘরে বলে বেড়াতে লাগলো, বলি শুনেছ দিদি সুখদার পাত্র ইংরাজি জানে।

অবশেষে কথাটা ঘুরতে ঘুরতে বরদাবাবুর বাড়িতেও এসে পৌঁছল।

৩

কি বলিস মা সুখু, এ যদি খুঁৎ না হয় তবে খুঁৎ আর কাকে বলে।

কেন মা, এই যে সেদিন হলদে বাড়ির ছোট মেয়েটার বিয়ে হল একটা আস্ত খুনের সঙ্গে।

হুঁ, খুন করা ভালো নয়, মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তা বলে সেই আর এই।

আর ঐ যে ও বাড়ির অঞ্জলির স্বামী একজন জালিয়াৎ।

সে তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে, কি আর করা যায়।

সুখদা রাগত বলল, এ বিয়েও না হয় হয়ে যেতো!

বিয়ের আগেই যে জানাজানি হয়ে গেল।

কিন্তু মা দোষটা এমন কি বুঝতে পারছি না। সে তো খুন বা জালিয়াতি করেনি, লেখাপড়া করে মাত্র।

আরে বোকা মেয়ে ওকে কি লেখাপড়া বলে। ও যে ম্লেচ্ছের ভাষা, যাদের ছুঁলে স্নান করতে হয়, তাদের ভাষা। তার উপরে রাজার আইন আছে, জেল জরিমানা শূল। না, মা, ও বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। কর্তা খুব রেগে গিয়েছেন। তিনি বলেন, ও ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে তিনকুলে কালি পড়বে।

আচ্ছা, তোমরা সুখ নিয়েই থাকো, কিন্তু আমাকে আর বিয়ের কথা বলো না। এই বলে সুখদা উঠে চলে গেল।

সুখদার দুঃখের কারণ আছে। যথারীতি আশীর্বাদ হয়ে যাওয়ার পরে

পিতামাতার অনুমতি নিয়ে সুখদা দু তিন দিন সিনেমায় গিয়েছে রমেশের সঙ্গে। কোন পক্ষ থেকেই আপত্তি হয়নি। এই প্রাগ্‌ বিবাহ মেলামেশার ফলে সুখদা ও রমেশের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে, দুজনেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুখস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে এই বজ্রাঘাত।

মোক্ষদা মেয়ের ক্রোধকে সাময়িক্ ব্যাপার মাত্র বলে মনে করল, ভাবলো দু দিনে মিটে যাবে, তখন আবার দেখেশুনে পাত্র সন্ধান করলেই চলবে, এমন পাত্র যার ইংরাজি ভাষা স্পর্শ জনিত খুঁৎ নেই। আজকাল লাখে একজনও ইংরাজি জানে না, কাজেই সৎ পাত্র সহজেই মিলবে।

এমন সময়ে বরদাবাবু প্রবেশ করলেন, বললেন, দমদম থেকে আসছি. বিয়ে ভেঙে দিয়ে এলাম।

মোক্ষদা বলল, একেবারে ভেঙে দিলে, মেয়ে যে বেঁকে বসেছে।

বাঁকা দু দিনেই সোজা হয়ে যাবে। তাই বলে তো অতবড় খুঁৎ যেখানে সেখানে তো আর বিয়ে দেওয়া চলে না। ধরা পড়লে যে নিশ্চয় শূল, তখন তোমার মেয়ের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ।

থাক, থাক, ও সব অলুক্ষণে কথা রাখো।

ও দিকে ভগ্নমনোরথ রমেশ সারাটা দিন গুম হয়ে বসে কাটালো, অবশেষে রাতের বেলায় চন্দ্রশেখরের মতো যাবতীয় ইংরাজি পুস্তক উঠানে স্তূপীকৃত করে আগুন লাগাতে মনস্থ করলো। কিন্তু দেখলো যে, কেরোসিনের বোতলটা শূন্য। তখন ভাবলো যাক, কাল সকালে আগুন লাগালেই চলবে। অন্য দিকে সুখদা সারারাত্রি বুকে বালিশ চেপে কেঁদে কাটালো। এই রকম যখন পাত্রপাত্রীর মনের অবস্থা, তখন প্রজাপতি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না, এবারে তিনি হস্তক্ষেপ করলেন।

৪

পরদিন সরকারী গেজেটে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল, তার মর্ম এই রকম।

যদিচ ইংরাজি এই পবিত্র দেশে দণ্ডনীয় অপরাধ তৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রের স্বার্থে বর্তমান ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করা যাচ্ছে। মার্কিন রাষ্ট্রের সঙ্গে দেশের যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে, দেশের পক্ষ থেকে তজ্জন্য ইংরাজি জানা একজন লোক আবশ্যক। নির্বাচিত প্রার্থীকে অবিলম্বে মার্কিন দেশে যাত্রা করতে হবে—বলা বাহুল্য সে সস্ত্রীক যেতে পারে। অবিলম্বে ইংরাজি জানা প্রার্থীকে সরকারে দরখাস্ত করতে হবে—পরীক্ষক মার্কিন দেশের জনৈক প্রতিনিধি।

এ হেন লোভনীয় বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও প্রার্থী জুটলো মাত্র দুজন, রমেশ এবং সেই অবনীবাবু যার বিদ্যা ফার্স্ট বুকের গাধার গল্প পর্যন্ত বিস্তারিত। বলা বাহুল্য রমেশ নির্বাচিত হল আর অবনীবাবু পরীক্ষককে একদেশদর্শিতার দোষ দিতে দিতে বাড়ি ফিরে এলেন। লোকে শুধালো কি হল ?

আর বলো না, মুরুব্বির জোর না থাকলে আজকাল কিছু হওয়ার উপায় নেই। নইলে ও ছোকরা আর আমি।

বরদাবাবু আবার দমদম গেলেন, এবারে গলবস্ত্র হয়ে। রমেশ তখন উঠান থেকে ইংরাজি বইগুলো তুলে এনে আলমারিতে সাজাচ্ছিল।

বরদাবাবুর কথা শুনে শশব্যস্তে তার পায়ের ধূল নিল। বরদাবাবু একখানা ইংরাজি বই তুলে মাথায় ঠেকালেন, ভাগ্যক্রমে বাইখানার নাম 'ইংলিশ উইদাউট টিয়ার্স'।

যথাসময়ে যথাশাস্ত্র রমেশের সঙ্গে সুখদার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তারা আমেরিকায় রওনা হয়ে গেল।

নিমন্ত্রণে অবনীবাবু ছাড়া সবাই এসেছিল। তিনি তখন জীর্ণ ফার্স্ট-বুকখানা খুঁজে বের করে পাঠ অভ্যাস করছিলেন, 'আই মেট এ লেম ম্যান ইন দি লেন।' এবারে সুযোগ এলে আর ফস্কে না যায়। মোক্ষদা আবার প্রতিবেশিনী মহলে দেখা দিলেন, প্রসঙ্গত জানালেন, জামাইয়ের বেতন মাসিক দশ হাজার ডলার অর্থাৎ পঁচাত্তর হাজার টাকা। সবাই শুষ্ক মুখে বলল, বড় আনন্দের কথা। বলা বাহুল্য কেউ বিশ্বাস করলো না।

সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো অমন খুঁতওয়ালা জামাই পাওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো। কিন্তু তলে তলে খোঁজ করতে লাগলো আর অমন খুঁতওয়ালা পাত্র পাওয়া যায় কিনা। তাদেরও অবনীবাবুর মতো মনের অবস্থা, এবারে সুযোগ এলে আর ফস্কে না যায়।

অভাবিত

আরেকটু জোরে চালাও লক্ষ্মীটি।

গাড়ির কাঁটা দেখছি ষাট মাইলের উপর উঠেছে, আর বেশী জোর দেওয়া উচিত হবে না।

তাহলে পৌঁছতে যে বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে যাবে।

লগ্ন তো সেই সাড়ে দশটায়। এখন সবে ন'টা।

তা হোক। একেবারে ঠিক বিয়ের আসরে তো যাওয়া চলে না, লোকে বলবে কি যে ছোট বোন, তার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এলে বুঝি।

আরে আমার তো ছোট বোন নয়, শালীর বিয়েতে না হয় নেমন্তন্ন খেতে এলাম। আমি কি ঢুলি না নাপিত যে দুদিন আগে এসে বসে থাকতে হবে।

দুদিন আগে আসাই উচিত ছিল। কতবার বললাম ছুটি নিতে।

অফিসের সাহেব তো নিমন্ত্রণ পত্র পায়নি, কাজেই সে ছুটি দেবে কেন? কালকে রবিবার বলেই যাওয়া সম্ভব হলো, নইলে আদৌ যেতে পারতাম না।

তোমার যেমন কথা, ছুটি চাইলেই পাওয়া যায়।

একসময়ে পেয়েছি যখন নীচের ধাপে ছিলাম। উঁচু ধাপে উঠে আর যখন তখন ছুটি চাওয়া চলে না। যাক্ তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আমার গায়ে আপিসের পোশাক দেখলেই শালী বুঝতে পারবে যে আসবার আমার কত আগ্রহ, পোশাক বদলাবার সময় পর্যন্ত পাইনি।

স্ত্রীর বিশেষ পীড়াপীড়িতে মোটরের গতি আরেকটু বাড়িয়ে দিল অনির্বাণ। দুদিকের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে মোটর গাড়ি বুলেটের মত ছুটে চললো। অনেক জায়গায় রেল লাইনের সমান্তরালে পাকা সড়ক। সেসব জায়গায় স্টেশনের আভাস পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় সিগন্যালের আলো-গুলো। তারপরেই আবার নিরেট অন্ধকার।

হঠাৎ স্ত্রী বলে উঠলো, "দেখো, ঐ যে দূরে আলো দেখা যাচ্ছে, বোধ হয় কৃষ্ণনগর শহরে তাহলে এসে পড়েছি।"

আমি তো গোড়া থেকেই তোমাকে অভয় দিচ্ছি ঠিক সময়েই পৌঁছবো। দেখো না গাড়ির কাঁটা সত্তর মাইলের উপরে উঠেছে—এ সব মফস্বলের পথে গতির যেমন বেগ বিপজ্জনক।

স্ত্রী প্রতিবাদের সুরে বলল, কেমন সুন্দর মসৃণ পথ!

মেয়েদের কাছে বাপের বাড়ির পথ সর্বদাই সুন্দর এবং মসৃণ।

এখন মনে হচ্ছে পৌঁছলাম বটে। এমন সময় হঠাৎ সবেগে কেঁপে উঠলো, ষ্টীয়ারিং আয়ত্তের বাইরে চলে গেল, মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড একটা শব্দ করে বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ, যেন আদৌ কিছু ঘটেনি, স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে। তারপরে গাড়ি থেকে একে একে বের হয়ে এলো অনির্বাণ ও নয়নতারা।

প্রথমে কথা বললো নয়নতারা, উঃ কী ভীষণ অন্ধকার! দূরে যে আলো-গুলো দেখা যাচ্ছিল, কোথায় গেল সব ?

আলো রেখে দাও, কোথাও লাগেনি তো ?

মোটেই না। শরীরটা দিব্বি হালকা বোধ হচ্ছে।

স্বামী বললো, আমিও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। এত বড় একটা ক্র্যাচ্ হলো অথচ গায়ে কাঁটার আঁচড়টি পর্যন্ত লাগলো না, এমনটি হয় না। যাক্ নেমন্তন্ন মাথায় রইলো, এখন প্রাণটা বেঁচে গিয়েছে এই যথেষ্ট।

নয়নতারা বললো, মোটেই যথেষ্ট নয়, পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। চলো এগিয়ে। কৃষ্ণনগর বোধহয় দু এক মাইলের মধ্যেই হবে।

কিন্তু গাড়িখানা কি এখানেই পড়ে থাকবে ?

নয়নতারা বললো, কালকে লোক পাঠিয়ে টেনে নিয়ে গেলেই হবে।

সেই ভালো। চলো এগোই! আমার শালী ভগ্নীপতির আন্তরিকতা দেখে বিস্মিত হয়ে যাবে। এরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কজন ভগ্নীপতি বিয়ের আসরে আসে ?

তখন দুজনে পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করলো। কিছুক্ষণ চলবার পরে দুজনেই বিস্মিত হলো এ যে নিতান্ত কাঁচা মেঠো পথ। ভাবলো এপথে মোটর গাড়ি চলে কি করে।

প্রথমে কথা বললো নয়নতারা, আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছি। কৃষ্ণ-নগরের পথ তো—

তার কথা শেষ করবার সুযোগ দিল না অনির্বাণ। বলে উঠলো, সুন্দর এবং মসৃণ। মাঝে মাঝে যে ইলেকট্রীক আলো দেখা যাচ্ছিল সেগুলো গেল কোথায় ?

আমরা নিশ্চয়ই ভুল পথ ধরেছি।

অনির্বাণ বললো, অসম্ভব নয়। যে বিপদটা গেল তাতে প্রাণ যে রক্ষা

পেয়েছে এ-ই যথেষ্ট।

কিন্তু এভাবে পৌছতে পৌছতে যে বিয়ের লগ্ন চলে যাবে।

কি আর করা যাবে বলো। দুর্ঘটনার উপরে তো কারও হাত নেই।

নয়নতারা বলে উঠলো, সে জন্যেই তো বলেছিলাম আরো দুঘণ্টা আগে বেরোতে। তুমি কিছুতেই শুনলে না।

দাঁড়াও ঐ যেন গোটা দুই আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ও তো মাটির প্রদীপের আলো।

তা হোক তবু তো আলো। অন্ধকারে আলো দেখলে মনে ভরসা পাওয়া যায়। ঐ দেখো, যেন ঘরবাড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

স্ত্রী রেগে উঠে বললো, তোমার যতসব বাজে কথা। মাটির প্রদীপ, খড়ের ঘরবাড়ি, কাঁচা রাস্তা—এই কি আমার বাপের বাড়ি কৃষ্ণনগর শহর ?

নিতান্ত মিথ্যা বলোনি। মনে হাচ্ছ দুশো বছর আগে এসে পড়েছি। এতক্ষণের মধ্যে রেল গাড়ির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল না। চারদিকে এমন নিরেট স্তব্ধতা—

তোমার ঐসব অলুক্ষণে কথা রাখো তো, আমার কেমন ভয় করছে। চলো এগনো যাক।

সেই ভালো। কৃষ্ণনগর না হোক, কোন একটা নগর, অন্ততঃ কোন একটা গ্রামে তো পৌছনো যাবে।

নয়নতারা আসলে মনে মনে ভীত হয়ে উঠেছিল। সেই ভীতি প্রকাশ পেল বিরক্তিতে। তোমার আর কি। তোমার তো বোন নয়। কিন্তু তারপরেই বিরক্তিকে ছাপিয়ে প্রকাশ পেল ভয়। বললো, একি এতক্ষণের মধ্যে কোথাও একটা মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। এ কোন দেশে এসে পৌছলাম বাপু। নিশ্চয়ই আমরা পথ ভুল করেছি।

স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে অনির্বাণ বললো, ঐ যেন মানুষের গলার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

তাই তো বটে! কে যেন সুর করে রামায়ণ পাঠ করছে।

তখন দু'জনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলো। কিছুক্ষণ শুনবার পরে অনির্বাণ বলে উঠলো, এ তো রামায়ণ নয়, মনে হচ্ছে আর কিছু হবে।

নয়নতারা এতক্ষণে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছে। স্বামীকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললো, চলো না ওখানে যাই, কাউকে দেখতে পাওয়া যাবে তো। তার কাছে সংবাদ নিলেই হবে। সত্যি কথা বলতে কি বাপু এমন অন্ধকার আর নির্জন কেমন যেন গা ছমছম করছে।

তারা দু'জনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল মেটে কুটীরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা আসছে। আর গলার স্বরও বেশ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ওরা ভাবতে লাগলো কি করা যায়! এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দেবে না ফিরে অন্যত্র যাবে। যতক্ষণ ভাবছে ওদের কান সুর করে পড়া কবিতার অংশবিশেষ শুনতে পেল।

"অন্নপূর্ণা উত্তরিল গঙ্গিনীর তীরে
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটুনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বর পাটুনী
ত্বরায় আসিল নৌকা বামাস্বর শুনি।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বর পাটনী
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশজাত
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশখ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।"

এবারে অনির্বাণ বলে উঠলো যে ভারতচন্দ্রের কাব্য বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ভারতচন্দ্রের কাব্য এখন আবার লোকে পড়ে।

এখনকার লোকে পড়ে না বটে, কিন্তু তখনকার লোকে খুব পড়তো। সে যুগে ছাপাখানা থাকলে ভারতচন্দ্রের কাব্য এ-বেলা ও-বেলা সংস্করণ হতো। সেকালে তিনি ছিলেন সবচেয়ে পপুলার রাইটার।

সেকালে কোন্‌কালে?

ধরো দুশো বছর আগে। চলো না এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দেওয়া যাক।

তখন তারা এগিয়ে গিয়ে দরজার সম্মুখে দাঁড়ালো। দরজা খোলাই ছিল, দেখতে পেল উত্তরীয় গায়ে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত কম বয়েসের একটি মহিলাকে পড়ে শোনাচ্ছে। তার হাতে তালপাতার একটা পুঁথি। ঘরের কোণে পীলসুজের উপরে তেলের বাটি।

এবারে দুই পক্ষ পরস্পরকে দেখতে পেল।

অনির্বাণ নমস্কার করে বললো, আমরা আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আপনার সুললিত কাব্য পাঠ শুনছিলাম।

প্রৌঢ় ব্যক্তি বললো, তাতে কি ক্ষতি হয়েছে, আসুন না ঘরের ভিতরে এসে বসুন।

অনির্বাণ ধন্যবাদ দিয়ে বললো, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি আছে, আজ আর বসবো না। দেখুন আমরা কৃষ্ণনগর যাবো। পথে একটা দুর্ঘটনার ফলে পথ ভুলে এইখানে এসে পড়েছি।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বললো, না, ঠিক জায়গাতেই এসে পৌচেছেন। এই কৃষ্ণনগর বটে।

যতক্ষণ তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল, নয়নতারা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মেয়েটি কী অসভ্য। গায়ে একটা জামা পর্যন্ত নেই, শুধু শাড়িব আঁচলটা জড়িয়ে রেখেছে।

মহিলাটি ওদের দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছে। পুরুষটির গায়ে এ কি ধরণের পোশাক, আর মেয়েটির পোশাকও কম বিচিত্র নয়।

তখন তার মনে পড়ে গেল একবার কাশিমবাজারের কুঠি থেকে একজন ফিরিঙ্গী এসেছিল, তার গায়ে ওরকম পোশাক ছিল বটে। তবে কি লোকটা কাশিমবাজারের কুঠির কেউ হবে?

প্রৌঢ় ব্যক্তিটির অনুরোধে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বসেছেন।

অনির্বাণ বললো, কেষ্টনগর তো মস্ত শহর, এ যেন পাড়াগাঁ বলে মনে হচ্ছে।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বললো, না, ভিতরের দিকে রাজবাড়ি আছে সেখানে দালান-কোঠার অভাব নেই। তা আপনারা কোত্থেকে আসছেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কলকাতা থেকে।

একটু চিন্তা করে নিয়ে প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বললো, ও কলকাতা, নাম শুনেছি বটে। সে তো একটা পাড়াগাঁ। কৃষ্ণনগরের চেয়েও অধম।

কী বলছেন আপনি। পৃথিবীর একটা মস্ত শহর। ইংরেজ রাজ্যের রাজধানী। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বিস্মিত হয়ে বললো, ইংরেজের রাজ্য স্থাপিত হল কবে? আমরা তো জানি এ নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব।

অনির্বাণ ভাবলো লোকটা নিশ্চয় পাগল। কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো, মশায়ের নামটি কি জানতে পারি?

এই যার কাব্য পড়া হচ্ছিল আমি সেই রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র।

অনির্বাণের নিশ্চিত ধারণা হলো লোকটি উন্মাদ না হয়ে যায় না। বললো, তিনি তো আজ দুশো বছর আগে মারা গিয়েছেন।

ভারতচন্দ্র একটু মৃদু হেসে বললো, আপনারাই কি বেঁচে আছেন বলে মনে করছেন?

এক্সিডেন্ট

অবশেষে ট্যাক্সি মিললো। একটানে দরজা খুলে ঢুকে পড়ে বললাম, হাঁকাও।

ঘণ্টাখানেক ধরে সমস্ত রাস্তাটা ছুটোছুটি করে জরিপ করে দেখেছি, না একখানা ট্যাক্সি, না একখানা ফিটন গাড়ি, না একখানা রিক্শা। কেন যে মরতে অসময়ে এই বেপাড়ায় এসে পড়েছিলাম বন্ধুর জন্মদিনের নিমন্ত্রণে অদৃষ্টই জানে। মমিনপুর পাড়ায় কখনো আসিনি, ট্রামে-বাসে যাতায়াতে দেখেছি এই পর্যন্ত, এদিককার ভূগোল সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট, বোধকরি

লণ্ডন শহরের পিকাডিলি সার্কাসের পথঘাট এর চেয়ে বেশী।

বন্ধুটির আবার সময় সম্বন্ধে নিষ্ঠা প্রবল, সে কোন করে জানিয়েছিল যে সন্ধ্যা ছটা তিপ্পান্ন মিনিটে তার জন্ম হয়েছিল তাই তার মায়ের ইচ্ছা ঐ সময়টাতে অনুষ্ঠান হয় আর সেই সময়ে বন্ধুবান্ধবেরা উপস্থিত থাকে। রজতের মায়ের ইচ্ছা কাজেই যেতে হবে, অবশ্য স্থানকাল জানলে (জানাই নি) আমার মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ হতো।

স্থানকাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পাঠক ভাবতে পারেন বালিগঞ্জ থেকে মমিনপুর যাওয়া এর মধ্যে এমন কি এডভেঞ্চার আছে যা ফলাও করে গল্প লিখতে হবে! আপাত বিচারে কথাটা মিথ্যা নয়, তাই স্থানকাল সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

বছরটা ১৯৪৩ সাল, সময় শীতকাল, রাত্রি সাড়ে আটটা। প্রবীণ পাঠকের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট হলেও নবীনের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

তখন কলকাতা শহরে ব্ল্যাক আউট; রাস্তার ও বাড়ীর সমস্ত বাতিগুলো ঘোমটা পরে নববধূর মতো সলজ্জ সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করেছে; পথের মোটরগাড়িগুলোর হেড লাইট কৃষ্ণাদ্বাদশীর চাঁদের মতো ক্ষীণ; তিথিটাও কাছাকাছি হবে তবে বুঝবার উপায় নেই, আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছে, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে; আর সময়টা শীতকাল। পরিবেশ রচনা এখনো শেষ হয়নি। মাঝে মাঝে সাঁজোয়া গাড়িগুলো ভীমবেগে ছুটে চলছে, ব্যস্ততা দেখলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়, বুঝি বা পথের মোড়েই জাপানী সৈন্য ঘাঁটি গেড়েছে; অসতর্ক পথিক চাপা পড়ে মরলে ক্ষোভ নেই, মানুষ মারবার জন্যেই তো ফৌজি গোরার আগমন, তবে শত্রুমিত্র ভেদ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এ হেন অবস্থায় যদি ট্যাক্সি না পাওয়া যায় তবে মনের অবস্থা কেমন হয় আর হঠাৎ সেই দুর্লভ ধন মিলে গেলেই বা মনের অবস্থা কেমন হয় প্রবীণ নবীন সকল বয়সের পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন।

ট্যাক্সিতে উঠে অদৃশ্যপ্রায় ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললাম, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বর্ধমান রোড, কালীঘাট পুল, এই পর্যন্ত বলে হেলান দিয়ে বসে এতক্ষণের ধকল সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম, ভাবলাম বাকীটুকু কালীঘাট পুল পেরিয়ে বললেই চলবে।

ট্যাক্সির বাইরে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে এদিক ওদিকে দু চারটি আলোর বিন্দু, সে-সব যেন অন্ধকার চাপা-পড়া আলোর

শেষ আর্তনাদ। ট্যাক্সির ভিতরে অন্ধকার আরও গাঢ়, পল্বলের জল যেমন বেশী ঘোলা নদীর জলের চেয়ে। ট্যাক্সি ড্রাইভারগণ এমনিতেই অর্ধদৃষ্ট, তাদের পিঠের দিক ছাড়া প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না, এ লোকটা তো একেবারে অনুমানগম্য; তবে নিশ্চয় একজন ড্রাইভার আছে নতুবা গাড়ি চালাচ্ছে কে! ভাবলাম গাড়ি চললেই হল, বাড়ি পৌঁছলেই হল, মোটামুটি নির্দেশ তো দিয়েছি।

গাড়ি চলছেই তো চলছে। একবার মনে হল এতদূর সোজা চলবার তো কথা নয়, এতক্ষণে বর্ধমান রোডে ঢুকে মোড় ঘোরা উচিত ছিল; তখনই মনে হল নিশ্চয় ঢুকেছে অন্ধকারে খেয়াল করতে পারিনি। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সম্বিৎ হল যে গাড়ি যেন মাঝেরহাট পুলের উপরে উঠে পড়েছে। হ্যাঁ ঠিক তাই। নীচে একখানা মালগাড়ি অন্ধকারের বন্যার মতো বেগে চলে গেল।

আরে তুম কিধার যাতা?

এ কোথায় চললে?

Where are you going to?

হিন্দী বাংলা ইংরাজি তিন ভাষাতেই বললাম, আর বেশী ভাষা জানি না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? পুল থেকে নেমে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে গাড়ি ছুটে চলল, বেগ যেন আরও বেশী হয়েছে।

ভালো মুশকিল, এ কার পাল্লায় পড়লাম, পাগলের না বদমাশের।

তখনই আবার মনে হল নিউ আলিপুরের মধ্যে দিয়ে টালিগঞ্জ হয়ে বালিগঞ্জ যাওয়ার একটা পথ আছে বটে। বোধকরি সেই পথই ধরবে।

শুনিয়ে ড্রাইভারজি, নিউ আলিপুর সে বালিগঞ্জ যানা।

লোকটা চমকে গেলো কি না জানি না, হাওয়ায় শব্দ ভেসে গেল, সে ভীমবেগ।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কদিন আগে এই পথেই রাতের বেলায় একখানা ট্যাক্সি মিলিটারি লরির সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সংবাদটা নিয়ে বেশ চাঞ্চল্য হয়েছিল, কাগজে লোকটার ছবিও বের হয়েছিল। সংবাদপত্রের লেখক হিসাবে ইংরেজকে সংরক্ষিত ভাষায় গাল দিয়ে জাতীয় কর্তব্য সমাপন করেছিলাম। সেই ঘটনা মনে পড়লো। তবে ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক এখানে নয়, বেহালা ঠাকুরপুকুর পেরিয়ে ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি

মাঠের মধ্যে।

আরে এ যে বেহালা বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তখন ঝুঁকে পড়ে উচ্চস্বরে ধমক দিয়ে বললাম, আরে তুম্ ক্যা কর্ রহা হ্যায়। আভি ঘুমকে চলো।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। গাড়ির বেগ আরও দ্রুত হল।

নাঃ বদমাশের হাতেই পড়েছি। যুদ্ধের কল্যাণে ও জিনিসটার বান ডেকেছে কলকাতা শহরে। আর কিছুদিন লড়াই চললে একটাও সৎ লোক থাকবে না দেখছি। কিন্তু এখন কি করা যায়, রক্ষা পাওয়ার উপায় কী ?

ঠাকুরপুকুর পেরিয়ে এসে গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটছে, আমার অনুনয় বিনয় পরামর্শ নিষেধ কিছুই মানছে না ড্রাইভার, বোধ করি তার কানেও প্রবেশ করছে না। অগত্যা হতাশ হয়ে ভবিতব্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে চিন্তা করতে লাগলাম। মন্দর ভালো এই যে এ দিকটায় গাড়ির যাতায়াত নেই, নইলে কি হতো কে জানে। যা হতো সে তো কদিন আগে সেই ট্যাক্সি-খানার দশা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সেখানাও বোধকরি এমনি পথের আনন্দবেগে ছুটতে গিয়ে সাধনোচিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। এ গাড়ি-খানারও কি সেই অবস্থা হবে নাকি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবি মনে পড়ে গেল, একেবারে ছাতু হয়ে গিয়েছে, আর ড্রাইভারের দেহটা তালগোল পাকিয়ে নিহত কীচকের মতো হয়েছে।

আরে ড্রাইভারজি, থোড়া হুঁশিয়ার সে যানা।

কে কার কথা শোনে।

মেঘাবৃত আকাশের তলে নিরেট অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছি। যেন একটা দীর্ঘ টানেলে ঢুকে পড়েছি, অপর প্রান্তে আলোর আভাসটুকু পর্যন্ত নেই।

এমন সময়ে দূরে, কতদূরে বুঝবার উপায় নেই, ঠিক যেন টানেলের অপর প্রান্তে একটি আলোর বিন্দু দেখা গেল। নীরন্ধ্র অন্ধকারে আলোর রেখা দেখে মনে আশার সঞ্চার হল, ভাবলাম একটা কিনারা হবে। আলোর বিন্দুটা ক্রমে বড় হতে লাগলো, ওটাও কি একটা গাড়ির আলো। পলে পলে আলোর বিন্দু বৃহত্তর উজ্জ্বলতর হচ্ছে, দুই গাড়ির বিপরীতমুখী গতি বাড়িয়ে তুলছে আলোর তেজ। তখনই মনে পড়লো সেদিনের ট্যাকসি দুর্ঘটনার কথা, মুহূর্তে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। আবার তার পুনরাবৃত্তি

ঘটবে নাকি। এবারে গাড়িখানার খসড়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কী অতিকায় লরি, মিনি টারি না হয়ে যায় না। সেই গাড়িখানাও দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসছে।

ড্রাইভারজি, রোখকে, রোখকে।

দুখানা এবারে মুখোমুখী, আর এক মুহূর্ত পরে সব শেষ হয়ে যাবে।

কতয়ের দেনাটা শোধ হয় নি, জমা-খরচের কাগজগুলো খুঁজে পাবে কি, টেরি কুকুরটার নাকটা অত খাঁদা কেন।

ধন্য ড্রাইভারজির শিক্ষা! কোন ব্যবধানে গাড়ির মোড় ঘুরিয়ে প্রচণ্ড বেগে নেমে পড়লো মাঠের মধ্যে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, গাড়িখানা কয়েকবার পালটেপ লটে পড়ে গিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। আমিও খেলাম প্রচণ্ড ধাক্কা।

বাবুসা'ব কালীঘাট পুল পেরিয়ে হাজরার মোড়ে এসেছি, এবারে কোন দিকে যেতে হবে।

ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক কষে দিল, তা পরে ডাকাডাকি শুরু করেছে।

গাড়িতে চেপে আমি কয়েক মিনিটের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ওয়াটারলু যুদ্ধের পারণাম

সেদিন গ্রামের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়া হচ্ছিল। এমন সময়ে ওয়াটারলু যুদ্ধের বিষয় এসে পড়লো। ইতিহাসের শিক্ষক হেডপণ্ডিত মশায়। তিনি কোনো ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, ওয়াটারলু যুদ্ধ একটি বিখ্যাত জলযুদ্ধ। তার কথা শুনে পেছনে উপবিষ্ট একটি ছাত্র বলে উঠলো, 'না মাষ্টারমশায় আমি শুনেছি যে, ওয়াটারলু স্থলযুদ্ধ। হেডপণ্ডিত মশায় শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন যে তোমার ইতিহাসের জ্ঞান যেমন-তেমন ইংরাজীটাও জানো না দেখছি। যে ছেলে এখনো স্কুলে ঢোকেনি সে জানে ওয়াটার মানে জল। এখন বলতো বাপু জলের মধ্যে স্থলযুদ্ধ হয় কি করে? ছাত্রটি বললো, এখানে ওয়াটার শব্দের অর্থ 'জল' নয়। ওটা একটা জায়গার নাম।

তোমাকে নিয়ে তো মহা মুশকিলে পড়লাম। ওয়াটার শব্দের সর্বত্র এক

অর্থ। তুমি কি বলো গোবিন্দ ?

গোবিন্দ বাবুদের বাড়ীর ছেলে। সে বললো, ওয়াটার মানে জল। কাজেই ওয়াটারলু'র যুদ্ধ জলযুদ্ধ।

এবার শুনলে তো ?

"শুনলাম। কিন্তু বিশ্বাস হলো না।"

আচ্ছা তবে অভিধানখানা নিয়ে এসো। অভিধান আনীত হলে দেখা গেলো ওয়াটার শব্দের অর্থ লেখা রয়েছে জল।

এবারে বিশ্বাস হয়েছে ? অভিধানকে বিশ্বাস করো তো ?

ছেলেটি বললো, ওয়াটার মানে জল, স্বীকার করছি; কিন্তু ওয়াটারলু মানে জল না হতেও পারে।

তবে কি বলতে চাও অভিধানে ভুল লিখেছে ? দেখেছো বইখানা কতো মোটা, আর ওজনে কতো ভারী ?

ছেলেটি মহা তার্কিক। বললো, এতগুলো শব্দের অর্থ লিখতে গিয়ে এক-আধটা ভুল হবে—এমন কি হয় না ?

তা যেন হলো। কিন্তু বাবুদের বাড়ীর ছেলে গোবিন্দ, সে কত জানে, কত দেখেছে। তার ভুল হতে যাবে কেন ?

ক্লাসে পিছন দিক থেকে একটি ছেলে বলে উঠলো, হ্যাঁ, বাবুদের বাড়ীর ছেলে অভিধানের মতই ওজনে ভারী। সত্যি তো, তার ভুল হবে কেন ?

আচ্ছা বাপু গোবিন্দ তুমি মীমাংসা করে দাও।

এর আর মীমাংসা কি পণ্ডিতমশায় ? ওয়াটার মানে জল, সবাই জানে। সেদিন আমাদের চাকরকে বলেছিলাম, ওরে, তাড়াতাড়ি আমার জন্য এক গ্লাস ওয়াটার নিয়ে আয়। সে ঠিক জল নিয়ে এলো।

শুনলে তো ?

বাবুদের বাড়ীর অশিক্ষিত চাকরটা শুদ্ধ যা জানে, তুমি সেটুকুও জানো না। যাও স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাবুদের বাড়ীর চাকরীতে ঢোকো। 'ওয়াটার' শব্দের অর্থে আর ভুল হবে না।

এহেন অপমানজনক বাক্য শুনে ছেলেটি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। অপমান করবেন না, স্যার।

তুমি তো দেখছি, আচ্ছা বেয়াদব, তোমার যেরকম বিদ্যে দেখছি, এরপরে

বাবুদের বাড়ীর চাকরিও জুটবে না।

তখন ক্লাসের মধ্যে পিছন দিকে গুজ-গুজ-ফুস-ফুস শব্দে একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া গেল।

কি হে, তোমরাও কি ওর দিকে ভিড়লে না-কী?

তখন ক্লাস নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গোবিন্দ তুমি উঠে মীমাংসা করে দাও দেখি।

গোবিন্দ উঠে দাঁড়ালো।— বললো, মীমাংসা তো অনেকদিন আগেই হয়ে গিয়েছে। নেপোলিয়ানের মতো বীরকে স্থলযুদ্ধে কেউ হারাতে পারেনি। তিনি যখনি হেরেছেন জলযুদ্ধে হেরেছেন।

এবারে হেডপণ্ডিত মশায় বললেন, বাবুদের বাড়ীর ছেলের কথায় বিশ্বাস হলো তো? তুমি বাবুদের বাড়ীর পুরুতের ছেলে। খাও কাঁচকলা সিদ্ধ ভাত। আর বাবুদের বাড়ীর সকলে কী খায় দেখেছো তো? আর না দেখে থাকলে, শুনেছো নিশ্চয়।

এবারে আবার ক্লাসের পিছন দিকে গুজগুজ-ফুসফুস আরম্ভ হলো। আগের বারের চেয়ে জোরে।

পণ্ডিতমশায়ের কিছু ভুল হয়ে গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে গণতন্ত্রের হাওয়া যে চন্দনপুর গ্রামের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ঢুকেছে, সে খেয়াল তার ছিল না। তাছাড়া বাবুদের নামের সম্মানও আর আগের মতো নেই। ক্লাসের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র একযোগে বলে উঠলো, পণ্ডিতমশায় আমাদের অপমান করেছেন। আমরা বরাবর দেখেছি বাবুদের বাড়ীর ছেলে বলে গোবিন্দকে খাতির করে চলেন। স্কুলে আমরা সকলেই সমান বেতন দিই। বাবুদের বাড়ীর ছেলে বলে গোবিন্দ কিছু বেশী দেয় না।

বেতন সকলেরই সমান। কিন্তু দাও কয়জনে? আমার উপরেই বেতন আদায় করবার ভার। পটলা, শঙ্কু, রন্তা, সকলের ছ'মাস বেতন বাকী। রমেশ, পূর্ণ, তোমরা হাফ্-ফ্রী। বেতন আদায়ের খাতাখানা কাছে থাকলে, আরো বলতে পারতাম। আর এদিকে বাবুদের বাড়ীর ছেলে শুধু পুরো বেতন দেয় না। স্কুলের চাঁদা বাবদ মাসিক কুড়ি টাকা দিয়ে থাকে।

এই কথা শুনে একটি ছেলে বলে উঠলো, তাই বলে কি ওয়াটারলু যুদ্ধ জলযুদ্ধ হয়ে যাবে।

এবার গোবিন্দ উঠে দাঁড়ালো। পণ্ডিতমশায়, আজকাল কোনো

বিষয়ের মীমাংসা করতে হলে দেখেছি, হাত তুলে ভোট দিয়ে স্থির করা হয়। এখানেও তাই হোক না কেন।

উত্তম, চালকলা খেলে এমন কথা ভাবতে পারতে [illegible] ঘি, দই, দুধ খেলে তবে মাথা খোলে।

বেশ, তবে তাই দেখা যাক্। তখন স্থির হলো, পরের ঘণ্টায় এখানেই ভোট নেয়া হবে। ওয়াটারলু যুদ্ধ জলযুদ্ধ [illegible] স্থল [illegible]

দুই ক্লাসের মধ্যে কিছু ফালতু সময় পাওয়া গেল [illegible] খন শুরু হয়ে গেল নেপথ্যবিধান। হেডপণ্ডিত মশায় গোবিন্দকে একান্তে ডেকে বললেন, দেখো বাবা, বাবুদের বাড়ীর মুখ হাসিও না।

আপনি কিছু ভয় পাবেন না। সে বললো যারা [illegible] বিরুদ্ধে ভোট দেবে, তাদের বাকী খাজনা বাবদ নালিশ [illegible] যাবে ব্রহ্মোত্তর ভোগ করে, তারা জমি থেকে যাতে উৎখাত হয় সেই রকম ব্যবস্থা করতে দেওয়ানজীকে বলে দেবো।

এই কথাগুলিকে এমন উচ্চস্বরে বললো, যাতে ছেলেদের কানে প্রবেশ করে।

স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই গাঁয়ের জমিদারের প্রজা [illegible] ব্রহ্মোত্তর ভোগী। তারা কাছেই বসে ছিলো [illegible] হয়ে বললো, [illegible] এখন কী করা যায়। বাড়ীতে বাবা কাকা দাদাদের দল শুনলে তারা [illegible] রাখবে না। বলবে, ওয়াটারলু যুদ্ধ জল [illegible] আর স্থলযুদ্ধই [illegible] তাতে তোদের কী? এখন যদি জমিদারের নালিশ করে [illegible] ব্রহ্মোত্তর [illegible] যাবে, আর ৩।৪ বছরের বাকী খাজনা [illegible] যা, [illegible] যা, পণ্ডিতমশায়ের পায়ে ধরে মাপ চাগিয়ে [illegible] বাবুদের বাড়ীর গোবিন্দকে দুটো মিষ্টি কথা বলে ঠাণ্ডা করগে।

রমেশ বললো, বাবা সেদিন একখানা আস্ত বাঁশের লাঠি আমার পিঠে ভেঙেছেন।

প্রায় সকলেরই অভিজ্ঞতা অনুরূপ এমনি সময়ে ক্লাসের দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লো। পণ্ডিতমশায়, গোবিন্দ ক্লাসের মধ্যে বসে ছিলো। ছেলেরা এসেই যার যা আসনে এসে উপবিষ্ট হলো। তখন পণ্ডিতমশায় দাঁড়িয়ে উঠে বললো, যারা ওয়াটারলু যুদ্ধ, জলযুদ্ধের পক্ষে, তারা সকলে হাত তোলো। বুঝে-সুজে হাত তোল বাপু। দেখতেই পাচ্ছো, গোবিন্দ খাতা-

পেনসিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিপক্ষে গেলে নাম লিখে নেবে।

তখন ক্লাসসুদ্ধ ছেলেরা হাত তুললো জলযুদ্ধের পক্ষে। আর যারা ওয়াটারলুর যুদ্ধ স্থলযুদ্ধের পক্ষে, তারা হাত তোলো।

একখানি মাত্র হাত উঠলো। আর সে হাত প্রথম আপত্তিকারী ছেলেটির। যে পুরোহিতের সন্তান যার কাঁচকলা সেদ্ধ ভাত ছাড়া আর কিছু জোটে না।

হৈ হৈ করে ক্লাস ভেঙে গেলো। পণ্ডিতমশায় সদর্পে দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করলেন, এবারে বিশ্বাস হলো তো, যে মহাবীর নেপোলিয়ান ওয়াটারলুর জলযুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

গোবিন্দকে নিয়ে হেডপণ্ডিত মশায় সদর্পে জমিদার বাড়ীর দিকে রওনা হলেন; আর বাকী সব ছাত্র ঐ একম আপত্তিকারী ছাত্রটিকে নিয়ে বটগাছটার গোড়ায় গিয়ে বসলো। অনেক সময় ধরে তাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হলো এবং কী [illegible] হলো, যথাসময়ে তা জানা যাবে। এইভাবে চন্দনপুর মাধ্যমিক স্কুলে [illegible] ২য় পর্ব সমাধা হলো। প্রথম পর্ব সমাধা হয়েছিল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, ১৮ই জুন। একথা সকলেরই জানা।

আমাদের দেশে [illegible] যতই অভাব থাকুক, আগাছা ম্যালেরিয়া ও দলাদলির অভাব আছে একথা কেউ বলতে পারবে না। এবারেই স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের মধ্যে দলাদলির সূত্রপাত আরম্ভ হলো, পূর্বোক্ত জলযুদ্ধের প্রবক্তা গোবিন্দ বাবুদের বাড়ীর বড় ছেলে। বাবু কিছুকাল হলো মারা গিয়েছেন। কাজেই গোবিন্দ যদিও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র, কার্যত সে বাড়ীর কর্তা। স্কুল থেকে ফিরে বৈঠকখানায় চা পান শেষ করে তিনদিনের পুরনো বসুমতী কাগজখানা টেনে নিয়ে বিজ্ঞাপনের মেয়েটির মুখে কালি বুলিয়ে যখন তার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে নিযুক্ত, এমন সময় হেডপণ্ডিত মশায়ের অভ্যুদয়। পণ্ডিতমশায়কে দেখে গোবিন্দর উঠে বসাই উচিত ছিল। কিন্তু ততটা প্রয়াস সে করলো না। একটু নড়ে-চড়ে বসে বললো, আসুন পণ্ডিতমশায়। পণ্ডিত একটি প্রমাণ সাইজের অনুগত হাসি হেসে বললো বাবা, দেখলে তো, আজ স্কুলের ব্যাপার। চাল কলা খাওয়া পুরুতের ছেলে শেষে কিনা তোমার উপর কথা বললো। আর হবেই বা না কেন, বিদ্যের দৌড় তো দেখলে। ওয়াটার মানে যে জল তাও জানে না,

ওর আর হবে কি। কোঁদলের গন্ধ পেয়ে উৎসাহভরে গোবিন্দ উঠে বসলো। বাবুর উৎসাহ দেখে হেডপণ্ডিতের উৎসাহ বেড়ে গেল। গোবিন্দ বললো, আমি এসেই নায়েবকে বলেছি। ওদের খাজনার হিসাবটা দেখতে। এতখানি এত অল্প সময়ে হেডপণ্ডিত আশা করেনি। বললো, এ না হলে জমিদারী রক্ষা হবে কি করে? তুমি পারবে বাবা, বলে তার মাথায় হস্তার্পণ করে আশীর্বাদ করলো। আর দেখলে তো, স্কুলে ছোটলোকের ছেলেগুলো সদম্ভে হাত তুলে পুরুতের ব্যাটাকে সমর্থন করলো। গোবিন্দ বললো, আপনি কিছু ভাববেন না পণ্ডিতমশায়। ওদের বাপ-খুড়ো সবাই আমার খাস-তালুকের প্রজা। এই চোত মাসেই সকলের নামে বাকী খাজনার নালিশ ঠুকে দেব। ওদের বাপ-খুড়োরা এসে বাপ্ বাপ্ বলে স্বীকার করে যাবে যে, ওয়াটার মানে জল। কাজেই ওয়াটারলুর যুদ্ধ একটি জলযুদ্ধ।

হেডপণ্ডিত বললো, বাবা তুমি যা বলেছো তা সত্যি। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে দেখি তিন-চারজন লোক শুক্‌নো মুখে বসে আছে, আমাকে দেখে তারা গড় করে একসঙ্গে বললো, পণ্ডিতমশায়, ওরা সব ছেলেমানুষ। কোন্ কথার কি অর্থ তা জানে না। আর এতবড় কি-না সাহস যে বাবুদের বাড়ীর বড় ছেলের উপর কথা বলে। গোবিন্দ বললো, এসেছিল না-কি?

হ্যাঁ তারা বললো যে, পণ্ডিতমশায় এই খবরের কাগজগুলো পড়ে ওদের মাথা বিগড়ে গিয়েছে কিন্তু আসল আসামীর তো কোনো সাজা হলো না।

সে ব্যবস্থা আমি করেছি। নায়েবকে বলেছি পুরুতঠাকুরের কাছে খাজনার তাগিদ দিয়ে পাইক পাঠিয়ে দিতে।

এহেন উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে হেডপণ্ডিত উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। বললো, এবার গ্রাম সায়েস্তা হয়ে যাবে। সকলকে বাপ্ বাপ্ বলে স্বীকার করতে হবে যে, ওয়াটার মানে জল, কাজে ওয়াটারলু যুদ্ধ হলো জলযুদ্ধ।

পণ্ডিত মশায় দেখলেন যে, বাবুর মনটা যথেষ্ট নরম হয়েছে। তাই বললেন, বাবা, আমার বাকী খাজনার বিষয়ে একটু বিবেচনা করতে হবে।

তা করতে হবে বৈকী, পণ্ডিত মশায় তখন উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করে সেরাত্রির মতো প্রস্থান করলো।

জলযুদ্ধের পক্ষে যখন এই রকম ব্যবস্থা হচ্ছিলো স্থলযুদ্ধের পক্ষেও তখন

নিষ্ক্রিয় ছিল না। তারা মাঠের মধ্যে নদীর ধারে বসে এর কি প্রতিকার করা যায়, সবে চিন্তা করছিল। ওরা আড়ালে গোবিন্দকে 'পেটমোটা গোবিন্দ' বলতো। পুরুতের ছেলে প্রধান বক্তা। সে বললো, পেটমোটা গোবিন্দর আর কত বুদ্ধি হবে? যে কথাটা সবাই জানে, সেটা বুঝতেও পারলো না। এই তো স্পষ্টই লেখা আছে, মহাবীর নেপোলিয়ান ওয়াটারলু স্থলযুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন, বলে, বইখানার প্রাসঙ্গিক অংশ সকলকে দেখিয়ে দিল। এখন দরকার হতে পারে বলে বইখানা সঙ্গে এনেছিল। সকলে যখন ঝুঁকে পড়ে বইখানা দেখছে, এমন সময়ে পায়রার ঝাঁকের মধ্যে চিলের আবির্ভাবের মতো গ্রামের পুরুতঠাকুর সারদাপণ্ডিত এসে বিনাভূমিকায় পুত্রের কান দুটি ধরে বললো, 'ভবে রে হারামজাদা, লড়াইটা জলযুদ্ধই হোক, আর স্থলযুদ্ধই হোক, তোর তাতে কি? এখন বাবুদের কাছারী থেকে চার বছরের বাকী খাজনা তলব করে পাঠিয়েছে, তার কী হয়?

একটি ছেলে বই খানার প্রাসঙ্গিক অংশ পুরুতঠাকুরের চোখের কাছে ধরে বললো, এই দেখুন ঠাকুরমশায়, লেখা আছে স্থলযুদ্ধ। ঠাকুরমশায় এই প্রত্যক্ষ প্রামাণ সত্বেও ঘাবড়ালেন না। বললেন, লেখা আছে সেটা আমিও দেখছি। কিন্তু চার বছরের বাকী খাজনা যার পাওনা, সে যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। দেখ খোঁজ করলেই জানতে পারবি ও বই যে লিখেছিল, সে জমিদারের বাকী খাজনার দায়িক ছিল না।

একজন ছেলে বললো, জমিদারের খাজনা দিয়ে ফেললেই হয়।

তবে রে ব্যাদড়া ছোকরা, যা বাড়ী গিয়ে দেখ, তোর বাপের নামেও বাকী খাজনার তলব এসেছে।

এই বলে সারদাঠাকুর নিজ ছেলেটির কান ধরে বললেন, ওঠ, আয়, আমার সঙ্গে। বাবুর কাছে গিয়ে পায়ে ধরে স্বীকার করগে যে, ওটা জলযুদ্ধই হয়েছিল। বইয়ে যা লিখেছে তা ছাপার ভুল।

পুরুতঠাকুরের পুত্র কিছু প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুরমশায়ের চটিজোড়া আরো বেশী উদ্যত হলো এবং পুত্রের পিঠে চটপট শব্দ করতে লাগলো। গতিক ভাল নয় দেখে সকলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। আর সারদাঠাকুর ছেলের কান ধরে জমিদারবাড়ীর দিকে চললেন।

এই যে দলাদলির সূত্রপাত হলো, তা উস্কে দেওয়ার লোকের অভাব

না হওয়াতে কিছুতেই থামলো না। স্থলযুদ্ধের পক্ষে বাপ-খুড়োরা জমিদারবাবুর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। সকলেই স্বীকার করলো যে, ছেলেরা অবুঝ। খবরের কাগজ পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে বলেই জমিদারের উপর কথা বলতে সাহস করে। ফলে বাকী খাজনা তাদের মাপ হয়ে গেল এবং সাব্যস্ত হলো যে, মহাবীর নেপোলিয়ান ওয়াটারলুর জলযুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

সে বছরে মহকুমার যাবতীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে চন্দনপুরের স্কুলটি আর ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় প্রথম হল চালকলাভোজী পুরুতের পুত্র যার মতে ওয়াটার যুদ্ধ স্থল যুদ্ধ। এই ফলাফলে গাঁয়ের অধিকাংশ লোক খুশী হন কারণ তাদের চালকলার বেশি জোটে না আর ওয়াটারলু যুদ্ধ জল যুদ্ধ কি স্থলযুদ্ধ সে বিষয়ে যাদের কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই। কিন্তু উদ্বিগ্ন হওয়ার লোকেরও একেবারে অভাব হল না। বাবুদের বাড়ীর গোবিন্দ হেড পণ্ডিতকে ডাকিয়ে এনে দাবী করলেন, পণ্ডিতমশাই, এ কেমন হল? সারদা পণ্ডিত যে সিদ্ধান্ত স্থির করে রেখেছিল তা জানালো, ওরা প্রশ্ন পত্র চুরি করেছিল।

সে কথা তো কেউ জানবে না, জানবে যে আমি মূর্খ, আমি ফেল করেছি।

পণ্ডিত বলল, বাবা চুরি করা প্রশ্নপত্র পরীক্ষা দিয়ে পাশ করবার চেয়ে ফেল করা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ কারণ সততা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ।

পণ্ডিতের উপদেশে গোবিন্দ সান্ত্বনা পেলো কিনা জানি না কিন্তু বাধা ঘটালো স্কুলের ছাত্রদের আচরণে। অভিধান তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও তাদের দারুন আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল বাবুদের বাড়ীর গোবিন্দ ও হেড পণ্ডিতের উপরে। এখন পুরুতঠাকুরের চালকলাভোজী পুত্রের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় তাদের আনন্দের অবধি থাকলো না। তাদের উপর সংসারের অবিচারে তাদের ধারণা ঈশ্বর ফীশ্বর কিছু না—কিন্তু এখন পট পরিবর্তনের ফলে তাদের ধারণারও পরির্তন ঘটলো। তারা স্থির করলো ঘটা করে একটা সভা করতে হবে, কারণ এ জয় স্বয়ং ঈশ্বরের জয়।

কিন্তু গোল বাধলো সভাপতি নির্বাচনে, কেউ সভাপতি হতে চায় না। ছাত্রদের ভাব গতিক দেখে সকলেই বুঝে নিয়েছিল—এই সভার আসল উপলক্ষ্য সারদা ঠাকুরের পুত্রের প্রথম স্থান অধিকার নয়, বাবুদের বাড়ীর

গোবিন্দর ফেল হওয়া। স্কুলের শিক্ষক, গাঁয়ের ডাক্তার কবিরাজ, মহাজন প্রভৃতি কেউই রাজি নয় এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে, বিশেষ সকলেই জমিদারের জোতজমি রাখে। ছেলেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো তবে কি সভাপতির অভাবে সভা পণ্ড হয়ে যাবে। সবাই যখন চিন্তাকুল ভাবে বসে আছে এমন সময় তাদের চোখে পড়লো মহাসমুদ্রের মধ্যে ভাসমান গাছের ডাল। সবাই দেখলো চায়না তসরের কোট গায়ে ছাতা মাথায় একটি শীর্ণকায় ভদ্রলোক গ্রামে প্রবেশ করছে, পিছনে একটি লোকের মাথায় ছোট একটি বিছানা ও বাক্স। লোকটি গাঁয়েরই বটে আবার গাঁয়েরও নয়, অর্থাৎ এই গাঁয়ে বাড়ী হওয়া সত্ত্বেও গাঁয়ের নয়। লোকটি বগুড়া মুন্সেফী আদালতের পেশকার, সেখানেই থাকে। গাঁয়ে আসবার বড় সুযোগ হয় না। লোকটি বিপত্নীক। তাকে দেখবামাত্র একটি ছাত্র লাফিয়ে উঠে বললো—হয়েছে আর ভাবনা নেই। যার কাজ তিনিই চালিয়ে নেবেন। মনে রাখতে হবে এ জয় তাদের ব্যক্তিগত নয় স্বয়ং ঈশ্বরের জয়। সে ছুটে গিয়ে লোকটির পায়ের কাছে গিয়ে বললো—"দাদাবাবু কখন এলেন?" এইরকম দাদাবাবু, জ্যেঠামশাই, অন্নদাদাদু প্রভৃতি নানা সম্ভাষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন—বাবা এই তো গাঁয়ে ঢুকছি, তা তোমরা এত সকালে কি মনে করে? ওরা বললো আপনার জন্য এসেছিলাম। জানতাম আপনি আসবেনই। কি ব্যাপার বলতো?

ব্যাপার আর কিছুই নয়, আজ একটা সভা হবে তাতে আপনাকে সভাপতির পদ অলংকৃত করতে হবে।

—কেন? গাঁয়ে কি আর লোক ছিল না?

—লোক তো অঢেল আছে, কিন্তু লোকের মত লোক চাইতো।

—তা কিসের সভা? ছাত্ররা সত্যের অপলাপ না করেও বললো—এই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া আর কি।

তা বেশ বেশ তোমাদের এমন সুমতি হয়েছে বড় খুশী হলাম, তা সভা কখন বলতো?

—এই বিকেল বেলা, আপনাকে ডেকে আনবো।

—তাহলে এখন বাড়ীর দিকে যাই।

—সেই ভালো, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

—হ্যাঁ সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে অন্নদাবাবু বাড়ীর দিকে প্রস্থান

করলেন। হায় তখন কি তিনি জানতেন এই সরল চিত্ত সত্য পেনসন প্রাপ্ত বৃদ্ধ অজ্ঞাতসারে কি সাপের গর্তে (বাঘের গর্তেও হতে পারে) প্রবেশ করলেন।

সভার স্থান নির্বাচন নিয়ে গোলমাল বেধে গেল। স্কুলের সেক্রেটারী জমিদারের দেওয়ান জমিদারের ইঙ্গিতে স্কুলে স্থান দিতে অস্বীকার করলো। গ্রামে একটা হরিবাড়ী ছিল। সেখানে বারোয়ারী পূজো ও যাত্রাভিনয় প্রভৃতি হয়ে থাকে। দেখা গেল সেখানেও কোনো এক অদৃশ্য হাতের প্রভাবে স্থান পাওয়া গেল না। তখন ছেলেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। গাঁয়ে সভা করবার মতো আর তো প্রশস্ত জায়গা নেই। তখন তারা স্থির করলো যে, অন্নদাবাবুর কাছেই যাওয়া যাক্। তাঁর বাড়ীতে মস্ত একটা আটচালা ঘর আছে। অন্নদাবাবু তাদের আর্জি শুনে বললেন, তোমাদের জায়গা তো দিতেই হয়; কিন্তু কী জানো ঐ ঘরখানা কোনো শুভকার্য করতে আমার গুরুর নিষেধ আছে। ছেলেরা আবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। একজন বললো কাকাবাবু গাঁয়ে আর তো জায়গা দেখি নে।

এক কাজ করো না কেন—হাটের মধ্যে অনেকটা খোলা জায়গা আছে। সেখানে দিব্যি সভা হতে পারে। আর তা ছাড়া আজকে হাটবার, সভার লোকেরও অভাব হবে না। ছেলেরা একযোগে বলে উঠলো, এই দেখুন, এই সহজ কথাটা আমাদের কারোও মাথায় আসে না।

অন্নদাবাবু বললেন, তা বাবা আজকের সভার বিষয়টা কী?

বিষয় এমন কিছুই নয়। এই আমাদের টোলের পণ্ডিতমশায়ের পুত্র এবার মহকুমার যাবতীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তাকে একটু আমাদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো।

কই হে, নকুড় কোথায়?

নকুড় এগিয়ে এসে তাকে প্রণাম করলো।

বা, বা বেশ ছেলেটি তো। বড় হয়ে মুন্সেফের পেশকার হবে নিশ্চয়।

টোলের পণ্ডিতী থেকে একেবারে পেশকার পদে উন্নীত হবার সম্ভাবনায় বিগলিত চিত্ত নকুড়ও আর একবার তাকে প্রণাম করলো।

অন্নদাবাবু তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, পেশকার পদের প্রধান গুণ হচ্ছে সততা—একথা মনে রেখো।

ছাত্ররা ছেলেমানুষ হলেও আণবিক যুগের ছেলেমানুষ। কোন্ কথার কী অর্থ তারা বেশ বুঝতে পারে। ছেলেরা তখন তগ্দত চিত্তে একটি টাকার থলি তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলো।

তিনি শুধোলেন, এ আবার কী?

—কিছুই নয়, কাকাবাবু, সামান্য প্রণামী। আপনার যোগ্য টাকা কোথায় পাবো?

যা জোগাড় করতে পেরেছি নিয়ে এসেছি।

—কেন আবার এই হাঙ্গামা করতে গেলে—বলে তিনি টাকার থলিটি পকেটস্থ করলেন।

ছেলেরা সভার উদ্যোগ করবার জন্য প্রস্থান করলো।

ইতিপূর্বে জমিদারের দেওয়ান অন্নদাবাবুকে কিছু প্রণামী দিয়ে এসেছিল তিনি বিনা দ্বিধায় উভয় পক্ষের প্রণামী আত্মসাৎ করলেন।

এই কাজটিতে পেশকারের দল পটু। তারা বাদী-বিবাদী দুই পক্ষ থেকেই প্রণামী গ্রহণ করে। যে পক্ষ জেতে তারা পেশকারবাবুর সততার প্রশংসা করে বাড়ী ফিরে যায়।

সততাই আদালতের পেশকারদের প্রধান গুণ।

বাবুদের বাড়ীর গোবিন্দ ফরাসের উপরে গড়াচ্ছিল। এমন সময়ে দেওয়ানজী এসে খবর দিল, বাবু, ছেলেরা আর কোথাও জায়গা না পেয়ে হাটতলাতে সভা করবে স্থির করেছে।

এটা কেমন হলো—দেওয়ানজী।

দেওয়ানজী বললো, ঠিকই হয়েছে। আমি প্রণামী দিতে গিয়ে অন্নদা-বাবুকে বলেছিলাম, হাটতলাতে সভা করবার জন্য ছেলেদের বলে দেবেন, তারা আর কোথাও জায়গা পাবে না।

কিন্তু সভা করলেই যে, আমার নামে একটা কেলেঙ্কারী রটাবে।

বাবুজী, সে ভয় আপনি করবেন না, সভা করতেই পারবে না। আমি হাটের সব বড় মহাজনের গদিতে বলে দিয়েছি, খবরদার, এখানে স্কুলের ছেলেরা যেন সভা করতে না পারে, সমস্ত হাটের মালিকানাই আমাদের। কাজেই তারা অন্যথা করবে না।

উৎসাহে ও আনন্দে গোবিন্দ ফরাসের উপর উঠে বসে বললো, এ বেশ বন্দোবস্ত করেছেন। তবু কিছু পাইক ও সড়কিওলাদের কাছাকাছি রেখে

দেবেন।

দেওয়ানজী বললো, অনেকদিন আমি আপনাদের সরকারে কাজ করছি। এ সব কাজ আমাকে মনে করিয়ে দেওয়াই বাহুল্য।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হলো। অর্থাৎ আদৌ আরম্ভ হতে পারলো না। হাটের লোকজন যথেষ্ট। কিন্তু সকলেই কেনা-বেচায় ব্যস্ত। যাকেই বলা হয়, ভাই সভায় এসে বসো, উত্তর শুনতে পায়, দাঁড়াও দাদাবাবু, এই আনাজগুলো বেচেনি।

ওদিকে অন্নদাবাবুকে একখানি চেয়ারে এনে বসানো হয়েছে। গলায় একটা ফুলের মালাও দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটি হয়নি।

তখন ছেলেরা দেখলো, হাটে কেনা-বেচা শেষ হতে-হতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন আর সভা হবে কেমন করে। কাজেই তাদের অনুরোধে সভাপতি মশায় উঠে দাঁড়িয়ে নকুড়ের প্রথম স্থান অধিকার করবার জন্য তাকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ করলেন।

এ পর্যন্ত সমস্তই পূর্ব নির্দেশমতো হলো। কিন্তু তারপরেই বাধলো গোলমাল। নকুড় উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা একভাবে বললো, আপনারা সব মহাজনব্যক্তি। আপনারা বলুন, ওয়াটারলু যুদ্ধ স্থলযুদ্ধ না জলযুদ্ধ। বলাবাহুল্য হাটের কোনো লোক ওয়াটারলুর যুদ্ধের নাম শোনেনি। কাজেই সেটা জলযুদ্ধ না স্থলযুদ্ধ তাতে তাদের কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। তারা যে যার কেনা-বেচা করতে লাগলো। নকুড়ের দল দেখলো আসল মজাটাই মাটি হবার উপক্রম। এত আয়োজন কী তারা করেছে নকুড়কে সংবর্ধিত করার উদ্দেশ্যে। তাই মজাটাকে আর একটু উস্কে দেবার আশায় একজন আবার জিজ্ঞাসা করলো, বলুন আপনারা, ওয়াটারলুর যুদ্ধটি স্থলে ঘটেছিল না জলে।

এই উত্তরহীন প্রশ্নের ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসাবে শোনা যাচ্ছিল, বেগুনের সের ৫ আনা? আলু কবে থেকে আট আনায় উঠলো হে, না-না বাপু ও মাছ তোমার পচা নেবো না।

কর্তা, এ মাছ কি পচা হতে পারে—কান্‌কো দেখুন।

কানে আলতা পরিয়ে এনেছো। ও সব জানি।

এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেনি যে, সভাপতির টেবিলের উপরে এক গেলাস জল ও একটুকরো ঢিল ছিল। নকুড়ের দলের একজন বললো,

এই দেখো জল। এর ইংরীজি নাম, ওয়াটার, আর এই যে দেখছো

মাটি, এর ইংরাজী নাম ল্যাণ্ড। এখন বলো দেখি, ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ জলযুদ্ধ না স্থলযুদ্ধ।

যাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে তখন কাঁচালঙ্কা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করছিলো। আগে কয়েকবার তার উপরে এই প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললো, কী জানি মশায়—জল না স্থল? আমার এই কাঁচা লঙ্কার দর যদি জানতে চান তো বলতে পারি।

তখন মজা জমছে না দেখে, নকুড়ের দলের একজন বলে উঠলো এই আমাদের বাবুদের বাড়ীর গোবিন্দ বলছিলো। ওয়াটারলু'র যুদ্ধ জলযুদ্ধ। সেইজন্য পরীক্ষায় সে ফেল করেছে। আর আমাদের এই নকুড় লিখেছিল ওয়াটারলু'র যুদ্ধ স্থলযুদ্ধ। তাই সে প্রথম হয়েছে। এইবার সভাপতি মশায় মীমাংসা করে দিন, ওটা স্থলযুদ্ধ না জলযুদ্ধ?

এই অতি দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা আর হলো না। বাবুদের বাড়ীর ছেলের নিন্দা শোনবা মাত্র নেপথ্যবর্তী নির্দিষ্ট অভিনেতার মতো লাঠিয়াল ও সড়কীধারীর দল মার মার শব্দে সভার উপরে এসে পড়লো। হাটের লোকজন সমস্ত অবাক। এ আবার কী আপদ?

কাঁচালঙ্কা যে বেচছিল, সে তখন খদ্দেরের সঙ্গে দরাদরি করছে। মাছ-ওয়ালা তখনো খদ্দেরকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, না মশায়, ওটা আলতা নয়, আসল রক্ত।

হাটের মধ্যে তখন সড়কি ও লাঠি চলছে। হাটের লোক পালাতে শুরু করেছে। সকলের আগে ছুটছেন সভাপতি মহাশয়। সভাপতি মহাশয় ও শ্রোতাদের ঐকান্তিক অভাবে ওয়াটারলু'র যুদ্ধ কী স্থলযুদ্ধ এই দুরূহ ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা আর হলো না। আর মীমাংসা হলো না, মাছের কানকোতে ওটা আলতা না আসল রক্ত।

অন্নদাবাবু পেশকারদের চিরাগত প্রথা অনুযায়ী কোনো পক্ষ বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নি—এ কথা পরদিন গাঁয়ে একটা প্রবাদের মতো মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল। কিন্তু কেউ যখন তাঁকে প্রশংসা করতেন, তিনি বলতে পারতেন হ্যাঁ হে ঐ যে কি যেন লড়াইটার নাম করলো সেটা জলে হয়েছিল না মাটিতে হয়েছিল, কিছু জানো?

লোকে বলতো, ছেড়ে দিন মশায়, চ্যাংড়াদের কথা। জলে হোক্ আর স্থলে হোক্ আমাদের পক্ষে সমান। আলতা পরানো মাছের দাম আর

কাঁচালঙ্কার দাম যে রকম বেড়ে চললো, জল ও স্থল এখন আমাদের পক্ষে সমান।

এইভাবে ওয়াটারলু যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব সমাধা হল।